মহাপীঠ তারাপীঠ

শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়

দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড
ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ
১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

প্রকাশক :—
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে
১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯

মুদ্রাকর :—
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি, এস-সি,
দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ
১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

সূচীপত্র

[শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্ত্যলীলা (শেষার্ধ)। বাংলা ১৩১২ সনের মাঝামাঝি থেকে ১৩১৮ সন পর্যন্ত।]

১।	তারাময় শ্রীবামের অমৃত কথা—	১
২।	শ্রীবামকৃপাধন্য যোগেশ ব্রহ্মচারী—	৯
৩।	শ্রীবামকরুণাধণ্য হরিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—	২৫
৪।	করুণার সাগর বামদেব—	২৯
৫।	শ্রীবামকৃপাধন্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস—	৩২
৬।	শ্রীবামভক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়—	৪৫
৭।	শ্রীবামকৃপাধন্য গৌর প্রামাণিক—	৪৮
৮।	ভক্ত নিমাই দাসের জীবন লাভ—	৫০
৯।	পরমপ্রেমিক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা—	৫৫
১০।	শ্রীবামের আশ্চর্য শিক্ষাদান—	৫৯
১১।	শ্রীবাম কর্তৃক প্রসাদের মাহাত্ম্য প্রদর্শন—	৬০
১২।	বামদেবের অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে গমন—	৬৪
১৩।	দান কাকে বলে?—	৬৬
১৪।	শ্রীবাম করুণাধন্য অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—	৭০
১৫।	শ্রীবামের বিচিত্র লীলা—	৭৩
১৬।	শ্রীবাম কৃপাধন্যা কবিচন্দ্রপুরের জটামা—	৭৫
১৭।	ভক্তপ্রবর শ্রীমাখন চক্রবর্তী—	৭৭
১৮।	ভাগ্যবান রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—	৭৮
১৯।	শ্রীবাম করুণাধন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং—	৮২
২০।	চিহ্নিত গুরু শিষ্য ও আদর্শ গুরু সেবা—	৮৭
২১।	শ্রীবাম কৃপাধন্য সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়—	৯০
২২।	শ্রীবামের আশ্চর্য করুণাঘন লীলা—	৯৪

২৩। শাসক ও সেবকরূপে পাণ্ডাগণ— ৯৭
২৪। শ্রীবামকৃপাধন্য সুশীল কুমার রায়— ১১৮
২৫। নামপ্রেমে শ্রীবাম— ১২৫
২৬। শ্রীবামের আশির্বাদধন্য শ্রীবাস মণ্ডল— ১২৮
২৭। শ্রীবাম কৃপাধন্য ভক্ত গুপীলেত— ১৩০
২৮। সাধু কাকে বলে— ১৩৬
২৯। শ্রীবাম করুণাধন্য প্রমথনাথ চক্রবর্তী— ১৪১
৩০। শ্রীবাম স্নেহধন্য যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— ১৪৮
৩১। নিজ বয়স সম্পর্কে বামদেবের বিচিত্র মন্তব্য— ১৫১
৩২। শ্রীবাম কৃপাধন্যা সরোজ কুমারী দেবী— ১৫৫
৩৩। প্রেম ভক্তির বিগ্রহ শ্রীবাম— ১৫৭
৩৪। বামদেবের নরেন মুস্তাফীর গৃহে গমন— ১৫৯
৩৫। শ্রীবাম কৃপাধন্য জনৈক কুষ্ঠ রোগীর আরোগ্য লাভ— ১৬১
৩৬। শ্রীবামের একটি অবিস্মরণীয় লীলা— ১৬৩
৩৭। চৈতন্যময় বামদেব ও ভক্ত ভূপতি পাণ্ডা— ১৬৫
৩৮। শারদীয়া চতুর্দশী মেলায় তারাময় বামদেব এবং
ভক্তবৃন্দ—১৬৯
৩৯। শ্রীবাম করুণাধন্যা দাক্ষায়নী দেবী— ১৭৬
৪০। লীলাময় বামদেবের আশ্চর্য লীলা— ১৮০
৪১। শ্রীগুরু বাম ও শাকম্ভরী ভৈরবী মা— ১৮৪
৪২। শ্রীবামের বক্রেশ্বর গমন ও পরম দিব্যলীলা দর্শন— ১৮৭
৪৩। শ্রীবামের বিষ্ণুপুর কালীমন্দিরে গমন ও
অলৌকিক পূজা—১৯৫
৪৪। শ্রীবাম সান্নিধ্যে বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস— ১৯৭
৪৫। শ্রীবামের তেলিয়ানা গ্রামে গমন ২০১
৪৬। শ্রীবাম কৃপাধন্য শরৎকুমার সেন এবং একটি সিদ্ধ
সাধক বংশের কাহিনী—২০৩
৪৭। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ও ক্ষ্যাপাবাবার বিচিত্র লীলা— ২২১
৪৮। করুণাময় শ্রীবাম ও ভাগ্যবান নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— ২২৫

৪৯। বিচিত্র প্রভু শ্রীবাম ও বিচিত্র ভৃত্য 'নোদা'— ২৩০
৫০। ভাগ্যবান মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়— ২৪১
৫১। শ্রীবাম কৃপাধন্য শালখের ভক্তবৃন্দ— ২৪২
৫২। শ্রীবাম করুণাধন্য বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় ২৪৫
৫৩। শ্রীবাম কৃপাধন্যা সন্ধ্যাজোলের ভক্তিমতী মহিলা— ২৪৭
৫৪। শ্রীবামের সেবায় সস্ত্রীক শচীপাণ্ডা— ২৪৯
৫৫। মুণ্ডমালিনতলায় লীলাময় শ্রীবাম— ২৫৩
৫৬। শ্রীবাম স্নেহধন্য অবিনাশ চৌধুরী— ২৫৮
৫৭। ভক্তপ্রবর জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য— ২৬০
৫৮। শ্রীবামানুজ রামচন্দ্রের দেহত্যাগ— ২৬১
৫৯। শ্রীবাম দর্শনে মহাত্মা ভুলুয়াবাবা-- ২৬৫
৬০। শ্রীবাম করুণাধন্য শশীমোড়ল— ২৭১
৬১। লীলাতরঙ্গে শ্রীবাম— ২৮১
৬২। চৈতন্যময় শ্রীবাম ও জড়মুখী ললিত গোঁসাই— ২৮২
৬৩। সাধকপ্রবর শীতলচন্দ্র ঘোষ— ২৯২
৬৪। শ্রীবামের সেবায় চণ্ডীপুরের পালগণ— ২৯৩
৬৫। বৃন্দাবনে শ্রীবামের অলৌকিক পূজা -- ২৯৬
৬৬। শ্রীবামের আশীর্বাদধন্য সস্ত্রীক নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— ৩০১
৬৭। ভাগ্যবান শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়-- ৩০৩
৬৮। শ্রীবামের করুণাধন্য সস্ত্রীক গোপীনাথ নরসুন্দর— ৩০৫
৬৯। রাঙ্গাবাবুর মরদেহ ত্যাগ— ৩০৮
৭০। সংগীতানন্দে শ্রীবামাক্ষ্যাপা— ৩০৯
৭১। পুরীতে শ্রীবামের অলৌকিক পূজা— ৩১৪
৭২। শ্রীবাম সান্নিধ্যে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ — ৩২১
৭৩। ভক্তপ্রবর দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়— ৩২৪
৭৪। শ্রীবামের আশীর্বাদধন্য সপুত্র যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা— ৩২৮
৭৫। শ্রীবাম করুণাধন্য কালীদাস লাহিড়ী ও উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৩৩১
৭৬। করুণাঘন বামদেব ও সেবক নোদা— ৩৩৮
৭৭। শ্রীবামের বিচিত্র দিব্যজ্ঞান— ৩৪৮

৭৮। ভক্তপ্রবর যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— ৩৫০
৭৯। ভক্ত ও সেবকরূপে নগেন্দ্রনাথ বাগচী— ৩৫২
৮০। শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বার তারাপীঠে আগমন—৩৫৮
৮১। শ্রীবাম কৃপাধন্য জ্ঞানানন্দ পরমহংস— ৩৬৬
৮২। বামদেবের টাকাচুরি প্রসঙ্গে— ৩৬৮
৮৩। স্যার মহারাজের কৃপালাভ— ৩৭৭
৮৪। ভক্ত সঙ্গে শ্রীশ্রীবামদেব— ৩৭৯
৮৫। ভাগ্যবান ভোলানাথ দত্ত— ৩৮৩
৮৬। শ্রীবাম করুণাধন্য সবান্ধব ননী কোনাই— ৩৮৪
৮৭। শ্রীবাম কৃপাধন্য সবান্ধব লালমোহন মুখোপাধ্যায়— ৩৮৭
৮৮। লীলাময় বামদেব কর্তৃক ব্রেন আটক ও মুক্তিদান— ৩৯৩
৮৯। শ্রীবাম দর্শনধন্য কমলাক্ষ রায়— ৩৯৪
৯০। শ্রীবাম কৃপাধন্যা কুণ্ডলিনী ও ননীবালা দেবী এবং শ্রীবাম ভক্ত গোপেশ্বর মাস্টার—৩৯৭
৯১। ভাগ্যবান হলধর দাস— ৪০০
৯২। শ্রীবামের মৃত্যুর স্বরূপ প্রদর্শন— ৪০১
৯৩। শ্রীবাম স্নেহধন্য শ্রীশ রায়— ৪০৩

নিবেদন

ত্রিভুবনতারিনী ত্রিলোকজননী অপারকরুণাময়ী, ব্রহ্মময়ী তারামায়ের অসীম কৃপায় 'মহাপীঠ তারাপীঠ' চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। তৃতীয় খণ্ডে শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্ত্যলীলার প্রথমার্ধ বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান চতুর্থ খণ্ডে তাঁর বিশাল অন্ত্যলীলার শেষার্ধ বর্ণিত হ'ল।

ইতিপূর্বে স্থির ছিল যে চারখণ্ডে মহাপীঠ তারাপীঠ গ্রন্থ সুসম্পন্ন হ'বে—

প্রথম খণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে তারাপীঠের প্রাচীন ও মধ্যযুগ এবং শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আদি লীলা। দ্বিতীয় খণ্ডে শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মধ্যলীলা। তৃতীয় খণ্ডে যুগাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্ত্যলীলা। চতুর্থ খণ্ডে তারাপীঠের আধুনিক যুগ, সাধন পরম্পরার ইতিহাস শ্রীশ্রীবামপঞ্জী প্রভৃতি বিশদ ভাবে বর্ণিত হবে। এই চারখণ্ডেই এই গ্রন্থ সমাপ্ত হবে।

কিন্তু অনন্ত লীলাময়ী তারামা ও করুণাময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ইচ্ছে অন্যরূপ। তাই শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্ত্যলীলায় এত বিশাল তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটলো যে চতুর্থ খণ্ডও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্ত্যলীলায় পরিপূর্ণ হ'ল। ফলে পঞ্চম খণ্ডে তারাপীঠের আধুনিক যুগ বর্ণিত হবে। চতুর্থ খণ্ড শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্ত্যলীলার অসংখ্য মণিমাণিক্যে উদ্‌ভাসিত। তাঁর মহাকরুণা ও মহালীলার প্রাণবন্ত বিগ্রহ এই চতুর্থ খণ্ড।

সুতরাং অনন্ত ভাবময়ী তারামা ও লীলাময় বামাক্ষ্যাপার ইচ্ছায় 'মহাপীঠ তারাপীঠ চতুর্থ' খণ্ড থেকে পঞ্চম খণ্ডে পর্য্যবসিত হ'ল।

ব্রহ্মময়ী তারামা ও শিবাবতার ব্যামাক্ষ্যাপা বাবার ইচ্ছায় এই

বিশাল গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছে। এই মহাগ্রন্থের পরম স্রষ্টা তাঁরা-ই। এই দীন লেখক কেবল নিমিত্ত মাত্র।

ব্রহ্মময়ী তারামায়ের নিত্যলীলা নিকেতন পরম ব্রহ্মক্ষেত্র তারাপীঠে শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে অফুরন্ত দিব্য ঐশী লীলা অনুষ্ঠিত করে তারাপীঠের আধ্যাত্মিক স্বরূপ ও তারামায়ের দিব্যলীলা মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করে গেছেন। আজো তাঁর নিত্যলীলা তারাপীঠে অব্যাহত রয়েছে। তাঁর এই ঐশী লীলা উপলব্ধি করতে হলে পরম ব্রহ্মক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠের মূল অধ্যাত্ম স্বরূপ জানতে হবে। কারণ তারাপীঠের অধ্যাত্ম অন্তর লোকে রয়েছে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবী তথা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল অধ্যাত্ম স্বরূপ।

অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিরঅধিশ্বরী, আদিভূতা ব্রহ্মসনাতনী, একাধারে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের নিত্য প্রাণবন্ত বিগ্রহ, সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী ব্রহ্মময়ী তারামায়ের দিব্যলীলা ক্ষেত্র সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়েই।

অনাদিকাল ধরে তাঁর এই নিত্যলীলা অব্যাহত রয়েছে অফুরন্ত ধারায়। একাধারে তিনিই যে ব্রহ্ম জীব ও জগত। তাই অনন্ত ভাবময়ী তারামা এই লীলা করছেন অনন্ত নামে অনন্ত রূপে।

তিনিই জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয়, তিনিই ধ্যান ধ্যাতা ধ্যেয়। তিনিই সব। কাল প্রবাহের ন্যায় তাঁর এই অনাদি অনন্ত দিব্যলীলা অবিরাম ছুটে চলেছে অফুরন্ত অমৃত ধারায়।

মহাচৈতন্যময় এই দিব্যলীলা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চললেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা আরো চৈতন্যময়, আরো আনন্দময় ও আরো অমৃতময় রূপে যুগ যুগ ধরে সুচিহ্নিত।

যেমন পরমেশ্বরী তারামায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানবদেহ। সর্বজীবে তিনি বিরাজ করলেও এই মানব দেহে তিনি বিশেষ ভাবে বিরাজিতা। তাঁর লীলা চৈতন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আধার এই মানব দেহ।

মানুষই একমাত্র তাঁকে ধারণা করতে পারে, ধ্যান করতে পারে, দর্শন করতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, তাঁর দিব্যলীলা আস্বাদ করতে পারে—যা মনুষ্যেতর জীবলোক পারে না।

দেব বাঞ্ছিত এই নরদেহ তাই ঈশ্বরের মহান লীলা ক্ষেত্র। স্বয়ং ঈশ্বরও নরাকারে বার বার এসে লীলা করেন ('কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ')।

পরমেশ্বরী তারামায়ের সৃষ্টি এই দুর্লভ মানব দেহের মধ্যে আবার বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র আরো মহান আরো মর্য্যাদা মণ্ডিত। যেমন মানব দেহের মস্তক, নয়ন, কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, কণ্ঠ, হৃদয় প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলো। ঈশ্বরের চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, দর্শন, উপলব্ধি, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম প্রভৃতির জন্য উপরোক্ত এই বিশিষ্ট মহান ক্ষেত্রগুলো চিরন্তন সুনির্দিষ্ট ও সচিহ্নিত।

তেমনি এই অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি পরম পবিত্র ক্ষেত্র, অতীব নিগূঢ় দিব্য অধ্যাত্ম ক্ষেত্র রূপে সুনির্দিষ্ট ও সুচিহ্নিত হয়ে আছে।

উর্দ্ধ সপ্তলোক ও নিম্ন সপ্তলোক বিশিষ্ট এই চৌদ্দ ভুবনের মধ্যে এই দিব্য ক্ষেত্র সকল বিশেষ ভাবে বিরাজিত। অনন্ত ভাবময়ী অনন্ত লীলাময়ী তারামায়ের নিত্যলীলা নিকেতন রূপে এই মহাপবিত্র মহাজাগ্রত দিব্য অধ্যাত্ম ক্ষেত্র সকল যুগ যুগ ধরে সুচিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

এই চৌদ্দ ভুবনের মধ্যে বিশিষ্ট দিব্য অধ্যাত্ম ক্ষেত্রগুলো হ'ল পরব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোক, সত্যলোক, তপোলোক, মহলোক এবং দেবভূমি ভারতবর্ষ।

এই মহাবিশ্বের মধ্যে দেবভূমি ভারতবর্ষ তথা দেবতাত্মা ভারতবর্ষের স্থান খুব উচ্চে। এই পরম পবিত্র অধ্যাত্ম ক্ষেত্র পরম ব্রহ্মময়ী তারামায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিব্যলীলা ক্ষেত্র রূপে সুচিহ্নিত। সমগ্র পৃথিবীর অধ্যাত্ম চেতনা, দিব্য ভাবনা, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ও মূল উৎস হ'ল এই দেবতাত্মা ভারতবর্ষ। তাই পৃথিবীর চিরন্তন ধর্মগুরু এই দেবভূমি ভারতবর্ষ।

সারা পৃথিবীর মধ্যে এই পরম পবিত্র দিব্য ক্ষেত্র ভারতবর্ষেই রয়েছে কেবল অফুরন্ত অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য সকল। যা সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়ের বিষয়।

এই দিব্য অধ্যাত্মপূর্ণ দেবভূমি ভারতবর্ষেই রয়েছে মহাশক্তি পূর্ণ ১০৮ সতীপীঠ, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, চার ধাম, সপ্ত মোক্ষপুরী (অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তি, পুরী), সপ্ত পরম পবিত্র নদী (গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী) এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে অগণিত দেব দেবীর মন্দির ও মহান তীর্থ ক্ষেত্র সকল। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ও কামাখ্যা থেকে দ্বারকাধাম পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই মন্দিরময় তীর্থময় মহান দিব্যভূমি বিরাজিত।

বিশ্বের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ধর্মমেলা তথা কুম্ভমেলা এই দেবতাত্মা ভারতবর্ষের চারটি স্থানে বহুযুগ ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে (হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী)।

অধ্যাত্ম জগতের এত বিশাল এত অফুরন্ত বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। ভারতের দিকে দিকে রয়েছে সকল ধর্মের সকল ভাবসাধনার তীর্থ সকল।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, শিখ, প্রভৃতি সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন ক্ষেত্র সকল রয়েছে ভারতের দিকে দিকে। অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ভাব সাধনার সাধনপীঠসকল সগৌরবে ভারতের দিকে দিকে বিরাজিত। শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর ব্রহ্ম গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও পথের সাধক সাধিকাগণ বিশাল বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সাধন করেছেন। পৃথিবীর চিরন্তন ধর্মগুরু এই ভারতবর্ষকে জানলে তাই পৃথিবীকে জানা যায়।

এই অধ্যাত্ম ভারতবর্ষের অন্তরেই রয়েছে পৃথিবীর মর্মবাণী। তাই জগতের সকল ধর্মের কর্মের ও মর্মের কেন্দ্রভূমি হ'ল এই দেবতাত্মা ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের এই অফুরন্ত অধ্যাত্ম সম্পদই হ'ল ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শাশ্বত সম্পদ। যুগ যুগ ধরে তা অম্লান রয়েছে। বহিরঙ্গে ভারতের রূপ বার বার পাল্টালেও অন্তরঙ্গে তা আজো অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে ভরা এই দেবভূমি ভারতবর্ষের আয়তনে ছিল পুরাকালে সুবিশাল।

এই মহাভারতবর্ষের আয়তন এত বিশাল ছিল যা বর্তমান কালে কল্পনা করা যায় না।

রামায়ণের যুগে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। মহাপরাক্রমশালী রাবণ জয়ী শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব সেকালে পৃথিবীর সকল রাজন্যবর্গই স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সপ্তদ্বীপা বিশিষ্টা এই পৃথিবী সম্পূর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের করতলগত ছিল। মহাভারতীয় যুগেও এর বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল না।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর রাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় দেখা যায় যে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব চতুরঙ্গী সেনা নিয়ে প্রায় সমগ্র পৃথিবী জয় করে আসেন।

বৌদ্ধ যুগেও ভারতবর্ষের আয়তন ছিল বিশাল। তখন তিব্বত, বার্মা, জাভা, কম্বোজ, সিংহল প্রভৃতি এই মহাভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল। তখন ভারতবর্ষের আয়তন ছিল উত্তরে তিব্বত থেকে দক্ষিণে সিংহল, পূর্বে কম্বোজ থেকে পশ্চিমে গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার, আফগানিস্থান)।

পৃথিবীর চিরন্তন ধর্মগুরু এই ভারতবর্ষ থেকেই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম তথা সনাতন হিন্দুধর্ম সর্বপ্রথম পৃথিবীকে শুনিয়েছে ধর্মের বাণী। বহু সহস্র বছর পূর্বে ভারতবর্ষের মহাজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ ঋষিগণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে উদার্ত স্বরে বলেছেন।

"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্য ধামাণি তস্তু
বেদাহমেতাং পুরুষো মহান্তম্
আদিত্য বরণাং তমসু পরস্তাৎ।"

শোন বিশ্ববাসী, শোন অমৃতের পুত্রগণ, আমরা বেদ বিহিত সেই পরম জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি। যাঁকে জানলে সকল অজ্ঞানতা দূর হয়। আত্মস্বরূপ লাভ হয়।

এই ভারতবর্ষ থেকেই পরবর্তীকালে (খৃষ্টপূর্ব পাঁচশো বছরেরও পূর্বে) হিন্দুধর্মেরই অঙ্গস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করে। ভগবান বুদ্ধের অহিংসা, করুণা, মুদিতা,

প্রেম, মৈত্রীর মহাবাণী সমগ্র বিশ্বে ধীরে ধীরে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ-ধর্মের সমসাময়িক আরেক অহিংসা ও প্রেমের ধর্ম জৈন ধর্মও এই সময় ভারতে ও ভারতের বাইরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

পৃথিবীর তিনটি সুপ্রাচীন মহান ধর্ম (হিন্দু বৌদ্ধ জৈন) পৃথিবীর ধর্মগুরু এই ভারতবর্ষই পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে ? তাছাড়া ভারতবর্ষ উপহার দিয়েছে পৃথিবীকে তার দর্শন, সাহিত্য, সংগীত. স্থাপত্য, শিল্পকলা, জ্যোতিষ প্রভৃতি অফুরন্ত অমূল্য সম্পদ। যা সর্বতো-ভাবে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষ যেমন জগতের মধ্যে ত্যাগে শ্রেষ্ঠ তেমনি জগতের মধ্যে ভোগেও শ্রেষ্ঠ। তাই রামায়ণের যুগে অযোধ্যা, বারাণসী, মিথিলা নগরী, মহাভারতীয় যুগে হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, প্রভৃতি বৌদ্ধ যুগে বৈশালী, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, মোগল যুগে দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নগরী স্থাপত্য শিল্পে ও ভোগ ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে জগতে শ্রেষ্ঠ নগরীর মর্য্যাদা লাভ করেছিল। যুগে যুগে ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং প্রভৃতি বিদেশী পর্য্যটকগণ ভারতবর্ষে এসে এসব দর্শন করে স্বতস্ফূর্ত ভাবে জগতের শ্রেষ্ঠ মহানগরীর মর্য্যাদা দান করে গেছেন।

এই অধ্যাত্ম ভারতবর্ষ জগৎকে তিনটি সুপ্রাচীন মহান ধর্মকে উপহার দিয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে পৃথিবীর আরেকটি মহান ধর্মকেও ভারতবর্ষ উপহার দিয়েছে জগৎ বাসীকে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য বাসীকে। তা হল খ্রীষ্ট ধর্ম। অনেকেই হয়তো জাত নন যে, খ্রীষ্ট ধর্মের স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা যীশুখ্রীষ্ট তাঁর দিব্য জীবনের ১৩ বছর থেকে ২৯ বছর এবং পরবর্তীকালে ৩৩ বছর থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত এই দেবভূমি ভারতবর্ষেই অতিবাহিত করে গেছেন এবং তাঁর শিক্ষা, সাধনা, সিদ্ধি সবই ভারতবর্ষে লাভ হয়েছে। তাই নিয়ে তিনি জেরুজালেমে ধর্ম প্রচার করেন। তারপর ক্রুশ বিদ্ধ হবার পর পুনরায় ভারতবর্ষে চলে আসেন চিরতরে।

এই ভারতবর্ষের কাশ্মীরেই তিনি আশী বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। আজো তাঁর সমাধি কাশ্মীরে রয়েছে। তাই খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্ত্তক যীশুখ্রীষ্টের ৮০ বছরের জীবনের সুদীর্ঘ ৬৪ বছরই এই

ভারতবর্ষে অতিবাহিত হয়েছে। বাকি ১৬ বছর (১-১২ বছর এবং এবং ৩০-৩৩ বছর) শুধু জেরুজালেম ও অন্যত্র অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের জীবনের পাঁচ ভাগের চারভাগ সময়ই ভারতবর্ষে অতিবাহিত হয়েছে (এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পঞ্চম খণ্ডে বর্ণিত হবে)।

বাইবেলে যীশুখ্রীষ্টের বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর দেখানো হয়েছে। তারমধ্যে আবার ১৩ বছর থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত যীশুর কথা নেই। এই সময় নাকি যীশুর অজ্ঞাতকাল। এই সময় যীশু ভারতে অতিবাহিত করেন এবং যোগ ও তন্ত্র সাধনা করেন। বাইবেলে যীশু তেত্রিশ বছরে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ দেখালেও আসলে যীশু পুনরায় ভারতে চলে আসেন এবং আশী বছরে দেহত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধক পরম্পরায় কথিত আছে যে ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলাবস্তু ও সমগ্র নেপাল দর্শন করতে যাবার পথে যোগ ও তন্ত্রসাধক যীশুখ্রীষ্ট ভারতবর্ষে তারা সাধনার প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতমপীঠ মহাপীঠ তারাপীঠে আসেন। একাধারে সতীপীঠ, যোগপীঠ, তন্ত্রপীঠ ও সিদ্ধপীঠের সমন্বিত এই পরম ব্রহ্মক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠে তিনি কিছুকাল তারা সাধনা করেন এবং ব্রহ্ম-সনাতনী তারামায়ের দর্শন ও কৃপালাভ করে কপিলাবস্তু গমন করেন এবং দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থসকল দর্শন এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করে দেশে গমন করেন (বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং জগতে খ্রীষ্ট ধর্মের উৎস, প্রেম ও অহিংসার বাণী; খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের পেছনেও বিশ্বের শাশ্বত ধর্মগুরু ভারতবর্ষের অপরিসীম অবদান রয়েছে।

তাই নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে পৃথিবীর চারটি সুপ্রাচীন মহানধর্ম (হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান) কে দেবভূমি ভারতবর্ষ বিশ্ববাসীকে সানন্দে উপহার দিয়েছে।

এই হ'ল বিশ্বের চিরন্তন ধর্মগুরু ভারতবর্ষ, দেবভূমি ভারতবর্ষ, চিরউদার ও চিরমহান ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষকে জানলেই পৃথিবীকে জানা যায়। আবার এই ভারতবর্ষকে গভীর ভাবে না

জানলে না উপলব্ধি করলে, ভারতবর্ষের চিরন্তন মূলাধার তথা ভারতীয় ভাব সাধনার সকল মত ও পথের মহাসমন্বয় স্বরূপ পরম-ব্রহ্মক্ষেত্র তথা জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের মর্মপীঠ এবং সর্ব ইষ্টের মহা-সমন্বয়পীঠ মহাপীঠ তারাপীঠকে জানা যায় না, বোঝা যায় না, উপলব্ধি করা যায় না।

দেবতা আত্মা ভারতবর্ষের শাশ্বত অধ্যাত্ম স্বরূপ সুপ্ত হয়েছে ভারতবর্ষের মূলাধার এই সুপ্রাচীন ব্রহ্মক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠেই। তাই তারাপীঠকে জানলে ও উপলব্ধি করলে দেবভূমি ভারতবর্ষকে জানা যাবে। ভারত আত্মার স্বরূপ ও মহাশক্তিকে উপলব্ধি করা যাবে।

মহাপীঠ তারাপীঠ তাই দেবতাত্মা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র। অধ্যাত্ম ভারতবর্ষের মর্মকেন্দ্র এই পরমব্রহ্ম ক্ষেত্র।

যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের সকল ভাবে সাধনার ধারা, সকল মত ও পথের ধারা এই মহাসাগরে এসে মিলিত হয়েছে।

মহাপীঠ তারাপীঠ তাই পৃথিবীর চিরন্তন ধর্মগুরু ভারতবর্ষের মূলাধার কেন্দ্র রূপে সুনির্দিষ্ট ও সুচিহ্নিত হয়ে রয়েছে। দেবভূমি ভারতবর্ষকে জানলে যেমন পৃথিবীর অধ্যাত্ম চেতনাকে জানা যায়, তেমনি তারাপীঠকে জানলে একই সাথে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীকে জানা যায়। তাই এই মহাবিশ্বের মূলাধার হ'ল ভারতবর্ষ-আর ভারতবর্ষের মূলাধার হ'ল এই মহাপীঠ তারাপীঠ।

সুতরাং মহাপীঠ তারাপীঠ মূলত পৃথিবীর মূলাধার। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরম পবিত্র ও সদা জাগ্রত দিব্য অধ্যাত্ম ক্ষেত্র এই ব্রহ্ম-চৈতন্যের মহাক্ষেত্র পরম ব্রহ্মময়ী তারামায়ের নিত্য লীলা নিকেতন মহাপীঠ তারাপীঠ।

মানব দেহের মধ্যে যেমন ষটচক্র রয়েছে—যথা, মূলাধার, স্বাধীষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ্য ও আজ্ঞাচক্র এবং এই ষটচক্র পথ ধরে মহাচৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মূলধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত চক্রে চক্রে লীলা করতে করতে ষটচক্র ভেদ করে সহস্রারে পরম-শিবের সাথে মিলিত হ'ন। ফলে জীব তার জীবত্ব থেকে শিবত্বে

পৌঁছে যায়, তেমনি এই বিশ্ব প্রকৃতির বিশাল দেহের মধ্যেও পরম-পবিত্র দিব্য ষটচক্র রয়েছে।

এই মহাবিশ্বের ষটচক্র তথা মহাপ্রকৃতির মহাচৈতন্যের এই ষটচক্র মণ্ডিত পরম জ্যোতির্ময় যোগ পথটি মূলত দেবভূমি ভারতবর্ষের মধ্যই অবস্থিত। মূলাধার থেকে ষটচক্র হয়ে 'সহস্রার পর্যন্ত এই মহাচৈতন্যময় মহার্জ্যোতির পথ প্রসারিত রয়েছে।

মহাবিশ্বের ব্রহ্মচৈতন্যের এই দিব্যজ্যোতির মূলাধার হ'ল মহাপীঠ তারাপীঠ। মহাচৈতন্যময়ী মহাশক্তিময়ী ব্রহ্মময়ী তারামা কুলকুণ্ডলিনী রূপে এখানে নিত্য বিরাজিতা।

দ্বিতীয় চক্র স্বাধীষ্ঠান হ'ল পরম দিব্য ক্ষেত্র সুপ্রাচীন শিবধাম বারাণসী।

তৃতীয় চক্র মণিপুর হ'ল পুরুষোত্তম তথা জগন্নাথ ধাম।

পৃথিবীর চতুর্থ চক্র অনাহত হ'ল নিত্য প্রণব ধ্বনি মণ্ডিত মধু বৃন্দাবন। বিশ্বের অধ্যাত্ম চৈতন্যের পঞ্চম চক্র বিশুদ্ধাক্ষ্য হ'ল দিব্য আনন্দময় ক্ষেত্র বদ্রীনারায়ণ।

ষষ্ঠচক্র তথা আজ্ঞাচক্র হ'ল নিত্য জ্যোতির্ময় ধাম পবিত্র কেদারনাথ।

সর্বোপরি মহাচৈতন্যময়ী মহাশক্তি ও ত্রিগুণাতীত পরমব্রহ্ম মহা-শিবের মহামিলন ক্ষেত্র তথা সহস্রার হ'ল পরম পবিত্র শিবক্ষেত্র কৈলাস।

সুতরাং মূলাধার থেকে কৈলাস পর্যন্ত অর্থাৎ তারাপীঠ থেকে কৈলাস পর্যন্ত এই মহাচৈতন্যমর মহার্জ্যোতির পথ প্রসারিত। বিশ্ব-চৈতন্যার এই সূক্ষ্ম যোগচক্র ও জ্যোতির্ময় যোগপথ কেবল মাত্র উচ্চকোটির সিদ্ধ মহাত্মাগণই দর্শন করতে সামর্থ হন এবং তার মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করে পরমব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

ভারত তথা মহাবিশ্বের মহাচৈতন্যের এই মূলাধার কেন্দ্র মহাপীঠ তারাপীঠে সত্যযুগে মহাদেবীর প্রজ্ঞানয়ন পতিত হওয়ায় এই দিব্য পবিত্র ও মহাজাগ্রত ব্রহ্মক্ষেত্রের গুরুত্ব ও মর্য্যাদা আরো বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

তার সাথে শত সহস্র সাধকের মহাসিদ্ধি ক্ষেত্র রূপে যগ যুগ ধরে তারাপীঠ সুবিধ্যাত। তাই ভারত আত্মার শাশ্বত স্বরূপ সুপ্ত রয়েছে এই দিব্য মহাক্ষেত্রে।

এত সুন্দর এত ভয়ঙ্কর এত মধুর এত অধ্যাত্ম শক্তিপূর্ণ এত পূতপবিত্র ব্রহ্মক্ষেত্র বলেই মহাপাঠ তারাপীঠ ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর মূলাধার কেন্দ্ররূপে সুচিহ্নিত হতে পেরেছে।

তাই পৃথিবীর ধর্মগুরু ভারতবর্ষের চিরন্তন মর্মকেন্দ্র রূপে মহাপীঠ তারাপীঠ চিরবন্দিত। তাই যুগ যুগান্ত ধরে অধ্যাত্ম ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের সকল সাধন পথের সাধক সাধিকাগণের তারাপীঠে আসা যাওয়া অব্যাহত রয়েছে। কঠোরতম সাধনার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ ইষ্টের দর্শন লাভ করে তাঁরা হয়েছেন আপ্তকাম।

আজো সেই ধারা অম্লান রয়েছে। দেবভূমি ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর মূলাধার এই মহাপীঠ তারাপীঠের অধ্যাত্ম শক্তি এতই অসীম অনন্ত ও অতলস্পর্শী যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেবল মাত্র উপলব্ধি সাপেক্ষ। ব্রহ্মময়ী তারামায়ের কৃপায় যিনি এই উপলব্ধি লাভ করেছেন তিনি পরিপূর্ণ ভাবে ভেসে গেছেন সীমাহীন আনন্দ ও অমৃতের জোয়ারে।

যুগে যুগে এই তারাপীঠের বহিরঙ্গ রূপ বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। সত্য ও ত্রেতা যুগে তপোবন, দ্বাপরে নগর ও কলিতে মহা-শ্মশান রূপে তারাপীঠ সুচিহ্নিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য—"যুগে যুগে তারাপীঠ" প্রথম খণ্ড)। কিন্তু অন্তরঙ্গে তারাপীঠ চিরন্তন এক ও অভিন্ন রয়েছে। এই অনাদি অনন্ত দিব্য ঐশ্বর্যপূর্ণ অন্তরঙ্গ তথ অধ্যাত্ম মণ্ডিত তারাপীঠই হ'ল এই দেবভূমি দেবতাত্মা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র মহাবিশ্বের মূলাধার এবং আদিভূতা ব্রহ্ম সনাতনী তারামায়ের শাশ্বত লীলাক্ষেত্র।

এই মহাপীঠ তারাপীঠে যুগে যুগে অজস্র ব্রহ্মবিদ, মহান যোগী, মহাতান্ত্রিক, মহাজ্ঞানী, সাধক ভক্তগণ এসে এই অন্তরঙ্গ তারাপীঠের অমৃত সাগরে পরম আনন্দে ডুব দিয়ে নিজ আত্মস্বরূপ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। ত্রিলোক জননী সর্বভাবময়ী নিত্য আনন্দময়ী

তারামায়ের কৃপায় তাঁরা লাভ করেছেন অনন্ত অধ্যাত্ম রত্নরাজি। আজো এই সুপ্রাচীন মহাপীঠের প্রতি ধূলি কণায় এই অমৃত ছড়িয়ে রয়েছে। যে মহাভাগ্যবান সাধক তা দেখতে পান এবং আস্বাদ করতে সক্ষম হন, তিনিই মহাধন্য। তারামায়ের কৃপায় তাঁর মানব জীবন সর্বতোভাবে ধন্য হয়।

ত্রিলোক জননী তারামা ও শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ওপর পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসা, নির্ভরতা ও শরণাগতিই হ'ল এই পরম অমৃত লাভের একমাত্র উপায়।

তন্ত্র মতে কলিযুগ শেষ হ'বার পূর্বে ব্রহ্মময়ী তারামায়ের কৃপায় ভারতের এই প্রাচীনতম তন্ত্রপীঠ ও সিদ্ধপীঠ তারাপীঠে আরো একলক্ষ সাধক সিদ্ধি লাভ করবেন। এই লক্ষ সাধকের মহাসিদ্ধির মহাশক্তি যে পরম ব্রহ্মক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠে গভীর ভাবে সুপ্ত রয়েছে, তার আধাত্মিক মূল্যায়ন কোন ভাষা দিয়েই পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি সাপেক্ষ।

মহাপীঠ তারাপীঠে ত্রিলোকের অধিশ্বরী তারামা ও শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা সর্বদা সদা জাগ্রত রয়েছেন। মহাপীঠ তারাপীঠ গ্রন্থের রচনার সঙ্কল্পের শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত (৪ঠা পৌষ, ১৩৭৬ থেকে ৩০শে আশ্বিন, ১৩৯৭) সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে তারামা ও বামাক্ষ্যাপা বাবা অশেষ কৃপা করে এই দীন লেখককে তা অসংখ্য বার প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। লেখকের দর্শন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এই মহাসত্যের ওপর সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

শুধু তাই নয়, তারামা ও বামদেবের অফুরন্ত দিব্য সঞ্জিবনী শক্তিতেই এই বিশাল মহাপীঠ তারাপীঠ মহাগ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে রচিত হতে পেরেছে। সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে এই দীন লেখকের নিত্য নেপথ্য সঙ্গীরূপে তারামা ও বামদেব অফুরন্ত করুণাধারা বর্ষণ করে চলেছেন।

মূলতঃ যুগ প্রয়োজনে ও জগৎ কল্যাণে তাঁরা সৃষ্টি করলেন তাঁদের দিব্য লীলা মণ্ডিত এই মহাগ্রন্থ। তাই এই 'মহাপীঠ তারাপীঠ' মহাগ্রন্থের স্রষ্টা স্বয়ং তারামা ও বামদেব। এই দীন লেখক নয়।

এই দীন লেখক শুধু নিমিত্ত মাত্র। চতুর্থ খণ্ডে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মহা অমৃতময় লীলা সকল আস্বাদন করতে করতে তা আরো ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ।

মহাবিশ্বের মূলাধার মহাপীঠ তারাপীঠ শুধু বীরভূম জেলার নয়, পশ্চিমবঙ্গের নয়, ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর নয়, এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডেরও নয়,—মহাপীঠ তারাপীঠ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি অনন্ত লোকের পরম অধ্যাত্ম দিব্য হিরন্ময় ক্ষেত্র রূপে চিরন্তন সুচিহ্নিত। কাল হতে কালান্তর যুগ হতে যুগান্তর তার জয়যাত্রা নিত্য অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান যুগ ও সমগ্র মানব জাতি আজ যুগ সংকট ও সভ্যতার সংকটের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র 'নামৈবকেবলম্' অর্থাৎ নামব্রহ্মের মধ্য দিয়েই নেমে আসবে সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ ও মহাশান্তি।

কলিযুগ তাই নাম-এর যুগ রূপে সুনির্দিষ্ট। মহানাম ও মহামন্ত্র "তারা" নাম জপ ও নাম গানের মধ্য মধ্য দিয়েই ঘটবে এই ঐশ্বরিক উত্তরণ।

পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাঁর আদি মধ্য ও অন্ত্যলীলায় এই 'তারা নাম' অফুরন্ত ধারায় বর্ষণ করেছেন জগৎ ও জীবের সার্বিক কল্যাণে। 'তারা' নাম জপ, তারা নাম কীর্তন, তারামা'র লীলা মাহাত্ম্য শ্রবণ, তারামা'র ধ্যান ও সম্পূর্ণ শরণাগতির মধ্যদিয়েই আসবে সার্বিক শান্তি ও মুক্তি। তাঁর মহাদিব্য লীলায় তাই তিনি জগৎবাসীকে দেখিয়ে গেছেন। এই পরিপূর্ণ শরণাগতির মধ্য দিয়েই অন্তরলোক হবে চির আনন্দে চির অমৃতে উদ্ভাসিত।

তবেই চতুর্দশ ভুবনের অধিশ্বরী অপার করুণাময়ী তারামা তরিয়ে দেবেন তাঁর নামগানে মগ্ন শরনাগত সন্তানকে, এই ভয়ঙ্কর দুঃসহ অশান্তি, দুঃখ রোগ শোক জরা মৃত্যুপূর্ণ ভয়াবহ সংসার সাগর থেকে।

বর্তমান যুগ হ'ল তারা যুগ। অচিরে মহানাম ব্রহ্মনাম "তারা" নামে সমগ্র জগৎ সংসার রোমাঞ্চিত হবে। জগৎ জুড়ে তারা নাম ছড়িয়ে পড়েছে ক্রমে ক্রমে। অনন্ত কোটি আনন্দঘন বিগ্রহ এই 'তারা'

নাম। যত জপ হবে ততই আনন্দ অমৃত আস্বাদ হবে। তাই সর্বসিদ্ধি-দায়িণী, সর্বমুক্তি প্রদায়িনী, আনন্দ অমৃত দায়িনী, মধুর মধুর 'তারা' নাম আজ লেখায় রেখায় নামে গানে ভাবে ভাষায় ছন্দে সুরে পৃথিবীর আকাশ বাতাসকে মুখরিত করছে।

সুরলোকে দেবলোকে ব্রহ্মলোকে যে আনন্দ অমৃত পূর্ণ 'তারা' নাম নিত্য ধ্বনিত হয়, দেবদেবী ঋষি যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নরের কণ্ঠে. সেই পতিত পাবনী 'তারা' নামের অমৃতধারা এবার নেমে এল ধরার ধূলিতে আর্ত তাপিত তৃষিত নরনারীকে সার্বিক শান্তি, তৃপ্তি, মুক্তি ও অফুরন্ত আনন্দ অমৃত প্রদান করতে।

সত্য যুগে সমুদ্র মন্থন কালে সমগ্র হলাহল পান করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। মহাভয়ঙ্কর সেই বিষের জ্বালায় জর্জরিত মহাদেবকে ত্রাণ করবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহাদের স্বয়ং সকল দেবতার সাথে একযোগে তাঁদের নিত্য আরাধ্যা দেবী পঞ্চাকাশে বিরাজিনী আদিভূতা ব্রহ্মসনাতনী তারাদেবীকে আহ্বান করলেন। তারামা বাৎসল্য ভাবে বিষে জর্জরিত মহাদেবকে কোলে নিয়ে তাঁর অমৃত স্তন সুধা পান করিয়ে মহাদেবের সকল জ্বালা দূর করলেন মহাভয় বিষ থেকে। মহাদেবকে ত্রান করবার জন্য তারামায়ের নাম হ'ল 'তারিণী'।

সত্য যুগের সেই মহাকরুণার কথা স্মরণ করে সকৃতজ্ঞ চিত্তে এই কলি যুগে দেবাদিদেব মহাদেব এবার এলেন শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা রূপে। শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা জগৎকে ও জগৎবাসীকে সর্বতোভাবে ত্রাণ করবার জন্য ও 'তারা' নামের মহিমা প্রকাশ করবার জন্য পরম অমৃতময় পরম আনন্দময় মহাশক্তি মন্ত্র মহামুক্তি মন্ত্র মহানাম "জয় জয় তারা" প্রচার করে গেলেন তার দিব্য মহাজীবন লীলায়।

সত্য যুগের সেই ঋণ কিছুটা শোধ করে গেলেন দেবাদিদেব বামদেব তারামায়ের দিব্য লীলা মাহাত্ম্য ও তারা নাম প্রচার করে সারা জীবন ধরে।

যুগ প্রয়োজনে এই কলি যুগে ত্রিলোক জননী তারামায়ের পরম দিব্য লীলা ও নাম মহিমা জগৎবাসীকে দেখানোর জন্য ও আর্ত ও তাপিত জগৎবাসীকে ত্রাণ করবার জন্যই এবার তাঁর আগমন।

এর ফলে জগৎতবাসীর সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি ও চিরআনন্দ লাভ হবে। মহাপীঠ তারাপীঠ মহাগ্রন্থ তারই আনন্দময় বিগ্রহ।

তাই "জয় জয় তারা" মহানামের সাথে সত্য শিব ও সুন্দর স্বরূপ "জয় জয় বাম" নামও এক ও অভিন্ন।

শিবশক্তি সমন্বিত এই সর্ববিঘ্ননাশক, সর্বসিদ্ধিপ্রদ, সর্বশান্তিপ্রদ, সর্ব মঙ্গলময়, মুক্তিময়, আনন্দময়, অমৃতময় নামই আজ ইহকাল পরকালের পরম পাথেয়।

মহাশক্তি মহাবিদ্যা ব্রহ্মময়ী তারামা ও শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা মুলত এক ও অভিন্ন।

তারামা-ই শ্রীবাম এবং শ্রীবামই তারামা। একই ব্রহ্ম জগৎলীলায় দুইরূপে অবতীর্ণ।

তাই যুগোপযোগী এই মহাসিদ্ধনাম মহানাম 'জয় জয় তারা জয় জয় বাম' জগৎ জীবকে ভবসিন্ধু পার করিয়ে পৌঁছে দেবে 'তারালোকে'।

এই দ্বাদশ অক্ষর যুক্ত অমৃতময় মহানাম কলিতে জীবের পরম আশ্রয়।

যিনি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবকে ত্রাণ করেছেন, সেই শিব-তারিণী, সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী, সত্ব রজ তম ত্রিগুণ ধারিণী, তারামায়ের নামে জীব শুধু মুক্তি লাভই করবে না অনায়াসে, তারসাথে এই এক জন্মেই জীবের সকল জন্মের বিশাল পুঞ্জীভূত সংস্কার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এই মহানামের মহাঅগ্নিতে।

জীব লাভ করবে তার পূর্বের আপন আনন্দময় অমৃতময় নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ। মহানাম তারানামের মাধ্যমেই এই স্ব স্বরূপ তথা শিবস্বরূপত্ব লাভ করবে কলির এই বদ্ধ জীব। এযুগে এই মহানামই একমাত্র সহজ সুন্দর ও আনন্দময় পন্থা।

শ্রীবাম মহেশ্বর তাই এবার অফুরন্ত ধারায় জগৎবাসীকে দান করে গেলেন।

এই অফুরন্ত আনন্দ ও অমৃত ধারায় নিত্য স্নাত হোক সমগ্র জগতের তৃষিত তাপিত নরনারী এবং ত্রিজগতের সকল জীবগণ।

শুধু মানব জাতি নয়, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব স্তরের দেব মানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ও মনুষ্যেতর পশু পাখী কীট পতঙ্গ তরুলতা তৃণ প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম সর্ব প্রাণ সব জীব সর্ব আত্মা সর্ব লোক মুক্তি লাভ করুক তারা বামের নাম গানে।

আকাশ বাতাস সপ্তলোক চতুর্দশ ভুবন অসীম অনন্ত লোক মুখরিত হোক তারা নামে, মধুময় হোক তারা নাম গানে, তারা নামের অমৃত ধারা বর্ষিত হোক সর্বলোকে সর্বকালে সর্বজীবের সার্বিক কল্যাণে—এই পরম প্রার্থনা চিরন্তরে রইলো ত্রিলোক জননী ত্রিলোক পালিনী অপার করুণাময়ী পরম ব্রহ্মময়ী তারামা ও শিবাবতার শ্রীশ্রী-বামাক্ষ্যাপার অমৃতময় চিরন্তন চরণ কমলে।

'জয় জয় তারা জয় জয় বাম'

--o--

তারাময় শ্রীবামের অমৃত কথা

"তারামা, তুই আমায় এগিয়ে নিতে এসেছিস? এই যে আমি এসেছি।" এই বলে বিরাট বিষধর গোখরা সাপের গলা জড়িয়ে ধরে তারাময় বামাক্ষ্যাপা বাবা আনন্দে আবেগে বিহ্বল হলেন।

ভয়ঙ্কর কালসর্প বিরাট গোখরা সাপটি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মৃত্যুস্বরূপ এই মহানাগ যেন মৃত্যুঞ্জয় শ্রীবামের দিব্য পবিত্র অঙ্গের স্পর্শে হিংসা ভুলে গেল।

শান্তভাবে শ্রীবামের আদর গ্রহণ করতে লাগলো। এই গোখরা সাপটি তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট যাবার পথে 'মুনসুবো' পুকুরের পাশ দিয়ে যে রাস্তা বরাবর রামপুরহাটের দিকে গেছে সেই নির্জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বামদেব রামপুরহাট থেকে তারাপীঠে ফিরছিলেন। সকাল বেলা তারাপীঠ থেকে রামপুরহাটে এসেছিলেন ভক্ত মহেন্দ্র রুজের আমন্ত্রণে। সেখানে মধ্যাহ্নে তারামাকে ভোগ নিবেদন করে ও প্রসাদ গ্রহণ করে আরেক ভক্তের বাড়ী গেলেন। সারাদিন ভক্তসঙ্গে আনন্দ করে অপরাহ্ণ কালে তারাপীঠ ফিরছিলেন ভক্তবৃন্দসহ। বামদেব পাল্কীতে না চেপে স্বেচ্ছায় পদব্রজে তারাপীঠে ফিরছিলেন। 'মুনসুবো' পুকুরের পাড় দিয়ে তিনি যখন আসছেন তখন এই বিরাট গোখরা সাপটি রামপুরহাটের দিকের রাস্তা দিয়ে চলেছে। উভয়ের মুখোমুখী দেখা হ'ল।

দেখা হতেই তারাভাবে সর্বদা বিভোর শ্রীবাম মনে করলেন যে মহাকুল কুণ্ডলিনী পরমা চৈতন্যময়ী ব্রহ্মময়ী তারামা স্বয়ং সর্পরূপ ধারণ করে এগিয়ে এসেছেন তাঁকে তারাপীঠে নিয়ে যেতে। ব্যাকুল জননী তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে দীর্ঘক্ষণ না দেখতে পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছেন। মা অন্তপ্রাণ পুত্রও যেন দীর্ঘক্ষণের অদর্শনের পর মাকে দেখতে পেয়ে মার ক্রোলে মহা আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারাময়

বামদেবের সর্বভূতেই তারামা। তাই তিনি এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুস্বরূপ বিষধর গোখরা সাপকে দেখলেন না। তিনি দেখলেন তারামাকে। তারামা কি রূপ ধারণ করে এসেছেন সেটা বামদেবের কাছে কোন ব্যাপারই নয়. তারামা এসেছেন এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

তিলমাত্র দেহবোধ থাকলে এই পরম দর্শন ও উপলব্ধি সম্ভব হ'ত না। সম্পূর্ণ দেহবোধ বিবর্জিত বলেই বামদেব এই ভয়াবহ কাল সাপকে সাপ না ভেবে তারামা ভেবে পরম আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন।

এই বিরাট বিষাক্ত গোখরা সাপ তাঁকে জড়িয়ে জড়িয়ে পিষে ফেলতে পারে বা দংশন করে মেরে ফেলতে পারে, তা কিন্তু একবারও বামদেবের মনে হ'ল না।

তিনি চিরজ্যোতির্ময়ী তারামা'র অমৃতময় কোল খুঁজে পেলেন এই মৃত্যুস্বরূপ কালসর্পের মধ্যে। বহিরঙ্গে এ এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। কিন্তু অন্তরঙ্গে শ্রীবাম যথার্থ দর্শন করেছেন। অনন্তভাবময়ী ব্রহ্মময়ী তারামা-ই সর্বজীবের দেহের মূলাধারে সর্পাকারে সাড়ে তিন পাক দিয়ে চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনীরূপে বিরাজ করছেন।

তাই এই মহাসর্পকে স্বয়ং তারামা রূপে দেখা ও উপলব্ধি করা শ্রীবামের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই এই গোখরা সাপের গলা জড়িয়ে ধরে শিশুর মত আদর করতে লাগলেন। ভয়ঙ্কর গোখরা সাপের বিরাট ফনাকে ধরে তাঁর মুখে চোখে আদর করতে লাগলেন। নিজের গালে সানন্দে চেপে ধরলেন গোখরা সাপের বিষাক্ত মুখকে।

তারাভাবে পরম বিভোর শ্রীবামের এই বিচিত্র ব্যবহার দেখে তাঁর উপস্থিত ভক্তগণ মহাভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু যাকে নিয়ে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার চলছে সেই বিরাট গোখরা সাপটি কিন্তু আশ্চর্যভাবে ধীর স্থির শান্ত। বিশাল সাপটিকে দেখে মনে হল যেন ছোট্ট শিশুর আদর সোহাগ তার মা যেমন পরম আনন্দে

শান্তভাবে উপভোগ করে, সেও যেন তেমনি শান্তভাবে চিরশিশু বামদেবের আদর সোহাগ উপভোগ করছে।

বামদেব আরো কিছুক্ষণ গোখরা সাপটিকে জড়িয়ে ধরে রেখে প্রাণভরে তার সাথে কথা বলতে লাগলেন। একটু পরে সর্পরাজ প্রসন্নমনে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। উপস্থিত সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারাভাবে বিভোর বামদেব সদলবলে তারাপীঠের পথে আবার রওনা হলেন।

ক্ষণকাল পূর্বে এই মহাবিস্ময়কর ব্যাপারটি বামদেবের ভক্তদের অন্তরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলো। বামদেব কিন্তু যথারীতি নির্বিকার। ভক্তদের মধ্যে যাঁরা তারাময় বামদেবের অন্তরঙ্গ লীলা পরিকর তাঁরা কিন্তু খুব একটা এই ব্যাপারে বিস্মিত হন নি। বরং বামদেবের পক্ষে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই তাঁরা উপলব্ধি করলেন। কারণ যিনি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অনলে অনিলে সর্বত্র তাঁরই প্রাণাধিক ইষ্টদেবী তারামাকে দর্শন করেন, যিনি সর্বভূতে সর্বরূপে ও সর্বজীবের মধ্যে নিজ ইষ্টকেই সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন, একমাত্র তাঁর পক্ষেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুস্বরূপ গরলের মধ্যে অমৃত দর্শন ও উপলব্ধি করা সম্ভব। কেবল তিনিই জীবজগত ব্রহ্মের মধ্যে একই মহাচৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করে আত্মানন্দে বিভোর হন। তিনিই নিজ আত্মায় বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে আনন্দে অমৃতে আপ্লুত হন। সেই মহান চৈতন্যময় প্রাণপুরুষ ও পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্ যে স্বয়ং বামদেব।

তাই মহাচৈতন্যময়ী ও পরম ব্রহ্মময়ী ত্রিলোকের অধিশ্বরী তারামাকেই বামদেব সর্বভূতে সর্বজীবে ও সর্বজড়ের মধ্যেও সর্বদা প্রত্যক্ষ করছেন।

একের মধ্যে সব ও সবের মধ্যে এককে দর্শন করতে পেরেছেন বলেই তারাময় বামদেব ভয়ঙ্কর বিষাক্ত কালসর্পকে অমৃতময়ী তারামা রূপে দেখতে পেয়েছেন এবং সেইভাবেই তারামাকে স্পর্শ করেছেন। তখন জীবরূপী ভয়াবহ সর্প আর সর্প রইলো না। সেই জীবের মধ্যেই যে চৈতন্যময়ী তারামা আছেন, তিনিই প্রকাশিত হলেন। তারাময়

বামদেবের মহাদিব্য স্পর্শে সেই হিংস্র সর্প আর সর্প রইলো না। সে মৃন্ময় থেকে চিন্ময়ে রূপান্তরিত হ'ল। তার বাইরের আকৃতি সর্পাকারে রইলো বটে কিন্তু আসলে সে তখন তারামাতে রূপান্তরিত। সে স্বয়ং তারামা।

মাতা-পুত্রের দিব্য মিলন হ'ল। তারপর বামদেবের কাছ থেকে সেই কালসর্প যখন জঙ্গলে গেল এবং বামদেব তারাপীঠের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করলেন তখন চিন্ময় থেকে পুনরায় মৃন্ময় দেহে সর্প রূপান্তরিত হ'ল। ধীরে ধীরে সে আবার তার স্বভাবিক প্রকৃতি ফিরে পেল। তবু তারাময় বামদেবের দিব্য জ্যোতির স্পর্শে সে তার হিংসা ভুলে গেল। তাই শান্তভাবে বামদেবকে ছেড়ে সে রাস্তা পার হয়ে জঙ্গলে চলে গেল।

শিবাবতার বামদেবের দেহ মন প্রাণ আত্মা ধ্যান জ্ঞান কতদূর তারাময় ছিল উপরোক্ত ঘটনাটি তারই প্রাণবন্ত নিদর্শন।

কি অপরিসীম অফুরন্ত ঐশী শক্তির অধিকারী বামদেব তা কল্পনা করা যায় না। তাঁর এক পলকের দর্শন ও স্পর্শের সাথে সাথে একটি সহজাত বিষাক্ত হিংস্র জীবের স্বভাবিক জীবত্ব নাশ হয় এবং সে পলকে শিবত্বে পৌঁছে যায় এবং বামদেব সেই জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিন দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাকে স্তব্ধ করে তার ওপর অবস্থিত পরমাত্মাকে বাইরে টেনে এনে তাঁর সাথে দিব্যলীলা করে আবার সেই পরমাত্মাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে জীবকে আবার তাঁর স্বাভাবিক স্বরূপে ফিরিয়ে দেন তা যথার্থ ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। একমাত্র উপলব্ধি সাপেক্ষ। তারাময় বামদেব পূর্ণ চৈতন্যময় পরম-বলেই তা সম্ভব।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সাধারণতঃ সাধকগণ ঈশ্বর জগৎ ও জীবকে আলাদা করে দেখেন। উচ্চ শ্রেণীর সাধকগণ ঈশ্বর জগৎ ও জীবকে মূলত একেরই তিন রূপ বলে উপলব্ধি করেন।

কিন্তু তারও উর্দ্ধে পূর্ণ ব্রহ্মাজ্ঞ মহাপুরুষগণ তথা অবতারগণ ঈশ্বর জগৎ ও জীবকে শুধু এক ঈশ্বর রূপেই সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁদের

প্রজ্ঞানয়নে ব্রহ্ম থেকে কীট পর্যন্ত একই ব্রহ্ম। একই ব্রহ্ম বহুরূপে বিরাজিত! তাই তাঁদের সদা উন্মোচিত জ্ঞান নয়নে একই সব, সবই এক। তাই তাঁদের কাছে ঈশ্বরই জগৎ, জগতই ঈশ্বর, ঈশ্বরই জীব, জীবই ঈশ্বর। এককথায় শুধুই ঈশ্বর। তাই মহাযোগী মহাজ্ঞানী শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা হলেন এই পূর্ণাবতার পরম ব্রহ্মজ্ঞ দেবমানব। তাই তাঁর কাছে ত্রিলোকের অধিশ্বরী স্বয়ং তারামা-ই জীবরূপিনী গোখরা সাপ। আবার জীব গোখরা সাপই ত্রিলোক জননী তারামা। এই পরম ব্রহ্মদর্শন তাঁর মধ্যে বিরাজমান। তাই তাঁর সবই তারা। আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশের তারা দেখতে দেখতে বলেন "আকাশ তারা"। পঞ্চাকাশের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের চির আরাধ্য যে ত্রিলোকের অধিশ্বরী তারাদেবী বিরাজিতা, সেই তারাদেবী তথা তারামা-ই আকাশ রূপে শ্রীবামের নয়নে বিরাজমানা। আকাশ মনাকাশ, প্রাণাকাশ, চিদাকাশ, মহাকাশ সবই তাঁর কাছে তারাকাশ। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত সবই তারা। তাই চৈতন্য ও জড়ের মহাসমাহার হয়েছে শ্রীবামের দিব্য প্রজ্ঞা নয়নে।

তাই চৈতন্যই জড় ও জড়ই চৈতন্য হয়ে ঈশ্বর জগৎ ও জীব একই মহাচৈতন্যে মিশে একাকার হয়ে গেছে শ্রীবামের অন্তরে বাহিরে।

পরম বিস্ময়ের কথা এই যে এই সর্বোত্তম পূর্ণতম ব্রহ্মদর্শন সুদীর্ঘ একুশ দিন একভাবে অবতার কল্প বা সিদ্ধ মহাপুরুষের মধ্যে বিরাজ করলে তাঁর স্থূল দেহ অবশ্য ত্যাগ হয়ে যায়। এই স্বয়ং স্বরূপ ঈশ্বর উপলব্ধির মহাতেজ সিদ্ধমহাপুরুষের জীবদেহও ধারণ করতে পারে না—তা সে যত বড় শুদ্ধ পবিত্র দৃঢ় ও মহাশক্তিধর দেহ-ই হোক না কেন। প্রকৃতির নিয়মে তার অবসান ঘটবেই। অথচ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে মহাবিস্ময়ের বিষয় এই যে এই পূর্ণতম ব্রহ্মদর্শন নিয়ে ব্রহ্মভাব নিয়ে, বামদেব প্রায় সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা চিরচিহ্নিত হয়ে রয়েছেন।

এই এক পূর্ণ ব্রহ্মভাবে তথা এক তারাভাবে সম্পূর্ণ বিভোর থেকে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা সুদীর্ঘ চুয়াত্তর বছর তাঁর মহাজীবন অতিবাহিত করে

গেছেন ভারতব্যাপী এক মহাঐশী মহাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে। বাল্যকালে 'আকাশ তারা'র ভাব সমাধিতে ডুবে যাওয়া থেকে (প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য) সারাজীবন এই একতারায় বাঁধা রইলেন। সুদীর্ঘ জীবন এই এক নিরবচ্ছিন্নভাবে এক ব্রহ্মভাবে কাটিয়ে গেছেন। অথচ তারই মধ্যে অসংখ্য অগণিত মহালীলা লোক কল্যাণে জগৎ কল্যাণে মহাসমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গের ন্যায় করে গেছেন। পৃথিবীর সাধনার ইতিহাসে শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাই এক্ষেত্রে সর্বতোভাবে অতুলনীয়। তাঁর অফুরন্ত সদা ব্রহ্মভাব ঐশ্বর্য, অফুরন্ত সাধন ঐশ্বর্য পৃথিবীর পূর্ণাবতার রূপে তাঁকে চিহ্নিত করেছে। ধর্মগুরু ভারতের অধ্যাত্ম ঐতিহ্যর প্রাণবন্ত বিগ্রহস্বরূপ তিনি।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দৈনন্দিন জীবনও দিনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সবই তারাময়। ব্রহ্মমুহূর্ত থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত সারাদিন রাতের অসংখ্য কাজ তাঁর সব একতারাতে বাঁধা। নাদসিদ্ধ বামদেব ব্রহ্মমুহূর্তে 'তারা তারা' রবে চারদিক প্রকম্পিত করেন মেঘমন্দ্রিত স্বরে। আবেগ-ভরে তারামাকে বলেন, "তারামা, আকাশ তোর, পৃথিবী তোর পা, চন্দ্র সূর্য তোর দুই নয়ন, অগ্নি তোর ত্রিনয়ন, বাতাস তোর শ্বাসপ্রশ্বাস, গ্রহ নক্ষত্র সব তোর লোমকূপ।

তুই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিস্ বিষ্ণুরূপে পালন করিস্ ও শিবরূপে সংহার করিস্। দুর্গমে রক্ষা করিস্, তাই তুই দুর্গা। মহাকাল তোর পদানত তাই তুই কালী, সর্বজীবকে ত্রাণ করিস্ তাই তুই তারা, তুই অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম, দিক, দেশ, কাল, যক্ষ রক্ষ দানব সবই তুই। তুই মন্ত্র, তুই গুরু আবার তুই-ই ইষ্ট। তুই স্বত্ব, রজ, তম, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দিন রাত্রি, স্রষ্টা দ্রষ্টা ও দৃশ্য সবই তুই। তুই দ্বারকা নদী, শ্মশান, জীবিত কুণ্ড। আবার তুই নীলমাধব (গোমস্তা), ইন্দ্রদমন (নায়েব), বাজনাদার, পূজক, পাণ্ডা সবই তুই।"

তাই শ্রীবামের সবই তারাজ্ঞান। তাই তারামা'র মধ্যকালীন ও রাত্রিকালীন প্রসাদ তিনি তাঁর অতি প্রিয় শব মাংস ভোজী কুকুরদের তারামা জ্ঞানে ভোজন করান। আবার নিজেও তাদের সাথে পরম

আনন্দে গ্রহণ করেন। শুধু তারামায়ের মধ্যাহ্নকালীন অন্নপ্রসাদ ও রাত্রিকালীন লুচিমিষ্টি নয়, তারাপীঠ মহাশ্মশানের ভয়াবহ পচাগলা বিষাক্ত পুজ রক্তযুক্ত শবদেহের কাঁচা মাংস নাড়ীভুড়িও তারামা জ্ঞানে অমৃত আস্বাদে ভোজন করেন এবং তাঁর প্রিয় কুকুরদেরও ভোজন করান।

কখনো কখনো বামদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য ভক্তদেরও এই বিচিত্র ভয়াবহ শবদেহের প্রসাদ দেন। মহাবিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তাতে কারোর কোন দৈহিক ক্ষতি হওয়া তো দূরের কথা বরং দেহ সুস্থ ও আনন্দময়ই থাকে। তার কারণ তারাময় শ্রীবামের দিব্য স্পর্শে এই ভয়াবহ বিষাক্ত মাংস মুহূর্তে অমৃতে পরিণত হয়ে যায়।

এতো গেল একদিক। আবার শ্রীবাম বলেন, "আকাশ যেমন তারা, তেমনি জীবিত কুণ্ড, দ্বারকানদীও তারা।"

তাই ঘন্টার পর ঘন্টা তারারূপিনী জীবিত কুণ্ডে স্নান করেন তারা নাম করতে করতে। কখনো কখনো চার পাঁচ ঘন্টা একটানা ডুবে থাকেন। সবাই ভয় পেয়ে যায়। তারপর সহসা ভেসে ওঠেন। কেউ প্রশ্ন করলে উত্তরে বলেন, "তারামার কোলে শান্তিতে তারা নাম করি। আর কি আছে রে বেটা।"

একবার দ্বারকানদীতে পদ্মাসনে বসে আশ্চর্যভাবে বিশালদেহী বামদেব ভাসতে ভাসতে কয়েক মাইল উত্তরে উদয়পুর চলে গিয়েছিলেন। উদয়পুরের সদাজাগ্রতা মা কালীকে দর্শন ও পুজো করতে। আবার ভাসতে ভাসতে ফিরে এলেন স্বেচ্ছাময় তারাময় বামদেব। এক সেবক ভক্ত প্রশ্ন করলেন, "বাবা, আপনি কি করে জলের মধ্যে এভাবে বেগে যাতায়াত করলেন? উত্তরে বামদেব বললেন, "বাবা, এসব তারাবেটীর খেলা। তারামা-ই উদয়পুরের কালীমাকে দেখিয়ে নিয়ে এলেন।" আরেকবার সাত আট ঘন্টা হঠাৎ দ্বারকানদীতে ডুব দিয়ে রইলেন।

সবাই খোঁজ করে হতাশ হলে পর সহসা ভেসে উঠলেন। এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "তারা বেটী বদ্। এসব তারই খেলা।" এমনকি শ্রীবামের নিত্য কোষ্ঠ পরিস্কারের ব্যাপারেও তারামা রয়েছেন। যেদিন কোষ্ঠ পরিস্কার হ'ল। তারাময় শ্রীবাম খুশি। ভক্তদের বললেন, "আজ তারামা মাখন দিয়েছে।"

আর যেদিন তাঁর কোষ্ঠ পরিস্কার হ'ল না। সেদিন রেগে গিয়ে তারামাকে বললেন, "তারা বেটী বদ্। আজ কুঁচলে বড়ি দিয়েছে।"

মাঝে মাঝে শ্রীবাম বলে ওঠেন, "মড়া মড়া তারা তারা।"

এর অর্থ জানতে চাইলে শ্রীবাম বলেন, "জগতে সবই মড়া। তারামাই একমাত্র জীবিত।"

ভক্তগণ বামদেবকে টাকা দিয়ে প্রণাম করলে তারাময় শ্রীবাম বলেন, "টাকা বলে টং টং ত্বং ত্বং তারা তারা।"

ভক্তদের আমন্ত্রণে যখন রেলগাড়িতে চড়ে কোথাও যান তখন রেলগাড়ির চলার খট খটাং শব্দ শুনতে শুনতে তারাময় শ্রীবাম বলেন, "আহা, রেলগাড়িও বলছে তারা তারা, তারা তারা।"

রাত্রিতে মশারীর মধ্যে শ্রীবাম না শুয়ে প্রায়ই মশারীর বাইরে শুয়ে থাকেন। ফলে সর্বাঙ্গে মশার দংশনের গভীর চিহ্ন থাকে। সেবক নগেন পাণ্ডা ও অন্যান্য শিষ্য ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে দেহ বোধ জ্ঞান শ্রীবাম বলেন, "রাত্রে তারামা জাগিয়া থাকেন কিনা তাই আমিও জাগিয়া কাটাই। কখন তারামার কি আজ্ঞা হয়। তখন আবার ছোট বড় মশারা কানে তারা নামের 'আশ্চর্য' গান শোনায়।" বামদেবের কাছে 'আশ্চর্য' মানে দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয়।

যিনি মহাশ্মশানের ভয়ঙ্কর বিষাক্ত মশার গুণ গুণ ধ্বনির মধ্যেও তারা নাম শোনেন। তারামায়ের দিব্য পবিত্র গান শোনেন, তিনি যে সম্পূর্ণ তারাময় তা সঠিকভাবে যথার্থ উপলব্ধি করা যায়।

সুতরাং তারাময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে সবই তারা। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র তারামাকেই দেখছেন। তাই শ্রীবাম বলেন, তারা মা আমার সব হয়েছেন।" সর্বদা তারা ভাবে তারা ধ্যানে তারা জ্ঞানে থাকতে থাকতে মহাকৌল তারাময় শ্রীবাম ব্রহ্মময়ী তারামায়ের পূর্ণ অভেদ স্বরূপ হয়ে স্বয়ং হয়ে গেছেন—

"স্বয়ং দেবী স্বয়ং দেবঃ স্বয়ং শিষ্য স্বয়ং গুরুঃ।
স্বয়ং ধ্যানম্ স্বয়ং ধ্যাত্মা স্বয়ং সর্ব্বত্র দেবতাঃ॥"

—o—

শ্রীবামকৃপাধন্য যোগেশ ব্রহ্মচারী

বাংলা ১৩১২ সনের হেমন্তের এক প্রসন্ন সকাল। বামদেব ভক্ত পরিবৃত হয়ে নিজ আশ্রমে বসে আছেন। এইসময় পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত, গুজরা নয়াপাড়ার অদূরে অবস্থিত জগৎপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ পূর্ণানন্দ স্বামী ও তাঁর সাথে ষোল বছর বয়স্ক যুবক যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য তথা আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী ব্রহ্মচারী তারাপীঠে বামদেবের সামনে উপস্থিত হলেন। যোগেশ চন্দ্রের বৈদান্তিক গুরু হলেন পূর্ণানন্দ স্বামী। সাধক পূর্ণানন্দ স্বামী বামদেবের পূর্বপরিচিত এবং বিশেষ স্নেহভাজন। বামদেব পূর্ণানন্দ স্বামীকে আশির্বাদ করলেন। যুবক যোগেশ ব্রহ্মচারী প্রণাম করতেই অন্তর্যামী বামদেব তাঁকে দেখে সস্নেহে বললেন, "ওরে, ছোটবেলায় তো মাকে খেয়েছিস্। মা'র দুধ খাওয়া আর হ'ল না তোর। মাতৃহত্যার দায়ে অনেক কষ্ট পাচ্ছিস।"

যোগেশ ব্রহ্মচারী স্তব্ধ বিস্ময়ে এই অন্তর্যামী মহাপুরুষের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আজ পর্যন্ত তাঁর অন্তরের এই মর্ম বেদনা কেউ এমনভাবে তাঁকে দেখা মাত্র বলতে পারেনি।

পূর্ণানন্দ স্বামী বামদেবের কথা প্রসন্ন মনে শুনছেন। তিনি জানেন শিবাবতার বামদেব কি অসীম অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাই মাতৃহারা যুবক যোগেশ ব্রহ্মচারীকে নিয়ে এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে তারাপীঠে।

বামদেব যোগেশ ব্রহ্মচারীকে আবার কৃপা করে বললেন, "তুই তো তোর মায়ের দুধ খেতে চেয়েছিলি। ত্রিভুবনে সকল মায়ের চিরকালের মা তারা মায়ের দুধ তোকে খাওয়াবো। তোর সকল দুঃখ, সকল পাপ তাপ দূর হবে।

তবে ব্রহ্মময়ী তারা মা তোর কাছে আসবেন কালীরূপে। কারণ

তোরা কালী সাধকের বংশ। তোর পূর্বপুরুষ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় তো কালীসাধক ছিলেন। কালী প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। সিদ্ধ বংশের ছেলে তুই।"

যুবক যোগেশ ব্রহ্মচারী উপলব্ধি করলেন যে বামদেব যথার্থ অন্তর্যামী মহাপুরুষ। যোগেশ ব্রহ্মচারী তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছে শুনেছেন যে তাঁদের পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কালীমূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্বে তাঁদের পদবী ছিল মুখোপাধ্যায়। পরে 'ভট্টাচার্য্য' উপাধী লাভ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল এই বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় (তারাপীঠ থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে)।

তাছাড়া বামদেব তাঁর মায়ের দুধ খেতে না পারার সীমাহীন দুঃখ এবং মাতৃহত্যার কারণের মর্মান্তিক যাতনার কথা যা বললেন তা-ও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃহারা যুবক যোগেশের চোখের সামনে এখনও ভেসে ওঠে সেই চরম বেদনাময় দুঃসহ দৃশ্য।

একদিন যোগেশের জননী বামাসুন্দরী দেবী দু'বছর চারমাসের শিশু যোগেশকে ভাত খাওয়াতে চাইছিলেন। কিন্তু শিশু যোগেশ প্রাণ ভরে মা'র স্তনদুগ্ধ পান করতে চাইছে। কিন্তু মা রাজী হলেন না কিছুতেই।

অভিমানে হৃষ্টপুষ্ট শিশু যোগেশ দাঁড়িয়ে রইলো। তাই দেখে যোগেশের মা নিজেই যেন একা ভাত খাবেন এই ভাব নিয়ে যেই মুখে ভাতের গ্রাস তুলছেন ঠিক তখনি শিশু যোগেশ সহসা দূর থেকে ছুটে এসে মা'র কোলে ঝাপিয়ে পড়লো।

যোগেশের মা তখন ছিলেন গর্ভবতী। তাই শিশু যোগেশের ভারি দেহের আকস্মিক আঘাতে আসন্নপ্রসবা জননী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সেই জ্ঞান আর ফিরলো না। দু'টি অপরিণত মৃত যমজ শিশু প্রসব করে তিনি পরলোকগমন করলেন। ফলে সোয়া দুই বছরের শিশু যোগেশ মাতৃহত্যার কারক রূপে আত্মীয় স্বজনের কাছে অনাদৃত ও অবহেলিত হতে লাগলো। বড় হ'বার সাথে সাথে অশেষ অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হতে লাগলো। এগার বছরে উপনয়ন হ'ল

(১৩০৭ সালে)। এই সময় জননীর কাছ থেকে দীক্ষা না পাবার শোক মাতৃহীন যোগেশকে আরো কাতর করে তোলে। পরলোকগত জননীর সাক্ষাতের সম্ভাবনায় কিশোর যোগেশ ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ, ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের সাধন প্রণালী গ্রহণ করে সাধনা করে কয়েক বছর ধরে কিন্তু বিদেহী জননীর সাক্ষাত সম্ভব হ'ল না। মাতৃশোকও দাবানলের ন্যায় হৃদয়ে প্রজ্বলিত রইলো।

এই অবস্থা দেখে পূর্ণানন্দ স্বামী ষোল বছরের যুবককে নিয়ে তারাপীঠে চলে এলেন বামদেবের কাছে।

বামদেবের অভয়বাণী ও পরম আনন্দময় কথা শুনে যুবক যোগেশ ব্রহ্মচারী অশেষ আনন্দিত হলেন। মহাপুরুষ বামদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয়ও তারাপীঠে আসামাত্র পেলেন।

বামদেবের নির্দেশে পূর্ণানন্দ ও যোগেশ ব্রহ্মচারী বামদেবের আশ্রমেই রইলেন। বামদেবের আশ্রমেই তারামায়ের প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা হ'ল। কয়েকদিন পর পূর্ণানন্দ স্বামী ফিরে গেলেন তাঁর জগৎপুর আশ্রমে। যোগেশ ব্রহ্মচারী তারাপীঠে বামদেবের আশ্রমে রইলেন।

একদিন মহানিশায় বামদেব মহাশ্মশানে নিয়ে গিয়ে যোগেশকে কালীমন্ত্র দিয়ে বললেন, "এই মন্ত্র জপ করে যা। এই মহামন্ত্রের ধ্বনি অন্তরে বাইরে ধ্বনিত হবে। কাল-ই তো কালী। কালীর কোলেই সবাই বসে আছি। আজ কাল পরশু সবই তো কাল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন কালের ওপর রয়েছে। সেই 'কাল'-ই কালী।"

সাধকপ্রবর যোগেশ ব্রহ্মচারী বামদেব প্রদত্ত এই কালীমন্ত্র গভীর নিষ্ঠার সাথে জপ করতে লাগলেন। কিছুদিন পর এক মহাযোগে এক নির্দিষ্ট লগ্নে গভীর রাতে বামদেব সাধক যোগেশ ব্রহ্মচারীকে নিয়ে গেলেন মহাশ্মশানের চিতার কাছে। শব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন বামদেব।

যা করণীয় সবই বামদেব করলেন। তারপর শবের ওপর যোগেশ

ব্রহ্মচারীকে বসিয়ে দিয়ে জপ করে যেতে বললেন। বামদেব কাছেই রইলেন।

যোগেশ ক্রমে ক্রমে জপে তন্ময় হয়ে গেলেন। হঠাৎ এক সময় দেখলেন পাশে যে হাড়িটা আছে, যা সাধারণত শবদাহ শেষে ফুটো করে রেখে যায় শব বাহকরা, তা ঘুরছে নিজ থেকে। ক্রমশঃ বেশ জোরে ঘুরতে লাগলো। তারপর এক সময় সাধকপ্রবর যোগেশ ব্রহ্মচারী দেখলেন যে চারদিক আলো করে জগতজননী কালী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বামদেব সস্নেহে যোগেশ ব্রহ্মচারীকে বললেন, "যা মায়ের দুধ খা।"

তারপর তারা মা তথা মা কালীকে বললেন, "মা একে দুধ খেতে দে।"

কোটি চন্দ্র সূর্যের সমন্বিত অপূর্ব স্নিগ্ধ নিলাভ জ্যোতিতে চারদিক পরিপূর্ণ করে মা কালী স্নিগ্ধ নয়নে মাতৃসাধক যোগেশ ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে আছেন প্রসন্ন বদনে। প্রাণভরে ইষ্টদেবী মা কালীকে দর্শন করলেন সাধক প্রবর যোগেশ। তারপর মা'র উন্মুক্ত স্তন যুগলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট শিশুর ন্যায় প্রাণভরে পান করতে লাগলেন মাতৃসুধা। সেই সুধার অমৃত পরশে তাঁর দেহের প্রতিটি রোম কূপ দিব্য আনন্দে, অনন্ত হর্ষে অসীম পুলকে অমৃতময় হয়ে গেল। পরম আনন্দে আত্মহারা হয়ে সিদ্ধ সাধক যোগেশ ব্রহ্মচারী জ্ঞান হারালেন। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলেন তাঁর ইষ্ট দেবী মা কালী নেই। বামদেব তাঁর পাশে রয়েছেন।

বামদেব সানন্দে স্নেহভরে বললেন, "যা, তোর সব দোষ কেটে গেল। মা'র দুধ খেয়েছিস, মহা ভাগ্যবান তুই।"

অসীম আনন্দে কৃতজ্ঞতায় হতবাক হয়ে গেলেন সিদ্ধ সাধক যোগেশ ব্রহ্মচারী। তারপর শিবস্বরূপ গুরু বামদেবের চরণকমলে প্রণত হলেন পরম শ্রদ্ধাভক্তির সাথে। মাত্র ষোল বছরে যে শিষ্যকে ইষ্টদর্শন করালেন সেই শিষ্যকে বামদেব সানন্দে আশির্বাদ করলেন। বামদেবের কাছে দীর্ঘ তিনমাস রইলেন যোগেশ ব্রহ্মচারী। এই তিনমাস তারাপীঠে

বামদেবের কাছে থাকার সময় গুরু বামদেবের অনেক দিব্য লীলা তিনি যে শুধু প্রত্যক্ষ করেছেন তা নয়, বামদেবের সাথে অনেক কথাও বলেছেন।

প্রশ্ন করে অনেক গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বও জেনেছেন।

বামদেব প্রায়ই "তারা তারা" বলে গভীর গম্ভীরস্বরে ডাকেন। তা দেখে একদিন যুবক যোগেশ ব্রহ্মচারী বললেন, "আপনি এত ডাকেন কেন?"

উত্তরে বামদেব বললেন, "ঈশ্বরকে ডাকতে হবে। একটা অবলম্বন তো দরকার। শব্দ ছাড়া ডাকা যায় কি? এই যে তুই আমার সাথে কথা বলছিস, শব্দ ছাড়া বলতে পাচ্ছিস কি? তাই তাঁকে ডাকতে হলে কথা বলতে হলে শব্দ ছাড়া হয় না।

শব্দই তো ব্রহ্ম। শব্দ আর ধ্বনি দিয়েই তো বলতে হয়, ভাবতে হয় ঈশ্বরকে।"

বামদেবের কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন মাতৃকৃপাধন্য যোগেশ ব্রহ্মচারী। তবু সংশয় যায় না। পুনরায় গুরু বামদেবকে বললেন, "আপনি শুধু তারা তারা করেন কেন? কালী কালী বা অন্য কিছু নাম বলেন না কেন?"

তা শুনে বামদেব মৃদু হেসে বললেন, "ওরে, তারাই তো তারণ করেন। তিনিই তো তারিণী। তাই তিনিই তারক। তারক ব্রহ্মনাম যে করিস, তা-ও তিনিই। তারাই তো তরিয়ে দেন।

তাই ত্রাণ পাবার জন্য তাঁকেই ডাকতে হয়রে।"

বামদেবের সাথে দীর্ঘ তিনমাস ধরে প্রায় সর্বক্ষণ পাশে পাশে থেকেছেন মহাভাগ্যবান সিদ্ধসাধক যোগেশ ব্রহ্মচারী। কিন্তু কখনও বামদেবকে জপ, পুজো, ধ্যান ইত্যাদি করতে দেখেন নি।

তবে মাঝে মাঝে গায়ত্রী করতেন। কিন্তু সবসময় যেন তন্ময় হয়ে থাকতেন। নাদসিদ্ধ ছিল বামদেবের গলার স্বর। বামদেবের গলায় পৈতা বিরাজমান। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের দেহে পৈতা সর্বসময় জপ ধ্যান

ও পবিত্রতার প্রতীক। কিন্তু বামদেবের ক্ষেত্রে তা বিচিত্র্য রকম বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ। সকল শুচি অশুচির উর্দ্ধে বামদেব বিরাজ করেন।

বামদেব গলায় পৈতা নিয়ে বসে আছেন। এই সময় শ্মশানের মড়া খেয়ে বামদেবের প্রিয় কালু কুকুর একটা পচাগলা মৃতদেহ থেকে এক টুকরো নরমাংস মুখে করে এনে বামদেবের সামনে দাঁড়ালো। বামদেব নির্বিকারভাবে সেই দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা নরমাংসের আর্ধেকটা নিজে খেলেন। বাকি আর্ধেকটা সস্নেহে কালুর মুখে গুজে দিলেন।

এ যেন প্রিয় ছেলের আবদারে ছেলের মুখের থেকে বিস্কুট নিয়ে বাবা কিছুটা খেয়ে আবার ছেলের মুখে বাকিটা গুজে দিলেন।

এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখে যুবক যোগেশ বামদেবকে বললেন, "বাবা, এই বিভৎস নরমাংস খেতে আপনার ঘৃণা হ'ল না?',

তা শুনে বামদেব আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "কেন?"

উত্তরে যোগেশ চন্দ্র বললেন, "এ তো নরমাংস, তাতে পচাগলা। তাতে আবার কাঁচা। এ তো সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।"

তা শুনে বামদেব এক গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ কথা বললেন যোগেশ চন্দ্রকে।

বামদেব শান্ত গম্ভীরভাবে বললেন, "দ্যাখ, খাদ্যের শুচি অশুচি বলে সত্যিই কিছু আছে কি? যা একজনের কাছে শুচি, আরেকজনের কাছে তাই অশুচি।

ধর না কেন, তুই ভাল মিষ্টি ছানা খেলি। তোর আনন্দ হ'ল। তারপর একসময় তা তোর শরীর থেকে মলদ্বার দিয়ে বের হ'ল। তোর দেহের ঐ বিষ্ঠা তখন আর তুই খেতে পারিস না, তোর কাছে তা তখন অশুচি হয়ে গেল। পরিত্যাজ্য হয়ে গেল। কিন্তু কুকুর আবার তোর ঐ বিষ্ঠা খেয়ে আনন্দে লেজ নাড়তে লাগলো। তার কাছে তোর ঐ বিষ্ঠা শুচি ও গ্রহণীয়।

আবার কুকুর যখন মলত্যাগ করলো তখন তার ঐ বিষ্ঠা কিন্তু সে আর খায় না। তার কাছে তখন তার বিষ্ঠাই অশুচি। কিন্তু তখন কাক, শালিক প্রভৃতি পাখী ঐ কুকুরের বিষ্ঠা খায়।

এখন বল দেখি শুচি অশুচি বলে আছে কি কিছু ?”

বামদেবের এই গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সিদ্ধ সাধক যোগেশ ব্রহ্মচারী। একটু পরে বামদেব বললেন, “দ্যাখ্, যার পেটে যে খাদ্য সহ্য হয় তাই হ'ল শুচি। আর যে খাদ্য সহ্য হয়না তাই হ'ল অশুচি। এই হ'ল আসল কথা।”

বামদেব সাধারণতঃ সকালবেলা মুড়ি খান। তার সাথে কেউ 'কারণ' মিশিয়ে দিলেও তাঁর আপত্তি নেই। আবার দুধ বা অন্য কিছু মেশালেও আপত্তি করেন না। আবার কুকুর যদি শ্মশান থেকে কাঁচা মাংস এনে দেয় তাতেও আপত্তি নেই।

এক কথায় বামদেবের কাছে গ্রহণীয় বর্জনীয় বলে কিছু নেই। তিনি সর্বাবস্থায় শুচি অশুচির উর্দ্ধে। তিনি সম্পূর্ণ অষ্টপাশ মুক্ত পূর্ণ ব্রহ্মবিদ মহাপুরুষ।

কয়েকদিন পর পূর্ণানন্দ স্বামী এলেন তারাপীঠে। বামদেবের স্নেহধন্য ও যোগেশ ব্রহ্মচারীর বৈদান্তিক গুরু এই পূর্ণানন্দ স্বামী শক্তিমান সিদ্ধ সাধক। তিনি মূলত জ্ঞানমার্গের সাধক হলেও তন্ত্রমতেও জগতজননী কালীর দর্শন পেয়েছেন।

তন্ত্রোক্ত সাধনপন্থায় তিনি দক্ষিণাচারী। একবার এক শ্মশানে দক্ষিণাচারে মা কালীকে পুজো করলেন শুদ্ধভাবে দই মিষ্টি ফল সরভাজা প্রভৃতি দিয়ে। যথাসময়ে মা কালী এলেন। সানন্দে জগতজননী বসে খেলেন প্রিয় সন্তানের দেওয়া শ্রদ্ধাভক্তির এই উপচার।

যা হোক, একদিন পূর্ণানন্দ স্বামী যোগেশ ব্রহ্মচারীকে বললেন যে, শ্মশানে শবদাহ করবার পর শববাহকগণ যে মাটির কলসীর জল ঢেলে দিয়ে তা নিভিয়ে দেয়, সেই কলসিটা সাধারণত শববাহকগণ ভেঙে দিয়ে যায়। কেউ বা তিনটে ফুটো করে দেয়। সেই রকম ফুটো হাড়ি নিয়ে শক্তি মন্ত্র জপ করতে বললেন তিনি যোগেশ ব্রহ্মচারীকে। যথাসময়ে গভীর রাতে যোগেশ ব্রহ্মচারী তা করলেন। সাথে সাথে আশ্চর্যভাবে হাড়ি ঘুরতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর দেহটা শব হয়ে গেছে। তার ওপরে মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন। মা'র কৃপা পেয়ে ধন্য হলেন যোগেশ চন্দ্র।

তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব বামাক্ষ্যাপা বাবার অনুমতি ছাড়া মহাজাগ্রত তারাপীঠ মহাশ্মশানে কেউ সাধনা করতে সাহস পায় না। শ্মশান বিভূতির তীব্রতায় অনেকেই আসন ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু বামদেব যাকে অনুমতি দেবেন প্রসন্ন মনে তিনিই নির্বিঘ্নে তপস্যা করতে পারেন এবং ইষ্ট দর্শন লাভ কবে মানবজীবন সফল করেন।

পূর্ণানন্দ স্বামী ও যোগেশ ব্রহ্মচারী তারাপীঠে থাকাকালীন একাধিক বার তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য তন্ময়তা এক অপরিসীম দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় ব্যাপার। যে মহাভাগ্যবান তা দর্শন করেছেন তাঁর জীবন ধন্য। মাতৃসাধক যোগেশ ব্রহ্মচারী একদিন রাতে সেই মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হলেন।

বামদেব একদিন গভীর রাতে তন্ময় হয়ে বসে আছেন। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় যোগেশ ব্রহ্মচারীও উঠে বসলেন। বামদেব তা দেখে যোগেশ ব্রহ্মচারীকে বললেন, "বাবা, চুপ করে বসে থাক। আস্তে আস্তে তন্ময় হয়ে যাও। তন্ময় হলেই শুনতে পাবে আকাশ বাতাসের মধ্যে এক অদৃশ্য ধ্বনি। আকাশ বাতাস সব জুড়ে রয়েছে ঐ ধ্বনি। তোমার মধ্যেও সেই ধ্বনি আছে। তার সাথে মিলে যাও। তন্ময় হও বাবা, তন্ময় হও।"

আশ্চর্য, বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে থাকতে যোগেশ ব্রহ্মচারীর মধ্যে তন্ময়তা আসতে শুরু করলো।

গভীর রাত। চারদিক অন্ধকারে আবৃত। নিস্তব্ধ প্রকৃতি। তন্ময়তা গভীর হতেই তিনি শুনতে পেলেন একটানা ধ্বনিত হচ্ছে প্রণব ধ্বনি—মধুর ও দিব্য ওঙ্কার ধ্বনি—অ-উ-ম। তন্ময়তা যত জমছে সেই প্রণব ধ্বনি ততই শুনতে পাচ্ছেন আকাশে বাতাসে চারদিকে।

যেন নাদ থেকে উঠে আসছে তারপর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

কতক্ষণ এই প্রণব ধ্বনির দিব্য মধুর তরঙ্গে ভেসেছিলেন তা খেয়াল নেই সাধক যোগেশ ব্রহ্মচারীর। এক সময় ভোর হয়ে এল।

মহা প্রকৃতি জেগে উঠলো। আস্তে আস্তে জনজীবনের প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হ'ল। সেই মধুর পবিত্র অমৃতময় প্রণব ধ্বনি ঊর্দ্ধ আকাশে মিলিয়ে গেল।

তন্ময়তার সমাধি থেকে ধীরে ধীরে জাগ্রত হলেন সিদ্ধ সাধক যোগেশ ব্রহ্মচারী।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহের পারে যে অমৃত আত্মা মহা কারণ পরমাত্মার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন প্রণব ধ্বনির মাধ্যমে, চৈতন্য মহাচৈতন্যের মহামেলায় সেই আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে জড়ভাবে ভাবিত হয়ে দেহবোধে ফিরে এলেন।

জড় আর চৈতন্য আলাদা হয়ে আপন খেলায় মেতে রইলো।

'তন্ময়' কথাটির ওপর বামদেব খুব জোর দেন। 'তন্' ধ্বনিতে ময় হয়ে যেতে বলেন। নিজের মধ্যে নিজেকে ডুবে যেতে বলেন।

যে আধারে যে রূপ ভাল লাগে সেই রূপের ধ্যান করতে বলেন বামদেব শিষ্য ভক্তদের। সাথে সেই রূপের নাম (শব্দ ব্রহ্ম) জপ করতে বলেন। শব্দ ও ধ্বনির তন্ময়তা লাভ করতে সাধক শিষ্য ভক্তদের উপদেশ দেন মহাযোগী বামদেব।

দিন মাস কেটে যেতে লাগলো। বামদেবকে যত গভীরভাবে দেখছেন যোগেশ ব্রহ্মচারী ততই গভীর বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হয়ে যান। অথচ সাধারণ ও স্থানীয় অধিকাংশ বিষয়ী জড় ভাবাপন্ন লোক, যারা দীর্ঘকাল ধরে বামদেবকে দেখে আসছে, তারা বামদেবকে একটা ক্ষ্যাপাটে ভক্ত মাতাল বলে ভাবে। বামদেবও এদের মধ্যেই বসে আছেন নির্বিকার ভাবে। এক দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্ম আবরণ তিনি নিজের চারদিকে এমনভাবে টেনে দিয়ে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন যে, এদের সাধ্য নেই তা ছিন্ন করে বামদেবকে উপলব্ধি করে।

বামদেবের সঙ্গ করতে করতে সাধকপ্রবর যোগেশ ব্রহ্মচারী আশ্চর্য হয়ে ভাবেন যে বামদেবকে সাধারণ লোক মাতাল বলে অথচ বামদেবকে তিনি কখনো মদ বা কারণ খেয়ে মাতাল হতে দেখেন নি। দ্বিতীয়ত, মাতালদের কোন একটা বিশেষসময়ে মদ না হলে চলে না। কিন্তু বামদেবের সেসব কিছুই নেই। মদের জন্য কোন আকর্ষণ নেই।

কেউ আনলে তারামাকে নিবেদন করে প্রসাদজ্ঞানে খেলেন। না হলে নয়। সাধারণ কোন ভক্ত মদ নিয়ে এলে বামদেব তা তারামাকে নিবেদন করে নিজে একটু পান করেন, তারপর কালু কুকুর প্রভৃতিকে একটু দেন। তারপর আবার যে ভক্ত মদ এনেছে তাকে একটু দিলেন এবং তাঁর কাছে যাঁরা রয়েছেন মদ খাবার প্রত্যাশী হয়ে তাঁদের দিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যে মদ খায় না, তাঁকে কখনো খেতে বলেন না। যেমন যোগেশ ব্রহ্মচারী মদ পছন্দ করেন না, তাঁকে বামদেব কখনো মদ খেতে বলেন নি বা বলেন না। বামদেব তাঁকে একাধিকবার মুড়ি খেতে দিয়েছেন।

একদিন যোগেশ ব্রহ্মচারী বামদেবকে গুরুকরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বামদেব বললেন, "তারামা-ই আমার গুরু।"

বামদেব মহাপ্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তথাকথিত অবধূতের চব্বিশ গুরুর মত বামদেবও মহা প্রকৃতি ও পশু পাখী পিঁপড়ে কেঁচো প্রভৃতিকে 'গুরু' বলতেন পরম আনন্দের সাথে। একদিন বামদেব ও যোগেশ ব্রহ্মচারী বসে আছেন। এমন সময় কালু কুকুর এসে বামদেবের কোলে মনের আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বামদেব স্নেহভরে কালু কুকুরকে আদর করতে করতে কালু কুকুরকে দেখিয়ে যোগেশ ব্রহ্মচারীকে বললেন, "এই কালুও আমার গুরু।" কুকুরের মধ্যে মহাপুরুষের অনেক গুণ আছে। কুকুর অল্পে তুষ্ট, কৃতজ্ঞ, একনিষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত, বিশ্বাসী। কুকুরের ঘুম অল্প, সামান্য শব্দে জেগে যায়। প্রভুর কল্যাণের জন্য সচেষ্ট থাকে সর্বক্ষণ।"

আবার বামদেব কখনো কেঁচোকে দেখিয়ে বলেন যোগেশ ব্রহ্মচারীকে, "এই দ্যাখ, কেঁচো কেমন এক পা এগুচ্ছে আবার নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। তেমনি মানুষকেও কেঁচোর মত নিজেকে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার সময় কামনা বাসনা লোভ হিংসা প্রভৃতি গুটিয়ে নিয়ে চলতে হয়। সুতরাং কেঁচোও গুরু।"

আবার একদিন যোগেশ ব্রহ্মচারীকে বললেন, "এই যে দ্যাখ্, এখানে গুড় পড়েছে। পিঁপড়ে এসে গেছে। নিজের থেকেই এসেছে। নিজের

প্রয়োজনেই খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছে। তুই ডেকেছিস কি? বা কেউ ডেকেছে তাকে? কেউ ডাকে নি। নিজের প্রয়োজনেই এসেছে। তেমনি ঈশ্বরের মধুর খোঁজে নিজের প্রয়োজনে নিজের থেকেই এগিয়ে আসতে হয় তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে। তবেই তো মধু মেলে। পিঁপড়ে এই আদর্শ দেখাচ্ছে। তাই পিঁপড়েও গুরু।"

আবার একদিন যোগেশ ব্রহ্মচারীকে বললেন, "এই দ্যাখ্, আকাশ কেমন পরিষ্কার। কত যুগ ধরে কত ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে আকাশের বুকে। কিন্তু আকাশে তার কোন দাগ নেই। তার চিহ্নমাত্র নেই। তেমনি জীবনে সুখদুঃখ ভালমন্দ কত কিছু ঘটে কিন্তু মনে কোন দাগ ফেলতে নেই। সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে থাকতে হয় আকাশের মত। তাই আকাশও গুরু।"

আরেকদিন বামদেব স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। পাশে যোগেশ ব্রহ্মচারী বসে রয়েছেন। জোরে বাতাস বইছে। সহসা বামদেব বললেন, "এই দ্যাখ্, বাতাস বইছে। সুগন্ধ দুর্গন্ধ দুই-ই বইছে অনাসক্তভাবে। সে কর্মী। শুধু কাজ করে যাচ্ছে। তেমনি সূর্য চন্দ্র প্রত্যেকেই আলো দিচ্ছে। যে যার কাজ করে যাচ্ছে। কে তাদের চাইছে কে চাইছে না তা ফিরেও দেখছে না। এমনি নীরব কর্মী হয়ে অনাসক্ত ভাবে কাজ করে যেতে হয়। এই শিক্ষা ওদের থেকে নিতে হয়। তাই বাতাস সূর্য চন্দ্র এরাও গুরু।"

এইভাবে মহাপ্রকৃতির সাথে পরম প্রেমিক পরম ব্রহ্মবিদ বামদেব একাত্ম হয়ে গেছেন। নিজ আত্মায় বিশ্বাত্মা দর্শন করে গভীরভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন।

বেদমতে 'বাম' শব্দের অর্থ সম্পদ। তাই যোগেশ ব্রহ্মচারী উপলব্ধি করলেন যে 'বাম' শব্দ অনুসারে বামদেব জগতের সম্পদস্বরূপ। তাঁর বামদেব নাম যথার্থ সার্থক।

দীর্ঘ তিন মাস তারাপীঠে কেটে গেল সিদ্ধ সাধক যোগেশ ব্রহ্মচারীর। আবার চট্টগ্রামে নিজ গৃহে ফেরার পালা। পরিপূর্ণ শান্তি আনন্দ ও তৃপ্তি নিয়ে তন্ত্রগুরু বামদেবের কাছ থেকে বিদায় নিলেন যোগেশ ব্রহ্মচারী।

তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে ফিরে চললেন পিতৃগৃহে। কিন্তু মনে বাসনা রইলো পুনরায় তারাপীঠে আসবার। বাংলা ১৩১২ সনে এই প্রথমবার এসে তিনমাস অতিবাহিত করলেন। তারপর ১৩১২ সন থেকে ১৩১৮ সনের মধ্যে (বামদেব স্থূলদেহে বর্তমান থাকতে) আরো দু'বার আসেন তারামা ও বামদেবকে দর্শন করতে। কিন্তু এই দু'বার বেশীদিন তারাপীঠে থাকেন নি।

মাত্র ১৬ বছরে যে মহাভাগ্যবান সাধক বামদেবের কৃপায় ইষ্টদর্শন ও ইষ্টদেবী জগতজননী কালী তথা তারামায়ের স্তনসুধা পান করবার অতি দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন সেই ঐশী নির্দিষ্ট এই মহান সিদ্ধ সাধকের পরবর্তী জীবন কাহিনীও অসাধারণ বৈচিত্র্য ও বিস্ময়কর ক্রিয়াকর্মে পরিপূর্ণ। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের ত্রিধারার বিচিত্র সঙ্গম হয়েছে তাঁর জীবন তটে।

একাধারে বৈদিক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, যোগী, তন্ত্রসিদ্ধপুরুষ, মহা-বৈষ্ণব, মহাশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্, মহান গুরু, মহাপুরুষের সঙ্গধন্য, পরিব্রাজক, দেশপ্রেমিক, বিশিষ্ট বিপ্লবী, সুলেখক, সুপণ্ডিত এবং মহান সংগঠক রূপে তিনি ক্রমে ক্রমে ভারতের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যোগেশ ব্রহ্মচারীর জন্ম ইংরেজী ১৮৯০ সালের (বাংলা ১২৯৬ সনে) ৭ই মার্চ চট্টগ্রাম জেলার গুজরা নয়াপাড়া গ্রামে এক বিশিষ্ট তন্ত্রসিদ্ধ পরিবারে। ছোটবেলা থেকে আধ্যাত্মিক পথে আসেন ও একাধিক সাধুসঙ্গ করেন।

শিশুকালে তাঁর জন্য তাঁর মায়ের মৃত্যু, দুঃখ অশান্তি এবং কৈশোরে পরলোকগত জননীর দর্শনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের সাধন পথে বিচরণ প্রভৃতি ঘটনা ঘটে। (যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে)।

আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর একাধিক দীক্ষা হয়। তাঁর প্রথম দীক্ষা তান্ত্রিক দীক্ষা। সেই দীক্ষা দেন তাঁর পিতৃদেব পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তারপর যৌবনে তারাপীঠে বামদেবের কাছে থেকে কালীবীজ লাভ করে জগতজননী মা কালীর দর্শন ও স্তন সুধা পান করে পরম

শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেন (ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। সেই হিসাবে বামদেব তাঁর দ্বিতীয় তন্ত্রগুরু।

পরবর্তীকালে এক হঠযোগী মুসলমান ফকিরের কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন। ফকির জলের নীচে জোয়ারের সময় ডুবে থাকতেন এবং ভাটার সময় জল থেকে মাথা তুলতেন।

তারপর মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সুযোগ্য শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করে আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের আদর্শ গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবীয় ভাব সাধনায় ব্রতী হ'ন।

এইভাবে বহু পথ ও বহু মতের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমে ত্রিশজন মহাপুরুষের কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন।

তিনি ভারতের বহু মহাসাধক মহা সাধিকার সঙ্গলাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীশ্রীরামঠাকুর, সন্তদাস বাবাজী, আনন্দময়ী মা, স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রভৃতিগণ।

আধ্যাত্মিক জীবনের পাশাপাশি তাঁর জাগতিক জীবনও অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ছাত্রজীবনে তিনি ও চট্টগ্রামের সর্বজনবন্দিত মহান বিপ্লবী সূর্য সেন (মাষ্টারদা) একই স্কুলে একই সাথে পড়তেন।

মাত্র দশ বছর বয়স থেকেই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন। মুসলমান বালকের বেশে তিনি রিভলবার প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে দলনেতার নির্দেশ মত নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিস্ট বিপ্লবীর হাতে তুলে দিয়ে আসতেন। যৌবনে বিপ্লবীদের সাথে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। বিপ্লবী বাঘাযতীনের সাথেও তাঁর গভীর যোগাযোগ বজায় থাকে। অস্ত্রশস্ত্র দেয়ানেয়া করতেন। ইতিমধ্যে ১৯১৬ সালে বি.এ পাশ করেন এবং ১৯২০ সালে এম.এ পাশ করেন দর্শন শাস্ত্রে। এম.এ-তে তিনি বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র শীলের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। দেশনেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লালা লাজপত রায়, বিপিন পাল, লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য তাঁকে অশেষ ভালবাসতেন।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে স্বরাজলাভের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে

মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁর সাধারণ সম্পাদক হ'ন এবং এই সময় গ্রাম্য যোগাশ্রম স্থাপনার কথা চিন্তা করেন।

১৯২২ সালে বত্রিশ বছর বয়সে তিনি উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছদ্মবেশে 'মিষ্টার যোশেফ' নাম নিয়ে বৃটিশ রাজশক্তিকে ফাঁকি দিয়ে রাশিয়ায় চলে যান। ক্রমে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার মহান রাষ্ট্রনেতা লেনিনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন।

মহান জননেতা লেনিন তাঁকে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক বলেই জানতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে লেনিন তাঁকে বলেন, "তোমরা ভারতীয় হিন্দুদের খৃষ্টান করবার জন্য যে চেষ্টা করছো তাব সার্থকতা ও মূল্যায়ন কি?"

উত্তরে জোসেফরূপী যোগেশ ব্রহ্মচারী লেনিনকে বলেন, "হিন্দুদের খৃষ্টান করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এই ধর্মের বিশালতা ও ব্যাপকতা এত গভীর যে তা চিন্তা করা যায় না। গণতন্ত্রের কথা তাঁদের আর কি বলবো। হিন্দুধর্মে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রতিদিন যে কোন পূজার প্রথম পূজাই হ'ল গণতন্ত্রের। তাঁদের দেবতা হলেন গণপতি। হিন্দুধর্মের বিরাট ও ব্যাপক ধর্ম ও সমাজ জীবনের মধ্যে সার্বিক সাম্য ও ঐক্যের প্রতীক হলেন এই 'গণপতি' (God of Democracy) তথা গণেশ। এই 'গণপতি' সকল জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য জনগণের দ্বারা নিত্য পূজিত হন। অর্থাৎ তিনি জনগণের জন্য, জনগণের ও জনগণের দ্বারা সর্বতোভাবে বিরাজিত (For the people, OF the people and By the people)। তাই ভারতবর্ষে হিন্দুদের ন্যায় এমন গণতন্ত্রের সার্বিক পূজা জগতে অন্য কোন দেশে বা ধর্মে নেই। সুতরাং ভারতীয় হিন্দুদের খৃষ্টানরা আর কি গণতন্ত্র শেখাবে?" যোসেফরূপী যোগেশ ব্রহ্মচারীর একথা শুনে ভি.আই লেনিন গভীরভাবে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। যোগেশ ব্রহ্মচারী লেনিনকে এরপর হিন্দুধর্মের পরম রত্নস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীগীতা মূল সারাংশ ব্যাখ্যা করেন।

লেনিন মুগ্ধ বিস্ময়ে তা শুনে বলেন, "ভাব ও নীতির দিক থেকে হিন্দুধর্মের তুলনা নেই। আমি এই মহান ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান।"

কিছুকাল পর যোগেশ ব্রহ্মচারী রাশিয়া থেকে পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ঘুরে ভারতে ফিরে আসেন।

তারপর ১৯২৪ সালে রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে প্রাচীন বৈদিক পন্থানুসারে গ্রাম্য যোগাশ্রম স্থাপনে ব্রতী হলেন। এজন্য চাই সর্বপ্রথমে আত্মদর্শন। আত্মস্বরূপ উপলব্ধি। এই হল প্রকৃত স্বরাজ।

এলাহাবাদে এলেন যোগেশ ব্রহ্মচারী। সেবার পূর্ণ কুম্ভমেলা হচ্ছে এলাহাবাদে। হঠাৎ তিনি দেখলেন, "গঙ্গার ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছেন এক সাধু আর বলছেন, "স্বরাড়হম্ স্বরাড়হম্" যোগেশ ব্রহ্মচারী সেই সাধুর সাথে সাক্ষাত করলেন। জানতে চাইলেন এর অর্থ। সাধু বললেন, "আমিই সেই স্বর বা ধ্বনি। নাদ থেকে সেই ধ্বনির প্রকাশ। শব্দ ব্রহ্ম যেমন, ধ্বনিও তেমনি ব্রহ্মস্বরূপ। আত্মজ্ঞান হলে নিজ আত্মা বিশ্বাত্মায় মিলিত হলে দেখা যাবে শব্দ ধ্বনি প্রভৃতি সবই আমাতে রয়েছে। আমিই সেই শব্দ বা ধ্বনি।

তখন বিরাট আমি সকল আমির মধ্যে মিশে যাব। সকল আমি এক বিরাট আমির মধ্যে মিশে যাব। এই আত্মানন্দ তথা ব্রহ্মানন্দই মানুষকে করবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্তরলোকে এই হ'ল প্রকৃত স্বরাজ।।"

সন্ন্যাসীর এই অমৃতময় কথা উপলব্ধি করে যোগেশ ব্রহ্মচারী অপরিসীম মুগ্ধ হলেন। এতদিন যা চাইছিলেন তাই এই প্রয়াগে এসে পেলেন। কুম্ভমেলায় যোগেশ ব্রহ্মচারী একদিন বক্তৃতা দিলেন। মদনমোহন মালব্য তাঁর অপূর্ব বক্তৃতা শুনে তাঁর সাথে এসে সাক্ষাত করলেন। অবশেষে ১৯৪৬ সালে তিনি বালীগঞ্জ গ্রাম্য যোগাশ্রম স্থাপন করলেন। আত্মজ্ঞান ও কর্মের আদর্শ সমন্বয় হ'ল এই বৈদিক আশ্রম। ক্রমে ভারতের দিকে দিকে স্থাপিত হয় আরো নানান উন্নয়ন মূলক সংস্থা। তারমধ্যে পুরুলিয়ার গ্রাম্য যোগাশ্রম, জামসেদপুরের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গণসংঘ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যোগেশ ব্রহ্মচারী আচার্য্যরূপে শ্রীমৎ অচলানন্দ স্বামী নামে অভিহিত হলেও যোগেশ ব্রহ্মচারী নামেই তিনি সর্বত্র সুচিহ্নিত ও সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর বালীগঞ্জ গ্রাম্য যোগাশ্রমে শাক্ত বৈষ্ণব উভয় ভাবেই সারা বছর নিত্যসেবা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর শিষ্য ভক্ত ও গুণমুগ্ধের সংখ্যা

দেশবিদেশে অগণিত। তিনি অতঃপর পনেরটি বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে শ্রীশ্রীগীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা, তোমার হাতে আমার বীণা, তোমার মুখে বাঁশী আমি, তোমার পায়ে নূপুর আমি, রথযাত্রা। কুলদানন্দের কথায় শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের বাণী, অন্নকূট প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁর বালীগঞ্জ গ্রাম্য যোগাশ্রমের ট্রাষ্টডীড্ রেজিষ্ট্রি করেন। ১৯৮৩ সালের ২৮শে জুন ৯৩ বছর বয়সে তিনি সজ্ঞানে মরদেহ ত্যাগ করে অমৃতলোকে গমন করেন। তাঁর মরদেহ তাঁর পরমপ্রিয় এই আশ্রমেই সমাহিত করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১৭ই জুলাই রবিবার এই বালীগঞ্জ গ্রাম্য যোগাশ্রমে বিশাল ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর অমর আত্মার কল্যাণে।

উপরোক্ত কাহিনী মহাসাধক যোগেশ ব্রহ্মচারী ১৯৭৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী শনিবার লেখককে বলেন তাঁর বালীগঞ্জ গ্রাম্য যোগাশ্রমে বসে। লেখকের সঙ্গে ছিলেন ভক্তপ্রবর রণজিৎ ঝা। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৩৮৭ সনের ১লা বৈশাখ সোমবার পুনরায় আরো কিছু কাহিনী লেখককে বলেন। লেখকের সাথে ছিলেন ভক্ত রত্ন মুখোপাধ্যায়। এদিন এই গ্রন্থের জন্য তাঁর ছবি তোলা হয়। এছাড়া আরো একাধিক বার লেখকের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। এই দীন লেখককে তিনি অশেষ প্রেম প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন কৃপা করে। জগতজননী তারা মা ও শিবাবতার বামদেবের ঐশী কৃপায় এই মহান সিদ্ধপুরুষের সাথে লেখকের সংযোগ ঘটে অলৌকিকভাবে। ১৯৭৫ সালে যোগেশ ব্রহ্মচারী যখন বৃন্দাবনে সেই সময় এই লেখক কলকাতায় রয়েছেন। উভয়ে উভয়ের অপরিচিত। কিন্তু অলৌকিকভাবে সহসা লেখকের মানস নয়নে তারামা তাঁর এই প্রিয় সাধক সন্তানের ছবি তুলে ধরেন। লেখক তখন তারামায়ের এক ভক্ত সন্তান শ্রীপ্রদ্যুত মুখার্জীকে বলেন একথা এবং তাঁর মাধ্যমে বৃন্দাবনে যোগাযোগ ঘটে যোগেশ ব্রহ্মচারীর। যোগেশ ব্রহ্মচারীও বিস্মিত ও আনন্দিত হন এই অলৌকিক ঘটনা শুনে। তারাপীঠের সাথে বৃন্দাবনের একাত্মতা

চিরন্তন। শ্যাম শ্যামার অভেদ ক্ষেত্র তারাপীঠ ও বৃন্দাবন। উপরোক্ত কাহিনী ও অলৌকিক ঘটনা তারই স্নিগ্ধ মধুর নিদর্শন।

—o—

শ্রীবাম করুণাধন্য হরিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ১৩১২ সালের রম্ভা তৃতীয়ার স্নিগ্ধ সকাল। তারামায়ের প্রভাতী সেবাপূজা সমাপ্ত হয়েছে। এই সময় তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন উড়িষ্যার বারিপদার বিশিষ্ট উকিল শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

হরিভূষণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাত্র দু'মাস পূর্বে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। তাই পুত্রশোকে জর্জরিত হরিভূষণ বাবু। মনকে অধ্যাত্ম সাধন জগতে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হলেন। সৎ প্রার্থনা সৎ-চিন্তা ও পবিত্র ব্যাকুলতা ভগবান সবসময়ই পূর্ণ করেন।

মহাসাধক কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শিষ্য হরিপদ মৈত্র বারিপদায় কাজ করেন। হরিপদবাবু একদিন পুত্রশোকে কাতর হরিভূষণবাবুকে তারাপীঠের শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার নানান লীলা কাহিনী বললেন। হরিপদ মৈত্র যদিও কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের শিষ্য তবু তিনি তারাপীঠের চলন্ত শিব বামাক্ষ্যাপাবাবার বিশেষ ভক্ত। হরিপদ মৈত্রর আরো দুই গুরুভাই হুগলীর উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়ও বামদেবের বিশেষ ভক্ত ও অশেষ কৃপাধন্য।

যাহোক, হরিপদ মৈত্রর কথা শুনে হরিভূষণবাবু তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপাবাবার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। দেবমানব বামদেবকে

দর্শন করে ও প্রণাম করে হরিভূষণবাবু তাঁর কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ভাবে কাঁদতে লাগলেন। বামদেব কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁর ভক্তি পরীক্ষা করবার জন্য মুখ থেকে একদলা 'কফ' বের করে বামদেব হরিভূষণবাবুর দিকে নিক্ষেপ করলেন। কফের দলা হরিভূষণবাবুর সামনে মাটিতে পড়লো। হরিভূষণবাবু সাথে সাথে আনন্দে তা মাটি থেকে তুলে মুখে দিলেন। তাঁর মনে হ'ল তিনি যেন অমৃত পান করলেন। এক অপূর্ব পদ্মফুলের গন্ধযুক্ত মধুর ঘন ক্ষীর তিনি প্রাণভরে পান করলেন মনে হ'ল। সাথে সাথে তাঁর দেহ মন থেকে এতদিনের সকল শোক তাপ দুঃখ জ্বালা রোগ শোক সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। তাঁর দেহ মন সুস্থ সবল হ'ল এবং এক পরম আনন্দে ভরে উঠলো।

এই মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার থেকে হরিভূষণবাবু আনন্দে অধীর হলেন। করুণাময় বামদেব ভক্ত হরিভূষণের নিষ্ঠা দেখে প্রসন্ন হলেন। একটু পরে বামদেব তাঁর আশ্রম থেকে মহাশ্মশানের শিমুলতলায় এলেন। ভক্ত হরিভূষণবাবুও সাথে সাথে এলেন। তারপর বামদেবের চরণযুগল জড়িয়ে ধরে দীক্ষা চাইলেন। বামদেবের নির্দেশে তিনি দাড়ি কামালেন। সুন্দর সুপুরুষ সরল উদার চিত্ত হরিভূষণবাবুর মুখখানি ধরে কৃপাময় বামদেব সস্নেহে বললেন, "বাবার মুখখানি পদ্মফুলের মত।"

সর্বজ্ঞ বামদেব জানেন যে হরিভূষণবাবুর কুলদেবতার মন্ত্রের ওপর যথেষ্ট আন্তরিকতা নেই। তাই সেই বিষয়ে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, "না, ব্যাটাকে অন্য মন্ত্র দেব!" হরিভূষণবাবুর শাস্ত্রীয় মতে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা থাকলেও মহাকৌল বামদেব সেই তথাকথিত বিধিনিষেধ গ্রাহ্য করলেন।

দুপুরে তাঁকে তারামায়ের অন্ন প্রসাদ খাওয়ালেন। রাত্রে উমা চতুর্থী তিথিতে তারামায়ের পূজা করলেন বামদেব এবং স্বয়ং নিজের হাতে বলিদান করলেন।

রাত দশটার পর শিমুলতলায় বীরভক্ত হরিভূষণকে নিয়ে গিয়ে তাঁর দু'কানেই বামদেব মন্ত্র দিলেন। সাথে সাথে মন্ত্রের মহাশক্তির

গভীরতা উপলব্ধি করে ও জ্যোতি দর্শন করে আবেগে আনন্দে অধীর হলেন।

মধ্যরাতে হোম প্রভৃতি ও চক্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে শিষ্য হরিভূষণকে অভিষেক করলেন শ্রীগুরু বামদেব। বীরাচার মতে দীক্ষা লাভ হ'ল মহাভাগ্যবনে শিষ্য হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের। শ্রীগুরু বামের নির্দেশে অভিষেকের মাধ্যমে ত্রিলোকজননী তারামায়ের 'কারণ' প্রসাদ গ্রহণ করে ধন্য হলেন তিনি।

পুত্রহারা শিষ্য হরিভূষণের মনের ব্যথা সর্বজ্ঞ বামদেবও জানেন। তাই করুণাময় বামদেব তাঁকে আশীর্বাদ করলেন যে শীঘ্রই সুপুত্র লাভ হবে। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে শিষ্য হরিভূষণ শ্রীগুরু বামদেবকে বললেন, "বাবা এই ছেলের নাম রাখবো 'তারাদাস'।"

ইষ্টদেবী তারামায়ের প্রতি ভক্তি দেখে শ্রীগুরুবাম প্রসন্ন হলেন।

বামদেব যথাসময়ে শিষ্য হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে স্ত্রী ও পুত্রসহ তারাপীঠে আসতে বললেন।

কিছুকাল পর হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি সুলক্ষণযুক্ত সুন্দর পুত্র হ'ল। ১৩১৩ সালের ফাল্গুন মাসে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে মহা আনন্দে তারাপীঠে এলেন শ্রীগুরু বামদেবের কাছে। হরিভূষণের পুত্র 'তারাদাস'কে বামদেব আশীর্বাদ করলেন এবং হরিভূষণের স্ত্রীকেও কৃপা করে দীক্ষা দান করলেন।

মহাভাগ্যবান হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় সপরিবারে বামদেবের চির আশ্রিত হলেন।

মহাভাগ্যবান শিষ্য হরিভূষণবাবুর কাছে শ্রীগুরু বামদেব সর্বতোভাবে কল্পতরু। তাঁর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক এই উভয় ক্ষেত্রের সকল ইচ্ছাই বামদেব পূর্ণ করেছেন। এমনকি হরিভূষণবাবুর মনের বাসনা অনুসারে শ্যামরূপে তাঁকে দর্শনও দেন শ্রীগুরু বামদেব।

হরিভূষণবাবু শ্রীগুরু বামদেবকে একটি গামছা দিয়েছিলেন। সেটি বামদেব পরম আদরে গলায় জড়িয়ে রাখেন কয়েকদিন।

কারো বিদ্রূপ প্রশ্নের উত্তরে কৃপাময় বামদেব বলেন, "এই যে আমার হরির গামছা।"

মাঝে মাঝে উড়িষ্যার বারিপদা থেকে শ্রীগুরু বামদেবের কাছে ছুটে আসেন বীরাচারী শিষ্য হরিভূষণ। শিবস্বরূপ গুরু শ্রীবামের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেন তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব সব। শ্রীবাম স্বয়ং হাত ধরে প্রিয় শিষ্যকে বীরাচার সাধনার বিভিন্ন স্তর পার করে দেন। শ্রীগুরুর দিব্য সঙ্গে পরম আনন্দে তারাপীঠ মহাশ্মশানের নিগূঢ় ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

পরে তন্ত্রশাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান শাস্ত্রজ্ঞানী হরিভূষণবাবু।

সব আশ্চর্য নিখুঁতভাবে শ্রীগুরু বাম বলেছেন এবং সেইভাবে সব ক্রিয়ানুষ্ঠান করেছেন।

অথচ অনেকের ধারণা বামাক্ষ্যাপাবাবা প্রায় নিরক্ষর। এসব শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান তাঁর নেই। শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা যে সর্বজ্ঞ, সকল জ্ঞানই যে তাঁর করায়ত্ত্ব তা উপলব্ধি অনেকেই করতে পারেন নি।

সর্বোপরি তিনি যে সকল জ্ঞানের, সকল পার্থিব ও অপার্থিব গুণের অতীত, ক্ষর অক্ষরের অতীত, নিত্য ত্রিগুণের অতীত তা-ও তাঁর অনেক পরিচিত প্রিয়জনও উপলব্ধি করতে পারেন। এক দুর্জ্ঞেয় দূরাতিগম্য রহস্যের কুয়াশার আবরণে নিজেকে তিনি ঢেকে রাখতেন।

তাই স্থূলদেহে সবার সামনে তিনি দৃশ্যমান থেকেও স্বরূপে প্রায় অদৃশ্যই থাকতেন।

প্রতিবছর শারদীয়া কোজাগরী চতুর্দশীর মেলায়, তারাপীঠের সর্বশ্রেষ্ঠ তারাপূজার মহোৎসবে শ্রীগুরু বামদেবের দিব্য সঙ্গলাভের জন্য হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় বারিপদা থেকে তারাপীঠে আসেন।

কয়েকদিন গুরুর দিব্যসঙ্গ ও অধ্যাত্ম নির্দেশ লাভ করে আবার হরিভূষণবাবু বারিপদায় ফিরে যান।

এই বীরাচারী শিষ্য শ্রীবামের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত হন। হরিভূষণ-বাবুর জন্মও বিখ্যাত বীরাচারী সিদ্ধ মহাপুরুষ ডাবুকের কৈলাসপতির

বংশে। কৈলাসপতির গৃহী নাম ছিল ভুবন মোহন মুখোপাধ্যায় (দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড)। শ্রীবাম তাঁকে 'রাজা গোঁসাই' বলে ডাকতেন।

তাঁর আদি নিবাস নদীয়া জেলার উলোরা বীরনগর গ্রামে। বীরনগরের জমিদাররূপে এই তান্ত্রিক সাধক বংশ সুপরিচিত।

শ্রীগুরু বামদেবের দেহত্যাগের পর বীরাচার সাধনার পদ্ধতিতে ভুল হওয়ায় সহসা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পরে শ্রীগুরু বামদেব অলৌকিকভাবে এসে কৃপা করে প্রিয় শিষ্যকে সুস্থ করে দেন এবং সঠিকভাবে সাধনা করবার পথ নির্দেশ করেন। সেইভাবে সাধনা করে তিনি আমৃত্যু সুস্থ সবল থাকেন।

বামমণ্ডলের অন্যতম সুপরিচিত বীরাচারী সাধক ও ভক্ত এবং সেবকরূপে হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

—o—

করুণার সাগর বামদেব

বাংলা ১৩১২ সালের শীতকাল। বেশ শীত পড়েছে। বামদেব শিষ্য ভক্তসহ তাঁর আশ্রমে বসে আছেন। সেবক 'নোদা'র সাজা দেয়া তামাক সানন্দে টানছেন। বেলা তখন দশটা। এই সময় একটি শীর্ণ মৃতপ্রায় যুবক বামদেবের চরণকমলে এসে লুটিয়ে পড়লো। সজল নয়নে সকাতরে জানালো তার দুরন্ত যক্ষা রোগের কাহিনী। সব চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এই কাল রোগের কোন ওষুধ নেই (তখন যক্ষা হলে মৃত্যু অবধারিত)। তারাপীঠের চলন্তশিব

বামাক্ষ্যাপাবাবার অলৌকিক শক্তি ও অপার কৃপার কথা শুনে সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য তারাপীঠে এসেছে। বামদেবের কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তের মুখে সে শুনেছে করুণাময় বামদেবের কথা। মৃত্যু ভয়ে ভীত যুবকের কান্না ও কাতরতা দেখে বামদেবের বিশাল হৃদয় করুণায় ভরে উঠলো। তিনি দিব্যনয়নে দেখলেন নিয়তি নির্দিষ্ট মৃত্যু যুবকের সামনে প্রায় উপস্থিত। আর কয়েকদিনের মধ্যেই রক্তবমি করতে করতে যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

কিন্তু নিয়তিরও নিয়তি আছে। সেই নিয়তি যে শ্রীবামের সম্পূর্ণ করায়ত্ত্ব। তারা অন্তপ্রাণ বামদেবের করুণার সাথে সাথে নিয়তির পূর্বনির্দিষ্ট বিধান পাল্টে গেল।

করুণাসিন্ধু বামদেব এই কঠিন যক্ষারোগগ্রস্থ যুবককে তাঁর অভয় চরণে স্থান দিলেন।

তিনি যুবককে বললেন যে প্রতিদিন ভোরবেলা মন্দিরে তারামাকে দর্শন করে এসে তারপর তার প্রিয় 'কালু' কুকুরের লালা সেবন করতে।

বামদেবের আদেশমত যুবকটি প্রতিদিন সকালবেলা তাই করতে লাগলো।

মহা বিস্ময়ের ব্যাপার মাত্র একমাসের মধ্যে ঘোর যক্ষা রোগগ্রস্থ যুবকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। ভয়াবহ যক্ষা রোগ থেকে সে চিরতরে মুক্তি পেয়ে গেল। তারপর পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় আনন্দে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল যুবকটি তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে এবং বামদেবের অতি প্রিয় 'কালু' কুকুরকে আদর করে বাড়ী চলে গেল। যুবকটি দীর্ঘজীবন লাভ করে। সারাজীবন সকৃতজ্ঞচিত্তে করুণার সাগর বামদেবের এই অপার কৃপার কথা সে স্মরণ করে। বামদেবের কি বিচিত্র লীলা! বহিরঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত ও শ্মশানের মাটিতে শায়িত শবদেহের নিত্য মাংসভোজী কুকুরের লালা দিয়ে মৃত্যুস্বরূপ যক্ষা রোগের চরম মৃত্যু ঘটালেন বামদেব। মৃত্যুর মৃত্যু ঘটিয়ে জীবনকে তিনি করলেন মহান ও প্রসারিত। মৃত্যুঞ্জয় বামদেবের এই বহিরঙ্গ লীলার অন্তরঙ্গে রয়েছে তারামা ও বামদেবের অপার

করুণা। বহিরঙ্গে তারামা ও বামদেব দুই কিন্তু স্বরূপত এক। এই এক ও অভিন্ন করুণার সাগরেরই লীলায়িত অনন্ত তরঙ্গের অন্যতম হ'ল উপরোক্ত আনন্দময় লহরীটি।

এই প্রসঙ্গে করুণার সাগর বামদেবের আরেকটি লীলা লহরী উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন পর একদিন কোলকাতার উত্তরে অবস্থিত বরাহনগর থেকে ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি তেইশ বছরের যুবক যক্ষ্মারোগী বামদেবের কৃপাধন্য এক ভক্তের সাথে তারাপীঠে এলেন। যথারীতি বামদেবের কৃপালাভের জন্য আসন্ন মৃত্যুভয়ে কাতর ও ভয়ঙ্কর যক্ষ্মা রোগে জর্জরিত ললিতমোহন বন্দোপাধ্যায় বামদেবের চরণে শরণাগত হলেন।

ললিতবাবুর দুঃসহ কষ্ট ও সঙ্কটজনক অবস্থা দেখে করুণাময় বামদেব বুঝতে পারলেন যে ললিতবাবুর মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুর করাল ছায়া নেমে এসেছে ললিতবাবুর সর্বাঙ্গে। শরণাগতের চির আশ্রয়দাতা করুণাসিন্ধু বামদেব এবারও মৃত্যুকে বিতাড়িত করলেন যুবক ললিতের নবীন জীবন থেকে। বিধির বিধানকে পাল্টে দিলেন তাঁর এক পলকের করুণায়।

শরণাগত ললিতমোহনকে বললেন যে প্রতিদিন তারাপীঠ মহাশ্মশানে তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করে তারপর মহাশ্মশানের একটু মাটি খেতে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার; কিছুদিন তারাপীঠ মহাশ্মশানে তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করে তারপর মহাশ্মশানের মাটি খাবার পরই ললিতবাবু এই মৃত্যুস্বরূপ ভয়াবহ যক্ষ্মারোগ থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

তারপর একদিন মহা আনন্দে তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। কিছুদিন পর সংসার জীবনে প্রবেশ করেন এবং কর্মজীবনও শুরু করলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল দেহে চাকরী করে গেলেন সুদীর্ঘকাল। সারাজীবন তিনি বামদেবের পরম ভক্তরূপে সুচিহ্নিত হন। বামদেবের অপার কৃপা ও দিব্য শক্তিতে কালান্তক করাল মৃত্যুস্বরূপ ভয়াবহ যক্ষ্মা রোগের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার পর সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে তিনি পৃথিবীতে পরম আনন্দে বিরাজ করেন।

এই সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি করুণার সাগর তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব বামদেবের এই করুণা ও অলৌকিক শক্তির কথা শত শত ভক্তকে সানন্দে সজল নয়নে বলেন।

করুণাময় বামদেব সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এভাবে যে কত শত সহস্র আর্ত তাপিত মহা রোগগ্রস্থ নরনারীকে অমোঘ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে নব জীবন দিয়েছেন এবং তারামায়ের দিব্যলোকের সন্ধান দিয়েছেন তার সংখ্যা নেই। বামসমুদ্রের এই অফুরন্ত অগণিত লীলা লহরীর পূর্ণরূপ কোন মানুষের পক্ষে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁর পূর্ণরূপ একমাত্র তারামা ও বামদেবই জানেন।

উপরোক্ত লীলা লহরী দু'টি তাঁদেরই অপার কৃপার এক নিদর্শন মাত্র।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস

আনুমানিক ১৩১২ সালের শেষাশেষি এক অপরাহ্ন। তারামন্দিরের উত্তরে অবস্থিত জীবিতকুণ্ডের পশ্চিম দিকের ঘাটে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা বসে আছেন আপনমনে। এই সময় একটি গৌরবর্ণ সৌম্যকান্তি যুবক এসে শ্রীবামের চরণকমলে পতিত হ'ল। তারপর শ্রীবামের চরণযুগল নিজ বক্ষে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

সর্বজ্ঞ শ্রীবাম সবই বুঝতে পারলেন। তবু লীলাময় বাম সস্নেহে

যুবককে হাত ধরে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরে, তুই কি চাস?" যুবক সজল নয়নে নিবেদন করলো তাঁর প্রার্থনার ইতিহাস।

যুবকের নাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার কুতুবপুর গ্রামে তার বাড়ী। তার পিতার নাম ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম মানিকসুন্দরী দেবী। ১২৮৬ সালে ঝুলন পূর্ণিমার দিন তাঁর জন্ম।

বাল্যকাল থেকেই নানান অলৌকিক দিব্য দৃশ্য কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো স্বপ্নে দেখতে থাকেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁর পিতামাতা তার বিয়ে দেন। তাঁর পত্নীর নাম সুধাংশুবালা দেবী। ওভারশিয়ারী পাশ করবার পর তার কর্মজীবন শুরু হয়। প্রথমে দিনাজপুর ডিষ্টিকবোর্ডে কিছুকাল চাকরী করেন। ১৩০৭ সালে একুশ বছর বয়সে সেই চাকরী ছেড়ে দিনাজপুর জেলার নারায়ণপুর জমিদারের কাছারীতে চাকরী গ্রহণ করেন। পরে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী দেবীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির দিনাজপুর কাছারীতে সুপারভাইজার রূপে নিযুক্ত হন।

এই সময় নারায়ণপুরে একদিন রাতে কাজ করতে করতে সহসা স্ত্রী'র ছায়ামূর্তি সামনে দর্শন করেন। প্রিয়তমা পত্নীর বিষাদ প্রতিমা ছায়ামূর্তি দর্শনে তিনি বিচলিত হন। পরে চিঠিতে জানলেন স্ত্রী অসুস্থা। পূজোর ছুটীতে কুতুবপুরে গিয়ে শুনলেন তাঁর স্ত্রী কিছুকাল পূর্বে দেহত্যাগ করেছেন।

যেদিন স্ত্রী'র ছায়ামূর্তি দর্শন করেন, তাঁর চারঘন্টা পূর্বে তাঁর স্ত্রী দেহত্যাগ করেছিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর এই আকস্মিক অকালে মৃত্যুতে তিনি পত্নীর শোকে খুবই কাতর হন। পরলোকতত্ত্ব ও প্রেততত্ত্ব পাঠ করতে লাগলেন। মৃত্যুতেই কি জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে যায়? না তাঁর পরেও মৃত্যুর অতীতে আত্মা তথা জীবন থাকে? এই প্রশ্ন নিয়ে গভীর চিন্তা করতে থাকেন। এই সময় দিনাজপুর কাছারী থেকে তিনি খুলনার কাছারীতে বদলী হলেন। খুলনা যাবার পথে কলকাতায় এলেন।

কলকাতায় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে খোঁজ নিয়ে জানতে

পারলেন যে মাদ্রাজে আডেয়াবে এই ব্যাপারে রেভারেণ্ড লেডবিটার সাহেবের কাছে গেলে পরলোক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তিনি তখনি মাদ্রাজে গেলেন। সেখানে গিয়ে থিয়োসফিষ্টদের সহ-যোগিতায় প্রেতলোকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে মৃতা পত্নীর সাথে কথা বলবার বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হ'ল না। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল।

পরলোকগতা প্রিয়তমা পত্নীর সাক্ষাত পাবার জন্য ও তাঁর সাথে কথা বলবার জন্য তিনি প্রায় পাগলের মত হয়ে গেলেন। কলকাতায় সহসা একদিন পূর্ণানন্দ পরমহংসদেবের কথা জানতে পারলেন। স্বামী পূর্ণানন্দ তন্ত্রসিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ পুরুষরূপে প্রসিদ্ধ।

স্বামী পূর্ণানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম পূর্ণচন্দ্র দত্ত। তিনি কলকাতার ডাফ কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

স্বামী পূর্ণানন্দের সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি ব্যাকুল হলেন। তাঁর মনে হ'ল যে যোগবলে স্বামী পূর্ণানন্দ নিশ্চয়ই তাঁর পরলোকগতা পত্নী সুধাংশুবালা দেবীকে এনে দিতে পারেন। যথা সময়ে তিনি উপস্থিত হলেন স্বামী পূর্ণানন্দের কাছে। নিবেদন করলেন তাঁর মনের বাসনা। স্বামী পূর্ণানন্দ শান্তভাবে শুনলেন সব কথা। তারপর তাঁকে বললেন, "বাবা, তুমি তোমার স্ত্রীকে পেতে ব্যস্ত হয়েছ, কিন্তু সেই স্ত্রী এবং বিশ্বের যে কোন স্ত্রীলোক মাত্রেই যে আদ্যাশক্তির ছায়া। তুমি শুধু এই ছায়ার সন্ধানে যে শক্তি ব্যয় করবে, তা দিয়ে মহামায়াকে লাভ করতে পার। সিদ্ধিলাভ করলে দেখবে সবকিছুই তোমার করায়ত্ত।" সিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী পূর্ণানন্দের একথা শুনে এক অভূতপূর্ব শান্তি পেলেন তিনি। সকাতরে প্রার্থনা করলেন দীক্ষা। তা শুনে স্বামী পূর্ণানন্দ হেসে বললেন, "না বাবা, আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন। সময় মত তুমি তাঁর দেখা পাবে।"

এরপর থেকে দীক্ষার জন্য তীব্রভাবে ব্যাকুল হলেন তিনি। বহু স্থানে গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। এই সময় এক রাতে তাঁর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। তাঁর নিজের ভাষায়, "রাত্রিতে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি, জানালা দরজা সব বন্ধ; ঘুম হয়নি, তন্দ্রা এসেছে মাত্র।

এমন সময় এক জ্যোতির্ময় সৌম্য মূর্তি মহাপুরুষ ডেকে বললেন, "নাও বৎস, এই মন্ত্র নাও। তুমি মন্ত্রলাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছ। তাই আমি তোমার জন্য মন্ত্র নিয়ে এসেছি, ধর।"

আমি হাত পেতে সেটা নিলাম। মহাপুরুষের অঙ্গ জ্যোতিতে অন্ধকার গৃহ তখন আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই আলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল একটি পাতায় কি যেন লেখা আছে। কাছে দেশলাই ছিল, তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দেখি বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে লেখা একাক্ষরী এক মন্ত্র।

এটা কি মন্ত্র, কেমন করে জপ করতে হয় তা জেনে নেবার জন্য যেমন মন্ত্রদাতার উদ্দেশ্যে মুখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি তিনি আর নেই। দিব্যমূর্তি অদৃশ্য হয়েছেন। ঘরের দরজা জানালা সব পূর্ব্ববৎ বন্ধ। ······একি স্বপ্ন? না—স্বপ্ন হলে বেলপাতা আসবে কোথা হতে?······ মনে হ'ল আমি কি অন্যায় করলাম। তখন বিল্বপত্রে কি লেখা আছে, জানতে ব্যাকুল না হয়ে যিনি আমায় বিল্বপত্রটি দিলেন, তাঁহাকে ধরলাম না কেন?"

এই মন্ত্রটি পাবার পর মনের অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। এই দুর্বোধ্য একাক্ষরী মন্ত্রের রহস্যের সমাধানের জন্য ভারতের অধ্যাত্ম রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ পীঠ কাশীধামে তিনি যাত্রা করলেন। কাশীতে তখন বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ বিরাজ করছেন। কিন্তু কেউ এই মন্ত্রের যথার্থ উত্তর দিতে পারলেন না। হতাশায় তিনি ঠিক করলেন যে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেবেন। সেদিন রাতেই কাশীতে এক অলৌকিক স্বপ্ন দেখলেন। এক দিব্য ঋষিপুরুষ তাঁকে বলছেন, "বৎস, তুমি দিগ্‌বিদিকে কোথায় গুরু খুঁজে হয়রাণ হচ্ছো? তোমার গুরু তো তোমার দেশের নিকটেই রয়েছেন। বীরভূম জেলার তারাপীঠে তুমি যাও। সেখানে গিয়ে মহাতান্ত্রিক বামাক্ষ্যাপার শরণাপন্ন হও। অভীষ্ট লাভের পথ তিনিই দেবেন।"

স্বপ্নে এই আদেশ পেয়েই তিনি তারাপীঠে ছুটে এসেছেন।

যুবক নলিনীকান্তের কথা শেষ হ'ল। সব শুনে তারামায়ের বরপুত্র মহাতান্ত্রিক ও মহাযোগী বামাক্ষ্যাপাবাবা হাসলেন। সবই জানেন তিনি;

তাই বিশাল আরক্তিম নয়ন মেলে করুণাময় মূর্তিতে যুবক নলিনীকান্তকে স্নেহভরে বললেন, "ওরে, আমার তারামায়ের মধ্যেই যে সব। তার দেখা পেলেই সব পাবি। পরম ভাগ্যবান তুই। তারামন্ত্র পেয়েছিস। তুই মায়ের ছেলে। তোকে আমি সাধন শিখিয়ে দেব। ভাবিস নে।" সমর্থ ও উন্নত আধার সম্পন্ন নলিনীকান্তকে শ্রীবাম তাঁর আশ্রমে থাকতে দিলেন। নলিনীকান্তও চিহ্নিত মহাগুরু শ্রীবামের চরণে শরণাগত হলেন এবং কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

শ্রীবাম নলিনীকান্তকে স্বপ্নে পাওয়া সেই দুর্বোধ্য একাক্ষরী মন্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা নিভৃতে করে দিলেন।

তারপর এক শুভক্ষণে বীরাচারে নলিনীকান্তের অভিষেক ক্রিয়া নিস্পন্ন করে তাঁকে জপ দিলেন এবং তার সাথে মন্ত্রোক্ত তন্ত্র সাধনার নিগূঢ় ক্রিয়া পদ্ধতিও তাঁকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করালেন। তারপর পক্ষকালের মধ্যেই শনিবার অমাবস্যার মহাযোগ পড়লো।

সেদিন সকালে শ্রীবাম নলিনীকান্তকে বললেন, "বাবা, তোর লগ্ন এসেছে।" নলিনীকান্ত তা শুনে আনন্দিত হলেন। যথাসময়ে মহা-নিশায় মহাশ্মশানের ভেতর শ্রীগুরু বাম শিষ্য নলিনীকান্তকে নিয়ে গেলেন।

তারপর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত এক শবকে শাস্ত্রমতে সংস্কার করে সেই শবের ওপর বীরাসনে শিষ্য নলিনীকান্তকে শ্রীগুরু বাম বসিয়ে দিলেন। তার সাথে জপ মন্ত্রও দিলেন। বীরভাবে নলিনীকান্তের শব সাধনা শুরু হ'ল। পাশে একটি প্রদীপ জ্বলতে লাগলো। শিষ্যকে ঠিকমত বসিয়ে শ্রীগুরু বাম তারামন্দিরে চলে গেলেন। শ্রীগুরু নির্দিষ্ট পথে এক মনে জপ করে যেতে লাগলেন নলিনীকান্ত।

গভীর রাত। মহাশ্মশান ক্রমেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। শব মাংস নিয়ে শিবা ও সারমেয়গণের ভয়াবহ চিৎকার। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অশরীরীর বিভৎস অট্টহাসি। ভয়াল সর্পদের যাতায়াতের সর সর শব্দ, কঙ্কাল, করোটি ও খর্পরের ওপর দিয়ে

বয়ে যাওয়া বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় গভীর শব্দ। বাদুড়, শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতির বিকটভাবে পাখা ঝাপটানোর ভীষণ শব্দ। শকনী ছানার কান্নার অবিরাম ধ্বনি প্রভৃতি সব মিলিয়ে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এই নিঃসীম নিবিড় অন্ধকারময় ঘোর মহাশ্মশানের মধ্যে। এ যেন এক জীবন্ত ভয়াবহ বিভীষিকা। অর্ধ ক্রোশ জুড়ে এই মহা ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে নলিনীকান্ত শুধু একা। তারওপর এক শবের ওপর বসে জপ করছে। সহসা নলিনীকান্তের মনে হ'ল কারা যেন তাঁর চারপাশে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। ক্রমে নলিনীকান্ত নানারকম বিভীষিকা দেখতে লাগলেন চারদিকে।

যুবক নলিনীকান্ত ভয় পেলেন। মন টলে গিয়ে আসন থেকে উঠতে চাচ্ছে। সাথে সাথে শিষ্য নলিনীকান্ত শুনলেন তারামন্দির থেকে বজ্রকণ্ঠে ভেসে আসছে নাদসিদ্ধ শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার 'তারা তারা তারা' ধ্বনি। সাথে সাথে সব বিভীষিকা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। নির্ভয় হলেন নলিনীকান্ত। শ্রীগুরু বাম শক্তি সঞ্চার করে দিলেন শিষ্যের মধ্যে। মন স্থির হ'ল নলিনীকান্তের। ক্রমে অন্তর্জগতে নলিনীকান্তের মন ডুবে গেল। তখন রাতের শেষ প্রহর। এক অসীম অনন্ত জ্যোতির্ময় জগতে তিনি প্রবেশ করলেন। সহসা দেখলেন এক দিব্য জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সর্বাঙ্গে জ্যোতির তীব্রচ্ছটা। দাঁড়িয়ে মৃদু হাসছেন ভুবনমোহিনী রূপে। নলিনীকান্ত প্রত্যক্ষ করলেন তাঁরই চিরবাঞ্ছিতা পত্নীরূপে এক দিব্য আলোকময়ী রমণী দাঁড়িয়ে আছেন। নলিনীকান্ত সানন্দে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করলেন সেই দেবীমূর্তিকে। তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর ইষ্টদেবী তারাদেবী স্বয়ং তাঁর সম্মুখে বিরাজিতা। মহা ভাগ্যবান নলিনীকান্ত নিজেই এই পরম সাক্ষাতকারের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর নিজের ভাষায়—

"আমি দেখে বিস্মিত হলাম। বললাম, 'তুমি কে?"

সে উত্তর দিল, "আমি তোমার ইষ্টদেবী।"

আবার প্রশ্ন করলাম, "এ মূর্তিতে কেন? এ মূর্তি তো আমার গুরুপদিষ্ট মূর্তি নয়।"

তিনি—'সে মূর্তি দেখলে ভয় পাবে, তাই।'

কি সুন্দর মূর্তি।

দেবী অতঃপর বললেন, "বৎস, বর লও।"

আর আমি কি চাইবো? আমার তো চাওয়ার কিছুই ছিল না। সেই দিব্য মূর্তি দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

তাই বললাম—"যখন ইচ্ছে হবে, তখন যেন তোমায় এইভাবে দেখতে পাই।"

'আচ্ছা তাই হবে'—বলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

তারপর তাঁর স্বরূপ মূর্তি দেখিয়ে দিলেন। সেই মূর্তি দেখে ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে আমি অচেতন হয়ে পড়লাম।

তারপর জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি আমি গুরুদেব বামাক্ষ্যাপার কোলে।"

আনন্দে আপ্লুত হয়ে পরম শ্রদ্ধায় গুরু বামাক্ষ্যাপাকে বন্দনা করলেন শিষ্য নলিনীকান্ত। শিবস্বরূপ গুরু শ্রীবামের কৃপায় একই সাথে পত্নীরূপ ও জগতজননীর দিব্যরূপ দর্শন হ'ল। তাছাড়া ইষ্টদেবী জগতজননী তারামায়ের কৃপায় বরলাভ হ'ল ও তারামায়ের স্বরূপ দিব্যরূপ তথা মহাপ্রলয়ঙ্করী মহাভয়ঙ্করী ত্রিলোকময় রূপও অশেষ কৃপায় দর্শন হ'ল।

শুধু তাই নয়, শিবগুরু বামাক্ষ্যাপাবাবার প্রদত্ত মন্ত্রে মহামায়াকে আহ্বান করলেই তিনি পত্নীরূপে আবির্ভূতা হবেন—এই বরও লাভ করেছেন। গুরুকৃপায় মায়াময়ী পত্নীর ছায়া ছেড়ে স্বয়ং মহামায়াকেই চিরতরে লাভ করে সিদ্ধসাধক নলিনীকান্ত হলেন আপ্তকাম।

তারই সাথে গভীরভাবে এই মহাজ্ঞান লাভ করলেন যে একই জগতজননী জীবের জন্মে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে ও মৃত্যুকালে যথাক্রমে মাতা, পত্নী, কন্যা ও কালীরূপে বিরাজমানা।

ইষ্টদেবীর দর্শনের পর সৌভাগ্যবান বীরশিষ্য সাক্ষাত শিবগুরু বামাক্ষ্যাপাকে প্রণাম করে মনের আনন্দে তারাপীঠ থেকে বিদায়

নিলেন। অধ্যাত্ম জগতের এই উচ্চভাবে সর্বদা আসীন হয়ে সিদ্ধসাধক নলিনীকান্তের পক্ষে আর চাকরী করা বা সংসার করা সম্ভব নয়। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি জাগতিক জীবনের সকল আকর্ষণ ও বন্ধন থেকে নিজেকে তিনি মুক্ত করলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দের অভাব ঘটায় কয়েকদিন পর আবার ছুটে এলেন। শ্রীগুরু বামের চরণে প্রণত হয়ে কাতরভাবে বললেন, "বাবা, আমার প্রতি কি কৃপা হবে না? আমি সিদ্ধকাম আজো হইনি। মনে হচ্ছে আমি তো কিছুই পেলাম না।"

এই হতাশগ্রস্থ হীন মনোভাবমণ্ডিত কথা শুনে মহাক্রোধে বামাক্ষ্যাপাবাবা গর্জন করে চিৎকার করে উঠে বললেন, "আমি স্বচক্ষে দেখলাম তোর কত কি হয়ে গেল। আর তুই শালা এখনো বলছিস্ তোর কিছুই মেলেনি। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া।"

উপস্থিত শিষ্যভক্তগণ বামদেবকে শান্ত করলেন। পরদিন সকালে শ্রীবাম স্নেহভরে নলিনীকান্তকে বললেন, "ওরে, তুই সন্ন্যাস নে। আর একটা কথা সর্বদা মনে রাখিস্ তারামা তোকে দিয়ে অনেক কাজ করাবেন।"

যথাসময়ে শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার অপার আশির্বাদ নিয়ে সন্ন্যাস নেবার জন্য সিদ্ধ সাধক নলিনীকান্ত চিরতরে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হলেন।

ত্রিলোকজননী ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার অপার কৃপাপ্রাপ্ত বীর সিদ্ধসাধক নলিনীকান্ত ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে এক বিরাট বিস্ময়। সাধনপথে সাধারণত আগে সাধনা ও পরে সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু নলিনীকান্ত-আগে সিদ্ধিলাভ করলেন ও পরে সাধনা শুরু করলেন। তাছাড়া ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামের কৃপায় তন্ত্রপথ ছাড়াও পরবর্তীকালে সন্ন্যাস নিয়ে একে একে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি পথেও সিদ্ধিলাভ করে পরিপূর্ণ 'পরমহংস' অবস্থাপ্রাপ্ত হতে তাঁকে দেখা যায়।

যাহোক, শ্রীগুরু বামের নির্দেশে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবার

জন্য সন্ন্যাসী গুরুর সন্ধানে নলিনীকান্ত পরিব্রাজনায় বের হলেন। ঘুরতে ঘুরতে আজমীরে এক ধর্মসভায় সহসা এক মহাজ্ঞানী, বৈদান্তিক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসীকে দেখে নলিনীকান্ত চমকে উঠে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। মুহূর্তে নলিনীকান্ত চিনতে পারলেন যে এই তেজদীপ্ত সন্ন্যাসীই জ্যোতির্ময় মূর্তিতে তাঁর ঘরে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বিল্বপত্র সেই একাক্ষরী মন্ত্র দিয়েছিলেন। প্রাণের আবেগে লুটিয়ে পড়লেন নলিনীকান্ত তাঁর চিহ্নিত গুরুদেবের চরণে। ভাগ্যবান নলিনীকান্তকে তিনি আশ্রয় দিলেন।

এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নাম আচার্য্য সচ্চিদানন্দ পরমহংস। কিছুকাল কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করবার পর নলিনীকান্তকে তিনি তাঁর পুস্কর আশ্রমে সন্ন্যাসদীক্ষা দিলেন। সচ্চিদানন্দজী নলিনীকান্তর নাম দিলেন নিগমানন্দ সরস্বতী। সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদিন পর গুরু সচ্চিদানন্দের সাথে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, মানস সরোবর প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ সকল দর্শন করেন। এই সময় অনেক দিব্য দর্শন নিগমানন্দ লাভ করেন। তীর্থদর্শন সেরে পুস্কর আশ্রমে ফিরে এসে নিগমানন্দ গুরুর নির্দেশে শ্রীক্ষেত্র, দ্বারকা, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু তীর্থ একাকী পরিভ্রমণ করেন।

দ্বারকার সারদা মঠে অবস্থান কালে গুরু সচ্চিদানন্দের অলৌকিক কৃপায় তিনি বিরাট প্রলোভনের বিপর্য্যয় থেকে রক্ষা পান। তারপর পরিব্রাজনার শেষে পুস্কর আশ্রমে ফিরে আসেন। শিষ্য নিগমানন্দের উন্নত আধারে সচ্চিদানন্দ পরমহংস অকৃপনভাবে ঢেলে দেন কৃপাধারা। তারপর তিনি নিগমানন্দকে জানালেন যে তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে। এবার নিগমানন্দকে যোগ সাধনা করতে হবে। তারজন্য যোগীগুরুর সন্ধান করতে হবে।

কিছুকাল পর আসামের পার্বত্য অঞ্চলে ঈশ্বরনির্দিষ্ট যোগীগুরু সুমেরুদাস মহারাজের দর্শন পান নিগমানন্দ।

সুমেরুদাসজী তাঁকে যোগসাধনার চরম শিখরে ধীরে ধীরে পৌঁছে দেন এবং দুরূহ রাজযোগ সাধনায় সাফল্যলাভ করান।

তারপর কাশীতে জগতজননী অন্নপূর্ণার প্রেরণায় প্রেম ভক্তির পথে সাধনার জন্য আড়াইশত বছরের ভক্তিসিদ্ধা মহাসাধিকা গৌরীমাতাজীর উত্তরাখণ্ডের আশ্রমে নিগমানন্দ গমন করেন। গৌরীমা নিগমানন্দকে প্রেমভক্তি পথে সিদ্ধিলাভ করিয়ে তাঁর সাধনা পূর্ণ করে দেন।

উত্তরকালে স্বামী নিগমানন্দ তাঁর এই চার ভাবের সাধনা ও সিদ্ধির কথা এবং চারজন গুরুর কথা অর্থাৎ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা, সচ্চিদানন্দ পরমহংস, সুমেরুদাস ও গৌরীমা'র কথা তাঁর তান্ত্রিক গুরু, জ্ঞানী গুরু, যোগী গুরু, প্রেমিক গুরু প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে ভারতের সাধক ও ভক্ত সমাজে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। সর্বোপরি 'মায়ের কৃপা' গ্রন্থে ত্রিলোকজননী তারামায়ের অসীম কৃপার বিবরণও তিনি অশেষ ভক্তিসহকারে লিখেছেন।

সেবার উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলায় শৃঙ্গেরী মঠের জগতগুরু শঙ্করাচার্য্য উপস্থিত রয়েছেন তাঁর বিশাল শিষ্য ভক্তগণসহ। ভারতের চারজন জগদগুরুর মধ্যে শৃঙ্গেরী মঠের জগদগুরু শঙ্করাচার্য্যই সর্বাধিক সম্মানীয় ও শ্রদ্ধেয়। আদি জগতগুরু শঙ্করাচার্য্যের নির্দেশ মত এই প্রধান মঠ থেকেই ভারতের চার ধামে অবস্থিত চার মঠ (পূর্ব ভারতে গোবর্ধন মঠ (পুরীতে), উত্তর ভারতে যোশী মঠ (বদ্রীনারায়ণের পথে), দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরী মঠ (মহিশূরে), ও পশ্চিম ভারতে জ্যোতি মঠ তথা সারদা মঠ (দ্বারকায়) এবং ভারতের দশনামী সাধু সম্প্রদায়কে পরিচালনা করা হয়।

তাই শৃঙ্গেরী মঠের জগতগুরু শঙ্করাচার্য্যই ভারতের সাধু সমাজের সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁরই শিষ্য হলেন নিগমানন্দের সন্ন্যাসগুরু মহাবৈদান্তিক সচ্চিদানন্দ পরমহংস। তিনিও সেবার উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলায় তাঁর গুরুদেবের সাথে এসেছেন এবং গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যের আসনের নীচে তিনিও তাঁর অন্যান্য গুরুভাইদের সাথে বসে আছেন।

এই সময় নিগমানন্দ সেখানে প্রবেশ করলেন এবং উপস্থিত সকলকে দেখতে পেলেন। সর্বোচ্চ আসনে বসে আছেন জগতগুরু শঙ্করাচার্য্য। নিগমানন্দের গুরুর গুরু। কিন্তু নিগমানন্দ এসে তাঁর

হাতের দণ্ড মাটিতে রেখে প্রথমে সাষ্টাঙ্গে তাঁর গুরু সচ্চিদানন্দ পরমহংসকে প্রণাম করলেন। তারপর জগতগুরু শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করলেন। উপস্থিত বিশাল সাধুমণ্ডলী এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন। স্বয়ং নাদগুরু, যিনি সবার প্রণম্য, তিনি যেখানে উপস্থিত রয়েছেন তাঁকে প্রণাম না করে নিগমানন্দ তাঁর গুরুকে প্রথমে প্রণাম করলেন। এ কি অন্যায়, এ কি ধৃষ্টতা। এ যে অমার্জনীয় অপরাধ।

বিশেষ করে নিগমানন্দের গুরুর গুরু যেখানে স্বয়ং জগতগুরু শঙ্করাচার্য্য। তাই প্রথমে পরমগুরু শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করে তারপর নিগমানন্দের উচিত ছিল নিজের গুরুকে প্রণাম করা। বিশাল সাধু-মণ্ডলী নিগমানন্দকে সরবে ধিক্কার দিতে লাগলেন এই অশিষ্ট আচরণের জন্য।

কিন্তু নিগমানন্দের পরমগুরু স্বয়ং জগতগুরু শঙ্করাচার্য্যই সমগ্র সাধুমণ্ডলীকে থামিয়ে দিলেন।

নিগমানন্দ তখন হাতযোড় করে বললেন, "মদ্‌গুরু জগৎগুরু। মন্নাথ জগন্নাথ।। মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।"

অর্থাৎ আমার কাছে আমার গুরুই জগতগুরু, তিনিই আমার নাথ, তিনিই আমার জগন্নাথ। আমার আত্মা সর্বভূতে পরমাত্মাস্বরূপ তাঁকেই দর্শন করে। সেই গুরুকেই আমি প্রণাম করি।"

উপস্থিত সাধুমণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে রইলেন একথা শুনে। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতের গুরুমুখী সাধনার এই অপূর্ব ধারাটি নিগমানন্দ সুন্দর ভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাজ ও কথার মধ্য দিয়ে সমবেত সাধু-মণ্ডলীর সামনে বহন করে আনলেন। স্বয়ং জগতগুরু শঙ্করাচার্য্য সানন্দে নিগমানন্দের এই কাজকে সমর্থন করলেন এবং নিগমানন্দের বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন করে বললেন, "বাচ্চা, ঠিকই বলেছে। আগে গুরু, তারপর অন্য সবাই। গুরুকে ইষ্ট জ্ঞানে যিনি সর্বদা সর্বত্র দর্শন করতে পারেন তিনিই সিদ্ধ হন। তিনিই পূর্ণ জ্ঞানী।"

তারপর নিজের শিষ্য সচ্চিদানন্দ পরমহংসকে বললেন, "তোমার এই পূর্ণ জ্ঞানী শিষ্যকে আর দণ্ডী বহন করাচ্ছ কেন? ও তো এখন পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত।"

গুরুর নির্দেশে সচ্চিদানন্দ পরমহংস তাঁর শিষ্য নিগমানন্দকে আদেশ করলেন নদীতে গিয়ে দণ্ডী ভাসিয়ে দিয়ে আসতে। গুরুর আদেশে নিগমানন্দ দণ্ডী ভাসিয়ে স্নান করে ফিরে এলেন। তখন সমগ্র সাধু সমাজের সামনে নিগমানন্দের গুরুর গুরু স্বয়ং জগতগুরু শঙ্করাচার্য নিগমানন্দকে "পরমহংস" উপাধি দিয়ে সম্মান জানালেন। তাঁর নাম হ'ল "স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস।"

পরবর্তীকালে তিনি সারাভারতে লোকগুরুরূপে ধীরে ধীরে সুবিখ্যাত হন। অগণিত শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী তাঁকে কেন্দ্র করে ভারতের দিকে দিকে গড়ে ওঠে। এই শক্তিধর মহাসাধকের বলিষ্ঠ সংগঠনের মাধ্যমে সারস্বত মঠ, ঋষিকুল শিক্ষায়তন প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় এবং স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসের নাম ও খ্যাতি বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ছাড়িয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতেও ছাড়িয়ে পড়ে। এমনকি বিদেশে পরবর্তীকালে তাঁর গুণমুগ্ধা জনৈকা ফরাসী মহিলা তাঁর দিব্য জীবন ও বাণী সংগ্রহ করে প্রচারে ব্রতী হন। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসের অনেক অলৌকিক লীলা তাঁর আশ্রিত শিষ্যভক্তগণ বহুবার প্রত্যক্ষ করেন। আত্মানুসন্ধান ও আত্মস্বরূপ লাভের জন্য তিনি শিষ্যদের সর্বদা সাধন পথে পরিচালিত করেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে শ্রীমৎ দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব, স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রভতির নাম বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য।

যে মহাঐশী নির্দিষ্ট লীলা জগতজননী তারামা ও শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা নিগমানন্দের দিব্যজীবনে সর্বপ্রথম সুপ্রকাশ করেন, উত্তরকালে তারই পরমপ্রকাশ ঘটে স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসের বিশাল কর্মধারার মধ্য দিয়ে। যার ভবিষ্যতবাণী প্রথমেই শ্রীগুরু বাম করেছিলেন। একাধারে মহান সাধক, সুলেখক ও বিরাট সংগঠকরূপে ঘটে স্বামী নিগমানন্দের আত্মপ্রকাশ। তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির

মহাসমন্বয়স্ব রূপ এই মহাপরুষ ১৩৪২ সালের ৬ই অগ্রহায়ণ বিষণ্ণ অপরাহ্ণে তাঁর মরলীলা সমাপ্ত করে মহাসমাধিতে ব্রহ্মলীন হন।

পরম ব্রহ্মক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠে একদিন পত্নীশোকে জর্জরিত যে পার্থিব জগতের যুবকটি অধ্যাত্ম পথের জিজ্ঞাসু হয়ে এসেছিল, ত্রিলোকের অধিশ্বরী তারামা ও শিবাবতার বামাক্ষ্যাপার মহাকরুণা রূপান্তরিত করলে অপার্থিব জগতের এক সিদ্ধসাধকে এবং তাঁকে পুনরায় ঐশী নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে জগৎ কল্যাণে রূপান্তরিত করলেন একাধারে কর্ম, তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মহাসমন্বয়স্বরূপ ভারত বিখ্যাত মহাপুরুষ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসরূপে।

এমনিভাবে দীর্ঘকাল ধরে মহান ব্রহ্মক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠে এসে কত মানব যে দেবমানবে রূপান্তরিত হয়েছেন তার সংখ্যা নেই। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস তারই এক পরম মনোরম নিদর্শন।

———

শ্রীবামভক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

একদিন শ্রীবাম তাঁর আশ্রমে বসে তন্ময় হয়ে গান করছেন। গানটি হ'ল—'মন গরীবের কি দোষ আছে।' সাধক রামপ্রসাদের এই গানটি বামদেব ইতিপূর্বে একাধিকবার গান করেছেন।

অনেক সময় তিনি তাঁর শিষ্যভক্তদের মধ্যে যাঁরা সংগীত জগতের অধিকারী তাঁদেরকে বলতেন এই গানটি করতে। কখনো আবার তাঁদের সাথে নিজেও গান করতেন মনের আনন্দে।

যাহোক, এই অপূর্ব শ্যামা সংগীতটি শ্রীবাম মধুর স্বরে গান করলেন। উপস্থিত শিষ্যভক্ত ও পাণ্ডাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলেন। গান শেষ হলেও সুরের মূর্চ্ছনায় সবাই আপ্লুত। এক দিব্য ভাবে সবাই বিভোর হলেন।

এই সময় বামদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও একনিষ্ঠ ভক্ত 'ষণ্ডাবাবা" এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর এই বিচিত্র নাম স্বয়ং বামদেব দিয়েছেন। তাঁর আসল নাম প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি তারাপীঠের অদূরে খরুণের অধিবাসী। খরুণে বামদেব একাধিক শিষ্যভক্তের বাড়ীতে যান। তাঁদের মধ্যে রসিক বন্দ্যোপাধ্যায় (রসিক গোঁসাই), নকড়ি রায়, আশু কর্মকার, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির বাড়ী অন্যতম। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বামদেবের এক বিচিত্র ভক্ত। তিনি বামদেবকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। আবার প্রাণভরে বামদেবের সাথে ঝগড়াও করেন। যা বামদেবের অন্য শিষ্যভক্তগণ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। বামদেব তাই তাঁর এই অতি প্রিয় ভক্ত প্রমথনাথকে কৌতুকভরে 'ষণ্ডাবাবা' নাম দিয়েছেন। এই 'ষণ্ডাবাবা' তথা প্রমথনাথ যখন বামদেবের সাথে ঝগড়া শুরু করেন তখন তা এক সত্যিই দেখবার জিনিষ। একবার প্রমথনাথ ও কাদুরী গ্রাম নিবাসী তার এক গৃহী

অবধূত বন্ধুসহ তারাপীঠে এলেন। কথায় কথায় প্রমথনাথ বামদেবের সাথে বেশ ঝগড়া শুরু করলেন।

ভীষণ রেগে গিয়ে বামদেব তাঁর এই 'ষণ্ডাবাবা'কে তারাপীঠ মহাশ্মশানের কাঠগোড়ায় ফেলে বলি দিতে উদ্যত হলেন। উপস্থিত শিষ্যভক্ত ও পাণ্ডাগণ ভয়ে তটস্থ। বামদেবের মহারুদ্র ভৈরব মূর্তি দেখে কেউ অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছেন না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার হ'ল যে, যাঁকে বলির কাঠগোড়ায় ফেলে বামদেব বলি দিতে খাঁড়া হাতে নিয়েছেন সেই প্রমথনাথ তথা 'ষণ্ডাবাবা' কিন্তু শান্ত নির্বিকার। মাথা নিচু করে দু'হাত পেছনে রেখে কাঠগোড়ায় মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে চুপ করে উপুর হয়ে রয়েছেন।

প্রমথনাথের মুখ দেখে সবাই স্তম্ভিত। বেশ উৎফুল্ল হাসিমুখ তাঁর। ভাবখানা এই যে তাঁর এই নশ্বর জড়দেহ যদি নিত্য মহাচৈতন্যময় শিবস্বরূপ বামাক্ষ্যাপাবাবার দিব্য হাতের খড়্গের আঘাতে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তবে তাঁর মোক্ষলাভ অনিবার্য হবে। যে ক্ষণভঙ্গুর রোগ শোক পাপ তাপ জরাগ্রস্থ দেহ আজ হোক কাল হোক একদিন বিনাশ হবেই তার জন্য বৃথা চিন্তা করে লাভ কি?

তার থেকে আত্মচিন্তা করলে অনেক সুফল হবে। আত্মা তো অবিনশ্বর। জড়দেহ ছিন্ন হলে সে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করবে মহানন্দে। পরমাত্মা ব্রহ্মময়ী তারামায়ের কোল লাভ করবে। তাই আনন্দের সাথে সকল চিন্তার 'মণি' চিন্তামণি তারামায়ের চিন্তায় মগ্ন হলেন প্রমথনাথ। প্রমথনাথ এই পরম দিব্য ভাবনায় মহা আনন্দে বিভোর হয়ে অপেক্ষা করছেন কখন বামদেবের পবিত্র হাতের খড়্গ নেমে এসে তাঁর মস্তক ছিন্ন করবে। মহারুদ্র বামদেব প্রমথনাথকে বলি দেবার জন্য বিরাট খড়্গ তুললেন। উপস্থিত সবাই ভয়ে আতঙ্কে তটস্থ। এতকাল পশু বলির পর এবার কি তারাপীঠ মহাশ্মশানে সত্যিই নরবলি হবে?—তা-ও আবার ভারতবিখ্যাত সর্বজন শ্রদ্ধেয় করুণাঘন দেবমানব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার হাতে। ভীম ভৈরব মূর্তিতে বামদেব খড়্গ তুললেন প্রমথনাথের মাথার ওপরে। শান্ত মনে প্রমথনাথ চোখ বুঁজলেন। মহাবেগে খড়্গ নেমে আসছে প্রমথনাথের

দেহ ছিন্ন করবার জন্য। কিন্তু বলি দিতে গিয়েও বামদেব শেষ পর্যন্ত বলি দিলেন না। বিশাল খড়্গটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর প্রিয় 'ষণ্ডাবাবা' তথা প্রমথনাথকে কাঠগোড়া থেকে তুলে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

উপস্থিত সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। আর বিরাট অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বীরভক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়। নির্ভীক বীর সাধক প্রমথনাথ বামদেবের বিশাল করুণাঘন বক্ষে পরম নিশ্চিন্তে দীর্ঘক্ষণ শিশুর মত আনন্দে রইলেন।

কৃপাময় বামদেব তাঁর এই বলির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বীরভক্ত প্রমথনাথের নির্ভীকতা ও তারামায়ের ওপর পরম নির্ভরতা সবাইকে প্রত্যক্ষ করালেন।

তিলমাত্র দেহবোধ বা মৃত্যুভয় থাকলে সে যে তারাসাধনার উপযুক্ত হতে পারে না তা বামদেব সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন এই লীলাভিনয়ের মধ্য দিয়ে।

মুখে শুধু বললেন, "এইজন্য 'ষণ্ডাবাবা'কে ভালবাসি। ষণ্ডের মত গোঁ আছে বটে তবে সাধন পথে এমন গোঁ না থাকলে সিদ্ধিলাভ হয় না।"

যাহোক, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এসে বামদেবের চরণে প্রণত হলেন। বামদেবের জন্য ভাল 'কারণ' নিয়ে এসেছেন। বামদেব প্রসন্ন মনে তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর প্রিয় প্রমথনাথ তথা 'ষণ্ডাবাবা'কেও প্রসাদ দিলেন। প্রমথনাথ আবদার করলেন যে একদিন খরুণে তাঁর বাড়ীতে শ্রীবামকে পদধূলি দিতে হবে। শ্রীবাম ইতিপূর্বেও একাধিকবার প্রমথনাথের-গৃহে পদার্পণ করেছেন। শ্রীবাম যথাসময়ে যাবেন বলে কথা দিলেন। প্রমথনাথ শুনে মহা আনন্দিত হলেন।

এই বীরভক্ত ও সাধক দীর্ঘকাল বামদেবের সঙ্গলাভ করেছেন। বামদেবের বহু অলৌকিক লীলাও তিনি বহুবার দর্শন করে তাঁর জীবন সার্থক করেছেন। বীরভক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সেই কাদুরী গ্রাম নিবাসী গৃহী অবধূত সাধক বন্ধুটিও বহুবার বামদেবের দিব্য সান্নিধ্য

লাভ করে ও কৃপা লাভ করে সাধনপথে আপ্তকাম হয়ে জীবন সার্থক করেছেন।

শ্রীবামলীলার অন্যতম মহান লীলাপরিকর রূপে শ্রীবামভক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বামমণ্ডলে চিরচিহ্নিত হয়ে রয়েছেন।

—০—

শ্রীবাম কৃপাধন্য গৌর প্রামাণিক

চণ্ডীপুরের (তারাপুর তথা তারাপীঠের) মহেন্দ্র চন্দ্র প্রামাণিক বামদেবের বিশেষ স্নেহ ও কৃপাধন্য। বামদেব মহেন্দ্র চন্দ্র প্রামাণিককে স্নেহভরে 'সদাগর' বলে ডাকেন (ইতিপূর্বে 'সদাগর'-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, দ্রষ্টব্য তৃতীয় খণ্ড)। এই সদাগরের মুদি দোকানে বামদেব প্রায়ই পায়ের ধূলা দেন। 'সদাগর' মহেন্দ্র প্রামাণিকও সাধ্যমত বামদেবকে সেবাযত্ন করেন।

মহেন্দ্র চন্দ্র প্রামাণিকের বালকপুত্র গৌর প্রামাণিককেও বামদেব বিশেষ স্নেহ করেন।

১৩১২ সালে শীতকালে দশ বছরের বালক গৌর প্রামাণিক এল. পি. বৃত্তি (নিম্ন প্রাইমারী বৃত্তি) পরীক্ষা দিতে যাবার সময় তার বাবা মহেন্দ্র প্রামাণিকের সাথে বামদেবের কাছে এল। বামদেবকে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করলেন।

বামদেব সস্নেহে আশীর্বাদ করে দশ বছরের বালক গৌর প্রামাণিককে বললেন, "যা যা ভালভাবে পাশ করে যাবি।"

সত্যিই বালক গৌর প্রামাণিক এল. পি. বৃত্তি পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করে গেল। পরবর্তীকালে গৌর প্রামাণিক বামদেবের অনেক লীলা কাহিনী তাঁর বাবা মহেন্দ্র চন্দ্র প্রামাণিকের কাছে শুনেছেন।

বাংলা ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষের দিকে ষোল বছর বয়সে যুবক গৌর প্রামাণিক উচ্চতর পরীক্ষা দেবার জন্য রামপুর হাটে এলেন। পরীক্ষার ব্যাপারে যথারীতি ব্যস্ত রইলেন। সহসা ৩রা শ্রাবণ (১৩১৮) শুনলেন যে পূর্বদিন (২রা শ্রাবণ) শেষ রাত্রে তারাপীঠে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা দেহত্যাগ করেছেন। পূর্বদিন ২রা শ্রাবণ তারাপীঠে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়।

বামদেব কৃপা ও আশীর্বাদের কথা স্মরণ করে যুবক গৌর প্রামাণিকের নয়নদ্বয় সজল হয়ে ওঠে। তাঁর পিতা ও তাঁদের সংসারের ওপর বামদেবের অসীম কৃপা ও স্নেহধারা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

শ্রীবাম কৃপাধন্য গৌর প্রামাণিক তারাপীঠ মহাশ্মশানের অনেক বিচিত্র রূপ দর্শন করেছেন। তাছাড়া তারাপীঠে বামদেবের কৃপাধন্য বিশিষ্ট প্রাচীন লোকের কাছ থেকেও তারাপীঠ মহাশ্মশানের নানান অলৌকিক কাহিনী জেনেছেন।

ইংরেজী ১৯৭১ সালের ১৯শে জানুয়ারী বৃদ্ধ গৌর প্রামাণিক তারাপীঠে এই লেখককে বামদেবের কাহিনী, বামদেবের সমসাময়িক সাধকদের কাহিনী বিশেষভাবে বলেন। তাছাড়া আরো বিভিন্ন সময়ে তিনি আরো অনেক কাহিনী লেখককে বলেছেন। যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীবাম কৃপাধন্য এই ভাগ্যবান ভক্ত গৌর প্রামাণিক নিজব্যয়ে তারামায়ের মন্দিরে ও চন্দ্রচূড় মন্দির সংলগ্ন ভোগমণ্ডপ, জীবিতকুণ্ড প্রভৃতির সংস্কার সাধন করেন এবং তারাপীঠের একাধিক উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করেন।

পরিণত বয়সে তারামা ও বামদেবের কৃপাধন্য এই ভক্তপ্রবর তারালোকে গমন করেন।

ভক্ত নিমাই দাসের জীবন লাভ

"আত্মহত্যা মহাপাপ। শীঘ্রই পালা"—এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল কাছে। গভীর রাতে ভয়াবহ তারাপীঠ মহাশ্মশানের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটি গাছে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত, অসহ্য হার্ণিয়া রোগে জর্জরিত, বেলেগ্রাম নিবাসী নিমাই দাস এই মেঘগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে কেঁপে উঠলো। একটু পূর্বেই যখন গলায় ফাঁস ঢুকিয়ে সবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে তখনই বজ্রগম্ভীর স্বরে সমগ্র তারাপীঠের মহাশ্মশান কাঁপিয়ে তারাপীঠের সদা জাগ্রত ভৈরব বামাক্ষ্যাপার মহানাদ "তারা তারা" স্বর ভেসে এল কাছে। ভয়ে নিমাইয়ের হাত থেকে দড়ি খসে পড়লো। অথচ আত্মহত্যার সংকল্পে দৃঢ়বদ্ধ হয়েই নির্ভয়ে নিমাই দাস গভীর রাতে ভয়ঙ্কর অন্ধকারে মহাশ্মশানে প্রবেশ করেছিল আত্মহত্যা করবার জন্য। কিন্তু নাদসিদ্ধ বামাক্ষ্যাপার গুরুগম্ভীর "তারা তারা" রবের মধ্যে ঐশী শক্তি ছিল যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নির্ভীক নিমাই দাসের মনেও ভয় ঢুকে গেল। ভয়ে হাত থেকে দড়ি খসে পড়লো মাটিতে। ফলে বাধ্য হয়ে গাছ থেকে নেমে দড়ি তুলে নিয়ে একটু পরে দ্বিতীয়বার যখন গাছে উঠে পুনরায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তে গেল আত্মহত্যার জন্য তখন ভেসে এল আবার সেই বজ্রগম্ভীর স্বর—আত্মহত্যা মহাপাপ, শীঘ্রই পালা।"

ভয়ে কেঁপে উঠলো নিমাই দাস। সে উপলব্ধি করলো যে এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও কোন অশরীরী বা কোন সিদ্ধ সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। নিমাই বামাক্ষ্যাপাকে চেনে না। সবে আজ রাতে বেলেগ্রাম থেকে শ্মশানে এসেছে। তবে সে বুঝতে পারলো যে এই পবিত্র মহাশ্মশানে এখন তার পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। তার ওপর কেউ দৃষ্টি রেখেছে।

ভয়ে কম্পিত দেহে নিমাই মহাশ্মশান ছেড়ে তারামায়ের মন্দিরে চলে এল। মন্দিরের আঙিনায় অবশিষ্ট রাত্রিটা কাটাবে বলে স্থির করলো।

নিস্তব্ধ ঘোর অন্ধকার রাত। তারামন্দিরের জনশূন্য উন্মুক্ত আঙ্গিনায় বসে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে কঠিন হার্ণিয়া রোগে জীর্ণশীর্ণ নিমাই দাস ভাবতে থাকে যে কে তাকে আত্মহত্যা করতে বারণ করে শ্মশান থেকে পালিয়ে যেতে বললেন ?

নিমাই দাস তারাপীঠের অদূরে বেলেগ্রাম থেকে আজই সন্ধ্যায় তারাপীঠে এসেছে। সে কাউকে চেনে না। আর এসেছে এই নির্জন মহাশ্মশানে রাতের ঘোর অন্ধকারে আত্মহত্যা করবার জন্য।

কারণ আত্মহত্যা ছাড়া আর তার বাঁচবার কোন পথ নেই। মৃত্যুই তার একমাত্র বাঁচবার পথ। একদিকে সীমাহীন ভয়াবহ মন্ত্রণাদায়ক দুঃসহ হার্ণিয়া রোগ, অন্যদিকে অসীম দারিদ্র্য ও সাংসারিক অশান্তির সাথে সাথে অবিরাম সংগ্রাম করে করে নিমাইয়েব দেহ আজ অস্থিচর্মসার হয়েছে। তার ওপর তাকে ও তার স্ত্রী-পুত্রকে অর্থাভাবের জন্য অর্ধেক দিন উপবাস করে কাটাতে হয়। এই দুঃসহ অশান্তি, হার্ণিয়া রোগ ও নিত্য দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত নিমাইকে আরো অস্থির করে তুলেছে। মৃত্যু চিন্তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তার ওপর পাওনাদারদের নির্মম তাগাদা তাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলেছে। নিমাই কঠিনভাবে উপলব্ধি করেছে যে সংসারে তার স্বাস্থ্যবল, অর্থবল ও জনবল এই তিনটির একটিও নেই। তার এই সংসারে বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এই পৃথিবীতে সে জীবিত থেকেও প্রকৃত মৃত। এই রোগ, অভাব, অশান্তি, ঋণ প্রভৃতি সকল যন্ত্রণার একদিনেই চিরতরে অবসান হবে যদি সে আত্মহত্যা করে মৃত্যুকে বরণ করে।

কিছুদিন ধরে তাই মৃত্যুচিন্তা নিমাই দাসকে সর্বদা পেয়ে বসেছিল। কারণ সে স্বাস্থ্যহীন, অর্থহীন, বেকার ও ঋণগ্রস্থ। তার ওপর সংসারের স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের গুরু দায়িত্ব তারই উপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘার মত সম্পূর্ণ ভাবে রয়েছে। অথচ সে শারীরিক ও আর্থিক উভয়

দিক থেকেই সম্পূর্ণ অক্ষম। তাছাড়া তার জনবল এমন নেই যে তাকে সাহায্য করে।

তাই একমাত্র এসব থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে হলে মৃত্যুই তার একমাত্র অবলম্বন। কেবল মৃত্যুই তাকে মুক্তি দিতে পারে। মৃত্যু তাই তার কাছে আজ মহামুক্তি। মৃত্যুই আজ তার পরম বন্ধু, যথার্থ প্রাণদাতা মুক্তিদাতা।

তাই আজ বেলেগ্রাম থেকে বাড়ীর কাউকে কিছু না বলে বহু কষ্টে হার্ণিয়ার অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সারাদিন হাটতে হাটতে অনেক কষ্টে সন্ধ্যাবেলা তারাপীঠে এসেছে নীরবে আত্মহত্যা করবার জন্য।

রাতের অন্ধকারের জন্য তারাপীঠ মহাশ্মশানের এক গাছের নীচে নীরবে সে বসেছিল। হাতে একগাছা দড়ি। আত্মহত্যার জন্য। রাত গভীর হলেই সে গাছে উঠে আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা জুড়াবে।

রাত ক্রমে বাড়তে লাগলো। মহাশ্মশান নির্জন নিস্তব্ধ নিথর ও ঘোর অন্ধকার।

কিন্তু তারাপীঠ কি রকম মহাশ্মশান তা নিমাইয়ের জানা নেই। রাত গভীর হবার সাথে সাথে ক্রমে ক্রমে মহাশ্মশান জাগ্রত হতে লাগলো। দৈত্যের মত বিশাল বিশাল শ্যাওড়া ও বুনো জামগাছগুলোর বাতাসে আন্দোলনের ফলে সাঁ সাঁ শব্দ। অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহ নিয়ে শেয়াল কুকুরের উন্মত্ত চিৎকার। অসংখ্য বিষাক্ত সাপের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে চলাফেরার সর্ সর্ শব্দ। গাছে গাছে শকুনি শাবকের কান্না, অগণিত মড়ার খুলির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ধ্বনি। তাছাড়া অসংখ্য অশরীরীর চলাফেরার ভয়াবহ দৃশ্য, মাঝে মাঝে বিভৎস দুর্গন্ধ প্রভৃতি সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করলো। মৃত্যুবরণ করতে এলেও এই অভূতপূর্ব ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নিমাই-ও ভয় পেল। তবু মৃত্যু ছাড়া আর তো তার কোন পথ নেই। তাই সে একটা বুনো শ্যাওড়া গাছে অনেক কষ্টে উঠলো। তারপর ফাঁস লাগিয়ে সেই ফাঁস যেই গলায় পরে ঝুলে পড়তে যাবে ঠিক তখনি সমগ্র মহাশ্মশান কেঁপে উঠলো এক বজ্রগম্ভীর

'তারা তারা' রবে। মেঘ গর্জনের ন্যায় সেই মহাশব্দে নিমাই কেঁপে উঠলো। হাত থেকে তার দড়ি পড়ে গেল। আবার নেমে দড়ি নিয়ে দ্বিতীয়বার আত্মহত্যা করতে গেলে সেই মেঘমন্দ্রিত স্বর কানে এল "আত্মহত্যা মহাপাপ, শীঘ্রই পালা।" নিমাই সেই নির্দেশ অমান্য করতে পারলো না। মহাশ্মশান থেকে পালিয়ে এল।

তারামা ও বামদেবের কি বিচিত্র লীলা। জগতের সবচেয়ে বড় ভয় মৃত্যুভয়। সেই মৃত্যুভয়কে যে জয় করেছে, সেই নির্ভীক লোকও ভয় পেয়ে মহাশ্মশান থেকে পালিয়ে এল সেই গুরুগম্ভীর মহানাদ ধ্বনি ও মেঘমন্দ্রিত আদেশ শুনে। কার এই নাদধ্বনি ও গভীর গম্ভীর স্বর তা নিমাই জানে না। কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করতে বাধ্য হ'ল নিমাই। আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করা আর তার হ'ল না। মৃত্যুর মৃত্যু হ'ল সেই মৃত্যুঞ্জয়ের কঠোর আদেশে।

ক্রমে ভোর হয়ে এল। নিমাই কিন্তু আর বাড়ী ফিরে গেল না। বাড়ী ফিরে কি হবে? আবার সেই দুঃখ কষ্ট দারিদ্র লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর পাওনাদারদের কঠিন তাগাদার পুনরাবৃত্তি মাত্র। নিমাই ঠিক করলো তারাপীঠেই থেকে যাবে আমৃত্যু। আর তাকে জানতে হবে যে কাল রাতে কে তাকে আত্মহত্যা করতে বারণ করে শ্মশান থেকে চলে যেতে বলেছিলেন। নিমাই প্রতিদিন যাত্রীদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে কোনরকমে দিন কাটাতে লাগলো। মধ্যাহ্নে মাঝে মাঝে তারামা'র অন্নপ্রসাদও পেতে লাগলো। একদিন সন্ধ্যাবেলা নিমাই শ্মশানে এল। শীতকাল। অদূরে বামদেবের ধুনি জ্বলছে। বামদেব সেখানে নেই। নিমাই গাঁজা খাবার জন্য সেই পবিত্র ধুনি থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার তুললো। এই সময় হঠাৎ বামাক্ষ্যাপাবাবা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

ভীমকান্তি ভৈরব বামাক্ষ্যাপাবাবা উগ্রমূর্তি ধারণ করে নিমাইয়ের সামনে এগিয়ে এলেন। নিমাই ভয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলে কাঁপতে লাগলো হাতজোড় করে। ক্ষমা চাইতে লাগলো কিন্তু ভয়ে গলা দিয়ে স্বর বের হ'ল না।

সহসা বামদেব নিমাইয়ের হাণিয়ার ওপর প্রচণ্ড জোরে পদাঘাত করলেন। ভীষণ আর্তনাদ করে নিমাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

বামদেব শান্তভাবে ধনির পাশে তাঁর আসনে গিয়ে বসলেন। উপস্থিত শিষ্যভক্তগণ স্তব্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখলেন। তাঁরা জানেন কৃপাময় বামদেবের সকল কর্মের পেছনে রয়েছে মহৎ কল্যাণ ও শান্তি।

অনেকক্ষণ পর নিমাইয়ের জ্ঞান হ'ল। ধীরে ধীরে উঠে মন্দিরে ফিরে গেল। মহা আশ্চর্য্যের ব্যাপার তার এতদিনের দঃসহ যন্ত্রনাদায়ক হার্ণিয়া আর নেই। সে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আনন্দে সে তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে উপস্থিত সবাইকে বললো তার কথা।

কৃপাময় বামদেব নিমাইকে আশির্বাদ করে ঘরে ফিরে যেতে বললেন। সর্বজ্ঞ বামদেব তার সাথে আরো বললেন যে অচিরে তার কাজ মিলবে এবং তার সংসারের অভাব থাকবে না। তার কণ্ঠস্বর শুনে নিমাই এবার সবিস্ময়ে বুঝতে পারলো যে সেদিন গভীর রাতে দু'বারই তাঁকে আত্মহত্যা থেকে বামদেবই রক্ষা করেছেন। "আত্মহত্যা মহাপাপ, শিগ্‌গির পালা"---এই গম্ভীর কণ্ঠস্বর যে স্বয়ং শ্মশান ভৈরব বামদেবের তা নিমাই এবার যথার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'ল। করুণাময় বামদেবের আশির্বাদ নিয়ে ভাগ্যবান নিমাই দাস সকালবেলা তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে নবজীবন লাভ করে সুস্থ সবল দেহে মনে মহানন্দে বেলে গ্রামে নিজ গৃহে ফিরে গেল।

তারামা ও বামদেবের কৃপায় সে অচিরে কাজও পেয়ে গেল। সুস্থভাবে সৎ পরিশ্রম করে সে সংসারের দারিদ্র ঘুচিয়ে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনলো। স্ত্রী পুত্রের মুখেও আনন্দ হাসি ফুটে উঠলো। নিমাইয়ের সমগ্র পরিবার তারামা ও বামদেবের শরণাগত হয়ে রইলো। সারাজীবন স্ত্রী পুত্রসহ নিমাই মহা শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত করলো। পরম কৃপাময় বামদেবের এই মহান কৃপার কথা তার পরিচিত সবাইকে সে সানন্দে সজল নয়নে বলেছে দীর্ঘকাল ধরে।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক ভৈরব দাস জ্ঞানানন্দ তীর্থনাথের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—o—

পরমপ্রেমিক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা

পরমপ্রেমিক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে ত্রিলোকের সকল জীবই ত্রিলোকজননী তারামায়ের সন্তান। মানুষ, পশুপাখী কীটপতঙ্গ বলে কোন ভেদ নেই। সবাই এক মায়ের পেটের সন্তানের ন্যায়। সবাই এক তারামায়ের সন্তান। সবাই তারামা'র অংশ ও শাশ্বত সন্তান বলে সবার প্রতিই শ্রীবামের সমান ভাব।

শ্মশানের শবমাংস ভোজী শেয়াল কুকুর যেমন তাঁর প্রিয় তারামা'র মানুষ সন্তানগণও। পূর্ণব্রহ্মবিদ পরমপুরুষ বামদেবের কাছে তাই সবই অভেদ। তাই মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন ভেদ জ্ঞান নেই। সবার প্রতি তাঁর অপার প্রেম। তাই সকল মানুষ পশু পাখী সাপ বানর ইঁদুর বেড়াল শেয়াল কুকুর টিকটিকি সবই তাঁর প্রাণসর্বস্ব তারামায়ের সন্তান। এমনকি মহাশ্মশানের মড়া খেকো দুরন্ত ও বলিষ্ঠ-পুষ্ট-মশারা-ও তাঁর কাছে সমান আদরের।

রাতে এইসব শ্মশানবাসী মশাদের গুঞ্জন ধ্বনি মহাপ্রেমিক বামদেবের কানে "তারা নাম, দুর্গা নামের আশ্চর্য্য গান শোনায়।"

রাতে এই গান শুনবার জন্য বামদেব প্রায়ই মশারীর বাইরে রাত কাটান। আর তাঁর মশারীও বিচিত্র। দু'তিনটি বড় বড় গর্ত রয়েছে মশারীতে। সেই বিরাট গর্তের মধ্য দিয়ে গভীর রাতে শ্মশানের মড়া খেয়ে এসে বামদেবের প্রিয় কুকুর কালু ভুলু প্রভৃতি তাঁর বিছানায় এসে তাঁর পাশে শুয়ে থাকে। প্রিয় কালু ভুলু প্রভৃতি কুকুরদের জন্য তিনি এই বড় বড় গর্ত করে রেখেছেন মশারীতে। রাতে মশারী টানালে পাছে এরা বিছানায় আসতে না পারে তাই এসব গর্ত করেছেন।

সন্তানের ন্যায় বামদেব এসব অবোধ ও আবোলা জীবদের স্নেহ করেন। এদের খাওয়া শোয়ার ওপর তাঁর সতত দৃষ্টি থাকে।

এদের একটু অযত্ন হলে তিনি ভীষণ রেগে যান। তারামা'র সন্তান জ্ঞানে তিনি শিষ্যভক্তদের বলেন এদের সেবাযত্ন করতে। এদের অযত্ন হলে শিশুর মত অভিমান করেন। শ্রীবামের নিত্যসেবক নন্দ পাটনী ('নোদা') এবং ব্রজপাঠক, শচী পাণ্ডা, নগেন বাগচি, ভূপতি পাণ্ডা প্রভৃতিদেরও বামদেব কখনো কখনো ধমক দেন তাঁর এই কুকুরদের অযত্ন হলে। শুধু তাঁদেরই ধমক দেন না, সাথে সাথে স্বয়ং তারামায়ের ওপরও অভিমান করেন শিশুর মত।

একদিন বামদেব তাঁর একান্ত প্রিয় কালু কুকুরকে অনেকক্ষণ না দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাই তাঁর প্রিয় শিষ্য ও সেবক ব্রজ পাঠককে বললেন, "বাবা, কালুবাবু কোথায়?—তাকে ডাকুন দেখি বাবা।"

ব্রজ পাঠক বামদেবের আশ্রমের বাইরে এসে কালু কুকুরের উদ্দেশ্যে 'কালু, তু-তু" করে ডাকতে লাগলেন। তাই শুনে বামদেব বিরক্ত হয়ে উপস্থিত সবার সামনে শিষ্য ব্রজপাঠককে বললেন, "কালু কি রে শালা, কালুবাবু বলতে হয়। কালুবাবু ব্রাহ্মণ বাবা।" এমন সময় কালু এসে বামদেবের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যেমন শিশু তার পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কালু কুকুরকে সন্তানভাবে আদর করতে করতে বামদেব বললেন, "কালুবাবু আমার রাজপুত্তুর বাবা।"

শ্রীবামের এই সর্বভূতে সমদর্শন তাঁর চরম ব্রহ্ম উপলব্ধির পরম নিদর্শন।

একদিন বামদেবের অন্যতম প্রিয় নগেন পাণ্ডা তথা 'নগেনকাকা' আশ্রমে সকাল বেলা এলেন।

বামদেব তাকে বললেন, "নগেনকাকা, রাত্রে তারামা জাগিয়া থাকেন কিনা তাই আমিও জাগিয়া কাটাই। কখন কি আজ্ঞা হয়। তখন আবার ছোটবড় মশারা কানে তারানাম, দুর্গানামের আশ্চর্য গান শোনায়। কিন্তু কামড়ায় এটাই বড় দুঃখ।"

নগেন পাণ্ডা বললেন, "মশারী খাটাইলে কামড়াইবে না। অথচ তারানাম শোনা যাইবে।"

নগেন পাণ্ডা কবিচন্দ্রপুরের দাসজীর থেকে মশারী আনিয়ে দিলেন। রাত্রে বামদেবের অন্যতম সেবক ভূপতি পাণ্ডা বামদেবের বিছানা করে মশারী টানিয়ে দিলেন। পরদিন সকালে আবার আশ্রমে এলেন নগেন পাণ্ডা। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন বামদেবের সর্বাঙ্গে শ্মশানের ভয়ঙ্কর বিষাক্ত মশার দংশনের চিহ্ন।

নগেন পাণ্ডা এর কারণ জানতে চাইলে বামদেব বিচিত্র উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, "মশা বড় বদ্‌কাটাস জাত। চালাকি করিয়া তারানাম দুর্গানামে ভুলাইয়া প্রাণ ভরিয়া কামড়ায়। মশারী খাটাইলেও ছাড়ে না।"

নগেন পাণ্ডা তাতে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "মশারীর মধ্যে কামড়ায়? তবে দাসজী ভাল মশারী দেয় নি। নয়তো ভূপতি ঠিক খাটাইতে পারে নাই।"

বামদেব উত্তরে বললেন, "না বাবা, মশারী ঘরে ভাল দেখিতে পাই না। তাই বাইরে শুয়েছিলাম।

প্রাজ্ঞ নগেন পাণ্ডা উপলব্ধি করলেন যে মশারী টাঙ্গানো বা না টাঙ্গানো দুই-ই দেহবোধহীন বামদেবের কাছে সমান ব্যাপার।

মশারী টাঙ্গালেও তাঁর প্রিয় কুকুরদের জন্য বড় বড় গর্ত করে রাখেন যাতে তারা মশারীর ভেতর এসে তাঁর পাশে শুতে পারে। আবার প্রাণাধিক প্রিয় তারানাম দুর্গানাম শোনবার জন্য মশারীর বাইরে শুয়ে মশাদের নিজ দেহের রক্ত দিয়ে তৃপ্তি দেন। এমনি মহান করুণাময় ও পরম প্রেমিক হলেন বামদেব। রক্তখেকো মশার গুঞ্জন ধ্বনির মধ্যে যিনি তারানাম দুর্গানাম প্রাণভরে শোনেন, তাঁর কাছে মশারী থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান।

একদিন সকালে যথারীতি বামদেবের আশ্রমে এলেন তাঁর প্রিয় পার্ষদ নগেন পাণ্ডা। এসে দেখলেন বামদেব যেন শিশুর মত অধৈর্য হয়ে কি খুঁজছেন। পাশে নগেন পাণ্ডার ভাইপো তথা বামদেবের সেবক পাণ্ডা ভূপতি পাণ্ডাও দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বামদেব বললেন; "ভূপকাকা, নগেনকাকা, পরাণকাঠি কৈ? কালু ভুলুকে খাইতে দিতে পারিতেছি না। তাহাদের ক্ষুধা হইয়াছে।"

বামদেব তাঁর আশ্রমের ঘরের চাবিকে বিচিত্র নাম দিয়েছেন পরাণকাঠি। একটি ক্ষুদ্র গামছার সাথে তা বেঁধে রাখেন। ছোট্ট ছেলের মতই তা কখনো কোমরে কখনো বিছানায় রাখেন। যেন কত প্রয়োজনীয় জিনিষ। পূর্বদিন রাতে তারামা'র শীতলী ভোগ কয়েকটি লুচি প্রতিদিনের মতই ঐ চাবিযুক্ত গামছায় বেঁধে রাখেন কালু ভুলুর জন্য এবং তা বিছানার বালিশের নীচে রাখেন।

কিন্তু লুচির গন্ধে একটি বিড়াল তা নিয়ে পালায়। তাই খুঁজে না পেয়ে বামদেব বিড়ালের উদ্দেশে শিশুর ন্যায় অভিমান করে বলতে থাকেন, "লুচি নিয়ে পালালি, পালালি তো পরাণকাঠি কেন লিলি?"

এমনকি এর জন্য স্বয়ং তারামার ওপরও তার অভিমান হ'ল। তারাময় বামদেবের যে সবই তারামা। মনেপ্রাণে রাগ অনুরাগে ভাবে অভাবে মানে অভিমানে জ্ঞানে ধ্যানে বলনে চলনে এককথায় সবই তারামা। তাই বিড়ালের জন্য তারামায়ের ওপর অভিমান করে বলতে লাগলেন, "তারামা লুচি দেন খাইতে। আবার পরাণকাঠি গামছা কাড়িয়া লেন।... এই বদ কুবিদে দেবোত্তরে আর থাকিব না।"

অর্থাৎ বিড়াল যে লুচিসহ পরাণকাঠিযুক্ত গামছা নিয়ে পালিয়েছে তাও তারামাই করেছেন।

একটু পরে নগেন পাণ্ডা ও ভূপতি পাণ্ডা খোঁজাখুঁজি করে আশ্রমের পেছনের থেকে সেই গামছাসহ পরাণকাঠি উদ্ধার করলেন। লুচিগুলো বেড়াল খেয়ে গেছে। বামদেবের হাতে এই বিচিত্র পরাণকাঠি তথা চাবিটা দিতেই বামদেব শিশুর মত খুশি হলেন এবং বললেন "নগেনকাকা, আমার ভূপকাকার ছেলে নেই। কিন্তু আমাকে ছেলের বেশী যত্ন করেন। আর আমার তারামা কেমন হাসি হাসি মুখ। ছোট্ট জিভ, দুপুরে প্রসাদ খাইতে দেন। সন্ধ্যায় শীতলী। তাইতো এস্থান ছাড়িয়া মন কোথাও যাইতে চায় না।"

তুচ্ছ ধাতুর চাবিকে বামদেব 'পরাণকাঠি' বলেছেন। এই জড় বস্তুর মধ্যেও চৈতন্য তথা প্রাণের দিব্য স্পন্দন তিনি দেখেছেন। চিন্ময়ী তারামা'র দিব্য পরমাণুর অণু অংশ এর মধ্যেও বিরাজমান। তাই বামদেব তার নাম দিয়েছেন 'পরাণকাঠি'। তারাময় বামদেব যে এই জগৎপ্রকৃতি তথা মহাবিশ্বপ্রকৃতির পরম প্রেমিক, উপরোক্ত কাহিনী তারই স্নিগ্ধ মধুর নিদর্শন।

শ্রীবামের আশ্চর্য শিক্ষাদান

আনুমানিক ১৩১২ সালের শীতকাল।

এক মহানিশায় শ্রীবাম তারাপীঠ মহাশ্মশানের তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এই সময় শ্রীবামের স্নেহধন্য এক ভক্ত তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে কলকাতা থেকে বামদেবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। এই ভক্তের নাম যোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই ব্যাপারে বামদেবের কৃপা ও শিক্ষাদানের জন্য প্রার্থনা করলেন। শ্রীবাম শান্তভাবে সব শুনলেন। তারপর যোগীন্দ্রনাথকে বললেন, "তুমি এই কমণ্ডলু ভরে দ্বারকানদী থেকে জল নিয়ে এস।"

যোগীন্দ্রনাথ তা শুনে কমণ্ডলু নিয়ে দ্বারকানদী যাবার জন্য নিবিড় অন্ধকার শ্মশানের মধ্য দিয়ে রওনা হলেন। গিয়েই ভয় পেয়ে গেলেন।

তবু দ্বারকানদীর দিকে অগ্রসর হলেন তারামা ও বামদেবের নাম স্মরণ করে।

এমন সময় একটি বড় কুকুর এল। পরে আরেকটা। দ্বারকা নদীতে গিয়ে জল ভরে ফেরবার সময় দেখলেন আরো একটা কুকুর। তিনটে কুকুর তাঁকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এল। কিন্তু নদীতীর থেকে শ্মশানে উঠেই কুকুর তিনটি অদৃশ্য হয়ে গেল। যোগীন্দ্রনাথ বিস্মিত হলেন ওদের দেখতে না পেয়ে। বামদেবের কাছে এসে জলভর্তি কমণ্ডলু দিতেই বামদেব যোগীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন যে শ্মশানে কিছু দেখেছেন কিনা।

যোগীন্দ্রনাথ বললো, "তিনটি কুকুর দেখেছি।"

তাই শুনে বামদেব তাঁরে চিমটে দিয়ে আঘাত করে বললেন, "তুই শালা কুকুরই দেখলি।"

হতভাগ্য যোগীন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। বুঝলেন তাঁর এখনও সময় হয় নি। অপেক্ষা করতে হবে এই তীক্ষ্ণ সাধনপথে অগ্রসর হ'বার জন্য। তাঁর জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের জন্য। পরে এই ভক্ত বামদেবের কৃপায় জ্ঞান ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

শ্রীরাম কর্তৃক প্রসাদের মাহাত্ম্য প্রদর্শন

প্রসাদ কাকে বলে ও তার মাহাত্ম্য কি তা লোকগুরু শ্রীরাম একদিন তাঁর এক ভক্তকে দেখালেন। এই প্রসাদকে কিভাবে সযত্ন সেবার দ্বারা ঠাকুরের পূজায় নিবেদন করতে হয় সেই শিক্ষাও তার সাথে শ্রীরাম তাঁর ভক্ত অমূল্য কুমার চক্রবর্তীকে শেখালেন। তার পরিণতি কি আনন্দদায়ক ও মুক্তিদায়ক তারও ইঙ্গিত দিলেন।

হাওড়া জেলার খরুণ গ্রাম নিবাসী শ্রীঅমূল্য কুমার চক্রবর্তী বামদেবের ভক্ত। একদিন তিনি হাওড়ার বিখ্যাত মিষ্টি "আবার খাবো" একহাড়ি কিনে নিয়ে তারাপীঠ রওনা হলেন। এই মিষ্টি শিবাবতার বামদেবকে নিবেদন করবেন বলে নিয়ে চললেন। পথে আসতে আসতে অসাবধানতাবশতঃ দু'একটি মিষ্টি মাটির হাড়ি থেকে মাটিতে পড়ে যায়। অমূল্য চক্রবর্তী সেই মিষ্টি মাটি থেকে তুলে আবার হাড়িতে ভরে তা ভালভাবে বন্ধ করলেন। তারপর তারাপীঠে এলেন।

বামদেবের চরণে 'আবার খাবো' মিষ্টির হাড়িটি খুলে সযত্নে বামদেবের সামনে রাখলেন। তারপর বামদেবকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। বামদেব একবার মিষ্টির হাড়িটির দিকে তাকিয়ে 'কালু' কুকুরকে ডাকলেন।

কালু কুকুর এসে একবার মিষ্টির হাড়িটা দেখলো। তারপর সেই মিষ্টিভর্তি হাড়ির ওপর পেচ্ছাব করে দিল।

উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল এই বিপরীত দৃশ্য দেখে। কারণ সাধারণতঃ বামদেবের শিষ্যভক্তগণ কোন খাবার আনলে বামদেব প্রথমে সানন্দে তা তারামাকে নিবেদন করেন তারপর নিজে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত সবাইকেও সেই পবিত্র প্রসাদ দেন। কিন্তু এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিসদৃশ দৃশ্য দেখে সবাই বিস্মিত ও চিন্তিত হলেন।

তখন সর্বজ্ঞ বামদেব অমূল্য চক্রবর্তীকে বললেন, "মাটি আগেই মিষ্টি উচ্ছিষ্ট করে দিল। সেই উচ্ছিষ্ট মিষ্টি নিয়ে এসেছ বাবা? কালু তাই পেচ্ছাব করে দিল।"

অমূল্যবাবু তা শুনে বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন। সর্বজ্ঞ বামদেবের দৃষ্টিতে যে সবই ধরা পড়ে তা অমূল্যবাবু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন।

আর লজ্জিত হলেন এজন্য যে সামান্য দু'একটা মাটিতে পড়ে যাওয়া মিষ্টি পুনরায় মাটি থেকে তুলে হাড়িতে রাখা তাঁর উচিত হয় নি। এর ফলে সব মিষ্টিই উচ্ছিষ্ট হয়ে গেলো। শতসহস্র লোকের পায়ের

স্পর্শযুক্ত যে মাটি, সেই পথের ধুলা থেকে তা তুলে মিষ্টি হাড়িতে রাখলে তা সবটাই অপবিত্র হয়ে যায়। তা আর ঠাকুরের ভোগে লাগে না। তাছাড়া মাটিতে পড়া মানে মাটির ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোও তা খেয়ে উচ্ছিষ্ট করে দেয়। তা কি করে তারামা ও বামদেবের ভোগে লাগবে ?

তাই জ্ঞানদাতা বামদেব তাঁকে এই জ্ঞান দিলেন যে ঠাকুরের জন্য যেটুকু সেবা করা হবে তা ঠিক ঠিক ভাবে গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং নিষ্ঠা ও সংযমের সাথে করতে হবে। তবেই সেবার সুফল পাওয়া যাবে। তা না হলে সেই সেবার ফল নষ্ট হয়ে যায় এবং তা কুকুরেরও অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য বস্তু হয়ে যায়। তাই তারই প্রতীকরূপে 'কালু' কুকুর সেই ঘৃণ্য বস্তুর ওপর পেচ্ছাব করে তার নিদর্শন রাখলো।

লজ্জায় অনুশোচনায় অমূল্যবাবু পুনরায় হাওড়ায় ফিরে গেলেন। পুনরায় আবার সেই বিখ্যাত মিষ্টি 'আবার খাবো' এক হাড়ি কিনে নিয়ে সযত্নে তারাপীঠ রওনা হলেন।

এবার রামপুরহাট ষ্টেশনে নেমে সেই মিষ্টির হাড়ি মাথায় নিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে ও সতর্কতার সাথে তারাপীঠ চললেন। দীর্ঘ ছয় মাইল পথ মাথায় করে মিষ্টি নিয়ে তারাপীঠ ঢুকতেই দ্বারকা নদীর তীরে বামদেবের দর্শন পেলেন। সস্নেহে করুণাময় বামদেব তাঁকে বললেন, "অমূল্যবাবা, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে বাবা। শীঘ্রই আমাকে এই মিষ্টি দাও।"

অমল্যবাবু সানন্দে মাথা থেকে মিষ্টির হাড়ি নামিয়ে বামদেবকে দেবার আগেই কৃপাময় বামদেব স্বয়ং হাত বাড়িয়ে সেই মিষ্টির হাড়ি নিয়ে তারামাকে নিবেদন করে পরম আনন্দে খেতে লাগলেন। বামদেবের পেছনে উপস্থিত শিষ্যভক্তগণ অবাক হয়ে এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগলেন। বীর ভক্ত অমূল্যবাবু সানন্দে ও সজল নয়নে গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে এবার তিনি যে ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠার সহিত এই মিষ্টি ভোগ এনেছেন তা ঠিক হয়েছে।

এই ভাবেই ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করতে হয়।

করুণাময় শিবাবতার বামদেব তারই স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠার সমন্বিত মাধুর্য্যমণ্ডিত ভোগকে সানন্দে গ্রহণ করলেন স্বেচ্ছায় সাগ্রহে এসে।

আরো লক্ষণীয় যে, সর্বজ্ঞ বামদেব তাঁর আশ্রম ছেড়ে, মহাশ্মশান ছেড়ে, দ্বারকানদীর তীরে এসে স্বয়ং এগিয়ে গিয়ে ভক্তের এই নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করলেন। এটা একাধারে তাৎপর্যপূর্ণ, ইঙ্গিতপূর্ণ ও নিগূঢ় অর্থবহ।

এর অর্থ হ'ল, যে ভক্ত এই অসার সংসারে প্রতিদিন তাঁর আরাধ্য দেবতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে ভোগ নিবেদন করেন, তাঁর জীবনের চলার পথের শেষে তাঁর আরাধ্য দেবতা, তথা তাঁর ভবপারের কাণ্ডারী, স্বয়ং এমনিভাবে এগিয়ে এসে তাঁকে গ্রহণ করে তাঁকে পার করে নেবেন এই মহাদুঃখময় ভবপারাবার।

বামদেবের উপরোক্ত লীলা তারই আনন্দময় নিদর্শন।

কয়েকদিন পরম আনন্দে প্রিয়তম আরাধ্যপ্রভু বামদেবের দিব্যসঙ্গ লাভ করলেন ভক্ত অমূল্য চক্রবর্তী। তারপর ত্রিলোক জননী তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করে মনের আনন্দে মহাভাগ্যবান ভক্ত অমূল্যকুমার চক্রবর্তী গৃহে ফিরে গেলেন।

বামদেবের অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়ে গৃহে গমন

রামপুর হাটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল শ্রীঅনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়। রামপুরহাটের এই বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ পুরুষের গৃহে বামদেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য বীরাচারী সাধক 'রসিক গোঁসাই (ডাক্তার রসিক বন্দোপাধ্যায়) মাঝে মাঝে অনন্তলালবাবুর বাড়ী যান। জীবনের মধ্যভাগে অনন্তবাবু সহসা হিন্দুধর্মের চেয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণ বেশী অনুভব করেন এবং ব্রাহ্মদের সাথে গভীরভাবে মিশতে থাকেন। এর ফলে নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণগণ অনন্তবাবুর ওপর অসন্তুষ্ট হন। অনন্তবাবুর মেয়ের বিয়ের সময় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ এই ব্যাপার নিয়ে অশান্তি করলেও অনন্তবাবুর বন্ধু শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় এই অশান্তি দূর করেন।

জীবনের শেষভাগে অনন্তবাবু হিন্দুধর্মের প্রতি পুনরায় আকর্ষণ অনুভব করেন। হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক হন। এই সময় বামদেবের শিষ্য রসিক গোঁসাই তাঁকে হিন্দুধর্মের সারমর্ম ও হিন্দুদর্শন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করেন।

বীরাচারী ও প্রাজ্ঞপ্রবর এই ব্যাপারে আরো গভীরতত্ত্ব জানবার ব্যাপারে অনন্তবাবুকে তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সাথে যোগাযোগ করতে বলেন।

অনন্তবাবু ইতিপূর্বে বহুবার বহুজনের কাছে তারাপীঠের মহাতান্ত্রিক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কথা শুনেছেন। তাঁর অনেক অলৌকিক শক্তির কথাও বহু লোকের মুখে শুনেছেন। বামদেব যে মাঝে মাঝে তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট তাঁর একাধিক ভক্তগৃহে পদার্পণ করেন সেই খবরও অনন্তবাবু রাখেন।

তাই শ্রীবামের শিষ্য রসিক গোঁসাইয়ের কথায় অনন্তবাবু উৎসাহী

হলেন। কিন্তু বার্ধক্যবশতঃ নিজে তারাপীঠ যেতে অক্ষম হওয়ায় রসিক গোঁসাইকে অনুরোধ করলেন তাঁর ব্যাকুলতার কথা বামদেবকে জানাবার জন্য। তার সাথে আরো জানালেন যে বামদেবের সম্মতি পেলে তিনি তারাপীঠে পাল্কী পাঠাবেন বামদেবকে তাঁর গৃহে নিয়ে আসবার জন্য।

অনন্তবাবুর অনুরোধে রসিক গোঁসাই শ্রীগুরু বামদেবের কাছে এসে অনন্তবাবুর জ্ঞানতৃষ্ণার কথা জানালেন।

রসিক গোঁসাইয়ের একান্ত অনুরোধে ও অনন্তবাবুর আন্তরিক অনুরোধে বামদেব অনন্তবাবুর গৃহে পদার্পণ করতে রাজী হলেন।

বামদেবের সম্মতি পেয়ে অনন্তবাবু সানন্দে তাঁর মুহুরী শ্রীশশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাল্কী দিয়ে তারাপীঠে পাঠালেন।

কৃপাময় বামদেব ভক্তের ব্যাকুলতায় সাড়া দিয়ে পাল্কীতে উঠলেন। সাথে রসিক গোঁসাই। পাল্কী রামপুরহাটে অনন্তবাবুর বাড়ীতে যথা-সময়ে এসে পৌঁছলো। অনন্তবাবু উচ্চ মধ্যবিত্ত লোক। তাঁর দোতালা বাড়ী। অন্দরমহল পাকা হলেও বাইরের মহল সম্পূর্ণ পাকা নয়।

তাই অনন্তবাবু বামদেবকে সাদরে অভ্যর্থনা করে অন্দরমহলে নিয়ে চললেন। অনন্তবাবুর অন্দরমহলে যাবার পথে একটি চমৎকার কূপ রয়েছে। বামদেব কূপটি দেখে খুশী হয়ে কূপটির নাম দিলেন "চন্দ্র কূপ"। বাড়ীর সবার প্রণাম গ্রহণ করবার পর বামদেব কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগ করলেন। তারপর একান্ত নিভৃতে অনন্তবাবুর জ্ঞানতৃষ্ণা মেটালেন। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রকৃত দর্শন ও উপলব্ধি এবং তাঁর স্বর্গীয় মাধুর্য বামদেব অনন্তবাবুকে কৃপা করে উপলব্ধি করালেন। ভাগ্যবান অনন্তবাবু বামদেবের প্রত্যক্ষ দিব্য জ্ঞান ও দিব্য শক্তির পরিচয় পেয়ে অভিভূত হলেন। হিন্দুধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করে অশেষ আনন্দিত হলেন।

অনন্তবাবুর একান্ত অনুরোধে করুণাময় বামদেব সেদিন অনন্তবাবুর গৃহে অতিবাহিত করলেন। পরদিন তারাপীঠ রওনা হলেন। যাবার পূর্বে অনন্তবাবুকে কিছু নিগূঢ় অধ্যাত্ম কথা বলেন। তাছাড়া অনন্তবাবুর

অধ্যাত্ম চিন্তা ও আত্মিক সহযোগিতার জন্য কৃপাময় বামদেব তাঁর জ্ঞানী ও ক্রিয়াবান শিষ্য রসিক গোঁসাইকে অনন্তবাবুর বাড়ীতে রেখে যান।

অনন্তবাবু সপরিবারে রসিক গোঁসাইকে বরণ করেন।

উত্তরকালে অনন্তবাবুর তিন পুত্রের মধ্যে বিশেষকরে মধ্যম পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক ও জননেতা জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার ন্যায় অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হন। জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বামদেবের শ্রেষ্ঠ শিষ্য মহা-বিপ্লবী ও সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপার সংস্পর্শে আসেন এবং তারাক্ষ্যাপার প্রিয় ভক্তরূপে সুচিহ্নিত হন।

শিবাবতার বামদেব ও তাঁর দুই সুযোগ্য শিষ্য রসিক গোঁসাই ও তারাক্ষ্যাপার পবিত্র পদধূলিতে সহৃদয় ভক্ত ও অতিথিপরায়ণ অনন্ত-বাবুর মহান পরিবার ও পুত্রগণ অশেষ গৌরবান্বিত হন।

দান কাকে বলে?

আনুমানিক ১৩১২ সালের মাঘ মাস। তারাপীঠে শীত বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা!

এই শীতের সময় কোন কোন শিষ্য ভক্ত বামদেবকে শীতের গরম পোষাক দিলে বামদেব তা দু'একদিন ব্যবহার করে কাউকে দান করে দেন। এতে যিনি দিলেন তাকেও সন্তুষ্ট করা হ'ল, আবার বামদেবকেও বেশী ব্যবহার করতে হ'ল না।

দেহবোধহীন পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ দেবমানব বামদেবের কাছে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি সব ঋতুই সমান।

তবু ভক্তের মনরক্ষার্থে গ্রহণ করেন কিন্তু এসবের কোন প্রয়োজন তাঁর নেই।

মাঝে মাঝে আবার শিষ্যভক্তদের দেওয়া গরম পোষাক পাওয়ামাত্র তখনি কাউকে দান করে দেন দাতার সামনেই। দাতা যদি যথার্থ জ্ঞানী হন তবে তা দেখে দুঃখিত হন না। কারণ তিনি জানেন যে স্বয়ং বামদেব যখন তাঁর দেয়া গরম পোষাক গ্রহণ করেছেন তখনি তাঁর যা পুণ্য তা তাঁর হয়ে গেছে। তারপর সেই পোষাক বামদেব ব্যবহার করুন বা না করুন তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। পোষাক ব্যবহারের ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে বামদেবের মর্জির ওপর নির্ভর করে।

এ তো গেল বামদেবের পোষাক পাওয়ামাত্র দান করবার কথা। আবার পোষাক নিয়ে বামদেব আরেক রকম লীলা করেন। সেই লীলা খুবই বিচিত্র। কখনো কখনো শীতের পোষাক পাওয়ামাত্র তা বিন্দুমাত্র গায় না দিয়ে তখনি আগুন লাগিয়ে মূল্যবান গরম পোষাকটি পুড়িয়ে দিলেন। আশেপাশের পাণ্ডা বা লোকজন সেই পশম বস্ত্রের পোড়া গন্ধ পেয়ে ছুটে এসে দেখেন সেই বস্ত্র তখন প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে মায়াতীত বামদেব সহজভাবে বলেন, "বাবা, কাপড়ের হোম করলাম।"

এরপর আর কি উত্তর আছে। যিনি শীতবস্ত্রটি দিয়েছেন তাঁর মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তবে তিনি যদি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হন তবে তাঁর দুঃখের কারণ ঘটে না। কারণ তিনি জানেন যে তাঁর প্রদত্ত শীতবস্ত্র ব্যবহার বামদেব করুন বা না করুন অথবা আগুনে পোড়ান তাতে তাঁর পুণ্যের কিছু হেরফের হবে না।

কিন্তু সকলের মন এতটা উচ্চ অবস্থায় থাকে না। তাই অনেকে দুঃখ পান। তবু বামদেবকে দেন। আর বামদেবও কখনো দাতার প্রকৃতি বুঝে মন বুঝে কখনো কিছুক্ষণ ব্যবহার করেন, কখনো পাওয়ামাত্র দান করেন, আবার কখনো আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে বিচিত্র 'হোম' করেন।

এই ভাবেই প্রতিবছর শীতকালটা বিচিত্র লীলা করে বেড়ান।

একদিন সকাল বেলা তারাপীঠে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। বামদেব তাঁর আশ্রমে বসে তারামায়ের ভাবে বিভোর হয়ে আপন মনে মধুরস্বরে গাইছেন—

"নগর হতে কানন ভাল"......

একটু পরে একজন ভক্ত এলেন একটি গরম চাদর নিয়ে।

ভদ্রলোকটি বললেন, "কর্ত্তাবাবা, এই চাঁদরটা গায়ে দিন। শীত লাগবে না।" এই বলে ভক্তটি শ্রদ্ধার সাথে বামদেবের গায়ে চাঁদরটি জড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বামদেবও সেই চাঁদরটি গায়ে দিয়ে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আরাম করে বসে আছেন। এর পূর্বে তাঁর গায়ে ছিল একটি ছেঁড়া কাঁথা।

এই সময় গ্রামের এক বুড়ো মানুষ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বামদেবের আশ্রমের সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছে।

বামদেবকে চাঁদর গায়ে দিয়ে বসে থাকতে দেখে সেই বৃদ্ধ বললে, "গোঁসাই, বড্ড জাড় (শীত) লাগছে, চাঁদরটা দ্যান কেনে?"

বামদেব তা শুনে চাঁদরটা তাঁর গা থেকে খুলে বৃদ্ধের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, "লিয়ে যা।"

বৃদ্ধ মহানন্দে সেই চাঁদর গায়ে দিয়ে তার বাড়ী ফিরতে লাগলো।

এই সময় বামদেবকে যে ভক্ত লোকটি চাঁদরটি দিয়েছিলেন তিনি দ্বারকানদীর তীরে মূত্রত্যাগ করে রাস্তায় উঠে এসে বৃদ্ধের গায়ে বামদেবকে দেয়া তাঁর চাদরটি দেখতে পেলেন।

লোকটি রেগে গেলেন। ভাবলেন যে ক্ষ্যাপাবাবাকে ভুলিয়ে বৃদ্ধটি এই চাঁদর নিয়ে পালাচ্ছে।

লোকটি রেগে গিয়ে বৃদ্ধাকে চোর বলে গালাগালি দিতে লাগলেন। বৃদ্ধটি গরীব বটে কিন্তু হীন স্বভাবের নয়। সত্যের তেজ তার মধ্যে বিরাজমান। তাই বৃদ্ধ সতেজে প্রতিবাদ করে লোকটিকে বললো, "অকথা বলেন না বাবু। আমি চোর লই। আমি চেয়েছি, গোঁসাই দিয়েছেন বটে গাঁয়ে জোড়িই তবে আমি লিয়েছি।"

তখন উভয়ে ঝগড়া করতে করতে বামদেবের আশ্রমে এল।

লোকটি বামদেবকে বৃদ্ধের বিরুদ্ধে চাদরের অপবাদ দিল। বৃদ্ধও তার প্রতিবাদ করে নিজ বক্তব্য জানালো।

সব শুনে বামদেব ভীষণ রুদ্রমূর্তি ধরে ভক্তলোকটিকে বললেন, "তুঁই দিঁয়ে আমায় শিখিঁই দিলি, আবার অ-কে ধরে লিঁয়ে আলছিস? তুঁই কেনে দিলি? আমি নইলে দিতেম না।"

অর্থাৎ বামদেব ভক্তলোকটিকে যা বললেন তার সারমর্ম এই যে, তুমি আমায় না দিলে আমি দেয়া শিখতুম না। দেয়াটা তুমিই শেখালে। আবার তার জন্য ওকে ধরে নিয়ে এলে? ওর মনে কষ্ট দেবার কোন কারণ নেই। যে নিতে শিখেছে, দিতে শেখেনি, তারই মনের ভাব ছোট হয়।

এই শিক্ষাই বামদেব ভদ্রলোকটিকে দিলেন।

আর দান কাকে বলে তা-ও বামদেব এর মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিলেন।

যে দেবে সে নিষ্কাম ভাবে ও নিঃস্বার্থ ভাবেই দেবে। যাকে সে যা দিল তা নিয়ে সে লোক কি করবে তা তার দেখবার কথা নয়। দেখতে যাওয়াটাও অন্যায়। যে দেখে তার দান যথার্থ দান নয়। সেই দানের কোন ফলও হয় না।

উপরোক্ত মনোরম কাহিনীটি বামদেবের অশেষ কৃপাধন্য হুগলী জেলার তেলীখানা শ্মশান নিবাসী মহাসিদ্ধসাধক ভৈরব দাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত লেখককে ১৯৭৩ সালের ৫ই অক্টোবর তাঁর নিজ আশ্রমে বসে বলেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীবাম করুণাধন্য অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গভীর রাত। চব্বিশ পরগণার প্রাচীন কুমারহট্ট গ্রাম (বর্তমান নাম হালিশহর)। সেই গ্রামের এক তাপস নিজ সাধন গৃহে গভীর ধ্যানে মগ্ন। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। ছোটবেলা থেকেই শিবের উপাসক এই তাপস। শিব অন্তপ্রাণ। কিন্তু কোন পথে গেলে নিজ ইষ্টের দর্শন পাবে? কে বলে দেবে সেই পথের সন্ধান! একটি পথ তো চাই। তার সাথে পথের পাথেয় স্বরূপ মন্ত্র।

সেই মন্ত্রদাতা গুরুর সন্ধানে এই তাপস বহু স্থান ঘুরেছে কিন্তু মনের মত সদ্‌গুরু পাওয়া যায়নি। অবশেষে হতাশ হয়ে শিবের শরণ নিয়েছে তাপস। তাঁকে পাবার জন্য তাঁকেই বলে দিতে হবে গুরুর সন্ধান। দায় তো ইষ্টের, সাধকের নয়। যেমন দায় গুরুর, শিষ্যের নয়। শিষ্যের কাজ কায়মনবাক্যে সন্ধান নেয়া আর গুরুর কাজ সন্ধান দেয়া। আর ইষ্টের কাজ এই গুরু শিষ্যের দেয়া নেয়ার মিলন ঘটানো এবং নিজের দিকে সাধক শিষ্যকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করে নিজ স্বরূপ দর্শন করানো এবং মন্ত্রগুরু ইষ্টের সমন্বয় করা।

তাই যে মুমুক্ষু সাধক তাঁর ইষ্ট শিবের শরণাগত হয়েছে, তাঁর দায় তো স্বয়ং দেবাদিদেব শিবের।

এক সময় তাপস অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ধ্যান ভগ্ন হ'ল। রাতের তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে চতুর্থ প্রহর শুরু হ'ল। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে যুবক অতুলকৃষ্ণ বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। একটু পরেই নিদ্রায় অভিভূত হ'ল।

সহসা স্বপ্নের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ দেখলেন দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ। প্রসন্ন প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, "বৎস, তুমি গুরুর জন্য ব্যাকুল হয়েছ। তোমার গুরু স্বয়ং তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা।

তুমি তাঁর শরণ নাও। অচিরে তোমার অভীষ্ট লাভ হবে।" মুহূর্তে মিলিয়ে গেল মহাদেবের দিব্য চিন্ময় দেহ। মহাদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে এক স্বর্গীয় আনন্দে আবেশে বিভোর হ'ল অতুলকৃষ্ণ। সাথে সাথে ঘুম ভেঙ্গে গেল কিন্তু তখনও মহাভাগ্যবান অতুলকৃষ্ণের নয়নে ভাসছে দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্য কান্তি আর তাঁর স্বর্গীয় সুধাভরা কন্ঠস্বর। এই দিব্য দর্শনে ও দিব্য বাণী শ্রবণে, মহাভাগ্যবান অতুলকৃষ্ণের সমগ্র দেহমন রোমাঞ্চিত।

জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো ব্রাহ্মমুহূর্ত সমাগত। আকাশে বাতাসে এই পরম শুভক্ষণের প্রস্তুতি চলছে।

আনন্দে অশ্রুতে বিগলিত হয়ে অতুলকৃষ্ণ এই মাহেন্দ্রক্ষণে শিবের স্তব করতে লাগলো প্রাণ ভরে। তার সারা দেহে তখনও সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট।

একটু পরে ভোর হ'ল। অতুলকৃষ্ণের মনে হ'ল এই নতুন দিনটির মত তারও যেন নব জন্ম হ'ল।

স্বয়ং ইষ্ট এসে গুরুর সন্ধান দিয়ে গেলেন। অধ্যাত্ম পথে এতো যথার্থ নবজন্ম লাভ। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বর দর্শন লাভ করা। তবেই চুরাশী লক্ষ পশু জন্মের পর এই দুর্লভ মনুষ্য দেহের যথার্থ সার্থকতা লাভ হয়।

আজ তাঁর মনুষ্য দেহের চরম সার্থকতা লাভ হ'ল। স্বয়ং ইষ্টদেব মহাদেব এসে তাঁকে দর্শন দিলেন, কথা বললেন।

সাধারণত গুরু শিষ্যকে তার ইষ্টের দর্শনের জন্য মন্ত্র দেন এবং ইষ্ট পথের সন্ধান দেন। প্রয়োজন হলে সদ্‌গুরু একহাতে ইষ্ট অন্যহাতে শিষ্যকে ধরে উভয়ের মিলন করান। গুরু যে ইষ্টেরই এক রূপ। যেমন মন্ত্রও ইষ্টের এক রূপ। তাই মন্ত্রশক্তি ও গুরুশক্তি দুই-ই মূলত ইষ্টের শক্তি।

সুতরাং মন্ত্র গুরু ইষ্ট সেই একেরই তিন রূপ। মূলত এক ও অভিন্ন।

যাহোক, ভোর হতেই অতুলকৃষ্ণ তারাপীঠের সন্ধান করতে লাগলো।

তারপর যথা সময়ে হালিশহর থেকে কলকাতায় এসে হাওড়া ষ্টেশন থেকে ট্রেন ধরলো। পরদিন ভোরে রামপুরহাট ষ্টেশনে নেমে পদব্রজে তারাপীঠ রওনা হ'ল।

আনুমানিক ১৩১২ সালের মধু বসন্তকাল। বসন্তের স্নিগ্ধ প্রসন্ন সকালের আলো তারাপীঠের আকাশ বাতাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

বামদেব তাঁর শিষ্য ভক্ত পরিবৃত হয়ে আশ্রমে বসে আছেন। এই সময় অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর আশ্রমে এসে তাঁর চরণ কমলে পতিত হ'ন।

সর্বজ্ঞ বাম সবই বুঝতে পারলেন। তবু স্বভাবসুলভ ভাবে প্রশ্ন করলেন, "কে বাবা তুমি? কোথা থেকে আসছো?— কি চাও?"

তখন আনন্দ অশ্রু ফেলতে ফেলতে যুবক অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সবকথা বামদেবকে বললো। উপস্থিত শিষ্যভক্তগণও এই দুর্লভ-কাহিনী শুনে বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন।

স্বয়ং শিবের নির্দেশে যে মহাভাগ্যবান মহাপীঠ তারাপীঠে শিবস্বরূপ বামাক্ষ্যাপার কাছে এসেছে তাঁর স্থান তো বামদেবের কাছে স্বভাবতই হবে। তাই হ'ল। বামদেব আশ্রয় দিলেন অতুলকৃষ্ণকে।

যথাসময়ে বামদেব মহাভাগ্যবান অতুলকৃষ্ণকে কৃপা করলেন। এক মহানিশায় মহামন্ত্র দিলেন প্রিয় শিষ্য অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে। তারপর কিছুদিন তাঁর দুর্লভ সঙ্গ দিয়ে নবীন শিষ্য অতুলকৃষ্ণকে সাধন পথে এগিয়ে দিলেন। শিবাবতার বামদেবের দিব্য সান্নিধ্য, নিগূঢ় নির্দেশ ও অফুরন্ত কৃপা লাভ করে সর্বতোভাবে ধন্য হ'ল অতুলকৃষ্ণ।

অতিদ্রুত সাধনার চরম পথে এগিয়ে চললো। যথাসময়ে ইষ্ট-দর্শন করে হ'ল আপ্তকাম।

পরবর্তীকালে এই মহাভাগ্যবান শিষ্য শ্রীগুরু বামদেবের বহু অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হ'ন।

আমৃত্যু তাঁর হৃদয় মন্দিরে সেই সকল দিব্য স্মৃতি চিরজাগ্রত থাকে। বামমণ্ডলের অন্যতম সিদ্ধ সাধকরূপে অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চিরচিহ্নিত হয়ে রইলেন।

—o—

শ্রীবামের বিচিত্র লীলা

বাংলা ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ। মধ্যাহ্নকাল। প্রচণ্ড উত্তাপে যেন চারদিক ঝলসে যাচ্ছে। সূর্য্যদেব যেন চারদিকে আগুন ছড়াচ্ছেন অফুরন্ত ভাবে। এই প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে বামদেব দ্বারকার তীরে বালির ওপর একটি উত্তপ্ত ইট পেতে তার ওপর বসে আছেন নির্বিকার ভাবে। মাথার ওপরেও একটি প্রচণ্ড উত্তপ্ত ইট চাপিয়েছেন। মধ্যাহ্নের সূর্য যথারীতি অগ্নিবর্ষী। এই সময় তারাপীঠের অদূরে কড়কড়িয়া গ্রাম থেকে রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁর ছেলে নৃসিংহ মুরারী মণ্ডলকে নিয়ে বামদেবকে দর্শন করতে এলেন।

এই ভয়ঙ্কর গরমের মধ্যে মহাযোগী বামাক্ষ্যাপাকে এভাবে ভীষণ রোদের মধ্যে বসে থাকতে দেখে তিনি অবাক হয়ে এর কারণ বামদেবকে জিজ্ঞেস করলেন।

বামদেব উত্তরে বললেন, "অট্টলিকা ভোগ করছি বাবা। অট্টালিকা ভোগ করা বড় কষ্ট বাবা। মাথায় লাগে, পাছায়ও লাগে।" বামদেবের এই বিচিত্র উত্তর শুনে সরল ভক্ত রাজেন মণ্ডল চুপ করে রইলেন।

আসলে বামদেব এই ভোগের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে সংসার ভোগ মানেই দুর্ভোগ। মায়াই ভোগ করায়।

ভোগের প্রতি আসক্তিই সকল দুর্ভোগ ও রোগশোকের কারণ। তপ্ত ইটের মতই এই মায়া কঠিন ভোগের দ্বারা জীবের সকল আনন্দকে শান্তিকে শুষে নিয়ে তাঁকে কীটে রূপান্তরিত করে। এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি করেছেন একাধারে ব্রহ্মবিদ ও মহাকবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। "ইটের পরে ইট তার ভেতর মানুষ কীট।"......

আর একদিন, একজন ধনবানলোক এলেন বামদেবের দর্শনের

জন্য। তার সাথে একটি পাইকও রয়েছে। ধনী লোকটির মুখে দাড়ি রয়েছে। বামদেবকে প্রণাম করে লোকটি বামদেবের সামনে বসলেন। পাইকটি বামদেবের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ বামদেব লোকটির দাড়ি ধরে টেনে বললেন, "মুখে অনেক খাস!" পাইকটি বামদেবকে তার মালিকের দাড়ি টানতে দেখে রেগে গিয়ে বামদেবের পিঠে ধাক্কা দিল। পাইকটি নিতান্ত মূর্খ ও ভদ্রতা জ্ঞান বিবর্জিত। সে ভাবলো না যে তার মালিক যাকে প্রণাম করছে সেই মহা শ্রদ্ধেয় পুরুষকে তার ধাক্কা দেয়া সাজে না। বামদেব কিন্তু হাসি মুখে এই নিতান্ত অশিক্ষিত ও কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত পাইকটিকে ক্ষমা করে শান্তভাবে পাইককে বললেন, "আজ তুমি আমায় দিব্যজ্ঞান দিলে।"

পাইকের মালিক তার চাকরের এই হঠকারিতা দেখে তাকে তিরস্কার করে তখনি পাইককে বিদায় দিয়ে অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে বামদেবের চরণ কমলে ক্ষমা চাইলেন।

চিরক্ষমাশীল করুণাময় বামদেব তখনি ক্ষমা করলেন। একটু পরে বামদেবের জনৈক ভক্ত এলে সেই ধনী লোকটিও বিদায় নিলেন। সেই ভক্তকে বামদেব বললেন, "আজ একজন আমায় দিব্যজ্ঞান দিয়ে গেল।"

নৃসিংহ মুরারী মণ্ডল এই কাহিনীটি যথাসময়ে জানতে পারেন। বামদেবের এই বিচিত্র লীলা শ্রবণ করে তিনি বিস্মিত হলেন।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্যা কবিচন্দ্রপুরের জটামা

তারাপীঠ মহাশ্মশানের পশ্চিমে দ্বারকানদী উত্তর মুখে সদা প্রবাহমানা। দ্বারকানদীর পশ্চিমে কবিচন্দ্রপুর। দ্বারকা পার হলেই অর্থাৎ তারাপীঠ মহাশ্মশানের ঠিক উল্টো দিকেই কবিচন্দ্রপুরের ঘাট। সেই ঘাটে উঠেই একটি উঁচু ঢিপি। সেই উঁচু ঢিপির উপর একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। সেই ঘরে বাস করেন এক উন্নত সাধিকা। তাঁর নাম জটামা। মাতৃসাধিকা জটামাকে শ্রীবাম যথেষ্ট স্নেহ করেন।

তাঁর উন্নত আধারে শ্রীবাম কৃপা একাধিকবার অধ্যাত্ম সাধন-শক্তি দান করে তাঁর সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করেন।

এই অন্তর্মুখীন সাধিকা আপন মনে জপ ধ্যানে সদা মগ্ন থাকেন; মাঝে মাঝে দ্বারকানদী পার হয়ে তারামাকে দর্শন করেন এবং বামদেবকে দর্শন করে তাঁর কৃপা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন; কৃপাময় শ্রীবাম প্রসন্ন মনে এই উন্নত সাধিকাকে আশীর্বাদ করেন; মাঝে মাঝে কিছু নিগূঢ় সাধন উপদেশও দেন।

জটামা জাতিতে শূদ্রাণী ছিলেন। সাধারণ লোক তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি জাতিতে শুঁড়ির মেয়ে বলে অনেকে তাঁকে অবজ্ঞাও করে। কিন্তু এসব মান অপমান জটামা গ্রাহ্য করেন না। তিনি আপন মনে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থাকেন।

অবশেষে তারামা ও বামদেবের কৃপায় তিনি হন আপ্তকাম। ইষ্ট দর্শন ও কৃপা লাভ করে তিনি তাঁর দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক করেন। তাঁর সাধন পথে বামদেবের কৃপা, শক্তিদান ও নিগূঢ় নির্দেশের জন্য আমৃত্যু তিনি তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব বামদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

জটামা দীর্ঘকায় ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। জটামা তারাপীঠ মহাশ্মশানে তাঁর সাধনার পূর্ণতা লাভ করলেও স্থানীয় জনগণ তাঁকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ হন। শুঁড়ির মেয়ে ছিলেন বলে জীবন সায়াহ্নে কবিচন্দ্রপুরের সেই উঁচু ঢিপির ঘরটাতে থাকতে পারলেন না। সামান্য কারণে তাঁকে সেই ঘরে থাকা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

তবু এই সাধিকা সহজ ভাবেই তা মেনে নেন। মাঝে মাঝে তারাপুর, সা-পুর প্রভৃতিস্থানে তাঁকে দেখা যেত মাধুকরী করতে।

কবিচন্দ্রপুর নিবাসী হরিদত্ত জটামার অন্যতম ভক্ত। তিনি সাধ্যমত জটামার সেবাযত্ন করেন।

পরিণত বয়সে এই শ্রীবামকৃপা ধন্যা সিদ্ধ সাধিকা জটামা তাঁর স্থূল দেহত্যাগ করে নিজ ইষ্টের সাথে মিলিত হন।

বামদেব আরেক জন সিদ্ধ সাধিকাকেও অশেষ কৃপা করেছিলেন। তাঁর নামও জটামা। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন। তিনি বামদেবপুর নিবাসিনী ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর কথা বর্ণিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২য় খণ্ড)। উপরোক্ত কাহিনীর জন্য শ্রীশ্রীবামদেবের অশেষ কৃপাধন্য তারামায়ের ভক্ত তারাপুর নিবাসী শ্রীগৌর প্রামাণিকের কাছে লেখক বিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৯৭২ সালের ১৯শে জানুয়ারী (বাংলা ৪ঠা মাঘ, ১৩৭৮) তিনি তারাপীঠে লেখককে উপরোক্ত কাহিনী বলেন। তিনি আরো বহু কাহিনী লেখককে বলেছেন। যথা সময়ে তা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

—০—

ভক্তপ্রবর শ্রীমাখন চক্রবর্তী

করুণাময় বামদেব তাঁর শিষ্যভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছেন ; এই সময় বর্দ্ধমান থেকে এক সাধননিষ্ঠ ভক্ত এলেন শ্রীবামের কাছে।

এই ভক্তপ্রবরের নাম শ্রীমাখন চক্রবর্তী। শ্রীবামকে দর্শন করে আনন্দে বিগলিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সর্বজ্ঞ বামদেব পলকে উপলব্ধি করলেন যে এই ভক্তটি তাঁর চিহ্নিত শিষ্য। তারামার কৃপাধন্য এই চিহ্নিত সন্তানকে তাঁর দিতে হবে তারামন্ত্র।

শ্রীবাম সানন্দে সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁর চিহ্নিত শিষ্যকে।

ধীরে ধীরে নানা প্রস্তুতি ও জপ ধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁকে গড়ে তুললেন মহামন্ত্র পাবার উপযুক্ত অধিকারী রূপে।

যথা সময়ে এক মহানিশায় মহাশ্মশানে বামদেব প্রিয় সন্তান মাখন চক্রবর্তীকে তারামন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

এই মহাপীঠের মহাশ্মশানে মহানিশায় মহালগ্নে মহাদেব স্বরূপ বামদেবের কাছ থেকে মহামন্ত্র তারামন্ত্র লাভ করে মহাভাগ্যবান মাখন চক্রবর্তী মানবজীবন সার্থক করে মহানন্দে আপ্লুত হলেন ; মন্ত্র পাবার সাথে সাথে নব দীক্ষিত শিষ্য গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন তাঁর সর্বসত্তায় গুরুদত্ত তারাবীজের অমোঘ শক্তি।

কিছুদিন প্রিয়তম শিব স্বরূপ গুরু বামদেবের নিবিড় দিব্য সান্নিধ্যে থেকে তারা সাধনার নিগূঢ় ক্রিয়াকর্ম আয়ত্ত করে মহাসৌভাগ্যবান শিষ্য মাখন চক্রবর্তী নিজগৃহে ফিরে গেলেন।

মাঝে মাঝে বর্ধমান থেকে ছুটে আসেন ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার রাতুল চরণে। তারপর কিছুদিন শ্রীগুরু বামের

অধ্যাত্ম উপদেশ ও দিব্য সঙ্গলাভ করে পরিপূর্ণ তৃপ্ত হৃদয়ে আবার ফিরে যান নিজ গৃহে।

অবশেষে যথা সময়ে ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামের অশেষ কৃপায় এক মহালগ্নে এই মাতৃসাধক হলেন আপ্তকাম।

উত্তরকালে বামমণ্ডলের অন্যতম বিশিষ্ট সাধক শিষ্যরূপে তিনি সুচিহ্নিত হলেন। ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার অপার কৃপা লাভ করে পরিণত বয়সে এই মহাসৌভাগ্যবান সিদ্ধসাধক স্থূলদেহ ত্যাগ করে বামমণ্ডলে গমন করেন।

—০—

ভাগ্যবান রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"কোথা থেকে আসছো বাবা?"

সর্বজ্ঞ বামদেব এই বিচিত্র প্রশ্ন করলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে এসে তাঁর চরণে পতিত এক ভক্তকে। ভক্তটির নাম রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিবাস হুগলী জেলার চন্দননগরে।

সাধন পথে গুরুলাভ করবার জন্য বিষয় বিরক্ত এই নবীন যুবক পরিব্রাজনায় বের হ'ন। বহুস্থান পরিভ্রমণ করলেন। বহু সাধুসন্তও দর্শন করলেন। কিন্তু মনের মত গুরু কোথাও খুঁজে পেলেন না। তবু হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন না। আবার ঘুরতে লাগলেন পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে। জগত জননী তারামা'র বিচিত্র লীলা।

তাঁরামায়ের অদৃশ্য আকর্ষণে ঘুরতে ঘুরতে তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন রামকুমার।

শিবস্বরূপ বামদেবকে দর্শন করামাত্র তাঁর সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হল'। অন্তরের অন্তস্থল থেকে কে যেন বললেন, "ওরে, যাঁকে তুই এত কাল ধরে খুঁজছিস, চেয়ে দ্যাখ্ তোর সামনে সেই গুরু দিব্যাসনে বসে আছেন।" প্রাণের আবেগে লুটিয়ে পড়লেন বামদেবের চরণে।

সর্বজ্ঞ বামদেব সবই বুঝতে পারলেন। তাঁর চিহ্নিত শিষ্যকেই তারামা তাঁর কাছে নিয়ে এসেছেন। এ তো পূর্ব নির্দিষ্ট সব। এ তো হতেই হবে।

তাই "যে তাঁর সে তাঁর।
যুগে যুগে অবতার॥"

এই ঋষি বাক্য শাস্ত্রবাক্য তো মিথ্যে হবার নয়। এ তো চন্দ্র-সূর্য্যের মতই চির শাশ্বত চিরন্তন।

জগতে যখনি কোন অবতার আবির্ভূত হন জগত প্রয়োজনে জগত কল্যাণে, তখন তাঁর অন্তরঙ্গ লীলা পরিবারগণও তাঁর সাথে আসেন। লীলার আস্বাদের জন্য, লীলার প্রয়োজনের জন্য, এবং লীলার প্রচারের জন্য।

যতবার অবতার জগতে আসেন ততবার তাঁর লীলা পার্ষদগণও আসেন। এটা বিধি নির্দিষ্ট। এই দৈবী লীলা, এই ঐশী লীলা জগতে চিরকাল হয়ে আসছে এবং আসবে।

জগতে প্রতি যুগে প্রতি অবতার, অংশবতার, অবতার কল্প সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। এমন কি সিদ্ধ মহাপুরুষ ও মহাসাধক মহাসাধিকাদের সম্পর্কেও তা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

এঁদের কারোর লীলাপরিকরগণ তথা শিষ্য ভক্তগণ কখনো অপরের লীলাপরিকর তথা শিষ্যভক্ত হ'ন না।

প্রতিবারেই যাঁর যাঁর তাঁর তাঁরই থাকেন। একজনের শিষ্য-ভক্ত অপরের শিষ্যভক্ত হ'ন না এবং হবেন না। এটাই ঐশী নিয়ম।

তাই জগতের সকল অবতার থেকে সিদ্ধ মহাসাধক মহাসাধিকা পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রে সর্বযুগে সর্বসময়ে সর্বক্ষেত্রে এই আপ্তবাক্য সর্বতোভাবে প্রযোজ্য

তাই শিবাবতার বামদেবের সকল লীলাপার্ষদগণ তথা অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্তগণ তাঁর কাছেই এসেছেন আসছেন ও আসবেন এটাই স্বাভাবিক। ইতি পুর্বে বামদেব জগত কল্যাণে যতবারই মর্তলীলায় এসেছেন ততবার তাঁরাও এসেছেন। এবারও আসছেন এবং ভবিষ্যতেও আসবেন।

মাঝে মাঝে এই ব্যাপারে লীলা বৈচিত্র্যও দেখা যায়। প্রারব্ধ-বশতঃ কোন অবতার বা মহাপুরুষের শিষ্য কখনো কখনো অপর মহাপুরুষের কাছে চলে যান অধ্যাত্ম আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু সত্যদ্রষ্টা অবতার এবং মহাপুরুষগণ সর্বজ্ঞ। তাঁরা সবই জানেন। তাই নিজে মন্ত্র না দিয়ে সেই লোক যাঁর চিহ্নিত শিষ্য সেই পুর্ব নিদিষ্ট গুরুর কাছেই তাঁকে পাঠিয়ে দেন। কারণ মন্ত্র গুরু ইষ্ট এই তিনের সাথে সম্বন্ধ জন্ম জন্মান্তরের। তাই যুগে যুগে শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বামদেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীরামঠাকুর, রামদাস কাঠিয়াবাবা, প্রভৃতি সবাই এভাবে যাঁর জিনিষ তাঁর কাছেই তাঁর শিষ্যকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অধ্যাত্ম জগতে এমন মধুর লীলাবৈচিত্র্য প্রায়ই ঘটে। এ যেন কঠোর তপস্যার মাঝে সাময়িক মধুর বিরাম। মধুর হাস্য পরিহাস; এ যেন, এক বাড়ীর ছেলে ভুল করে আরেক বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে নিজের বাড়ী মনে করে। তখন সেই বাড়ীর মালিক সেই ছেলেকে আবার তার বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

যা হোক, মহাযোগী বামদেব তাঁর চিহ্নিত শিষ্যকে আশ্রয় দিলেন। রামকুমার জানালেন তাঁর সব কথা। রামকুমারের ব্যাকুলতা আর্তি ও একনিষ্ঠা দেখে শ্রীগুরুবাম প্রসন্ন হলেন।

যথাসময়ে শিমুলতলায় নিয়ে গিয়ে রামকুমারকে দিলেন দুর্লভ বীজমন্ত্র।

অতি দুর্লভ তারাবিদ্যার অধিকারী হলেন বীরশিষ্য রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিছুদিন তিনি শ্রীগুরু বামের দিব্য সঙ্গলাভ করলেন।

তারপর সদ্‌গুরু শ্রীবামের নির্দেশে তিনি চন্দননগরে ফিরে গেলেন। সেখানে গুরু নির্দিষ্ট পথে সাধনা করতে লাগলেন নিভৃতে।

মাঝে মাঝে সাধনার প্রয়োজনে তারাপীঠে শ্রীগুরু বামদেবের কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন। বামদেব তাঁর উপযুক্ত উন্নত আধারে ঢেলে দেন তাঁর কৃপা বারি।

উত্তরকালে তিনি শ্রীগুরুর কৃপায় ইষ্টদর্শন করে মানবজীবন সার্থক করলেন।

তিনি শ্রীগুরু বামদেবের বহু অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হন।

শ্রীবামকৃপাধন্য এই শক্তিধর উন্নত শিষ্য পরবর্তীকালে বহু অলৌকিক যোগবিভূতি লাভ করেন। যথাসময়ে বামমণ্ডলে তিনি চিহ্নিত হন একজন উন্নত সিদ্ধ সাধকরূপে।

শ্রীবামের অন্যতম লীলাপরিকর রূপেও উত্তরকালে তিনি সুচিহ্নিত হন। শ্রীবামের সকল শিষ্য ভক্তই শ্রীবামের অন্তরঙ্গ লীলাপরিকর হ'বার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন নি। অন্তরঙ্গ লীলা পরিকর তাঁরাই যাঁরা প্রায় সর্বক্ষণ শ্রীগুরু বামের দিব্যসঙ্গ, অফুরন্ত দিব্যভাব ও অজস্র লীলা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করেছেন।

এই অন্তরঙ্গলীলা পরিকরগণও এক একজন মহাপুরুষ। সকল যুগে সকল অবতার, অবতারকল্প, অংশাবতার প্রভৃতি দেব মানবদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। এঁদের সংখ্যাও সকল যুগে সকল ক্ষেত্রে খুবই কম। যাহোক, যথা সময়ে ইষ্ট গুরুতে মনকে লীন করে মরদেহ ত্যাগ করে বীর সাধক রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিত্যধাম দিব্যধাম অমৃতধাম তারালোকে অধিষ্ঠিত হলেন।

—০—

শ্রীবাম করুণাধন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং

বাংলা ১৩১৩ সালের এক স্নিগ্ধ সকাল। বামদেব তাঁর আশ্রমে বসে আছেন। কয়েকজন শিষ্যভক্ত ও সেবক পাণ্ডা উপস্থিত রয়েছেন। সহসা বামদেব নগেন পাণ্ডাকে বললেন, "দেখুন তো বাবা নগেন কাকা, ভাল বিলেতি মদ, মিষ্টি ফলের গন্ধ নাকে লাগে কেন ?'

নগেন পাণ্ডা তা শুনে তাঁর ভাইপো ভূপতি পাণ্ডাকে খোঁজ করতে পাঠালেন। ভূপতি পাণ্ডা তারাপীঠের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত খুঁজে এলেন কিন্তু কাউকে উপরোক্ত জিনিষ সহ আসতে দেখলেন না।

দুপুরবেলা দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং সদলবলে তারামা ও বামদেবকে দর্শন করতে এলেন। মন্দির দর্শনের পর নগেন পাণ্ডার সাথে বামদেবকে দর্শন করতে এলেন সদলবলে।

কিন্তু বামদেব আশ্রমে নেই। মহারাজা ও তাঁর পরিষদবর্গের রাজকীয় বেশবাস দেখে বামদেব মহাশ্মশানের এক নির্দিষ্ট গোপন স্থানে লুকিয়ে রইলেন।

ইতিপূর্বে জনৈক দারোগা এবং এক জজসাহেবকে দেখেও তিনি এভাবে লুকিয়ে ছিলেন।

এদের যেন বামদেব ঠিক মেনে নিতে পারেন না। আসলে তিনি ক্ষণিক নশ্বর ঐশ্বর্য্য ও ভোগের পূজারীদের পছন্দ করেন না।

যাহোক, নগেন পাণ্ডা জানেন বামদেব কোথায় লুকিয়ে আছেন। সেখানে গিয়ে তিনি বামদেবকে জানালেন যে এরা (মহারাজা ও তাঁর পারিষদবর্গ) তারামা ও বামদেবের ভক্ত সন্তান। বামদেবের দর্শনের জন্য এসেছেন। বামদেবের বালক ভাব। সরল মনে তাই বিশ্বাস করে নগেন পাণ্ডার সাথে আশ্রমে ফিরে আসতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নগেন পাণ্ডার কথামত মহারাজা কামেশ্বর সিং ও তাঁর অনুচরগণ রাজকীয় বেশ ছেড়ে সাধারণ পোশাকে আশ্রমের দাওয়ায় বামদেবের আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বামদেব আশ্রমে এলেন নগেন পাণ্ডার সাথে। মহারাজা ও তাঁর অমাত্যবর্গ বামদেবকে প্রণাম করলেন। মহারাজা বামদেবের চরণে রাখলেন বিলেতি কারণ, ফল মিষ্টি প্রভৃতি। তারপর মহারাজা জানালেন তাঁর গভীর সমস্যার কথা।

তাঁর বড়ভাই মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকার লক্ষ্মীশ্বরের পুত্র রমেশ্বর সিংকে রাজা বলে স্বীকার না করে তাঁকেই দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু তাঁর পরলোকগত বড়ভাই লক্ষ্মীশ্বরের বিধবা পত্নী তাঁকে মহারাজা রূপে স্বীকার করেননি। দেবরের পরিবর্তে নিজেই সব অধিকার নিতে চান নাবালক পুত্রের রাজমাতা রূপে। এর ফলে বিরাট মামলা শুরু হয়েছে কামেশ্বর সিং ও তাঁর বিধবা বৌদির সাথে। এই মামলায় কামেশ্বর সিং হেরে গেলে তাঁর মান সম্মান অর্থ খ্যাতি সব হারাবেন। তাছাড়া কামেশ্বর সিং আরো জানালেন যে, তাঁর মনে ভীষণ দুঃখ যে তাঁর কোন পুত্র নেই। অপুত্রক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর বংশ লোপ পাবে এবং তাঁর রাজ্যের উত্তরাধীকারীও থাকবে না।

বামদেব সব শুনলেন শান্ত ভাবে। কি মনে করে মহারাজার দেয়া মদের বোতলগুলো থেকে একটি বোতল খুলে কারণ ঢাললেন তাঁর মহাপাত্রে এবং কিছু খাবারসহ তা সামনে দাঁড়ানো তাঁর প্রিয় কালু কুকুরকে খেতে ইঙ্গিত করলেন। 'কালু' উঠে এল কিন্তু 'কারণ' ও খাদ্য একটু শুঁকেই ফিরে গেল না খেয়ে।

ফলে মুহূর্তে বামদেব উগ্র হয়ে উঠলেন। নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রোষকষায়িত নেত্রে বলে উঠলেন, "কুকুরেও ছোঁয় না, সে বদকুবিদে জিনিষ কে খায়রে, কে খায়?" এই বলে বামদেব চলে গেলেন সেখান থেকে।

মহারাজা কামেশ্বর সিং ও তাঁর অমাত্যবর্গ লজ্জায়, ভয়ে, অনুশোচনায় এবং আশাহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এই

অবস্থা দেখে নগেন পাণ্ডা ও অন্যান্য পাণ্ডাগণ মহারাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতে বললেন।

তারপর নগেন পাণ্ডা অনেক বলে অনেক অনুরোধ করে বামদেবকে ফিরিয়ে আনলেন।

তখন বামদেব মহারাজা কামেশ্বর সিংকে বললেন, "তারামা'র পূজাভোগ, ব্রাহ্মণ কুমারী ভোজন এবং শ্মশানে একলক্ষ কর্পূর যাগ করানো হোক, তাহলে তারামা দয়া করতে পারেন।"

মহারাজা ক্রিয়াকর্মে অভিলাসী। পাণ্ডারাও তা সমর্থন করলেন। যথাসময়ে যজ্ঞানুষ্ঠান, চণ্ডীপাঠ, দানধ্যান, কুমারীভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হ'ল।

বামদেবের কৃপালাভ করলেন মহারাজা। বামদেবের নির্দেশে মহারাজা কামেশ্বর সিং মহাশ্মশানে শিমুলতলায় বশিষ্ঠের আসনে বসে জপ শুরু করলেন। যাতে নিভৃতে জপ করতে পারেন সেজন্য শিমুলতলা কানাৎ দিয়ে ঘিরে দেয়া হ'ল। এর ফলে সাধারণ যাত্রী ও ভক্তবৃন্দের অসুবিধা হতে লাগলো। কিন্তু মহারাজার রাজকীয় ব্যাপার বলে কেউ কিছু বলতে সাহস পেল না। এই সময় বামদেবের প্রধান শিষ্য মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা মুর্শিদাবাদের জুড়ানপুর থেকে তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন।

বীরাচারী এই তেজদীপ্ত সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপা শিমুলতলা মহারাজার জন্য ঘেরা রয়েছে দেখে মহাতেজে জ্বলে উঠলেন। পশুরামের ন্যায় তাঁর হাতে সবদা এক কুঠার থাকে। সেই কুঠার নিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে মহারাজাকে আদেশ করলেন, "শিমুলতলা তোমার দ্বারভাঙ্গার গদি নয়, এই পরম পবিত্র স্থানে সকল সাধকের সমান অধিকার। কানাৎ ওঠাও।"

তারাক্ষ্যাপার মহাউগ্র মূর্তি দেখে মহারাজা সভয়ে কানাৎ উঠিয়ে নিলেন। মহারাজা জপ শেষ করবার পর সথাসময়ে বামদেব মহারাজাকে কৃপা করে বললেন যে তাঁর বিপদ কেটে যাবে। তিনি রাজ্যলাভ করবেন।

তাছাড়া কৃপাময় বামদেব মহারাজাকে আশির্বাদ করলেন যে তাঁর বংশ রক্ষাও হবে। তিনি পুত্রলাভ করবেন। দু'টি পুত্র হবে তাঁর।

মহারাজা সানন্দে বামদেবকে প্রণাম করলেন। তাঁর দু'টো বাসনাই বামদেব পূর্ণ করলেন। শিবাবতার বামদেব যে কল্পতরু তা মহারাজা উপলব্ধি করতে পারলেন।

মহারাজ বামদেবের সেবার জন্য প্রতিমাসে চল্লিশ টাকা করে প্রণামী দেবেন বলে স্বীকার করে সদলবলে তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে দ্বারভাঙ্গায় ফিরে গেলেন।

কিছুদিনের মধ্যে মহারাজার বিপদ কেটে গেল। তিনি মামলায় জয়লাভ করে রাজ্য লাভ করলেন। যথাকালে তিনি দু'টি পুত্রলাভ করেন।

উত্তরকালে তন্ত্রসাধনায় বিশেষ উৎসাহী ভাগ্যবান মহারাজা কামেশ্বর সিং পুনরায় তারাপীঠে আসেন এবং বামদেবের কাছে মহাশ্মশানে অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য অভিচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ও তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় ক্রিয়া সাধনের জন্য প্রার্থনা করলেন।

বামদেব তা শুনে স্নেহভরে বললেন, "তুমি তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে কুমারখালিতে যাও। তিনি শক্তিমান, তান্ত্রিক, নিগূঢ় অনুষ্ঠানেও দক্ষ। তাঁর কৃপা পেলে সিদ্ধ হবে তোমার আকাঙ্খা।"

বামদেবের কথা শুনে কামেশ্বর সিং কুমারখালিতে গেলেন সিদ্ধ তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার স্নেহধন্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব কামেশ্বর সিংয়ের কাছে বামাক্ষ্যাপার নির্দেশ শুনে রাজী হলেন।

অচিরেই শিবচন্দ্রের কৃপায় কামেশ্বর সিং তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হলেন শিবচন্দ্রের তন্ত্রোক্ত নির্দেশ অনুসারে। শিবচন্দ্রের সাধন শক্তির পরিচয় পেয়ে মহারাজ আনন্দিত হলেন। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রের নিগূঢ় ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হলেন তন্ত্রসাধক কামেশ্বর সিং। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের জীবন কাহিনী বিশাল বৈচিত্র্যময়

(দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড)। তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উডরফ।

যাহোক, কুমারখালি ও দেওঘরে শিবচন্দ্রের সাথে একাধিক তন্ত্রোক্ত সাধন ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে মহারাজা তন্ত্রধর্ম ও তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

তন্ত্রসাধক মহারাজা কামেশ্বর সিং এসবই তারাপীঠের সাক্ষাত শিব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অপার কৃপা বলে উপলব্ধি করতে পারলেন।

বামদেবের অশেষ কৃপাধন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও সাধক প্রবর কামেশ্বর সিং যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন তা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কুল। যা ব্রাহ্মণ কুলে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে স্বীকৃত। এই ধর্মপ্রাণ রাজবংশ বহুকাল ধরে ভারত ব্রাহ্মণ মহামণ্ডলের সভাপতি। মহারাজা কামেশ্বর সিং বাংলা বিহার ভূস্বামী সংঘের সভাপতি রূপেও সুপ্রসিদ্ধ হন।

কামেশ্বর সিংয়ের ভাইপো (মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের পুত্র) রমেশ্বর সিং পরবর্তীকালে মহারাজা হন। তিনিও তারা সাধকরূপে সুপরিচিত হন। তিনি বিশিষ্ট তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি তারামন্দির নির্মাণ করেন তাঁর রাজবাড়ীর অদূরে। গুপ্ত সাধনের জন্য রমেশ্বর সিং রাজবাড়ীর ত্রিশ মাইল দূরে রাজনগরে সাধনক্ষেত্র তৈরী করে সাধনা করেন।

পরবর্তীকালে কঙ্কালী মন্দিরও তিনি তৈরী করেন। তিনিও বামদেবের কৃপাধন্য হ'ন।

দ্বারভাঙ্গার ধর্মপ্রাণ মহারাজা ও তন্ত্রসাধক কামেশ্বর সিং বামদেবের জন্য প্রণামী স্বরূপ মাসিক চল্লিশ টাকা (১৯০৬ সালে এই টাকা কম নয়) বামদেবের স্থূলদেহ ত্যাগ পর্যন্ত (১৯১১ সাল পর্যন্ত) দীর্ঘ ছয় বছর প্রতিমাসে দেন এবং নিজেও আমৃত্যু বামদেবের অন্যতম বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগী থাকেন।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিং এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজাগণ বাঙ্গালীদের প্রতি বরাবর শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

দ্বারভাঙ্গা নিবাসী বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল এই রাজপরিবারে একাধারে গৃহশিক্ষক ও মহারাজার ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন।

মাহারাজা কামেশ্বর সিং তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি ও সাধক পরম্পরার প্রতি এই রাজবংশের গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায়। পূর্বে বাংলার দ্বার স্বরূপ এই 'দ্বারবঙ্গ' (পরবর্তীকালে 'দ্বারভাঙ্গা' নামে সুপরিচিত) বিশাল ভূভাগ ছিল। তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই গ্রেট বেঙ্গলের গৌরবময় দিনে তার দ্বার স্বরূপ ছিল এই দ্বারবঙ্গ তথা বর্তমান দ্বারভাঙ্গা। বাংলার সেই প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যস্বরূপ দ্বারবঙ্গ তথা দ্বারভাঙ্গার রাজগণ চিরদিন বাংলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আজো সেই মহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

—o—

চিহ্নিত গুরুশিষ্য ও আদর্শ গুরুসেবা

একদিন পাথুরিয়াঘাটার ছোট রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বড় জামাই বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পত্নী জয়ন্তী দেবী তারাপীঠে উপস্থিত হলেন। বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় শ্রীবামের সুপরিচিত ও কৃপাধন্য। তিনি ইতিপূর্বে (১৩০৫ সালে) শ্রীবামকে তারাপীঠ থেকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের কাতর প্রার্থনা অনুসারে। বেণীমাধববাবু ও জয়ন্তীদেবী তারাপীঠে এলেন রামপুরহাট থেকে গরুর গাড়িতে।

তাঁদের ইচ্ছা তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব সাক্ষাত শিবস্বরূপ বামাক্ষ্যাপার কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কুলগুরু জ্ঞানানন্দ তীর্থনাথের কাছে তাঁদের কৌলদীক্ষা নেবার ইচ্ছে হয়েছিল।

যাহোক, গুরুর গাড়ি থেকে নেমে বামদেবের আশ্রমে এসে জানলেন যে বামদেব দ্বারকানদীতে স্নান করছেন। স্বামী-স্ত্রী নদীতীরে এসে বামদেবের দর্শন পেলেন। তাঁরা শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে কখন বামদেব স্নান সেরে উঠবেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, বামদেব তাঁদের দেখতে পেয়েই জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই হাত তুলে বললেন আমি জানি, তোরা উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করেছিস। তাঁর নিকট থেকেই অভিষিক্ত হবি। কল্যাণ হবে। বেণীমাধববাবু ও জয়ন্তীদেবী একথা শুনে যেমন বিস্মিত হলেন তেমনি আনন্দিত হলেন। তাঁরা বামদেবের একথা শুনে উপলব্ধি করলেন যে শিষ্য যেমন চিহ্নিত থাকে জন্ম জন্মান্তর ধরে তেমনি গুরুও চিহ্নিত থাকেন।

মন্ত্রের মধ্য দিয়েই এই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শাশ্বত সম্পর্ক চিরদিন বিরাজ করে। স্বয়ং ইষ্ট এই মিলন ঘটান। আবার এই ঐশী নির্দিষ্ট চিরন্তন সম্পর্ক পূর্ব পূর্ব জীবনের সাধনার কর্ম অনুসারে কোন কোন শিষ্য বা শিষ্যার জীবনে সাধনার ক্রম, বীজমন্ত্র ও আধার অনুসারে কখনো কখনো একাধিক গুরুর কাছ থেকেও দীক্ষা প্রাপ্তি ঘটে।

ভারতের বহু মহাসাধক মহাসাধিকার জীবনে তা দেখা গেছে এবং দেখা যায়।

বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পত্নী জয়ন্তীদেবীর সাধন জীবনেও তার প্রতিফলন ঐশী নির্দিষ্ট রূপেই ঘটেছে। কুলগুরু জ্ঞানানন্দ তীর্থনাথের কাছ থেকে কৌল মন্ত্রলাভ করবার পরও পরবর্তীকালে মহাযোগী বামাক্ষ্যাপা তাঁদের দীক্ষা দান করেন। তাঁদের উন্নত পবিত্র আধারে অকৃপণ ধারায় ঢেলে দেন অফুরন্ত শক্তি।

তন্ত্র ও যোগের সমাহার করালেন তাঁদের শক্তিশালী বিশাল আধারে!

তার সাথে সাথে দেখালেন গুরুসেবা কাকে বলে এবং তার নিদর্শনও রাখলেন বামদেব তাঁর প্রধান শিষ্য মহাত্মা তারাক্ষাপার মাধ্যমে।

বামদেবের কাছ থেকে দীক্ষিত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় ও জয়ন্তীদেবী তখনও তারাপীঠে রয়েছেন।

এদিকে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং তাঁর অভীষ্ট লাভের জন্য তারাপীঠ মহাশ্মশানেব মহাপবিত্র শিমূলতলা কানাৎ দিয়ে ঘিরে জপ পূজা করছেন। এই সময় কুঠার হাতে মুশিদাবাদের জুড়ানপুর শ্মশান থেকে শ্রীগুরু বামদেবের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে সিদ্ধ-পুরুষ তারাক্ষ্যাপা তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন।

শিমূলতলা কানাৎ দিয়ে ঘেরা থেকে তারাক্ষ্যাপা রুদ্ররূপ ধারণ করলেন এবং মহারাজা কামেশ্বর সিংকে কানাৎ তুলতে বাধ্য করালেন। শ্রীগুরুবাম নির্বিকার রইলেন। এ যেন শ্রীগুরু বামদেবের ইচ্ছাই তাঁর বীর শিষ্য তারাক্ষ্যাপার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল।

এই সময় একদিন তারাপীঠে বামদেবের আশ্রমে বসে শিষ্যা জয়ন্তীদেবী শ্রীগুরু বামদেবের পা দু'খানি জল দিয়ে ধুয়ে নিজের বহু মূল্যবান শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর স্বামী বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত। আরো কয়েকজন শিষ্য ভক্ত উপস্থিত রয়েছেন সেখানে।

সহসা সেখানে মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা এসে উপস্থিত হলেন। তারাক্ষ্যাপা জয়ন্তীদেবীকে আঁচল দিয়ে তাঁর গুরুদেবের চরণ যুগল মুছাতে দেখে জয়ন্তদেবীর হাত থেকে বামদেবের চরণদ্বয় নিজের হাতে নিলেন এবং তারাক্ষ্যাপা তাঁর সুদীর্ঘ কেশপাশ দিয়ে বামদেবের শ্রীপাদপদ্ম মুছিয়ে দিতে দিতে জয়ন্তীদেবীকে বললেন, "এইরূপে গুরুসেবা করতে হয়।"

বামদেব তাঁর এই মহান বীর সিদ্ধ সাধকের গুরুভক্তি দর্শন করে সস্নেহে বললেন, "দাদা যান, আপনি কামরূপ জয় করে আসুন।

কিছু দিনের মধ্যেই তারাক্ষ্যাপা গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে কামরূপ গমন করলেন।

এই যোগ ও তন্ত্র সিদ্ধ মহাপুরুষ, মহাবিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক এবং মহাতেজস্বী সন্ন্যাসীর জীবন কাহিনী অসাধারণ (দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড)।

উপরোক্ত লীলার মাধ্যমে শ্রীগুরু বাম দেখিয়ে দিলেন যে গুরুশিষ্য ঐশী নির্দিষ্ট পথেই চিরচিহ্নিত।

তার সাথে সাথে দেখালেন যে আদর্শ গুরুসেবা কাকে বলে। যিনি আদর্শ শিষ্য হতে পারেন, উত্তরকালে তিনিই আদর্শ গুরু হতে পারেন।

পৃথিবীর শাশ্বত ধর্মগুরু অধ্যাত্ম মণ্ডিত ভারতবর্ষে এই মহান দৃষ্টান্ত ভারতের মহান ধর্মগুরুগণ গুরুশিষ্য পরম্পরা অব্যাহত রেখেছেন। এই মহান ঐতিহ্যময় ধারা চিরদিন চলেছে চলছে চলবে।

শ্রীবাম কৃপাধন্য সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ১৩১৩ সালে জনাইয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত বংশজাত অধ্যাপক সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় চব্বিশ বছর বয়সে তারাপীঠে এলেন শ্রীবাম দর্শনে। তাঁর সাথে তাঁর বড় ভগ্নিপতি শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় এসেছেন। সুবোধ বাবুর জন্ম বাংলা ১২৮৯ সালে।

প্রায় দু'বছর পূর্বে সুবোধবাবু তাঁর জ্যাঠতুতো ভাই শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর গুরু বামাক্ষ্যাপা বাবার কথা শুনেছিলেন।

তাই কিছুটা কৌতুহল নিয়ে তিনি শ্রীবাম দর্শনে তারাপীঠে

এলেন। তাছাড়া সুপণ্ডিত ও গণিতের অধ্যাপক সুবোধ বাবুর মানসিক অবস্থাও ভাল নয়। কিছুদিন পূর্বে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পাশ করতে পারেন নি। এজন্য মানসিক অবস্থা ভাল নেই। এই পরীক্ষার জন্য হাজারিবাগে অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে গৃহে চলে আসেন।

যাহোক, সুবোধ বাবু ও তাঁর বড় ভগ্নিপতি দেখলেন যে শিবা সারমেয় পরিবৃত হয়ে শ্রীবাম বসে আছেন। দর্শন ও প্রণাম করে সুবোধবাবু বামদেবের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একদিব্য আকর্ষণ অনুভব করলেন। সহসা তাঁর হাজারিবাগের এক মহাপুরুষের কথা মনে হল। তিনি যখন হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক, তখন 'বুড়াবাবা' বলে শতাধিক বছর বয়স্ক এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে তিনি আসেন।

মনে মনে সুবোধ তাঁর সাথে বামদেবের তুলনা করতে থাকেন। অন্তর্যামী শ্রীবাম তা বুঝতে পেরে সস্নেহে সুবোধবাবুকে বললেন "বাবা, তাবড় তাবড় কত আছেন, কিন্তু যে যার সে তাঁর, যুগে অবতার।"

সুবোধ বাবুর মনে হ'ল, বামদেব তাঁকে ইঙ্গিত করলেন যে তিনিই সুবোধ বাবুর জন্ম জন্মান্তরের গুরু।

সুবোধ বাবু সেই মুহূর্তে মনে মনে ভাবলেন যে যদি সত্যিই বামদেব তাঁর চিহ্নিত গুরু হয়ে থাকেন তবে এই মুহূর্তে বামদেব তাঁর শ্রীচরণ সুবোধ বাবুর মাথায় তুলে দেবেন। সুবোধ বাবু একথা ভাবামাত্র বামদেব উঠে 'জয়তারা' বলে সুবোধবাবুর মাথায় নিজের ডান পা রাখলেন। সাথে সাথে এক মহাজ্যোতির আলোতে সুবোধ বাবু মহাচৈতন্য লাভ করলেন। কিন্তু তাঁর জড়দেহ সেই তীব্র দিব্য জ্যোতিতে চৈতন্য হারালো। একটু পরেই সুবোধবাবুর মাথা থেকে পা নামিয়ে নিলেন বামদেব। সুবোধ বাবু প্রকৃতিস্থ হলেও এক দিব্যভাবে বিভোর হয়ে রইলেন।

এইভাব নিয়েই তিনি তাঁর ভগ্নিপতি শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তারাপীঠ থেকে ফিরলেন।

কিন্তু ফিরলেন অন্য মানুষ। সংসার ও কর্মজীবনে এল প্রবল বিতৃষ্ণা। শ্রীবাম প্রসঙ্গ ও তারাপীঠই হ'ল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সুবোধ বাবুর পিতৃদেব রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় চিন্তিত হলেন পুত্রের এই বৈরাগ্য ভাব দেখে। তাই ছোটছেলে সুবোধকে বিয়ে দিলেন তিনি। ক্রমে এক ছেলে ও এক মেয়ে হ'ল। কিন্তু পিতামাতা স্ত্রীপুত্র কন্যার মায়াজালে তিনি আবদ্ধ হলেন না। মাঝে মাঝেই তারাপীঠে চলে যান। বামদেবের দিব্যসঙ্গ লাভ করেন। ১৩১৬ সালে শারদীয়া চতুর্দ্দশীর মেলায় তারাপীঠে এসে বামদেবের কাছে পূর্ণ সন্ন্যাসে চান এবং গুরুভাই হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়েও বামদেবকে অনুরোধ করলেন। কৃপাময় বামদেব সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিচিত্র সন্ন্যাস দিলেন। সন্ন্যাস দিলেন কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতা ও পত্নীর সামনে গৃহেতেই রাখলেন। কারণ ইতিপূর্বে সুবোধ বাবুর বৃদ্ধ পিতামাতা তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র শশধর গঙ্গোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শোক পেয়েছিলেন। সুবোধ বাবুর মেজদা শশধর গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশ্রিত। তাই বামদেব সুবোধকে তাঁর পিতামাতার চোখের সামনেই রাখলেন।

নিদারুণ অর্থ কষ্টের মধ্যেও সুবোধ বাবু আর কর্ম জীবনে প্রবেশ করলেন না। এমনকি বৃদ্ধ পিতাকে শেষ বয়সে সংসারের জন্য পুনরায় কর্মজীবনে প্রবেশ করতে দেখেও সুবোধ বাবু নির্বিকার রইলেন।

ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামদেবের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে রইলেন।

শ্রীগুরু বামদেবের দেহ ত্যাগের পর তিনি পরিব্রাজনায় বের হলেন। উত্তরা খণ্ডের বদ্রীনারায়ণ, কেদার নাথ প্রভৃতি বহু তীর্থ ভ্রমণ করে ফিরে এলেন গৃহে। তারপর গৃহী সন্ন্যাসীরূপে গৃহে আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন। যথার্থ সন্ন্যাসীর ন্যায় তিনি সন্ন্যাস জীবন গৃহে থেকেই পালন করতে লাগলেন।

রাজযোগ সাধনায় তিনি নিজেকে নিমগ্ন করলেন। সংসারের কঠোর দায় দায়িত্ব ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরুবামদেবের ওপর

ছেড়ে দেবার সুফলও পেলেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের ভার তাঁর বড়ভাই নিরাপদ বাবু গ্রহণ করলেন। তাঁর কন্যারও সুপাত্রে বিবাহ হয়। তাঁর পিতা মাতাও যথাসময়ে দেহ ত্যাগ করেন। ফলে তারামা ও বামদেব সুবোধ বাবুকে সংসারের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন।

সুবোধ বাবুর গুরুভক্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার বামদেবের অন্যতম প্রিয় শিষ্য সারদা সাহা তাঁর গুরুভাই গণিতের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট পণ্ডিত সুবোধ বাবুকে বলেন, "আপনি এমন বিজ্ঞানী লোক, দু'চারখানা বই লিখলে তো জগতের কল্যাণ হ'ত।" তাঁর উত্তরে সাধকপ্রবর সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এ বিদ্যা কিছু নয়। এ কেবল অর্থকরী বিদ্যা। আসল বিদ্যা তারাবিদ্যা।"

এই দুর্লভ তারাবিদ্যার পূর্ণ প্রাণবন্ত বিগ্রহ শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার দিব্যমূর্তি ও ভাব ধ্যান করতে করতে সাধক সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহের আকৃতিও শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপার ন্যায় হয়ে যায়।

জীবনের শেষ ভাগে শ্রীগুরুর মতই তিনি শিশু হয়ে যান। কাপড় পরা ত্যাগ করলেন। শিশুর মতই উলঙ্গ থাকেন। ভাব ভাষাও গুরুর মত হয়ে যায়। জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতিও জেগে ওঠে। এই সময় তাঁর উরু দু'টিতে কঠিন উরুস্তম্ভ হল। তীব্র যন্ত্রণাতেও তিনি অবিচল থাকেন। দেহবোধ নেই। সর্বদা প্রায় আত্মস্থ। এই অবস্থায় তাঁর জ্যাঠতুতো ভাই ও গুরুভাই শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অন্যতম ভক্ত প্রফুল্ল কুমার বসুকে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসেন। শাস্ত্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাবিস্ময়ে দেখলেন যে গভীর দেহ যন্ত্রনার মধ্যেও সুবোধদা শান্ত নির্বিকার ভাবে রয়েছেন। তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নি সেবাযত্ন করছেন। এই পরম নির্বিকার ভাবেই একদিন সকালে সবাইকে কাছে ডেকে আশির্বাদ করে মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন। যথাসময়ে মহাসমাধির মধ্যে মরদেহ ত্যাগ করে বামমণ্ডলে চলে গেলেন পরম আনন্দে।

শ্রীবামের আশ্চর্য্য করুণাঘন লীলা

তারাপীঠে একদিন তারাপদ মুখার্জী নামে এক মাতৃশোকে কাতর ভক্তসন্তান এলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের উকিল। মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের শোকে তিনি পাগলের মত হয়ে যান। যাকে দেখেন তাকেই বলেন আমার মাকে দেখেছ? অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে তারাপীঠে এলেন তিনি। যাকে তাকে এই একই প্রশ্ন করছেন।

এই সময় বামদেব জীবিতকুণ্ডে স্নান করছেন মনের আনন্দে। মাতৃশোকে প্রায় উন্মাদ তারাপদবাবুকে শ্রীবাম দূর থেকে দেখতে পেলেন। করুণাময় বামদেব তারাপদবাবুর দিকে কিছু কচুরি পানা জল থেকে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, জীবিতকুণ্ডের জল থেকে ছোড়া কচুরি পানা অনেক দূরে রাস্তায় দাড়িয়ে থাকা তারাপদবাবুর গায়ে গিয়ে লাগলো। সাথে সাথে প্রায় উন্মাদ তারাপদবাবু বামদেবকে দেখতে পেলেন।

তাড়াতাড়ি জীবিতকুণ্ডের ঘাটে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে জলের ধারে দাঁড়িয়ে বামদেবকে চিৎকার করে বললেন, "আমার মাকে দেখেছ?"

বামদেব স্নান করতে করতেই তারামায়ের মন্দির দেখিয়ে মাতৃশোকে উন্মাদ তারাপদ মুখার্জীকে বললেন, "ওখানেই আসল মা।"

কিন্তু শ্রীবামের কথা শুনে পাগল বললেন, "আমার নিজের মাকেই দেখতে চাই।"

করুণাময় বামদেব তখন জল থেকে উঠে সিক্ত দেহে মাতৃশোকে জর্জরিত উন্মাদ তারাপদকে নিয়ে তারামায়ের মন্দিরে এলেন। তারামাকে দেখালেন তিনি। কিন্তু পাগল নিজের মাকে দেখতে চাইলেন বার বার।

তখন শ্রীবাম বললেন, "তবে তোকে দীক্ষা নিতে হবে।"

নিজের মাকে দেখবার আশায় তারাপদবাবু দীক্ষা নিলেন।

সাথে সাথে দেখলেন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁর গর্ভধারিণী জননী, তাঁর সর্বক্ষণের ধ্যান জ্ঞান তাঁর মা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মায়ের পরণে সাদা থান। আনন্দে বিস্ময়ে ভাবে বিহ্বল হয়ে তারাপদবাবু তাঁর মাকে ধরতে গেলেই তাঁর মা মিলিয়ে গেলেন।

করুণাময় বামদেব তাঁকে শান্ত করলেন।

কৃপা করে দেখালেন যে জগতে সবার চিরকালের মা তারামায়ের মধ্যেই তাঁর মা রয়েছেন।

তাই তারামাকে দেখতে পেলে নিজের মাকেও সাথে সাথে দেখতে পাবেন।

সদ্‌গুরু শ্রীবামের নির্দেশ মত শান্ত চিত্তে তারাপদবাবু তারামায়ের দর্শনের জন্য সাধনা শুরু করলেন।

যথাসময়ে বামদেবের কৃপায় তিনি ত্রিলোকের অধিশ্বরী তারামাকে চিনতে পেরে মহানন্দে অধীর হলেন। অবশেষে তারামায়ের কৃপায় তারামায়ের মধ্যে নিজের মাকে দর্শন করে চিরতরে শান্ত হলেন। ক্ষণিকের মায়ের সাথে চিরকালের মাকে পেলেন। করুণাময় শ্রীবাম এই মাতৃভক্ত সন্তানকে কিছুদিন তাঁর দিব্য সঙ্গ দিয়ে তাঁকে অধ্যাত্ম পথে এগিয়ে দিলেন। তারাপীঠে তারাপদবাবু কিছুদিন বাস করলেন। একদিন বামদেব আহারে বসেছেন। তারাপদবাবুর ইচ্ছে শ্রীগুরু বামদেবের প্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু বামদেবের আহারের ব্যাপার দেখে তিনি খুবই বিস্মিত হলেন।

বামদেব সব খাবার একত্র করে মাখলেন। তারপর আঙুল দিয়ে তিনবার স্পর্শ করে জিভে ছোঁয়ালেন। তারপর যিনি খাবারের থালা নিয়ে এসেছেন তাঁকে বললেন, "যা থালা নিয়ে যা।"

তারাপদবাবুর আর প্রসাদ পাওয়া হ'ল না।

তারাপীঠে থাকতে থাকতেই তারাপদবাবু একদিন বামদেবের প্রধান শিষ্য মহা সিদ্ধপুরুষ ও মহান যোগী তারাক্ষ্যাপাকে দেখতে পেলেন।

তারাক্ষ্যাপাজী শ্রীগুরু বামকে দর্শন করতে তারাপীঠে এলেন।

তারাক্ষ্যাপাজীর চেহারা খুবই আকর্ষণীয়। শ্যামবর্ণ চেহারা, দীর্ঘ দেহ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত জটা। তাঁর পরনে হাঁটু পর্যন্ত সাদা কাপড়। বিশাল নয়নদ্বয় তেজদৃপ্ত। তীক্ষ্ণ নাক। সব মিলিয়ে এক প্রশান্ত গম্ভীর ব্যাক্তিত্বপূর্ণ চেহারা তারাক্ষ্যাপাজীর।

যাহোক্ তারামায়ের কৃপালাভ করে, শ্রীগুরু বামদেবের করুণা, সিদ্ধমন্ত্র ও নির্দেশ পেয়ে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে তারাপদবাবু নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

তাঁর প্রিয়জনগণ তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল ও আনন্দময় দেখে অশেষ সুখী হলেন।

করুণাময় বামদেবের অফুরন্ত কৃপার এক আশ্চর্য আনন্দ লহরি রূপে সাধকপ্রবর তারাপদ মুখার্জী শ্রীবামমণ্ডলে চিরচিহ্নিত হয়ে রইলেন।

উপরোক্ত কাহিনীটির জন্য লেখক শ্রীশ্রীবামদেবের প্রিয় শিষ্য ও সেবক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

ইংরেজী ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর সকালবেলা শ্রীনগেন বাগচী তারাপীঠে তাঁর আশ্রমগৃহে বসে লেখককে উপরোক্ত কাহিনীটি বলেন।

তিনি পরবর্তীকালে আরো একাধিক কাহিনী বলেছেন। যথাসময়ে যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

—o—

শাসক ও সেবকরূপে পাণ্ডাগণ

বামদেবের প্রতি পাণ্ডাদের ব্যবহার গোধূলীর আকাশের মেঘের মত। ক্ষণে ক্ষণে তার রং বদলায়

পাণ্ডাদের মনের রং এত বেশী পরিবর্তনশীল যে পাণ্ডারা নিজেরাও তা সবসময় টের পান না। সুদীর্ঘকাল বামদেবের দিব্য সান্নিধ্যে থেকেও বামদেবের প্রতি তাঁদের অজ্ঞতা ও ক্ষ্যাপাজ্ঞানে উদাসীনতা অপরিসীম। তার সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার কঠিন তমোরূপ ও বাসনার অসীম রজরূপ। এই কালো ও লালের বিচিত্র দ্বন্দ্বে তাঁদের অন্তরের সহজ বিকাশ পরিস্ফুট হয়নি।

তবু এই লাল কালোর আলো আঁধারের মাঝে চলতে চলতে সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকজন মাত্র পাণ্ডা বামদেবের অফুরন্ত যোগবিভূতি ও বাকসিদ্ধি দেখে বামদেবকে কিছু কিছু চিনতে পেরে বামদেবের প্রতি পূর্ব মনোভাব পরিবর্তন করে বামদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং তাঁদের মনকে সাত্ত্বিক তথা শ্বেতশুভ্র করে বামদেবের সেবাযত্নে তৎপর হন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

তার কিছুকালের মধ্যেই বামদেব তার অর্ধশতাব্দী ব্যাপী মর্ত্যলীলা সমাপ্ত করে অপ্রকট হন।

তাই তাঁর স্থূলদেহের মহাপ্রয়াণের পর তারাপীঠের অনেক পাণ্ডাকেই বামদেবের প্রতি তাঁদের অপরিসীম অজ্ঞতা, অবহেলা, অপমান ও কঠিন পীড়নের জন্য গভীর অনুশোচনায় চোখের জল ফেলতে দেখা যায়।

তারামা ও বামদেবের এ এক বিচিত্র রহস্যময় লীলা। যে বামদেবকে কেন্দ্র করে, যে বামদেবের মহাজ্যোতিতে সারা তারাপীঠ তথা বীরভূম তথা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজগত আলোকিত ও উদ্ভাসিত এবং ভারতের সকল প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসছেন

মহাসাধক মহাসাধিকা মুমুক্ষু আর্ত তাপিত লক্ষ লক্ষ নরনারী, সেই বামদেবের মহাপবিত্র দিব্য দর্শন ও পরম পবিত্র সঙ্গ প্রতিদিন লাভ করেও, বামদেবের অজস্র যোগবিভূতি ও মহালীলা সুদীর্ঘকাল ধরে দর্শন করেও পাণ্ডাগণ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলেন না।

এ এক মহাবিস্ময়কর রহস্য। এ যেন "প্রদীপের নীচেই অন্ধকার"—এই প্রবচনের এক প্রাণবন্ত নিদর্শন।

বামদেবের আদি লীলায় দেখা যায় যে, পাণ্ডারা তারাময় শিবাবতার বামদেবকে একেবারেই চিনতে পারেননি। অথচ পাণ্ডারা বংশ পরম্পরায় তারামায়ের নিত্য সেবাপূজা করছেন যুগ যুগ ধরে। তারামাকে নিয়েই তাঁদের সবকিছু। তারামা-ই তাঁদের ইষ্ট ধ্যান জ্ঞান।

অন্যদিকে বামদেবের দেহ মন প্রাণ আত্মা ধ্যান জ্ঞান স্মরণ মনন ভাব ভাষা ভাবনা সবই তারামা। এক কথায় তাঁর সর্বস্ব তারামা। সবই তারামার চরণে সর্বক্ষণ নিবেদিত। তবু তারামা অন্তপ্রাণ তারামায়ের অভেদস্বরূপ তারাময় বামদেবকে তারামায়ের নিত্য সেবক পাণ্ডাগণ চিনতে বা বুঝতে পারেননি। এই রহস্য সত্যিই পরম বিস্ময়কর।

তারামায়ের এই লীলা যথার্থ দুর্বোধ্য।

তারামা পাণ্ডাদের ইষ্টদেবী, বামদেবেরও ইষ্টদেবী তারামা। তারামায়ের নিত্য সেবাপূজা করেন পাণ্ডাগণ। আর তারামায়ের নিত্য ধ্যানে মগ্ন বামদেব।

পাণ্ডারা করেন তারামায়ের জাগতিক পূজা ও সেবা। বামদেব করেন তারামা'র আধ্যাত্মিক তথা পরম আত্মিক পূজা ও প্রেমভক্তির তথা শরণাগতির সুগভীর সেবা।

পাণ্ডারা নিত্য দেখেন তারামা'র শিলাময়ী মূর্তি এবং তাঁকে নিত্য শাস্ত্রমতে স্নান করান। বামদেব দেখেন তারামা'র সদা চৈতন্যময়ী রূপ। যে শিলাময়ী তারামাকে পাণ্ডারা শাস্ত্রমতে পূজা করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে নিত্য প্রয়াসী হন, বামদেব তাঁদের সেই শাস্ত্রোক্ত কর্ম সুসম্পন্ন করে দেন তাঁর মহান দিব্য সাধনা ও অহেতুকী প্রেমভক্তির দ্বারা। জড়শিলাকে নিত্য চৈতন্যে রূপান্তরিত করে তার মাঝে ব্রহ্মময়ী

তারামাকে অধিষ্ঠিত করলেন বামদেব। তাঁর মহালীলা ছড়িয়ে দিলেন তারাপীঠ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অধ্যাত্মমণ্ডলে। তাঁর সুফল সবাই লাভ করলেন। তাই তারাপীঠের তারামায়ের নিত্য সেবক পাণ্ডাদের স্বভাবতই গভীর কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভরতা থাকা উচিত ছিল শিবাবতার তথা তারামা'র অভেদস্বরূপ বামদেবের প্রতি কিন্তু বাস্তবে ঘটলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবটি।

জড়মুখী তথা বিষয়মুখী পাণ্ডাগণ, সদা চৈতন্যময় সদা ব্রহ্মভাবে বিভোর বামদেবকে উপলব্ধি করতে পারলেন না।

যে নিত্য চৈতন্যময়ী ব্রহ্মময়ী তারামা'র নিত্য সেবাপূজা পাণ্ডাগণ করছেন, সেই তারামা'র এক অসীম অনন্ত প্রেমময় জীবন্ত বিগ্রহ বামাক্ষ্যাপা তথা বামদেবকে নিত্য চোখের সামনে দেখেও ও সুদীর্ঘকাল কাছে পেয়েও এবং সঙ্গ করেও তাঁকে চিনতে বা উপলব্ধি করতে পারলেন না। এমনকি চিনবার বা বুঝবার চেষ্টাও করলেন না।

এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি আছে! যেখানে অপূর্ব আনন্দময় মিলন হতে পারতো সেখানেই ঘটলো তীব্র বিরোধ।

বহিরঙ্গের পার্থক্যই বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দিল। অন্তরঙ্গে তাই মিল হ'ল না।

পাণ্ডাগণ মূলত জড়মুখী, তাই তাঁদের সেবাপূজা তথাকথিত আচার অনুষ্ঠান সবই বাস্তবভিত্তিক তথা বহিঃমুখী।

সাধারণ ভক্ত নরনারীও এই অনুষ্ঠানসর্বস্ব সেবাপূজা দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু বামদেব চৈতন্যময় পরম পুরুষ। তাই তাঁর সবই অন্তর্মুখীন। তাই তাঁর জপ ধ্যান পূজা সেবা কাজকর্ম সবই বহিরঙ্গের সকল আচার বিচার বিধি নিষেধের অতীত।

ফলে জড়ভাবাপন্ন বহিঃমুখী ভাবসর্বস্ব পাণ্ডাদের কাছে তা বিসদৃশ লাগলো। পাণ্ডাগণ স্বভাবত অন্তর্মুখীন হলে বামদেবকে উপলব্ধি করে পরম শান্তি আনন্দ পেতে পারতেন। ফলে মিলন হ'ত অপূর্ব। কিন্তু তার বিপরীত হওয়ায় বামদেবকে চিনতে পারলেন না।

বামদেবকে চিনতে পারলে লাভ করতেন আধ্যাত্মিক শক্তি। করুণাময় বামদেবের দিব্য সান্নিধ্যে লাভ করতেন অধ্যাত্ম রাজ্যের

বিশাল অধিকার। মাতৃদর্শন লাভ করে মানব জীবনও সফল হ'ত। তার সাথে যোগবিভূতিও স্বভাবতই করায়ত্ত হ'ত। কিন্তু এসব কিছুই হ'ল না।

জড়মুখী তথা বহিঃমুখী ও বিষয় বাসনা ও অর্থকরী ক্রিয়াকর্মে সদা উৎসাহী এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের শৃঙ্খল পাশে আবদ্ধ পাণ্ডাগণ সুদীর্ঘকাল বংশ পরম্পরায় বামদেবকে দেখে ও সঙ্গ করেও সদা অন্তর্মুখীন, পরম পুরুষ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যপবিত্র, মহাযোগী, মহাতান্ত্রিক, পরম চৈতন্যময় তারাময় শিবাবতার বামদেবকে চিনতে পারলেন না। এমনকি বামদেবের অনেক অপার্থিব অলৌকিক লীলা দর্শন করেও তাঁকে জানবার বা উপলব্ধি করবার চেষ্টাও করলেন না।

বরং সকল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অতীত, পূর্ণাবধূত বামদেবের ভাব ভাষা ও নিগূঢ় চৈতন্যযুক্ত সকল লীলাকে পাণ্ডাগণ অজ্ঞতার বশে ভুল বুঝে বামদেবকে সকল ক্ষেত্রে অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, করেছেন দীর্ঘকাল ধরে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে দৈহিক পীড়ন ও আঘাত করতেও কুন্ঠিত হননি পাণ্ডাগণ। বামদেবের আদি ও মধ্য লীলায় এর বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি বামদেবের অন্তলীলাতেও একাধিক ক্ষেত্রে তার নিষ্ঠুর নিদর্শন দেখা গেছে।

বামদেবের আদি লীলায় পাণ্ডাগণ বামদেবকে সর্বাধিক ভুল বুঝে বামদেবকে অপরিসীম অপমান, অবহেলা ও দৈহিক আঘাত করেছেন।

তারামন্দিরের ভোগ রান্না, ফুল তোলা প্রভৃতি কাজে পরম চৈতন্যময়ী তারামায়ের ভাবে সদা বিভোর বামদেবকে সামান্য ভুল ত্রুটির জন্য কঠোর অপমান করে মন্দির থেকে বিতাড়ন, প্রসাদ থেকে বঞ্চিত করা এবং তারাপীঠ থেকে চিরতরে তাড়িয়ে দেবার জন্য সুকৌশলে তারামায়ের সেবায়েত নাটোর রাজ স্টেটের নায়েব ভরত মৈত্রর পাচক রূপে ভরত মৈত্রর সাথে মুর্শিদাবাদে রঘুনাথ গঞ্জের কাছারীতে প্রেরণ প্রভৃতি ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করছে। (দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড)

বামদেবের সিদ্ধিলাভের পরও তাঁর মধ্যলীলায় দেখা যায় যে, সিদ্ধ মহাপুরুষ বামদেবের প্রতি অহেতুক অবহেলা বশত তারামন্দিরের

বরাদ্দ প্রসাদ থেকে তাঁকে অপমান ও পীড়ন করে বিতাড়ন করা, বামদেবকে মহাশ্মশানে দিনের পর দিন অনশনে থাকতে বাধ্য করা, শিমুল বৃক্ষ পুড়িয়ে দেওয়ায় বামদেবের প্রতি দৈহিক নির্য্যাতন প্রভৃতি বহু ঘটনা ঘটেছে। (দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড)।

তারাপীঠ মহাশ্মশানে শিমূল বৃক্ষ দহন করায় পাণ্ডারা যে বামদেবের পবিত্র দেহে আঘাত করেছিলেন তা বামদেব স্বয়ং নিজেই বলেছেন তাঁর এক শিষ্যকে কথা প্রসঙ্গে। বামদেব বলেছেন, "শিমূল গাছটি পুড়িয়ে দেওয়ায় পাণ্ডারা আমায় মেরেছিল বাবা।"

যাহোক, এরই মধ্যে নাটোরের মহারাণীকে তারামা স্বপ্নাদেশ দেবার পর কয়েকজন পাণ্ডা বামদেব সম্পর্কে তাঁদের পূর্বের বিরূপ ও অবজ্ঞাসূচক মনোভাব কিছুটা ত্যাগ করেন। বামদেবের প্রতি কিছুটা মানবোচিত ভাব প্রদর্শন করেন।

বামদেবের মধ্যলীলার শেষভাগ থেকে অন্তলীলার শুরু পর্যন্ত বামদেবের মাতৃশ্রাদ্ধের অলৌকিক শক্তি ও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে বামদেবের বাকসিদ্ধি ও অলৌকিক যোগবিভূতির পরিচয় পেয়ে পাণ্ডারা ক্রমে ক্রমে বামদেবের প্রতি কিছুটা সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তা-ও সাময়িক ভাবে। বামদেব তাঁদের মনের মত কাজ না করলেই বামদেবকে অশেষ তিরস্কার ও অপমান করতে দ্বিধা করেন নি।

বামদেবের অন্তলীলার শুরু থেকে প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনেক পাণ্ডা বামদেবের বিরাট যোগবিভূতি ও অপরিসীম জনপ্রিয়তা ও তাঁর কাছে সহস্র সহস্র সাধুসন্ত মুমুক্ষু, ভক্ত, আর্ত নরনারীর অবিরাম আসা যাওয়া দেখে দেখে বামদেবের প্রতি বেশ কিছু শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করেন। বামদেব যে একজন মহাপুরুষ এটাও অনেকে মনে করতে থাকেন। অনেক পাণ্ডাই তাঁর দ্বারা উপকৃত হন। ফলে যাঁরা উপকৃত হলেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হলেন এবং কিছুটা বামদেবের সেবাযত্নও করতে থাকেন। কিন্তু যাঁরা কোন কারণে বামদেবকে দিয়ে তাঁদের মনের মত কাজ করাতে পারলেন না বা বামদেবকে দিয়ে তাঁদের যজমানদের বাঞ্ছিত কাজ করাতে পারলেন না বা দীক্ষা দেয়াতে পারলেন না—

তারা কিন্তু বামদেবকে গালাগাল বা অপমান করতে দ্বিধা করতেন না। (দ্রষ্টব্য তৃতীয় খণ্ড)।

বামদেবের অন্তলীলার শেষার্ধে তারাপীঠের বহু পাণ্ডাই বামদেবের প্রতি ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধান্বিত হন।

বামলীলার অনন্ত লহরি দীর্ঘ কাল ধরে প্রত্যক্ষ করে বিষয়মুখী পাণ্ডাদের মধ্যেও তার কিছুটা প্রভাব পড়ে। বামদেবের এই অন্তিম লীলা লগ্নে অনেক পাণ্ডাই তাঁর দিন্য সেবক হবার জন্য প্রয়াসী হন। যদিও তাঁর মধ্যেও কিছুটা পার্থিব তথা আর্থিক আকর্ষণ ছিল তবু তার মধ্যেও আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

বামদেবের এই নিত্য সঙ্গধন্য সেবকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা, ভূপতি পাণ্ডা, শচী পাণ্ডা, নুটুবিহারী পাণ্ডা প্রভৃতিগণ। অন্য পাণ্ডাগণ বামদেবকে সাধারণত 'ক্ষ্যাপা' বলেই মনে করতেন। তবে তিনি যে শক্তিধর পুরুষ তা অনেক পাণ্ডাই অনেক সময় স্বীকার করতে বাধ্য হতেন বামদেবের অজস্র অলৌকিক শক্তি দেখে।

বামদেবের যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তি যত বাড়তে থাকে এবং তারাপীঠে বামদেবের শিষ্যভক্ত ও বহিরাগতের ভীড় যত বাড়তে থাকে ততই পাণ্ডারা বামদেবের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। অনেকে বামদেবের প্রতি পূর্বের বৈরী মনোভাব ত্যাগ করে তাঁর প্রতি ভক্তি দেখাতে থাকেন এবং সেচ্ছায় সেবাযত্নও করতে থাকেন।

আবার অনেক পাণ্ডা বামদেবের প্রতি পূর্বের বিরূপ মনোভাব গোপন করে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বামদেবের সাথে অন্তরঙ্গ হবার জন্য সচেষ্ট হন। বামদেবকে খোসামোদ করে নিজের কাজ সিদ্ধি করতে থাকেন। কারণ বামদেব প্রসন্ন থাকলেই বামদেবের কাছে নিত্য আগত শিষ্যভক্ত ও গুণমুগ্ধ বিত্তবান লোকেরা তাঁদের যজমান হন এবং পূজা যাগ যজ্ঞ বলি প্রভৃতির জন্য অনেক অর্থও পাওয়া যায়।

যে লোক, তিনি মধ্যবিত্ত, ধনী, জমিদার, রাজা, মহারাজা যেই হোন, একবার যে পাণ্ডার যজমান হবেন তারাপীঠে প্রথম এসে,

চিরকাল বংশ পরম্পরায় তিনি সেই পাণ্ডারই যজমান থাকবেন। ফলে বামদেবের মাধ্যমে এভাবে তারাপীঠে সকল পাণ্ডারই বহু যজমান লাভ হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। তার ফলে পাণ্ডাদের অতীব আর্থিক দুরবস্থাও কেটে গেছে। অনেক পাণ্ডাই অর্থ ও স্বাচ্ছন্দ লাভ করেছেন। বামদেবের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তির অন্যতম কারণও এই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ লাভ করা।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তা সত্বেও সামান্য কারণে মাঝে মাঝে পাণ্ডারা তাঁদের পূর্বের বৈরী মনোভাব প্রকাশ করে বামদেবকে শাসন করতে দ্বিধা করতেন না। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

বামদেব অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা জীবিতকুণ্ডের জলে ডুবে থাকেন। এ ব্যাপারে তাঁর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বলে কিছু নেই। যখনি ইচ্ছে হয় জীবিতকুণ্ডের জলে নেমে ডুব দেন। শুধু চোখ দু'টো দেখা যায়। একদিন এমনিভাবে অনেকক্ষণ বামদেব জীবিতকুণ্ডের জলে আছেন। এই সময় উপরোক্ত পাণ্ডারা শাসনের ভঙ্গিতে বামদেবকে সজোরে বললেন, "বামা, জল থেকে উঠে আয়।"

বামদেব কিন্তু শান্তভাবে জল থেকেই উত্তর দিলেন, "ওরে আমার কোন অসুখ করবে না।" তারপর যখন তাঁর ইচ্ছে হ'ল তখনি জল থেকে উঠে এলেন। কেউ তাঁকে গালাগালি করেও উঠাতে পারেনি।

অনেক তথাকথিত পাণ্ডারা বামদেবের শুধু আদি ও মধ্যলীলা নয়, এমনকি অন্তলীলার মধ্যভাগ পর্যন্তও বামদেবকে নাম ধরে এবং 'তুই' বলে সম্বোধন করেন। পিতার বয়সী এই ভারতবিখ্যাত পরমব্রহ্মজ্ঞ শিবস্বরূপ দেবমানবকে এভাবে নাম ধরে ডাকতে ও 'তুই' বলে ডাকতে পাণ্ডাদের বিবেকে বাধেনি। বিশেষ করে ঘরোয়া পরিবেশে।

বাইরের লোকজন ও বামদেবের শিষ্যভক্ত ও গুণমুগ্ধ লোকদের সামনে অবশ্য নাম ধরে বা তুই বলে ডাকবার দুঃসাহস পাণ্ডাদের হয়নি।

তখন বাধ্য হয়ে 'ক্ষ্যাপাবাবা', বা 'কর্তাবাবা', বা 'বাবা' বলেই ডাকেন।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

একবার বর্ষাকাল চলছে। প্রবল বর্ষণে মাঠ ঘাট জলে জলাকার। রাত ৮টা তখন। বামদেব তাঁর আশ্রমে বসে আছেন। তাঁর কাছে নগেন পাণ্ডা ও ভূপতি পাণ্ডা উপস্থিত রয়েছেন। হঠাৎ বামদেব নগেন পাণ্ডাকে বললেন, "লগেন কাকা, ফলের গন্ধ আসছে। নদীতে আসবে।"

নগেন পাণ্ডা এবং তাঁর ভাইপো ভূপতি পাণ্ডা উভয়েই শাসনের ভঙ্গিতে বামদেবকে বললেন, "দেখবি শালর, বাঁশপেটা করবো। ফল কোথায় আছে তোর এখন। চারদিকে বাণ বর্ষা।"

এই সময় কলকাতা থেকে অমূল্য মুখোপাধ্যায় আরো কয়েকজন লোক নিয়ে তারাপীঠে এলেন। তারা বামদেবের জন্য নানান ফল নিয়ে এসেছেন। তাছাড়া তারামা'র পূজোর জন্যও প্রচুর ফল এনেছেন। সেই ফল তাঁরা মাতারা ও বামদেবকে দিলেন। আরো কিছু ফল অন্যান্য সাধু ও ভক্তদের দিলেন। সেই সময় প্রায় পনের জন সাধু থাকেন বামদেবের আশ্রয়ে। প্রতিদিন শুধু গাঁজা তৈরী হয় এক সের করে।

বামদেবের কথা ঠিক ঠিক মিলে যাওয়ায় উপরোক্ত পাণ্ডাগণ বামদেবকে আর কিছু বলতে পারলেন না। এজন্য যে কোন অনুশোচনা বা দুঃখ প্রকাশ করা উচিত বামদেবের কাছে তা মোটেই তাঁদের মনে হ'ল না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কাহিনী উল্লেখ করা যায়।

এই ঘটনার দু'একদিন বাদেই একদিন সকালবেলা বামদেব পুনরায় নগেন পাণ্ডাকে বললেন, "লগেন কাকা, দুধ চিঁড়ের গন্ধ আসছে নাকে।"

উত্তরে নগেন পাণ্ডা তাঁর পিতার বয়সী মহাপুরুষ বামদেবকে বললেন, "শালর, ক্ষ্যাপা, দুধ চিঁড়ে কোথায় আছে?"

এই সময় পদিমকান্তি থেকে বাবুরা (খুব সম্ভবত পদিমকান্তির জমিদার রামকৃষ্ণ সরকার প্রভৃতিগণ) ভক্তিভরে সরুধানের চিঁড়ে, কলা, দুধ প্রভৃতি লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিলেন।

বামদেবের কথা এভাবে বার বার অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়ায় নগেন পাণ্ডা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

উপরোক্ত কাহিনীগুলো নগেন পাণ্ডার অন্যতম ভাইপো ও বামদেবের নিত্যসেবক শচী পাণ্ডার স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুধামুখী দেবী বাংলা ১৩৭৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন তারাপীঠে তাঁর নিজগহে বসে এই লেখককে সবিস্তারে বলেন।

১৩৭৮ সালে চুরাশী বছর বয়স্কা সুধামুখী দেবী এই লেখককে গভীর দুঃখের সাথে বলেন, "বাবা, আমি নিজে পাণ্ডার স্ত্রী। তবু বলছি যে পাণ্ডারা বামাক্ষ্যাপাকে চিনতে পারে নি।

তাঁকে 'ক্ষ্যাপা' বলে গালাগাল দিয়ে কথা বলতো পাণ্ডারা। 'তুই' বলে অনেক পাণ্ডা বলতো।

বামাক্ষ্যাপার প্রথম দিকে এবং শেষ দিকেও। ক্ষ্যাপাকে কেউ বিশ্বাস করতো না।"

সুধামুখী দেবীর ভাসুর হলেন ভূপতি পাণ্ডা এবং তাঁর খুড়োশশুর হলেন নগেন পাণ্ডা। সুধামুখী দেবীর স্বামী শচী পাণ্ডার গৃহে একাধিকবার বামদেব কৃপা করে পদার্পণ করেছেন এবং সুধামুখী দেবী নিজে রান্না করে বামদেবকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়েছেন (যথাসময়ে সেই কাহিনী বর্ণিত হবে)।

বামদেবের প্রতি পাণ্ডাদের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা সম্পর্কে স্বয়ং বামদেবের একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৩১৫ সালের ২৩শে আশ্বিন সকালবেলা বামদেব তাঁর ভক্ত কালীদাস লাহিড়ীকে পাণ্ডাদের প্রসঙ্গে বলেন—"এরা আমার কথা একটুও বিশ্বাস করে না। এরা বলে আমি মাতাল, পাগল ও গাঁজাখোর।"

বামদেবের এই বেদনার্ত উক্তি সর্বাংশে দুঃখজনক।

পাণ্ডাদের চরম দুর্ভাগ্য যে তাঁরা সারাজীবন বামদেবের একান্ত সান্নিধ্যে থেকেও বামদেবের অজস্র মহান দিব্যলীলা প্রত্যক্ষ করেও বামদেবকে চিনতে পারেন নি বা চেনবার চেষ্টাও করেন নি। এজন্য বামদেবের মর্ত্যলীলা সম্বরণের পর বহু পাণ্ডাকে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে দেখা যায়। চোখের জল ফেলতে দেখা যায়।

বামদেবের স্থূলদেহে থাকাকালীন পাণ্ডারা সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁকে নিতান্ত 'ক্ষ্যাপা' বা 'পাগল' ভেবে বামদেবকে শাসন করতেন, গালাগাল

দিতেন, অপমান করতেন, পীড়ন করতেন। কেবল বামদেবের অন্তলীলার শেষদিকে কিছুটা চিনতে পেরে ভক্তিশ্রদ্ধা ও সেবাযত্ন করেন।

আবার প্রয়োজন মত নিজকার্য্য সিদ্ধি করতেন বামদেবকে দিয়ে। যজমানদের মন্ত্র দেবার জন্য বামদেবকে ধরতেন (দ্রষ্টব্য তৃতীয় খণ্ড)। বামদেব না দিতে চাইলে জোর করতেন, গালাগাল দিতেন। তাছাড়া নানান ভাবে বামদেবকে দেয়া প্রণামীর টাকা নিতেন। কখনো বামদেব দিতে না চাইলে তাঁকে দৈহিক পীড়ন পর্যন্ত করতেন।

এই সম্পর্কে বামদেবের সুদীর্ঘকালের সেবক ও শিষ্য নগেন্দ্রনাথ বাগচীর একাধিক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। নিম্নে তার এক নিদর্শন দেয়া হ'ল—

এই ঘটনাটি বাংলা ১৩১৫ সালের (বামদেবের মর্ত্যলীলা সমাপ্তির মাত্র তিন বছর পূর্বের ঘটনা)।

একদিন বামদেব তাঁর আশ্রমে বসে আছেন। পাশে তাঁর নিত্য সেবক বাইশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক নগেন বাগচি বসে আছেন। এই সময় বামদেবের কৃপাধন্য অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর এক আত্মীয় বামদেবের কাছে এলেন। অমূল্যধন ইতিপূর্বেও বামদেবের কাছে এসেছেন। উভয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে বামদেবকে প্রণাম করলেন। প্রণামী স্বরূপ দু'টো রূপোর টাকা দিলেন।

সেবক নগেন বাগচি টাকা দুটো বামদেবের হাতে দিলেন।

বামদেব শিশুসুলভ কৌতুহল দেখিয়ে নগেন বাগচিকে বললেন, "লগেন বাবা, দেখুন তো King না Queen ?"

নগেন বাগচি দেখে বললেন, Queen (রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি)।"

তা শুনে বামদেব টাকা দু'টো তাঁর ঘরের ভেতর লোহার সিন্দুকে রাখতে বললেন। লোহার সিন্দুক চাবি দিয়ে বন্ধ করা আছে। সিন্দুকের মাঝখানে ফুটো করা আছে, তা দিয়ে প্রণামীর টাকা তাতে ফেলা হয়।

নগেন বাগচি উঠে রাখতে যাবেন, এমন সময় বামদেব বললেন, "আমিও যাব বাবা।"

নগেন বাগচি বামদেবকে নিয়ে চাবি দিয়ে ঘর খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ঘরটি প্রায় অন্ধকার। অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। এই প্রায় অন্ধকার ঘরে লোহার সিন্ধুকটি রয়েছে। তাছাড়া ঘরের শোভা বর্ধন করছে পাঁচটি খাঁড়া, চারটে চিমটা, চারটে ত্রিশূল আর কিছু মড়ার খুলি। তাছাড়া এই অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে কিছু গোখরা কেউটে প্রভৃতি সাপ সানন্দে শান্তিতে বিরাজ করে।

যাহোক, নগেন বাগচি টাকা দু'টো বামদেবের সামনে সিন্ধুকে ফেললেন। ঠং করে শব্দ হ'ল।

যুবক নগেন বাগচির মনে হ'ল সিন্ধুকের ভেতর বাটি রয়েছে (১৩০৫ সালে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দেয়া রূপোর ফুরসীও তাতে রয়েছে)।

টাকা দু'টো ফেলবার পর বামদেব শিশুসুলভ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "লগেন লাবা, টাকা দু'টি ফেলেছেন বাবা?"

নগেন বাগচি বললেন, "হ্যাঁ বাবা, ফেলেছি?"

বামদেব রহস্য করে বললেন, "কৈ বাবা শব্দ হ'ল না তো?"

নগেন বাগচি বললেন, হ্যাঁ বাবা, শব্দ হয়েছে।"

বামদেব আরো রহস্যভরে বললেন, "না বাবা, হয়নি।"

যা হোক, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আশ্রমের দাওয়ায় বসলেন। আবার বামদেব একই প্রশ্ন করলেন, নগেন বাগচি একই উত্তর দিলেন। এই সময় অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর আত্মীয়টি এলেন। বামদেব শিশুসুলভ ভাবে তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করলেন। নগেন বাগচি একই উত্তর দিলেন। বামদেব একই প্রশ্ন বার বার রহস্য করে করায় নগেন বাগচি মুশকিলে পড়লেন। তখন অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়ও বললেন, "হ্যাঁ বাবা, উনি ফেলেছেন। তখন বামদেব চুপ করলেন। নগেন বাগচী তাঁর অসীম ধৈর্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

ইতিমধ্যে অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর আত্মীয়টি নগেন পাণ্ডা প্রভৃতির কাছে কথায় কথায় বামদেবকে যে এই দু'টাকা প্রণামীস্বরূপ দিয়েছেন তা বলেছেন।

কিছুক্ষণ পর খাঁড়া হাতে শচী পাণ্ডা এল। তাঁর সাথে নগেন পাণ্ডাও এল বামদেবের কাছে। নগেন বাগচি বামদেবের অদূরে একটু আনমনা হয়ে বসে আছেন।

এমন সময় তারামায়ের অন্ন প্রসাদ নিয়ে ভূপতি পাণ্ডা এলেন। বামদেব খেতে বসলেন। তাঁর একদিকে খাঁড়া হাতে শচী পাণ্ডা দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে নগেন পাণ্ডা দাঁড়িয়ে। পাশে ভূপতি পাণ্ডা রয়েছেন।

নগেন বাগচি শচী পাণ্ডার হাতে খাঁড়া দেখে ভাবলেন, বোধহয় পাঁঠাবলির ব্যাপার রয়েছে।

নগেন বাগচি একটু অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবছিলেন সাময়িক ভাবে। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন নগেন পাণ্ডা উত্তেজিত ভাবে বামদেবকে বলছে, "শালর, টাকা দুটি সিন্ধুকে ফেললি কেন?

উত্তরে বামদেব বললেন, "ঘর সারাতে হবে।"

নগেন পাণ্ডা ততোধিক উত্তেজিত স্বরে বামদেবকে বললো যে তার টাকার দরকার, দেনা টেনা আছে। অর্থাৎ বামদেবকে তাঁর শিষ্যভক্ত যা প্রণামী দেন তা নগেন পাণ্ডা প্রভৃতিগণই 'সব নেবে।

বামদেব উত্তরে বললেন, "কার কি দেনা আছে তা আমার ভাববার প্রয়োজন নেই।"

এমনি সব কথাবার্তা হচ্ছে। যুবক নগেন বাগচি দূরে বসে চুপ করে শুনছেন।

হঠাৎ নগেন বাগচি শুনলেন বামদেবের কণ্ঠস্বর, "আঃ, লাগছে রে শালা।"

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখেন যে বামদেবের বাম হাতখানি (ডান হাতে প্রসাদ খাচ্ছিলেন) নগেন পাণ্ডা সজোরে ধরে সবিক্রমে মোচরাচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, "দে শালর, টাকা দে।"

বামদেব সাধারণত আপনভাবে বিভোর থাকেন। দেহবোধহীন এই দেবমানবের তারামায়ের প্রসাদ গ্রহণের সময় দেহে মন এসেছে। দেহবোধ এসেছে। অন্যসময় দেহবোধ প্রায় থাকেই না। হাত পা কেটে গেলে বা দেহ পুড়ে গেলেও দেহবোধ থাকে না—এ রকম ঘটনা ইতিপূর্বে বহুবার ঘটেছে।

সেই পূর্ণব্রহ্মবিদ মহাপুরুষ তারামা'র প্রসাদ খেতে বসেছেন তখন তাঁর বাম হাত ধরে সজোরে মোচড়ানো কোনমতেই মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়।

বামদেব ডান হাতে অন্নপ্রসাদ নিচ্ছেন। তিনি পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। তাই শাস্ত্রোক্ত গলিত হস্ত অর্থাৎ হাত গলে প্রায় সব অন্ন আঙুলের ফাঁক দিয়ে বুকে পেটে পড়ে যায়। মাত্র কয়েকটি ভাত মুখে যায়।

সেই মহাপুরুষের খাবার সময় বাম হাত ধরে অমানুষের মত নগেন পাণ্ডা মোচড়াচ্ছে। আর বামদেব খাওয়া বন্ধ করে বসে এই যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

এই অসহ্য দৃশ্য শ্রীবাম অন্তপ্রাণ সেবক নগেন বাগচি আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অত্যন্ত বিরক্তভাবে নগেন পাণ্ডাকে বললেন, "এটা আপনার অন্যায়। খাবার সময় একজন মহাপুরুষকে হাত মোচড়াচ্ছেন সামান্য দু'টো টাকার জন্য? বিবেক বলে কি কিছু নেই?"

উত্তরে রোষকষায়িত আরক্তিম নয়নে দাঁত কড়মড় করে নগেন পাণ্ডা বললেন নগেন বাগচিকে, "চোপ, এখানে মুখ বুজে থাকতে হবে। না হলে বের করে দেব।"

তা শুনে বিশাল বলিষ্ঠদেহী বাইশ বছরের যুবক নগেন বাগচি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর কাছে একটি টাঙ্গী রয়েছে। তাই নিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। তিনি ইতিপূর্বে দেশ স্বাধীন করবার জন্য বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাই মৃত্যুর ভয় তিনি করেন না।

নগেন বাগচি তীক্ষ্ণ ঝকঝকে ধারালো টাঙ্গী হাতে উগ্রমূর্তি ধরে এগিয়ে এলেন। তিনি ঠিক করলেন হয় এদের মারবেন নয় নিজে মরবেন। নগেন বাগচির এই রুদ্র রূপ দেখে নগেন পাণ্ডা, শচী পাণ্ডা ও ভূপতি পাণ্ডা ভয় পেয়ে বামদেবের আটচালা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি দৌড়ে রাস্তায় নেমে পড়লো।

কৃপাময় বামদেব পাশ থেকে নগেন বাগচিকে ধরে ফেলে নিরস্ত্র করলেন। দূর থেকে নগেন পাণ্ডা তখন নগেন বাগচিকে শাসাচ্ছে যে

তিনি দলবল নিয়ে এসে নগেন বাগচিকে শায়েস্তা করবে। নগেন বাগচি তা গ্রাহ্য করলেন না।

যা হোক, একটু পরে বামদেবের কথায় নগেন বাগচি শান্ত হলেন। কিছুক্ষণ পর নগেন বাগচি নগেন পাণ্ডাকে ডাকলেন। নগেন পাণ্ডা কাছে এলে নগেন বাগচি সিন্ধুকের চাবি (সাধারণত বামদেবের কোমরে বাঁধা থাকতো) নগেন পাণ্ডার সামনে ফেলে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "টাকার দরকার থাকে নিন, কিন্তু টাকার জন্য সাধু মহাপুরুষকে এভাবে অপমান করবেন না।"

যা হোক লীলাময় বামদেবের মাধ্যমে নগেন বাগচির সাথে নগেন পাণ্ডার আবার স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

উপরোক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে বামদেব দেখালেন যে, ভগবান খুব কাছের মানুষ হয়ে থাকলেও তাঁকে সাধারণ বিষয় সর্বস্ব মানষ কাছে পেয়েও চিনতে পারে না। যেমন পাণ্ডারা পারেনি।

পরমাত্মা স্বরূপ বামদেবকে সুদীর্ঘকাল একান্ত কাছে পেয়েও পাণ্ডারা তাঁকে শুধু চিনতেই পারেনি তা নয়, উল্টো অপমান, গালাগাল, শাসন, পীড়ন, করেছে।

ফলে চিরন্তন পরমার্থ পেয়েও অবহেলা করে ক্ষণিক অর্থের জন্য লালায়িত হ'ল পাণ্ডারা।

সামান্য দু'টাকার জন্য সাক্ষাত শিবস্বরূপ বামদেবের দিব্য পবিত্র হাত মুচড়ে দিতেও পাণ্ডাদের বাধেনি।

উপরোক্ত কাহিনীটি বৃদ্ধ নগেন বাগচি বাংলা ১৩৮২ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ রবিবার (ইং ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৫) তারাপীঠে বামদেবের আশ্রম মন্দিরে তাঁর গৃহে বসে লেখককে সজল নয়নে বলেন। তাঁর শতাধিক বছর ব্যাপী মহাজীবন বিচিত্র বৈচিত্র্যময় (দ্রষ্টব্য তৃতীয় খণ্ড)।

যাহোক, বামদেবের প্রতি পাণ্ডাদের বহু অত্যাচারের কাহিনী লেখক শুধু শচী পাণ্ডার স্ত্রী সুধামুখী দেবী, নগেন্দ্র নাথ বাগচি প্রভৃতিই নয়, বামদেবের আরো বহু শিষ্য ভক্তের কাছেও শুনেছেন।

তাঁদের মধ্যে প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়, শশী মোড়ল, করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য্য, ভৈরব দাসজ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত, গৌড় প্রামাণিক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া বামদেবের একাধিক জীবনীগ্রন্থেও এই ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে।

যাহোক, বামদেবের অন্তলীলার শেষ পর্য্যায়ে পাণ্ডারা বামদেবের মাহাত্ম্য কিছুটা বুঝতে পারেন। অনেকে শিবাবতার বামদেবের কৃপালাভের জন্য সচেষ্ট হন। তখন পাণ্ডাদের অনেকেই শাসক থেকে ক্রমে ক্রমে সেবকের পর্য্যায়ে উপনীত হ'বার তাগিদ অন্তর থেকে অনুভব করেন।

শাসনের পরিবর্তে সেবা যত্ন শুরু করেন তাঁরা বামদেবের। তবু মাঝে মাঝে ঘরোয়া পরিবেশে দীর্ঘকালের পূর্ব অভ্যাসবশত তাঁদের বিরূপ মনোভাব তাঁদের ভাব ও ভাষায় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

তবু বামদেবের অন্তলীলায় মূলত মধ্যভাগ থেকে তিরোভাব পর্যন্ত শেষ লগ্নে অনেক পাণ্ডাই বামদেবের অল্পবিস্তর সেবাযত্ন করেন।

তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ভূপতি পাণ্ডা, নুটু পাণ্ডা, শচী পাণ্ডা, নবীন পাণ্ডা, বিপিন পাণ্ডা প্রভৃতি গণ। কালক্রমে নগেন পাণ্ডাও বামদেবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে বামদেবের অন্তলীলার বিভিন্ন সময়ে তাঁর দিব্য সঙ্গলাভ করে ধন্য হন এবং সস্ত্রীক বামদেবের কিছু সেবা যত্নও করেন।

নগেন পাণ্ডা নানা কারণে বামদেবের প্রিয় পাত্র হন। নগেন পাণ্ডার বুদ্ধিদীপ্ততার জন্য বামদেব তাঁকে স্নেহ করেন। যদিও নগেন পাণ্ডার বিষয় বুদ্ধি ও আর্থিক আকর্ষণ অত্যন্ত বেশী পরিমাণে দেখা যায়, এমন কি ১৩১৫ সালে বামদেবের বিরাট টাকাচুরির সাথেও তিনি জড়িয়ে পড়েন এবং বামদেবের কৃপায় ছাড়া পান (যথাসময়ে সেই কাহিনী বর্ণিত হবে) তা সত্ত্বেও নগেন পাণ্ডাকে বামদেব স্নেহ করেন এবং তাঁর নিত্য আসরে স্থান দেন। বামদেবের সাথে সৌভাগ্যবশত নগেন পাণ্ডা বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন।

অনেক পাণ্ডার ন্যায় নগেন পাণ্ডাও বামদেবকে একাধিকবার নিজগৃহে নিয়ে গিয়ে সেবা যত্ন করেন।

অনেক সময় বামদেবের সেবার জন্য নিজের ঘর থেকে মুড়ি 'কারণ' ছোলাভাজা প্রভৃতি খাবার নিয়ে যেতেন। তাঁর সাধ্বী স্ত্রী শরৎ কুমারী দেবী বামদেবকে একাধিকবার নিজ গৃহে এনে সানন্দে 'সেবা' করান।

কখনো বামদেবের প্রিয় কুকুর কালু এসে বামদেবের নির্দেশে নগেন পাণ্ডার ঘর থেকে মুড়ি 'কারণ' প্রভৃতি খাবার নিয়ে যেত। শরৎ কুমারী দেবী সযত্নে তা গামছায় বেঁধে কালু কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।

ভূপতি পাণ্ডার পর্য্যাপ্ত সেবাযত্ন অনেকেরই প্রশংসা অর্জন করে। ভূপতি পাণ্ডা বামদেবকে তাঁর আশ্রমে নিত্য সাধ্যমত সেবাযত্ন করেন। তাছাড়া নিজ গৃহেও বামদেবকে নিয়ে গিয়ে বহুবার যত্ন করে খাওয়ান। অপুত্রক ভূপতি পাণ্ডা বামদেবের নিত্য সেবক রূপে কালক্রমে চিহ্নিত হন। তিনি বহুদিন নিজের হাতে বামদেবকে খাইয়ে দেন। শিশুভাব বামদেব কখনো খেতে না চাইলেও তিনি আদর করে 'খাও বাবা খাও' বলে খাইয়ে দিতেন যত্ন করে।

নুটুবিহারী পাণ্ডাও বামদেবকে যথেষ্ট সেবাযত্ন করেন। তাঁর বিছানা করে দেয়া, মশারী টাঙিয়ে দেয়া, তারামা'র ভোগপ্রসাদ এনে দেয়া প্রভৃতি কাজ যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে করেন।

বামদেব যে 'মহাপুরুষ' তা তিনি অনেক পাণ্ডার উপলব্ধির পূর্বেই নিজে উপলব্ধি করেছিলেন।

১৩১১ সালে শ্রাবণ মাসে শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কথাপ্রসঙ্গে তা তিনি স্বীকার করেন। তাছাড়া হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়-কেও ১৩১১ সালে ভাদ্র মাসে বামদেব যে 'মহাপুরুষ' তা প্রথম সাক্ষাতেই বলেন স্বেচ্ছায়।

শচীপাণ্ডাও বামদেবকে যথেষ্ট সেবা যত্ন করেন এবং তাঁর স্ত্রী সুধামুখীদেবীও বামদেবকে একাধিকবার নিজের হাতে রান্না করে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে তাঁর স্বামী গৃহে বামদেবকে ভোজন

করান। করুণাময় বামদেব পরম তৃপ্তির সাথে আহার করে শচী পাণ্ডা ও সুধামুখীদেবীকে আশির্বাদ করেন।

এভাবে বামদেবকে একাধিকবার সেবা করবার মহাসৌভাগ্য সুধামুখী দেবী লাভ করেন। নবীন পাণ্ডাও বামদেবের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনিও সাধ্যমত বামদেবের সেবাযত্ন করেন।

তাঁর স্ত্রী কুণ্ডলিনী দেবীও একবার নিজ হাতে বামদেবকে সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তাছাড়া নগেন পাণ্ডার দ্বিতীয় পুত্র ভোলানাথ পাণ্ডার স্ত্রী সৌভাগ্য-বাসিনী দেবীও বামদেবের কৃপালাভ করেন। তাছাড়া বিপিন পাণ্ডাও বামদেবকে মাঝে মাঝে নিজ সামর্থ অনুযায়ী সেবা যত্ন করেন।

সৌভাগ্যবশত উপরোক্ত পাণ্ডাগণ বামদেবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে থাকেন ক্রমে ক্রমে। তাঁর ফলে তাঁদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই সুফল লাভ হয়।

বামদেবের অনেক দিব্যলীলা দর্শনের সৌভাগ্য যেমন তাঁদের লাভ হয় তেমনি শিমূলতলায় নানান ক্রিয়া অনুষ্ঠানেও তারা অংশ গ্রহণ করেন। তার ফলে তাঁদের জাগতিক তথা আর্থিক লাভ যথেষ্ট হয়।

তাছাড়া বামদেবের বহু শিষ্য ভক্ত ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁদের যজমান হন বরাবরের জন্য। তাঁর ফলে তাঁদের আর্থিক. স্বাচ্ছন্দ্যও বৃদ্ধি পায়। যজমানদের কাছে বামদেবের গুণ কীর্ত্তন করতে করতে পাণ্ডাগণ অবচেতন মনে বামদেবের ভক্ত হয়ে পড়েন। বামদেবের বহু অলৌকিক লীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে তাঁরা বামদেবের প্রতি নিজেদের অজান্তেই গুণমুগ্ধ ও ভক্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া বামদেবের সেবাযত্ন করতে করতে তাঁদের মনের মলিনতাও দূর হয়।

তারামা ও বামদেবের কৃপায় তাঁদের অধ্যাত্ম চিন্তাধারা ক্রমশঃ উন্নত হয়। বামদেবের শিষ্য ভক্ত ও গুণমুগ্ধ নরনারীর কাছেও তাঁরা সম্মান ও অর্থলাভ করেন। বামদেবের অসীম লীলা মাহাত্ম্যও তাঁরা ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকেন।

এমনি ভাবে শাসক থেকে সেবকে রূপান্তরিত হলেন পাণ্ডাগণ। এই রূপান্তরিত হতে দীর্ঘকাল সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়। পরিণামে তাঁদের সার্বিক কল্যাণই হয়।

পরম করুণাময় শিবাবতার বামদেব এই দোষগুণ সমন্বিত পাণ্ডাদের পূর্বোক্ত সকল দোষ ত্রুটি অপরাধ অসীম করুণাভরে ক্ষমা করেছেন।

শুধু ক্ষমাই নয়, পাণ্ডাদের বহু দোষ ও সীমাহীন অপরাধের জন্য অপার করুণাময় বামদেব বহুবার পাণ্ডাদের হয়ে তারামায়ের কাছে ক্ষমা পর্যন্ত চেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বামদেবের দিব্য কৃপাধন্য ও তারাপীঠের উত্তরে সরলপুর গ্রামের অধিবাসী গুপী লেট একদিন শিমূলতলা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দেখলেন ক্ষ্যাপা-বাবা (বামদেব) শ্মশানে তারামায়ের পাদপদ্মের কাছে একা বসে আছেন। অথচ কার সাথে যেন কথা বলছেন। কিন্তু তাঁকে ছাড়া গুপী লেট আর কারোকে দেখতে পাচ্ছেন না। গুপী লেট শুনতে পেলেন বামদেব বলছেন, "মা, অরা আমায় বেঁড়াইছে।" তারপর একটু পরে বামদেব আবার বললেন, "আমার তু আছিস, তু অদের বেঁড়াইলে কে দেখবে মা?"

অর্থাৎ 'মা (তারামা), ওরা আমায় মেরেছে। আমার তো তুমি আছ কিন্তু তুমি ওদের মারলে ওদের কে দেখবে?—অর্থাৎ রক্ষা করবে?'

সেদিন যে কোন কারণেই হোক পাণ্ডারা শাসকের ভূমিকা নিয়ে বামদেবকে ভীষণ ভাবে মেরেছে। কারণ তারামায়ের সেবায়েত পাণ্ডারা ছাড়া পরমপুরুষ বামদেবের দিব্য পবিত্র দেহে আঘাত করা আর কারোর পক্ষে সম্ভব তো নয়ই, এমন কি চিন্তারও অতীত।

সেই আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বামদেব শিমূলতলায় তারামায়ের পাদপদ্মের কাছে চলে এলেন।

যেমন ছোট্ট শিশু ব্যথা পেলে মায়ের কোলে চলে আসে। তারপর তাঁর সেই আঘাতকারী পাণ্ডাদের এই সীমাহীন অপরাধের জন্য যাতে

তারামা ক্রুদ্ধ হয়ে কঠিন শাস্তি না দেন, তার জন্য অপার করুণাময় বামদেব পাণ্ডাদের হয়েই তারামায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন যাতে তারামা এই মনুষ্যত্বহীন নিষ্ঠুর পাণ্ডাদের কোন শাস্তি না দেন (১৩৩৩ সালে এই কাহিনীটি ৯৩ বছর বয়স্ক গুপী লেট ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দকে বলেন। তিনি ১৩৮১ সালের ৫ই মাঘ রবিবার এই লেখককে বলেন)। আরেকবারও পাণ্ডারা বামদেবকে কঠিন ভাবে মেরেছিলেন। সেই অত্যাচার এতই মর্মান্তিক হয় এবং প্রচারিত হয় যে সিউড়ি থেকে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে তদন্ত করতে আসেন তারাপীঠে। বামদেবকে সবার সম্মুখে তিনি বার বার অনুরোধ করেন যে কোন্ কোন্ পাণ্ডা তাঁকে এমন নৃশংস ভাবে মেরেছে তা বলতে। কিন্তু কিছুতেই অসীম করুণাময় বামদেব তাঁর গুণমুগ্ধ ও ভক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে দোষী পাণ্ডাদের নাম বললেন না। বললে দোষী পাণ্ডাদের খুব কঠিন শাস্তি হ'ত এবং তাঁদের পরিবার ও সন্তানদের অশেষ দুর্গতি হ'ত। তাই পরম দয়ালু বামদেব এই বিবেকহীন মহাদোষী পাণ্ডাদের রক্ষা করলেন।

এভাবে পাণ্ডাদের বামদেব প্রতিবার রক্ষা করেছেন। ক্ষমা করেছেন এবং সর্বোপরি তারামায়ের কাছে পাণ্ডাদের জন্য সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু একবার নবদ্বীপে জগাই মাধাইকে, নিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত ও অপমান করার জন্য প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়েও পরে ক্ষমা করেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কাতর অনুরোধে। কিন্তু এ যুগে প্রেমাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা অনেক জগাই-মাধাই পাণ্ডাদের শত সহস্র অপরাধ, আঘাত, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পীড়ন শতসহস্র বারই ক্ষমা করেছেন। সর্বোপরি এই অজস্র জগাই-মাধাইদের এই মহা পাপের জন্য তারামায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

এটা একবার দু'বার নয়, অজস্রবার এবং দু'এক বছর নয় সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে।

ভারতবরেণ্য এই দেব মানবের এই ক্ষমা ও করুণা ভারতের

তথা পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসে এক অতুলনীয় অধ্যায় রূপে সুচিহ্নিত হয়ে আছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল তিনি যখন ভারতের অধ্যাত্ম জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এবং ভারতের সকল প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে সাধুসন্ত জ্ঞানীগুণী আসছেন এবং তাঁর অফুরন্ত অলৌকিক কৃপাশক্তি লাভের জন্য সহস্র সহস্র আর্ত তাপিত নরনারী আসছেন, তখনও তিনি পাণ্ডাদের কাছে দৈহিক পীড়ন লাভ করছেন। অথচ তাঁর ন্যায় অলৌকিক মহাশক্তিধর মহাযোগীর এক পলক লাগে এসব দুস্কৃতিকারী পাণ্ডাদের চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে কিন্তু অপার করুণাময় বামদেব সেই মহাশক্তি কখনো প্রয়োগ করেন নি।

অর্থাৎ সবল চিরদিন অতি দুর্বলের হাতে মার খেয়ে গেলেন। সকল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নীরবে সব সহ্য করে গেলেন। দুর্বলের অত্যাচার সহ্য করে গেলেন সবল চিরদিন। এ এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

কেন বামদেব সহ্য করলেন এই নৃশংস অত্যাচার প্রায় সারাজীবন ধরে ?

তার কারণ হ'ল পাণ্ডাগণ অতি সৌভাগ্যবশত তারামায়ের নিত্য সেবায়েত বংশ পরম্পরায়। মঙ্গল আরতি থেকে শীতলী ভোগ পর্যন্ত অর্থাৎ দিনের শুরু থেকে রাত পর্যন্ত পাণ্ডাগণ পালাক্রমে তারামায়ের সেবা করছেন! তারামা বামদেবের প্রাণাধিক প্রিয়। তাঁর যথাসর্বস্ব হ'ল তারামা। সেই তারামায়ের সেবা যাঁরা করেন তাঁদের কোন অপরাধই বামদেব দেখেন না। ক্ষমার দৃষ্টিতে তাঁদের সকল অপরাধই ক্ষমা করেন। এই ব্যাপারেও প্রমাণিত হ'ল যে বামদেব কিভাবে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে তাঁর প্রাণাধিক ইষ্টদেবী তারামাকে ভালবাসেন।

শুধু তারামাকে সেবা করবার জন্যই পাণ্ডাগণ সব অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন বামদেবের কৃপায়। বামদেব শুধু অপরাধ ক্ষমাই করলেন না উপরন্তু ত্রিলোকজননী তারামা যাতে এই দুস্কৃতিকারী পাণ্ডাদের শাস্তি না দেন তাঁরজন্যও কাতর প্রার্থনা করলেন। বামদেবের সকল কথাই শোনেন তারামা। তাই বামদেবের অনুরোধে

অপরাধী পাণ্ডাদের শাস্তি দিলেন না। ফলে দুর্বলের অত্যাচার সারা জীবন বামদেব সহ্য করে গেলেন। দুর্বলের অত্যাচার বড় ভয়ঙ্কর, তবে বামদেবকে এই সীমাহীন আঘাত অপমান করবার জন্য সেই অপরাধী পাণ্ডাদের ওপর এই অভিশাপ পড়েছে যে তাঁদের অভাব কোনদিন ঘুচবে না। বিষয় তৃষ্ণায় তাঁরা সর্বদা জ্বলবে।

যে বিষয় আশয় টাকা পয়সার জন্য তাঁরা বামদেবকে অপমান করেছে, আঘাত করেছে সেই টাকা পয়সার জন্য তাঁরা সারাজীবন তৃষ্ণার্ত চাতকের মত ঘুরবে।

মরীচিকার ন্যায় টাকা পয়সা তাঁদের ঘোরাবে সারাজীবন ধরে। জীবনেও অর্থের অভাব ঘুচবে না।

পরবর্তীকালে সেই পাণ্ডাদের জীবনে তাই দেখা গেছে।

যাহোক, পরম করুণাময় বামদেব শুধু পাণ্ডাদের ক্ষমাই করলেন না, উল্টো তাঁদের সেবা যত্নও গ্রহণ করে তাঁদের সীমাহীন অপরাধ লাঘব করলেন এবং তাঁদের পরলোকে মুক্তির ব্যবস্থাও করলেন অশেষ কৃপা করে। তাই শাসক থেকে সেবকে রূপান্তরিত হয়ে বামদেবের দিব্য দেহের সেবা করে পাণ্ডাদের মনও ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হ'ল। বামদেবের অন্তলীলার শেষভাগে উপরোক্ত পাণ্ডাগণ অনেকে সাধ্যমত সেবাযত্ন করেন বামদেবের। বামদেবের মহাপ্রয়াণের সময় নগেন পাণ্ডা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং বামদেবের নরলীলা সমাপ্তির সংবাদ গভীর রাতে প্রচণ্ড জল ঝড়ের মধ্যেও পাণ্ডাগণ এসে বামদেবের তিরোভাবে একান্ত প্রিয়জন হারানোর ন্যায় শোক প্রকাশ করতে থাকেন।

বামদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও তথাকথিত সেবক পাণ্ডাগণ শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন।

পাণ্ডাদের পরিবার বর্গ ও তাঁদের সন্তানগণ বামদেবের তিরোভাবের পরদিন (৩রা শ্রাবণ, ১৩১৮) সজল নয়নে এসে শোক প্রকাশ করেন। অনেকে আলতা দিয়ে বামদেবের পবিত্র শ্রীপাদপদ্মের ছাপ সযত্নে তুলে পরম শ্রদ্ধার সাথে বাড়ীতে নিয়ে যান।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য সুশীলকুমার রায়

জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। বিশেষ করে অধ্যাত্ম রাজ্যে। যাঁর প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নেই, যাঁকে যাচাই না করে সাধু বলতে ইচ্ছা করে না, সেই লোকের কাছেই যদি শেষ পর্যন্ত মাথা নত করতে হয় ও প্রাণের আবেগে দীক্ষা নিতে হয় এবং চিরতরে গুরুরূপে বরণ করে নিতে হয় তবে তাকে অসম্ভব বা অঘটন ছাড়া আর কি বলা যায়।

সেই অঘটনই ঘটলো নদীয়া জেলার শান্তিপুর নিবাসী শ্রীসুশীল কুমার রায়ের জীবনে। আর সেই অঘটনের নায়ক হলেন ভারতবিখ্যাত মহাযোগী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা।

এই ভাগ্যবান ভক্তপ্রবর সুশীলকুমার রায়ের জন্ম বাংলা ১২৮৭ সালের ৪ঠা আশ্বিন, বুধবার। তাঁর পিতার নাম পরমেশ্বর রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়)। পরমেশ্বরবাবুর জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটে তাঁর কর্মজীবন সিমলাতে।

সুশীলবাবু শিশুকাল থেকেই জ্ঞানপিপাসু। শিক্ষান্তে বেঙ্গল ক্যেমিক্যালে চাকরী করেন। এই সময় সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর বন্ধু অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য তারাপীঠের শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সুযোগ্য শিষ্য। এই বন্ধুর সংস্পর্শে এসে সুশীলবাবু অধ্যাত্ম জগত সম্পর্কে আকৃষ্ট হন।

অমূল্যধনবাবু সুশীলবাবুকে বার বার বলেন তারাপীঠে তাঁর গুরুদেব বামাক্ষ্যাপার কাছে যেতে এবং নিজেও নিয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু কি জানি কেন তিনি বামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করতে যেতে চাইলেন না। বরং তীর্থ ভ্রমণে বের হয়ে তিনি একে একে বহু মহাপুরুষের দর্শন লাভ করলেন। তাঁদের মধ্যে কাশীর ভাস্করানন্দ সরস্বতী, বৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়াবাবা এবং তাঁর শিষ্য সন্তদাস বাবাজী,

গোরখপুরের স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিখ্যাত যোগী ও তন্ত্রসিদ্ধপুরুষ খাকিয়াবাবার সান্নিধ্যেও আসেন। তীর্থ ভ্রমণ করে তিনি মনের আনন্দে ফিরে এলেন। কিন্তু তারাপীঠে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে যেতে তাঁর মন চাইলো না।

অবশেষে বন্ধু অমূল্যধন ভট্টাচার্য্যের একান্ত অনুরোধে সুশীলবাবু ১৩১৩ সালে বন্ধুর সাথে তারাপীঠ রওনা হলেন। ছাব্বিশ বছরের যুবক সুশীলবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুধুমাত্র বন্ধুর একান্ত অনুরোধে তারাপীঠে চললেন। তারাপীঠ পৌঁছে যথাসময়ে বামাক্ষ্যাপাবাবার দর্শন লাভ করলেন। কিন্তু বামদেবের বহিরঙ্গের ভীম ভৈরব উগ্র মূর্তি দেখে এবং কুকুরদের সাথে এক থালায় খেতে দেখে সুশীলবাবুর ভাল লাগলো না। বামদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি এল না। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুদিন তারাপীঠে কাটালেন বন্ধু অমূল্যধন ভট্টাচার্য্যের সাথে হরি পাণ্ডার গৃহে।

বামদেবের শাস্ত্রীয় জ্ঞান পরীক্ষা করবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বামদেবের উগ্রমূর্তি ও গালাগালির ভয়ে বামদেবের কাছে একবারও যেতে সাহস পেলেন না সুশীলবাবু।

অবশেষে হতাশ হয়ে তারাপীঠ থেকে বাড়ী ফিরে এলেন। কিছুদিন পর পুনরায় তারাপীঠে এলেন বামদেবকে যাচাই করবার জন্য কিন্তু এবারও বামদেবের সামনে যেতেই সাহস পেলেন না। কিছুদিন তারাপীঠে অবস্থান করে পুনরায় বিফল হয়ে গৃহে ফিরে গেলেন।

এভাবে বহুবার তারাপীঠে যাতায়াত করতে লাগলেন। তারামা ও বামদেবের কি রহস্যময় লীলা। বামদেবকে সুশীলবাবু একবারও যাচাই করতে সাহস পাচ্ছেন না অথচ তারাপীঠে আসাও বন্ধ করতে পারছেন না।

প্রতিবারই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তারাপীঠে আসছেন। ভাবছেন এবার ঠিক বামদেবকে যাচাই করে নেবেন কিন্তু প্রতিবারই বামদেবের সামনে যেতেই সাহস হারিয়ে ফেলেন। দূর থেকেই বামদেবকে শুধু

দেখেন। এক অদৃশ্য অমোঘ ভয়ে তিনি বামদেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেন। কথা বলা তো দূরের কথা।

অথচ বিচিত্র ব্যাপার এই যে, যতই তিনি বিফল হতে লাগলেন ততই তাঁর জেদ বাড়তে লাগলো। বার বার চাকরী থেকে ছুটি নিয়ে এভাবে তারাপীঠে আসা যায় না। তাই চিরতরে চাকরী ছেড়ে দিয়ে তারাপীঠে এসে বাস করতে লাগলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বামদেবকে যাচাই করা। এদিকে শান্তিপুরের বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র কন্যা সব পড়ে রইলো।

সুশীলবাবুর সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল। পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট রয়েছে কিন্তু বামদেবকে পরীক্ষা করবার প্রচণ্ড জেদের বশে দীর্ঘদিন ধরে তিনি তারাপীঠ বাস করায় তাঁর জমিজমা সম্পত্তিসকল তদ্বিরের অভাবে হাতছাড়া হতে লাগলো। সময় মত খাজনা না দেয়ায় অনেক সম্পত্তি নিলামে উঠলো। ফলে আথিক অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় রূপ ধারণ করলো। তবু সুশীলবাবু তাঁর জেদ ছাড়লেন না। বছরের পর বছর এভাবে কাটতে লাগলো। এ এক মহাবিস্ময়কর ব্যাপার। শুধু মাত্র বামদেবকে যাচাই করবার জন্য একজন তাঁর ঘর বাড়ী স্ত্রী পুত্র কন্যা বিষয় আশয় সব ফেলে বছরের পর বছর তারাপীঠে বাস করছেন অথচ বামদেবের সামনে গিয়ে যাচাই করা বা কথা বলার সাহসও নেই। তবু জেদ বজায় রাখছেন। একদিকে তাঁর সংসারের তীব্র অভাব, স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজন চিঠির পর চিঠি দিয়ে সংসারের চরম দুরাবস্থা জানিয়ে তাঁকে বার বার শান্তিপুরে ফিরে আসতে লিখছেন অন্যদিকে তীব্রতম জেদ বামদেবকে পরীক্ষা করবার। এই দুই বিপরীত অবস্থা ক্রমে এক চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো।

এ যেন ঈশ্বরকে শত্রুরূপে সাধনা করা। তার ফল হ'ল এই যে, ঈশ্বরের শক্তি পরীক্ষা করবার অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে মূলত ঈশ্বরের স্মরণে মননেই দিনরাত অতিবাহিত করা অব্যাহত রইলো।

কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত করুণাময়। শত্রুরূপী সেই ভক্তের প্রতি তিনি

সদাই সদয়। শিবাবতার বামদেব তাঁর এই বিচিত্র ভক্ত সন্তানের সব খবরই রাখেন। তিনি সর্বজ্ঞ, তাই তাঁর অজানা কিছু নেই।

ভক্তি করে বা অভক্তি করে শত্রু বা মিত্ররূপে যেভাবেই স্মরণ মনন করুক করুণার সাগর বামদেব তাতেই প্রসন্ন। তাতেই কৃপা করেন।

সুশীলবাবুর সুদীর্ঘ চার বছর ব্যাপী অসীম ধৈর্য্য, সহ্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, স্মরণ মনন প্রত্যক্ষ করে বামদের যথার্থ প্রসন্ন হয়ে কৃপা করলেন।

১৩১৬ সালে বৈশাখ মাসে এক অমাবস্যার রাতে বামদেব যখন তাঁর প্রিয় কুকুরদের নিয়ে মহাশ্মশানে শিমুলতলায় শান্ত সমাহিত হয়ে বসে আছেন সেই সময় সুশীলবাবু সাহসভরে বামদেবের সামনে উপস্থিত হলেন। শ্রীবাম সবই জানেন। নাদসিদ্ধ বামদেব বজ্রগম্ভীর স্বরে 'জয়তারা' বলে ডেকে উঠলেন। আকস্মিক চোখের সামনে বাজ পড়লে যে ভয়ঙ্কর শব্দ হয় ঠিক সেই রকম ভয়ঙ্কর শব্দে সমগ্র মহাশ্মশান কেঁপে উঠলো। সেই মহানাদ ধ্বনি শুনে সুশীলবাবু ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বামদেবকে পরীক্ষা করবার এত বছরের বাসনা তাঁর মন থেকে মূহূর্তে বিলীন হয়ে গেল।

সজল নয়নে বিগলিত অন্তরে এগিয়ে এসে বামদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করলেন। অপার করুণার সাগর বামদেব সস্নেহে সাদরে ভক্ত সুশীলকুমারকে বুকে টেনে নিলেন। শিশুর মত বামদেবের বিশাল করুণাঘন বক্ষে মাথা রেখে সুশীলকুমার পরম শান্তি লাভ করলেন। এত শান্তি জীবনে কখনো লাভ করেননি। তারপর বামদেব মধুর কোমল স্বরে তাঁকে বললেন, "আপনি কি চান বাবা?"

এই দিব্য কণ্ঠস্বর শুনে সুশীলবাবু আনন্দে আপ্লুত হয়ে বললেন, "আমি দীক্ষা চাই।"

সস্নেহে বামদেব বললেন, "বেশ বাবা, নিশ্চয়ই দেব। যাও শীঘ্র নদীতে স্নান করে এসো।"

সুশীলবাবু মহানন্দে দ্রুত দ্বারকা নদীতে স্নান করতে গেলেন।

যেতে যেতে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে কত বড় অন্যায় চিন্তা ও কাজ এতদিন তিনি এই পরম করুণাঘন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সম্বন্ধে করেছিলেন। চরম অনুশোচনায় তিনি অন্তরে দগ্ধ হতে লাগলেন।

যা হোক, তাড়াতাড়ি দ্বারকা নদীতে স্নান করে শিমুলতলায় এলেন। মহানিশার মহালগ্নে বামদেব তাঁকে মহাপবিত্র ও মহাজাগ্রত শিমুলতলায় তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মের সামনে তারামন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষার পর মহাসৌভাগ্যবান সুশীলকুমারকে এই মহাশ্মশানের শিমুলতলায় বসে জপ করতে বলে বামদেব তারামন্দিরে চলে গেলেন।

একে সদ্যদীক্ষাপ্রাপ্ত সুশীলকুমার রায় অত্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব আধারের অধিকারী, তার ওপর মন্ত্রদাতা স্বয়ং তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব শিবাবতার স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা আর জপের ক্ষেত্র হ'ল মহাশ্মশানের মহাজাগ্রত শিমুলতলার লক্ষমুণ্ডী আসন। তাই পরম ভাগ্যবান সুশীলবাবু সেখানে বসে মাত্র তিনবার জপ করতেই সহসা এক দিব্য স্বর্গীয় মহাজ্যোতিতে সমগ্র মহাশ্মশান আলোকিত হয়ে গেল। অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার দূর হয়ে সহস্র সূর্য্যের দীপ্তিতে প্লাবিত হ'ল মহাশ্মশান।

সেই অলৌকিক অফুরন্ত নীলাভ মহাজ্যোতি জপরত সুশীলকুমারের সামনে উপস্থিত হতেই তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে আসন ছেড়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন এবং মাটিতে পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

যখন তাঁর জ্ঞান হ'ল তখন ভোর হয়ে গেছে। সুশীলকুমার চোখ মেলে দেখলেন বামদেবের কোলে তাঁর মাথা। বামদেব সস্নেহে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ভয় কি বাবা, ও যে তারামা।"

তাই শুনে মনের আনন্দে উঠে বসে শ্রীগুরু বামের চরণ বন্দনা করলেন তিনি।

কৃপাময় বামদেব তাঁর এই সদ্যদীক্ষিত শিষ্যকে "শ্রীদুর্গা জয়তারা" বলে সানন্দে আশীর্বাদ করলেন।

গুরু বামদেবের পরম কৃপালাভ করে পরম আনন্দে শিষ্য সুশীলকুমার রায় তারাপীঠে থাকতে লাগলেন।

শ্রীগুরু বামের নিত্য দিব্য সঙ্গলাভ করে এবং তাঁর বহু অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করে জীবন সার্থক করতে লাগলেন।

জাগতিক সংসারের কথা ও স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা প্রায় ভুলেই গেলেন। কিন্তু চিরন্তনী জগতজননী তারামা তাঁর ভক্তসন্তান সুশীল কুমারকে তা মনে করিয়ে দিলেন।

এক শোকের মধ্য দিয়ে সুশীলকুমারকে সংসারের ক্ষণিক মায়া থেকেও মুক্ত করে দিলেন।

সুশীলবাবুর শান্তিপুরের বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এল যে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার কলেরা হয়েছে এবং অন্তিম অবস্থা। বামদেব তাঁকে ডেকে টেলিগ্রামের কথা জানালেন এবং বললেন বাড়ী যেতে।

এই দ্বিতীয়া কন্যাকে সুশীলবাবু অত্যন্ত ভালবাসেন এবং এই কন্যাই তাঁর সংসারের মূল বন্ধন।

সুশীলবাবু টেলিগ্রাম পেয়ে এবং শ্রীগুরু বামদেবের নির্দেশ পেয়ে সজল নয়নে বামদেবের চরণে প্রার্থনা করলেন যে তিনি যেন বাড়ী গিয়ে কন্যাটিকে জীবিত দেখতে পান। যতক্ষণ না বাড়ী পৌঁছান ততক্ষণ যেন কন্যাটি জীবিত থাকে। করুণাময় বামদেব তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন।

সুশীলবাবু তারাপীঠ থেকে শান্তিপুর যাত্রা করলেন। পরদিন বাড়ী পৌঁছলেন। কন্যাটি এতক্ষণ যেন পিতার জন্যই জীবিত রয়েছে। পিতাকে কাছে পেয়ে প্রাণভরে 'বাবা' বলে ডেকে উঠলো। তারপর দু'হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে দেহত্যাগ করলো।

প্রাণাধিকা কন্যার কঠিন মৃত্যুশোক সুশীলবাবু শ্রীগুরু বামের কৃপায় শান্তভাবে গ্রহন করলেন। দ্বিতীয়া কন্যার শেষকৃত্য নিজের হাতে শান্ত চিত্তে সম্পন্ন করে উদাস হৃদয়ে তারাপীঠে ফিরে এলেন। সংসারের প্রতি আর কোন আকর্ষণ রইলো না। তারপর দীর্ঘদিন তিনি তারাপীঠে গুরুর অপার পবিত্র সঙ্গ ও সাধনপথের নির্দেশ লাভ করে

জীবন সার্থক করলেন। শ্রীগুরু বাম স্থূলদেহে অপ্রকট হবার পর তিনি গৃহে ফিরে গেলেও সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে সাধন জীবনের মধ্যে মগ্ন রইলেন।

জীবনের শেষভাগে বিহারের রাঁচীতে অতিবাহিত করলেন। সুশীলবাবুর চার ছেলে তিন মেয়ে। ছেলেদের নাম প্রফুল্ল, প্রমথ, সচ্চিদানন্দ ও বামাপ্রসাদ।

মাতৃসাধক সুশীলবাবুর প্রগাঢ় ভক্তি, সততা, শিশুর মত সরলতা এবং বিনয়তার জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় হন।

এই মহান গুপ্তসাধক শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপা প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধ চিত্তে বলেন, "যা হারিয়েছি তা আর জীবনেও পাব না। তিনি পিতা মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, স্নেহাস্পদ ও স্নেহময়ী। দেব দেবী কিছু বুঝি না, তিনিই সব।"

পরবর্তীকালে মহাত্মা সুশীলকুমার রায় অনেক সাধক ভক্তকে ঈশ্বরীয় পথে নিয়ে যান।

তাঁর শিষ্যভক্ত ও গুণমুগ্ধের সংখ্যা কম নয়। অবশেষে ঘনিয়ে এল তাঁর ঐশী নির্দিষ্ট ইহজীবনের শেষ দিনটি।

বাংলা ১৩৬০ সালের ১৪ই কার্তিক শনিবার কৃষ্ণানবমী তিথিতে রাত ৯॥ টায় ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামাক্ষ্যাপাকে স্মরণ করতে করতে স্থূলদেহ ত্যাগ করে অমৃতধাম বামমণ্ডলে চলে গেলেন।

পবিত্র সুবর্ণরেখা নদীতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। অশেষ বিরূপতার মধ্য দিয়েও যে অসীম করুণাময় সদ্‌গুরু লাভ করা যায় তার এক জীবন্ত নিদর্শন হলেন সিদ্ধসাধক মহাত্মা সুশীলকুমার রায়।

তাঁর পবিত্র মহাজীবন সংশয় ও শরণাগতির এক আশ্চর্য্য মহা সমন্বয়ের অতুলনীয় আলোকে উদ্‌ভাসিত।

—o—

নাম প্রেমে শ্রীবাম

বাংলা ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাস। গ্রীষ্মের দাবদাহের পর সন্ধ্যাবেলা জীবিতকুণ্ডের পশ্চিমদিকের চাতালে বামদেব বসে আছেন। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন তারামায়ের দিব্যমন্দিরের দিকে। তারা নামে মাতোয়ারা তারাময় শ্রীবাম মাঝে মাঝে প্রাণভরে বলছেন, "তারা, 'জয় তারা', 'জয় জয় তারা', শ্রীদুর্গা জয় তারা।" নাদসিদ্ধ বামদেবের মেঘগর্জনের মত এই গুরুগম্ভীর স্বর শুধু জীবিতকুণ্ড নয়, সমগ্র তারাপীঠকে প্রকম্পিত করছে।

বহু দূর থেকে এই মেঘমন্দ্রিত নাদসিদ্ধ স্বর শুনে লোকে বলাবলি করেন, "ঐ যে বামাক্ষ্যাপাবাবা ডাকছেন।"

আবার গভীর রাতে মহাশ্মশান থেকে যখন বামদেবের এই বজ্রগম্ভীর স্বর ভেসে আসে তখন তিন চার মাইল দূর থেকেও তা লোকে শুনতে পান। নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে গভীর শ্রদ্ধা ও ভয়ের সাথে লোকে তা শ্রবণ করেন। দীর্ঘকাল ধরেই তাঁরা শুনছেন। শ্রীবাম যখন বিশেষ করে ভাবে বিভোর হয়ে 'শ্রীদুর্গা জয় তারা' বলেন তখন উপস্থিত শিষ্য ভক্তগণের অন্তরলোক অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়। 'দুর্গা' শব্দের ওপর জোর দিয়ে এক দিব্য ভাবের প্রবাহ তিনি সৃষ্টি করেন। জনৈক ভক্ত একবার শ্রীবামের কাছে জানতে চান যে তারা নামেই তো সব তরিয়ে যায়, তারামা-ই তো সব বিপদ থেকে তারণ করেন। তাই তারা নামের সাথে দুর্গা নাম যুক্ত করার সার্থকতা কি?"

উত্তরে শ্রীবাম স্নেহভরে বলেন, "দশ মহাবিদ্যার মধ্যে মহাবিদ্যা হ'ল কালী ও তারা। আর সব বিদ্যা। এই মহাবিদ্যা কালী ও তারার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যা হল তারা। কালী কৈবল্যদায়িনী,

তারা পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রদায়িনী। তারা অভেদজ্ঞানদায়িনী, পরম লয়-কারিণী। ব্রহ্মময়ী তারা তাই শূন্যময়ী। এই শূন্যই হ'ল পূর্ণ। দুর্গা হলেন সকল দেবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। তিনি জীবের ত্রিতাপ দুর্গতি নাশ করেন। তিনি সকল শুভশক্তির প্রতীক। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যা তারা ও সর্বশ্রেষ্ঠ দেবীর নাম একসাথে উচ্চারণ করলে জীব একই সাথে ত্রিতাপ জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়।"

তাই করুণাময় বামদেব নাম সর্বস্ব এই কলিযুগে ('নামৈব কেবলম্') এই দুই মহা নাম দুর্গা ও তারাকে জীবের সার্বিক মুক্তি ও পরমপ্রাপ্তির জন্য এক অমৃত সূত্রে গেঁথে প্রতিদিন অজস্রবার প্রাণ ভরে মধুর ভাবে বলেন, "শ্রীদুর্গা জয় তারা।" নিকটে দূরে যাঁরা পরম আনন্দে এই মহা সিদ্ধনাম শ্রবণ করেন এবং এই নামামৃতের স্বর্গীয় সুধাপান করেন তাঁদের ন্যায় মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সংসারে আর কে আছেন? শুধু মানুষ নয়, পশু পাখী কীট পতঙ্গ তরুলতা প্রভৃতিও শ্রীবামের এই 'শ্রীদুর্গা জয় তারা' নাম শুনে জগৎ জীবনের মায়িক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবার দিব্যশক্তি লাভ করেন। কলি যুগে দুর্গা, কালী, তারা, শিব হরি, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সবই সিদ্ধ নাম।

শ্রীবাম কথিত 'দুর্গা' নামের ও নাম মাহাত্ম্যের ও শক্তির গভীরতা ও তাৎপর্য্য একাধারে অসীম ও অফুরন্ত।

শিবোক্ত তন্ত্রে আছে, "দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণ যথা।

তথা সর্বশাস্ত্রানাং তন্ত্রশাস্ত্র মনুত্তমম্॥"

অর্থাৎ সকল দেবীর মধ্যে দুর্গা, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ।

'দুর্গা' নামটির শব্দ ও অর্থও গভীরতম ব্যঞ্জনাপর্ণ।

দু+গ+রেফ+আ=দুর্গা

অর্থাৎ দু মানে দুর্গতি, দুঃখ, দুর্দশা প্রভৃতি সকল ভীষণ বিপদ। গ মানে গতিমুক্তি তথা মহাজ্ঞান, রেফ মানে—বিনাশ করা, আ মানে

—অনন্ত মহাশক্তি। তাই দুর্গা শব্দের সামগ্রিক অর্থ হ'ল, যিনি সকল দুর্গতি নাশ করে গতি (সুখ শান্তি আরোগ্য যশ জয় প্রভৃতি) ও মুক্তি (মায়া মোহ প্রভৃতি অবিদ্যা থেকে) প্রদান করে মহাজ্ঞান দান করেন—সেই অনন্ত মহাশক্তিই হলেন দুর্গা। তাই ভগবতী দুর্গা হলেন স্বগুণ ব্রহ্মের সাকার স্বরূপা। তিনিই ব্রহ্ম সনাতনী, নারায়ণী, চণ্ডী, তারা, সর্বমঙ্গলা, মহাকালী, মহাদেবী, মহাযোগিনী, মহামায়া, শিবা, বিশ্বেশ্বরী, ভৈরবী, উমা, প্রভৃতি অজস্র নামে বিভষিতা।

আবার তিনিই দশমহাবিদ্যাস্বরূপিনী। এই পরম কল্যাণময়ী, ত্রিলোকঈশ্বরী, দেবী দুর্গার অনন্ত নাম ও অনন্তরূপ। তিনি সর্ব-গুণান্বিতা, তিনি ত্রিগুণময়ী, আবার ত্রিগুণাতীতা এই অষ্টশক্তিমাতা চৌষট্টিকৃতা অসুরদলিনী, সর্বরিপুনাশিনী ভগবতী দুর্গার পূজা সাত্ত্বিক ও রাজসিক উভয় ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা, মহাপূজা। এক দুর্গাপূজার মধ্যেই সকল দেবদেবীর পূজা হয়। তাই তিনি সর্ব জীবের সর্ব লোকের সর্ব দেবদেবীর আরাধ্যা দেবী। তিনি সকল সন্তানের পরম মঙ্গলকারিনী চিরন্তনী জননী।

তাই এই অনন্তশক্তিময়ী, সকল দুর্গতিনাশিনী, ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী সর্ব মঙ্গলরূপিনী সকল শ্রীসম্পন্না 'শ্রীদুর্গা' নাম বামদেব পরম ভক্তিভরে মহানন্দে উচ্চারণ করেন। এই সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী মহানামের সাথে পরম ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী মহাবিদ্যা মহানাম 'তারা' নাম যুক্ত করে শিবাবতার বামদেব জগতকে জানালেন যে এই দুই মহাসিদ্ধ নামের মহামিলনে সর্বতোভাবে জীবনে মরণে 'জয়' অনিবার্য। ইহকাল পরকাল চিরকাল এই 'জয়' অব্যাহত থাকবে।

তাই নাম প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীবাম জগতকে শোনালেন এই অভূতপূর্ব মহানাম ব্রহ্মনাম মহা সিদ্ধনাম "শ্রীদুর্গা জয় তারা।"

এই কলিযুগে যাগ যজ্ঞ তপস্যা না করে শুধু নাম করলেই ভক্তি মুক্তি মিলবে। তাই নামৈব কেবলম্। তাই সকল যুগের মধ্যে কলিযুগ হ'ল শ্রেষ্ঠ ("প্রণমোহ কলিযুগ সর্বযুগ সার।")।

এই নামমণ্ডিত কলি যুগে তারক ব্রহ্মনাম মহাসিদ্ধ নাম—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

শিবাবতার শ্রীবাম করুণাবতার শ্রীবাম প্রেমাবতার শ্রীবাম কলিযুগে অন্নগত প্রাণ অল্পায়ু দুর্বল জীবের ভক্তি মুক্তির জন্য আরো সংক্ষেপে পরম পবিত্র মধুর নাম প্রবর্তন করলেন—

"শ্রীদুর্গা জয়তারা।"

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যুক্ত মধুর তারক ব্রহ্মনামের চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত অথচ মধুর এই অমৃতময় মহানাম—'শ্রীদুর্গা জয়তারা'। এই সদা মঙ্গলময় 'শ্রীদুর্গা জয়তারা' নাম যেমন উচ্চারণে তেমনি স্মরণে মননে ধ্যানে জ্ঞানে সাধনে সর্বক্ষণেই সহজতম ও মধুরতম।

তাই শিবস্বরূপ শ্রীবাম প্রবর্তন করলেন এই কলিযুগে জগৎ ও জীবের সার্বিক কল্যাণ ও মহামুক্তির জন্য এই ইহকাল পরকাল চির-কালের পরম পাথেয় পরম আনন্দম্ অমৃতম্ মধুরম্—'শ্রীদুর্গা জয়তারা'।

—o—

শ্রীবামের আশীর্বাদধন্য শ্রীবাস মণ্ডল

জীবিত কুণ্ডের পশ্চিম দিকের ঘাটের চাতালে একদিন বামদেব শান্তভাবে বসে আছেন। জীবিত কুণ্ডের দক্ষিণে তারামায়ের মন্দির। বামদেব সেই দিকে পরম আনন্দে তাকিয়ে আছেন। বামদেবের সামনে কয়েকটি কলকে ফুলের গাছ।

এই সময় বামদেবপুর নিবাসী শ্রীবাস মণ্ডল অনেক কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে এসে বামদেবের পায়ের কাছে বসে হাঁপাতে লাগলো।

একজ্বরী রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ছয়মাস ধরে বেচারা ভুগছে। সকল গ্রাম্য চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে। ডাক্তার ও বাড়ীর সবাই জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে। যে কোন দিন মৃত্যু হতে পারে। তাই জীবন প্রদীপ নিভে যাবার পূর্বে ধুকতে ধুকতে এসেছে বামদেবের পরম পবিত্র চরণ ধূলি নেবার জন্য।

করুণাসিন্ধু বামদেব মধুর স্বরে শ্রীবাস মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বললেন। "আহা মোড়লবাবা, আপনার এ দশা কেন হ'ল?"

বামদেবের এই স্নেহভরা প্রশ্ন শুনে শ্রীবাস মণ্ডল কাতরভাবে বললো, "আর বাঁচবোনি বাবা, অনেকদিন ভুগছি, তাই একবার শেষ দেখা দেখতে এসেছি। একটু চরণের ধূলি আর প্রসাদ দেন বাবা।"

করুণাময় বামদেব তাঁর করুণাভরা দিব্য হাত দিয়ে শ্রীবাস মণ্ডলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ভয় নেই মোড়লবাবা, তারামা'র দয়ায় আপনার রোগ সেরে যাবে। মন্দিরে গিয়ে মায়ের চরণামৃত খান।"

মহাপুরুষ বামদেবের এই কথায় পরম শান্তি পেল রোগ জর্জরিত শ্রীবাস মণ্ডল। তারা মন্দিরে গিয়ে চরণামৃত পান করলো ভক্তি ভরে।

তারপর সশ্রদ্ধ চিত্তে বামদেবকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীবাস মণ্ডল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। তারপরও দীর্ঘকাল শ্রীবাস মণ্ডল জীবিত ছিল।

বামদেবের আশীর্বাদ ও কৃপাধন্য শ্রীবাস মণ্ডলের জন্ম বাংলা ১২৮৪ সালে।

বামদেবের কাছে যখন অসুস্থ অবস্থায় গিয়েছিল তখন তার বয়স প্রায় ত্রিশ বছর।

তারপর রোগ মুক্ত হয়ে সুস্থ সবল দেহে প্রায় আরো পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে যায় এই পৃথিবীতে। আমৃত্যু শ্রীবাস মণ্ডল বামদেবের একান্ত

ভক্ত ছিল। বামদেবের কথা ও করুণার কথা বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারা নেমে আসতো।

শ্রীবামের অফুরন্ত অহেতুক কৃপালহরির অন্যতম রূপে চিরচিহ্নিত হয়ে রয়েছে ভক্ত শ্রীবাস মণ্ডল।

—০—

শ্রীবাম কৃপাধন্য ভক্ত গুপী লেট

তারাময় বামদেবের অন্যতম কৃপাধন্য ভক্ত সরলপুর গ্রামের গুপী লেট।

তারাপীঠের দু'মাইল উত্তরে সরলপুর গ্রামের এক জরাজীর্ণ কুঁড়ে ঘরে সপরিবারে বাস করে গুপী লেট।

একদিন একটি বড় জামগাছে উঠে কাঠ কাটতে গিয়ে ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হ'ল গুপী। গরীব মানুষ, সুচিকিৎসা করবার সাধ্য নেই। গ্রাম্য চিকিৎসার ওপর নির্ভর করে দিন কাটাতে লাগলো। কিন্তু আঘাত জনিত অসুস্থতা কমলো না। দৈহিক যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। আসন্ন মৃত্যু জেনে ভক্ত গুপী প্রাণভরে কৃপাসিন্ধু বামদেবকে রোগ শয্যায় শুয়ে স্মরণ করতে লাগলো। ভক্তের ব্যাকুলতা ভগবানকে আকর্ষণ করে।

ভক্ত গুপী লেটের তীব্র যন্ত্রণা ও আর্তি বামদেবকে আকর্ষণ করলো।

তারাপীঠ থেকে করুণাময় বামদেব চললেন সরলপুরে গুপীর কুঁড়ে ঘরে। সাথে যথারীতি কালু ভুলু তিলু (তৈলকা) শ্বেতফুল প্রভৃতি

সারমেয় বৃন্দ। কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীবাম এসে উপস্থিত হলেন গুপীর কুড়ে ঘরে।

বামদেবকে দেখে অসুস্থ ও যন্ত্রণায় কাতর গুপীর প্রাণ আনন্দে ভরে উঠলো।

সজল নয়নে বললো, "আহা, আমার দুয়ারে আজ ভগবান এসেছেন। ক্ষেপাবাবা, একটু চরণের ধুলি দেন, আর বাঁচবো না।"

বামদেব অভয় দিয়ে বললেন, "দূর শাল, এর মধ্যে যাবি কোথায়, আগে আমি যাই, তারপর তুই যাবি।"

গুপী ভক্তি ভরে বললেন, "ক্ষেপাবাবা, আমি যে চার বছরের বড়।"

বামদেব গুপীর পাশে বসতে বসতে বললেন, "তা জানিরে শাল, তা জানি। পরে দেখতে পাবি।" এই বলে গুপীর যন্ত্রণার স্থানে তাঁর দিব্য হাতের অমৃত স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন। গুপী অনেকটা সুস্থ বোধ করলো।

বামদেবের এই প্রিয় ভক্ত গুপী বামদেবের চেয়ে চার বছরের বড় বলে বামদেব তাকে স্নেহ ভরে, "ক্ষেপাদা" বলে ডাকেন। প্রিয় 'ক্ষেপাদা'কে অভয় দিয়ে বামদেব তারাপীঠে ফিরে এলেন। বামদেবের কথা যথারীতি সত্য হ'ল। মাস খানেকের মধ্যে ভক্ত গুপী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

বামদেবের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় গুপী লেটের মন ভরে উঠলো। মাঝে মাঝে তারাপীঠে এসে এই কৃষ্ণকায় ছোটখাটো গড়নের ভক্তপ্রাণ গুপী লেট তার প্রাণ প্রিয়তম বামদেবকে প্রণাম করে যায়।

এভাবে দিন কাটতে লাগলো। কিছুদিন পর সহসা গুপী লেট আক্রান্ত হ'ল দুঃসহ হাঁপানী রোগে। গ্রামের সকল রকম কবরেজী চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় গুপী প্রায় অন্তিম অবস্থায় উপনিত হ'ল। আর কোন উপায় নেই দেখে গুপী লেটের স্ত্রী তারাপীঠে এসে বামদেবের কাছে তার স্বামীর শেষ অবস্থা জানিয়ে ব্যাকুল ভাবে কাঁদতে লাগলো।

করুণাবতার বামদেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "শিগ্‌গির তারামা'র চরণামৃত নিয়ে ও শালকে খাইয়ে দে।"

গুপীর স্ত্রী তখনি তারামা'র চরণামৃত নিয়ে বাড়ী গিয়ে গুপীকে খাওয়ালো।

কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। তারপর সুদীর্ঘকাল সুস্থ সবল দেহে গুপী লেট জীবিত রইলো।

বামদেবের তিরোভাবের পর দীর্ঘ তিরিশ বছর প্রতিদিন দিনে ও রাতে তারাপীঠে গুপী লেটকে দেখা যায়। বামদেবের সমাধি মন্দিরের সামনে সশ্রদ্ধ চিত্তে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

একদিন চতুর্দশীর রাতে বামদেবের সমাধি মন্দিরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীবাম ভক্ত গুপী লেট বললো, "হায় আমার ক্ষেপাবাবাকে জগৎ চিনলো না। ওরে, সে কি মানুষ ছিল?—সে ছিল স্বয়ং শঙ্কর।" গুপী লেটের অধ্যাত্ম শক্তি আশ্চর্য্য ধরণের। শ্রীবামের প্রতি পূর্ণ ভক্তি বিশ্বাস ও ভালবাসা এবং নির্ভরতার দ্বারা সে অধ্যাত্ম জগতের জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করেছে। সহজ পথেই সে যে পরম সহজকে লাভ করেছে।

একবার তারাপীঠ ভৈরব গ্রন্থের লেখক শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও বৈদান্তিক শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে গুপী লেটের ধর্ম ও সাধনা নিয়ে আলোচনা হয়। বেদান্ত ও তন্ত্র বিষয়ে গুপীর উপলব্ধিজাত অগাধ জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় পেয়ে সুশীল বাবু ও সুবোধ বাবু খুবই বিস্মিত হন। গুপী জাগতিক জীবনে তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির কোন ডিগ্রি তার নেই। এমন কি সাধারণ প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানও তার নেই। জাতিতে লেট এই গুপী দিন মজুরির কাজ করে। তাই গ্রামের সমাজে সে একজন অতি সাধারণ অশিক্ষিত লোক।

এই প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য বৃদ্ধের মুখে (গুপীর বয়স তখন ৯০ বছরের ওপর) বেদান্ত, তন্ত্র ও নানান অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে গভীর জ্ঞান ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত শুনে সুশিক্ষিত সুশীল বাবু ও সুবোধ বাবু স্তম্ভিত হয়ে যান।

এটা শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অপার করুণার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। বামদেবের অজস্র 'মিরাকল'-এর মধ্যে গুপী লেটও এক আশ্চর্য 'মিরাকল'।

শুধু প্রেম ভক্তি ভালবাসা ও নির্ভরতার মধ্য দিয়ে যে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায়—যা তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যার বহু উর্দ্ধে বিরাজিত—তা এই নীচ জাতীয় নিরক্ষর অতি বৃদ্ধ গুপী লেট সসম্মানে প্রমাণ করে দিল। অনেক উচ্চবর্ণের উচ্চশিক্ষিত লোক তা সারা-জীবনেও লাভ করতে পারেন না।

ভক্ত গুপী লেটের সহজ উপলব্ধিজাত সাধন পন্থাও গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। গুপী বলে. "মদ খাস্‌না, শুধু তারামা'র শ্রীচরণ দু'টি বুকের ভেতর ভাববি আর ক্ষেপাবাবাকে মনে করবি। তাঁকে ঘরে বসে পাবি।"

বৃদ্ধ গুপী প্রতিদিন দু'বেলা সরলপুর থেকে তারাপীঠে আসে। তারাপীঠ মহাশ্মশানের যাতায়াত পথ থেকে নরকপাল, নরঅস্থি ও অন্যান্য হাড়গোর প্রভৃতি প্রতিদিন গুপী সানন্দে নিজের হাতে পরিষ্কার করে।

এটা যেন গুপীর দৈনন্দিন ধর্ম জীবনের এক অপরিহার্য কাজ। এই সেবার মধ্য দিয়ে ভক্ত ও সাধক গুপী যেন তার ভেতরের ষড়রিপু ও মায়া মোহকে পরিষ্কার করে দিয়েছে বামদেবের কৃপা শক্তিতে।

শ্রীবাম ভক্ত ও প্রাজ্ঞ গুপীকে যার যা খুশি দেয়। শতাধিক বছর বয়স্ক গুপী তাই সানন্দে গ্রহণ করে।

বামদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ শতাধিক বছর বয়স্ক এই ভক্ত গুপী লেটকে কেউ বামদেবর কথা জিজ্ঞেস করলেই গুপী লেট সখেদে বলে, "আরে, সে কি মানুষ ছিল? সাক্ষাত শঙ্কর মহাদেব ছিল। তাঁকে চিনলো নারে। জগৎবাসী অন্ধকারে রইলো।

একবার (১৩৩৩ সালে) বামদেবের অপার কৃপাধন্য, শিষ্যপ্রতীম্ ও সিদ্ধ সাধক এবং বামদেবের বিদেহ লীলার জীবন্ত বিগ্রহ ভৈরব দাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত (তেলিখানা শ্মশান, হরিপাল, হুগলী) তারাপীঠে এসেছেন।

বামদেবের দিব্য পরশ ও কৃপাধন্য বৃদ্ধ গুপী লেটকে দেখে

জ্ঞানানন্দজী সাদরে তাকে কাছে ডাকলেন। বৃদ্ধ গুপী লেট জ্ঞানানন্দজীকে দেখেই প্রণাম করলেন। জ্ঞানানন্দজীও শ্রীবামের অশেষ কৃপাধন্য গুপী লেটকে প্রণাম করলেন। তারপর গুপী লেটকে কিছু খাওয়ালেন। খাওয়া শেষে জ্ঞানানন্দজী গুপী লেটকে অনুরোধ করলেন বামদেবের কথা বলবার জন্য।

বামদেবের কথা বলতে গিয়ে শতবর্ষের পথযাত্রী বৃদ্ধ গুপী লেটের দু'চোখ ছল ছল করে উঠলো। জ্ঞানানন্দজীকে সবিনয়ে বললো, "বামাক্ষ্যাপা বাবাকে আপনারাই চিনতে পেরেছেন বটে। তাই এতদূর থেকে সব আইছেন। আমরা চিনতে পারি নাই। তাঁকে পেয়েও বুঝতে পারি নাই।"

যাহোক, বামদেবের অপার করুণা, সহিষ্ণুতা, ও মহিমার কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ গুপী লেট একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলো। ঘটনাটি গুপী স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছে।

বিগত দিনের সেই মধুর স্মৃতি রোমন্থন করে বৃদ্ধ গুপী সজল নয়নে বললো, "একদিন কিছু 'কারণ' খেয়ে শিমুলতলা দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখি ক্ষ্যাপা বাবা তারামা'র পাদপদ্মের সামনে একা বসে আছেন। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। কিন্তু তাঁকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। শুনলাম ক্ষ্যাপা বাবা বলছেন, "মা অরা আমায় বেঁড়াইছে"। তারপর একটু পরে কাতর স্বরে বললেন, "আমার তু আছিস্। তু অদের বেঁড়াইলে কে দেখবে মা?" (অর্থাৎ মা, ওরা আমায় মেরেছে। আমার তো তুমি আছ, কিন্তু তুমি ওদের (পাণ্ডাদের) মারলে ওদের কে দেখবে? অর্থাৎ রক্ষা করবে?)।

ক্ষ্যাপা বাবার এই কথা শুনে ভাবতে লাগলাম, ক্ষ্যাপা বাবা তো একা, তবে কার সঙ্গে কথা বলছেন। ভাবতে ভাবতে চলে গেলাম।"

পরে এই আশ্চর্য্য ঘটনার তাৎপর্য্য গুপী লেট উপলব্ধি করতে পারে। সেই সময় উপলব্ধি করতে না পারলেও এই দিব্য ঘটনাটি সেদিন প্রত্যক্ষ করে গুপীর জীবন ধন্য হয়।

গুপী লেট পরে উপলব্ধি করতে পারে যে, সেদিন পাণ্ডারা যে কোন কারণেই হোক বামদেবকে ভীষণ মেরেছে। পাণ্ডারা ছাড়া বামদেবের গায়ে হাত তোলার সাহস আর কারোর নেই। পাণ্ডাদের আঘাতে জর্জরিত হয়ে বামদেব শিমুলতলায় তারামার পাদপদ্মের কাছে একা চলে আসেন। যেমন ছোট্ট শিশু ব্যাথা পেলে মায়ের কোলে চলে আসে।

তারামা'র কাছে এসে বামদেব সেই কথা বললেন অর্থাৎ মা, অরা আমায় বেঁড়াইছে অর্থাৎ মা ওরা আমায় মেরেছে।

তারামা তাই শুনে প্রাণাধিক পুত্রের ব্যাথায় ব্যাথিতা হয়ে পাণ্ডাদের কঠোর শাস্তি দেবেন বলে তাঁর আদরের ক্ষ্যাপাকে জানালেন।

তাই শুনে অসীম করুণাময় বামদেব সেই নিষ্ঠুর পীড়নকারী পাণ্ডাদের পক্ষ নিয়েই তারামাকে কাতর ভাবে বললেন, "আমার তু আছিস, তু ওদের বেঁড়াইলে কে দেখবে মা?" অর্থাৎ পাণ্ডারা যদিও আমাকে মেরেছে, তবু তুমি তো আমার আছ। কিন্তু তুমি ওদের মারলে ওদের কে রক্ষা করবে? ওদের বাঁচাবার যে কেউ নেই।

মহাপুরুষ অসীম সহিষ্ণুতা ও অপার করুণার প্রতিমূর্তি। তারই নিদর্শন হলেন পরম ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। উপরোক্ত ঘটনা তারই আনন্দময় প্রতীক। ভক্ত গুপীর মুখে এই দিব্য ঘটনাটি শুনে ভৈরব দাস জ্ঞানান্দজীর বিশাল নয়নদ্বয় আনন্দ অশ্রুতে আপ্লুত হ'ল। বৃদ্ধ গুপীর বয়স কত জিজ্ঞেস করায় গুপী ভৈরবদাস জ্ঞানান্দজীকে বললেন "বাবা, আমার বয়স এখন (বাংলা ১৩৩৩) চার কুড়ি তের বছর" (অর্থাৎ ৯৩ বছর চলছে)।

এই ঘটনার পনের বছর পর বাংলা ১৩৪৮ সালে একদিন তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে যথারীতি কাজ সেরে দু' মাইল দূরে সরলপুরে ফিরে গিয়ে নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের ওপর সজ্ঞানে মাথা রেখে ১০৮ বছর বয়স্ক ভক্ত ও সাধক গুপী লেট তার জড়দেহ ত্যাগ করে তার প্রাণ সর্বজ্ঞ ক্ষ্যাপাবাবার নিত্য অভয় চরণ কমলে চির আশ্রয় নিল।

মহাভক্ত গুপীর ১০৮ বছরের পুণ্য জীবন ১০৮ বিল্বপত্রের মতই শিবাবতার বামাক্ষ্যাপার দিব্য শিবলিঙ্গে অর্পিত হ'ল পরম আনন্দ অমৃত ভরে।

ভক্ত ও সাধক গুপী লেটের উপরোক্ত শিমুলতলার দিব্য কাহিনীটির জন্য লেখক বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মহাকৃপাধন্য ভৈরব দাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূতের কাছে।

বাংলা ১৩৮১ সালের ৫ই মাঘ রবিবার তিনি উপরোক্ত কাহিনীটি তাঁর তেলিখানা শ্মশানে অবস্থিত আশ্রমে বসে (হরিপাল, হুগলী) সজল নয়নে লেখককে বলেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

সাধু কাকে বলে

বৈশাখের রুদ্র রোষে তারাপীঠের আকাশ বাতাস প্রচণ্ড উত্তপ্ত। ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকাল নবকলেবরে সজ্জিত হয়ে মহা উৎসাহে আকাশ বাতাস জল স্থল অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করছে।

কেবলমাত্র তারাপীঠ মহাশ্মশানের প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র শিমুলতলা শান্ত শীতল। চারদিকের অসংখ্য বিশাল বিশাল বৃক্ষ নিবিড় ভাবে সূর্যের খরতাপ থেকে তারামায়ের দিব্য লীলাক্ষেত্র শিমুলতলাকে ঘিরে রেখেছে।

মহাপবিত্র শিমুলতলার শান্ত শীতল ছায়ায় শ্রীবাম আপন মনে বসে ত্রিলোক জননী তারামায়ের ভাবে বিভোর হয়ে আছেন।

নিস্তব্ধ মহাশ্মশান প্রত্যক্ষ করছে শিবস্বরূপ বামদেবের এই মহামৌন রূপে।

মহাশ্মশানও যেন আনন্দে মূক হয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য প্রাণ ভরে উপভোগ করছে। দর্শন ও আনন্দের এই মৌন মুখরতায় মহাশ্মশান যথার্থ প্রাণবন্ত। কিন্তু সহসা এই দিব্য আনন্দ ও ভাবের মধ্যে ছন্দ পতন ঘটলো।

দু'টি যুবক যুবতী সাধু বেশে শিমুলতলায় এসে উপস্থিত হ'ল। শিমুলতলার শান্ত স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ মনোরম পরিবেশ দেখে মনের সুখে যুবক যুবতীদ্বয় বসলো। শিমুলতলার শান্ত শীতল হাওয়া মনের সুখে উপভোগ করতে লাগলো দু'জনে নিবিড় ভাবে বসে।

সহসা বামদেবের দৃষ্টি পড়লো এই সাধুবেশী যুবক যুবতীর দিকে। এদের দেখেই বামদেব ভয়ঙ্কর উগ্র মূর্তি ধারণ করলেন। বাইরের গ্রীষ্মের রুদ্র মূর্তিও হার মানলো তারাপীঠের সাক্ষাত ভৈরব বামাক্ষ্যাপার মহারুদ্র মূর্তির সামনে। আসন থেকে উঠে বামদেব সাধুবেশী যুবকটির দাড়ি ধরে টানতে টানতে তীব্র স্বরে বলতে লাগলেন, "ওরে শাল ভণ্ড, গেরুয়া পড়ে সাধু সেজেছিস? শালা তোকে মজা দেখাচ্ছি।" এই বলে দাড়ি ধরে বামদেব এত জোরে টান দিলেন যে যুবকটি মাটিতে পড়ে গেল। দাড়ির টানের যন্ত্রণায় যুবকের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সাধুবেশী কামাসক্ত যুবকটি বামদেবকে গালাগাল দিতে দিতে মাটি থেকে উঠতে চেষ্টা করলো। কিন্তু অসীম শক্তিধর বামদেবের পদতল ছেড়ে প্রাণপণে উঠবার চেষ্টা করেও যুবকটি ব্যর্থ হ'ল।

সত্তর বছরের বৃদ্ধ বামদেবের পায়ের তলা থেকে বাইশ বছরের সাধুবেশী যুবকটি আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না। সাধুরূপধারী যুবকের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে সাধু বেশধারিনী যুবতীটি আর্তস্বরে চিৎকার করতে লাগলো।

চিৎকার শুনে আশে পাশের থেকে বামদেবের কয়েকজন শিষ্য ভক্ত ও পাণ্ডা ছুটে এলেন। এসে দেখলেন এই অপূর্ব দৃশ্য।

মহারুদ্র বামদেবের পায়ের তলায় সাধুবেশধারী একটি যুবক পড়ে

আছে। আর বামদেব যুবকটির দাড়ি ধরে সজোরে টানছে। পা দিয়ে যুবককে চেপে ধরে হাত দিয়ে যুবকের দাড়ি টানতে টানতে গর্জন করতে করতে বামদেব বজ্রকণ্ঠে বলছেন, এখনি এখান থেকে বোরো শাল, মরবার আর জায়গা পাসনি। এখানে মরতে এসেছিস।"

বামদেবের শিষ্য ভক্ত ও পাণ্ডাদের কাতর অনুরোধে বামদেব শেষ পর্যন্ত কপট সাধুবেশী যুবকটিকে তাঁর পদতল থেকে নিস্কৃতি দিলেন। যুবকটি মাটি থেকে উঠলো। তারপর তাকে মাটিতে ফেলে দাড়ি উপড়ে ফেলবার চেষ্টার জন্য বামদেবকে গালাগালি দিল। সাধুবেশী ভণ্ড যুবকটি তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব বামাক্ষ্যাপাকে চিনতে পারেনি। সে অসাধু ভণ্ড বলেই বামদেবের মহিমা উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই অসাধু ভাষায় বামদেবকে গালাগালি দিতেই সর্বজ্ঞ বামদেব এবার এই সাধুবেশধারী যুবকের আসল স্বরূপ সবার সামনে প্রকাশ করে বজ্রকণ্ঠে বললেন, "শালা, ভাগনীকে ভৈরবী সাজিয়ে ঢং করে সাধু সেজে তারামা'র কাছে ভণ্ডামী করতে এসেছিস? "দাঁড়া শালা, চিমটে নিয়ে আসি, তারপর দেখাচ্ছি মজা।" এই বলে বামদেব তাঁর বিশাল চিমটে আনতে আশ্রমে গেলেন তাই শুনে ভয়ে সাধুবেশী ভণ্ড যুবক যুবতীদ্বয় তারাপীঠ থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল বামাদেব ফিরে আসবার পূর্বেই।

শিবাবতার বামদেবের প্রাণাধিক প্রিয় এই মহাপবিত্র, সদাজাগ্রত ও মহা ঐতিহ্যপূর্ণ এই শিমুলতলা তথা মহাশ্মশান।

তিনি নিজে এই মহাশ্মশানের সদাজাগ্রত জীবন্ত ভৈরব। তাই এই পরম সিদ্ধক্ষেত্রে, পরম পবিত্র পীঠস্থানে, বহু যুগ যুগান্তরে সাধন-ক্ষেত্রে এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের অজস্র সাধক সাধিকার সিদ্ধি লাভের মহামোক্ষ ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি ত্রিলোকের অধিশ্বরী তারা মায়ের নিত্য লীলার এই দিব্য ক্ষেত্রে কোন অন্যায়, অনাচার তিনি বরদাস্ত করেন না।

তাই কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ এখানে এলেই সর্বজ্ঞ বামদেবের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়। সাথে সাথে বামদেব রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তাকে কঠোর শাস্তি দিয়ে তার স্বরূপ সবার সামনে

প্রকাশ করে তাকে তারাপীঠ থেকে বের করে দেন। ক্ষমার অবতার বামদেব এখানে রুদ্রের অবতার। ভারতের এই প্রাচীনতম মহাতন্ত্রপীঠ তথা যোগপীঠ ও ব্রহ্মক্ষেত্রের পবিত্রতা সদা বজায় রাখাই বামদেবের উদ্দেশ্য।

এই চিরজাগ্রত মহাসিদ্ধক্ষেত্র মহাশ্মশানে যে সকল মুমুক্ষু সাধক সাধিকা নিস্কাম ভাবে একাগ্র চিত্তে ত্রিলোক জননী তারামায়ের জপ ধ্যানে নিমগ্ন হতে চান এবং তার জন্য তারামায়ের অভেদ স্বরূপ বামদেবের অনুমতি প্রার্থনা করেন, সেই সমর্থ সাধক সাধিকাদের বামদেব সানন্দে অনুমতি দেন। বামদেবের অনুমতি পেলেই তাঁরা শিমুলতলায় স্থান পান তপস্যা করবার জন্য এবং বামদেবের কৃপায় তাঁরা যথাসময়ে সিদ্ধিলাভও করেন। সৎকে যিনি ধরে থাকেন তিনিই সাধু। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাধুবেশ ধরলেই সাধু হওয়া যায় না। আসল সত্য প্রকাশ হবেই। গেরুয়া পরে জটা দাড়ি রেখে রুদ্রাক্ষ গলায় পড়লেই সাধু হয় না। সাধু সেই, যিনি সত্য, ও ত্যাগের উপাসক। তাঁর সাধুর বেশ না ধরলেও ক্ষতি নেই। তাঁর সত্য ও ত্যাগই তাঁকে চিনিয়ে দেবে।

উপরোক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে বামদেব অবিদ্যার উপাসকদের অর্থাৎ কামনা, বাসনা, লোভ, লালসার বশীভূত পাপাসক্ত সাধুবেশী নরনারীদের সাবধান করে দিলেন এবং এই মহাপবিত্র সিদ্ধস্থানের আসল মর্ম বুঝিয়ে দিলেন।

তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব বামদেব তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এমনি ভাবে বহু ভণ্ড সাধুবেশধারী ভণ্ড নরনারীকে শায়েস্তা করেছেন এবং তারাপীঠ থেকে তখনি বিদায় করে দিয়েছেন।

এই সুপ্রাচীন দিব্য ক্ষেত্রের অমর্য্যাদা বামদেব কখনো সহ্য করেন নি। যাদের শাস্তি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন পরিণামে তাদেরও মঙ্গল করেছেন, তাদের পাপকার্য থেকে নিবৃত্তি করে।

উপরোক্ত সাধুবেশী ভণ্ড যুবক যুবতীকে বামদেব তাড়িয়ে দিয়ে বামদেব পরোক্ষভাবে তাদের মঙ্গলই করেছেন। পশুতুল্য এই মামা ভাগ্নী সাধুর বেশ ধরে এসেছিল এই মহাপবিত্র ক্ষেত্রে নির্জন

নিরালায় তাদের কাম চরিতার্থ করতে। কিন্তু সর্বজ্ঞ বামদেব তা ধরতে পেরে যুবকটিকে কঠিন শাস্তি দিয়ে ও যুবক যুবতীর আসল রূপ প্রকাশ করে দিয়ে তাঁদের ভয় দেখিয়ে তারাপীঠ থেকে বিতাড়ন করলেন। সদা জাগ্রত এই দিব্যক্ষেত্রে আসল স্বরূপ প্রকাশ হবেই।

যাহোক, এই সাধুবেশী ভণ্ড যুবকটি একদিক থেকে চরম হতভাগ্য, তেমনি আরেক দিক থেকে মহাভাগ্যবান। যে বামদেবের অভয় পদতলে আশ্রয় পাবার জন্য সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সহস্র সহস্র সাধু ভক্ত সাধক মুমুক্ষু তারাপীঠে এসেছেন, মহাহতভাগ্য যুবকটি সেই বামদেবের পদতল থেকে উঠে আসার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। আর যুবকটি মহাভাগ্যবান এই জন্য যে, স্বয়ং বামদেব স্বেচ্ছায় তাকে নিজপদতলে দীর্ঘক্ষণ রেখেছেন এবং এই ভণ্ড লোভী কামুক যুবকের মুখ ও সর্বাঙ্গ বামদেবের দিব্য পবিত্র হাত ও পায়ের স্পর্শধন্য হয়েছে। ফলে বামদেবের দিব্য স্পর্শে যুবকের এই অবিদ্যা প্রসূত আসক্তি চিরতরে দূর হয়ে যায়। উত্তরকালে যুবকটি এই ঘৃণ্য কাম, থেকে মায়া মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যথার্থ সাধু জীবন যাপন করে।

যাহোক, বামদেব স্থূল দেহে অপ্রকট হ'বার পরও আজো বামদেবের বিদেহ লীলা তারাপীঠ তথা তারাপীঠ মহাশ্মশানে অব্যাহত রয়েছে। যারা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারাপীঠ যায় এবং এই সুপ্রাচীন মহাজাগ্রত পবিত্র ক্ষেত্রে অনাচার করে তাদের পরিণাম আজো শোচনীয়তম হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে। আজো সূক্ষ্মে তারামা ও বামদেব সব দেখছেন এবং প্রতি মুহূর্তে তা বিচার করছেন।

তারামা ও বামদেব দীর্ঘকাল ধরে এই লেখককে তা প্রত্যক্ষ করিয়েছেন (দ্রষ্টব্য 'নিবেদন' প্রথমখণ্ড)। ঐসব অসৎ কামুক লোভী নরনারীর শোচনীয়তম পরিণতি ঘটেছে। সাধুবেশধারী থেকে থেকে সাধারণ গৃহী পর্যন্ত কোন অসৎ লোকই বাদ যায় নি। সীমাহীন অশ্রু, রক্ত ও শোচনীয়তম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের চরম প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

শ্রীবাম করুণা ধন্য প্রমথনাথ চক্রবর্তী

বাংলা ১৩১৪ সালের এক স্নিগ্ধ সকাল। একটি গরুর গাড়ী এসে থামলো বামদেবের আশ্রমের অদূরে। বামদেব তাঁর আশ্রমে বসে আছেন। তাঁর সামনে বসে আসেন তাঁর প্রিয় শিষ্য হরিসত্য চট্টোপাধ্যায় ও নগেন পাণ্ডা। বামদেব জিজ্ঞেস করলেন, "কে এল ?"

নগেন পাণ্ডা উঠে গেলেন খোঁজ নিতে। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, "প্রমথনাথ চক্রবর্তী নামে একজন বাবু এলেন।" সর্বজ্ঞ বামদেব তা শুনে মৃদু হেসে বললেন, "হুঁ, একদিন চক্রবর্তী বাবা হবে।"

শিবাবতার বামদেবের কথা পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ সত্য হয়।

যাহোক, একেবারে পুরোপুরি বাবু হয়ে এসেছেন প্রমথনাথ চক্রবর্তী। গরুর গাড়ী থেকে নামলেন তিনি। উপস্থিত লোকজন সবিস্ময়ে তাঁকে দেখলেন। এরকম বাবু হয়ে সাধারণত এই মহাপীঠস্থানে কোন গৃহী আসেন না। সুপুরুষ সুদর্শন প্রমথনাথ চক্রবর্তীর গায়ে দামী পাঞ্জাবী। তাতে সোনার বোতাম, পাঞ্জাবীর ওপর দামী শাল চাপানো রয়েছে। সোনার চেন দেয়া ঘড়ি বুক পকেটে রয়েছে। তাঁর পরনে দামী ধুতি, পায়ে পাম্পসু।

কি আশ্চর্য, গাড়ি থেকে নেমে বাবু প্রমথনাথ চক্রবর্তী লয়বিদ্যার পরম ক্ষেত্র তারাপীঠে এসে প্রথমেই 'বাবু' নাম ও রূপটিকে লয় করলেন।

গরুর গাড়ীর আশে পাশে যে সকল স্থানীয় লোক নিছক কৌতুহলে ভীড় করে রয়েছে, তিনি তাদের একে একে পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম, সোনার চেনযুক্ত ঘড়ি, শাল, গেঞ্জী, টাকা পয়সা ও পাম্পসু জোড়া, একে একে সব দান করে দিলেন। সবাই বিস্ময়ে হতবাক। উপস্থিত যারা এসব মূল্যবান জিনিষ না চাইতেই পেয়ে গেল তারা তো মহা খুশি হ'ল।

সব দান করবার পর দেখা গেল প্রমথনাথ চক্রবর্তীর উর্দ্ধ অঙ্গ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। খালি গায়ে শুধু একটি পৈতা আর পরনে শুধু কাপড়। জীবিত কুণ্ডে স্নান করলেন মনের আনন্দে। তারপর পরনের কাপড়টিকে দুই টুকরো করে একটি খণ্ড পরলেন এবং অন্যটি গায়ে উত্তরীয় হিসাবে দিয়ে তারামাকে দর্শন করতে মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

তারামাকে দর্শন করে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। দু'নয়নে অবিরল ধারা বয়ে যেতে লাগলো। তারাপীঠে শুরু হ'ল তাঁর অধ্যাত্ম জীবন। শুরু হ'ল নবজন্ম। এই সর্বত্যাগী প্রমথনাথ চক্রবর্তীর জন্ম আনুমানিক ১২৬৯ সালে মেদিনীপুর জেলার পাথরা গ্রামে।

প্রমথনাথের পিতার নাম দ্বিজপদ চক্রবর্তী। পিতামাতার একমাত্র পুত্র তিনি। দ্বিজপদ চক্রবর্তী সৎ ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাথরা গ্রামের শিব মন্দিরের পূজারী ছিলেন। এই মহা সৌভাগ্যবান পূজারী মহাদেবের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হন যে মহাদেব তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

তারপরই প্রমথনাথের জন্ম হয়। প্রমথনাথের পাঁচবছর পূর্ণ না হতেই তাঁর পিতা দেহ ত্যাগ করেন।

ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতা ঘুচে যায়। পূজারী হিসাবে প্রমথনাথের পিতা যে দেবোত্তর সম্পত্তি পেয়েছিলেন তা অন্য পূজারী লাভ করেন। কারণ সেই পূজারীই তখন শিবের মন্দিরে পূজা করতে থাকেন।

বাল্যকালেই প্রমথনাথ শিবের উপাসক হন। যৌবনে লেখা পড়ার সাথে তিনি গীতাপাঠ ও চণ্ডীপাঠও করেন এবং পূজা পদ্ধতিও শেখেন। তাঁর অপূর্ব আরতী দেখে সবাই মুগ্ধ হন।

এই সময় জনৈক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ জমিদারের স্নেহ সান্নিধ্য তিনি লাভ করেন। তাঁর জাগতিক সহযোগিতায় প্রমথনাথ কঠোর আর্থিক অভাব থেকে অনেকটা রেহাই পান।

প্রমথনাথ প্রথম দীক্ষা লাভ করে কুল গুরুর কাছ থেকে। তেইশ বছর বয়সে তিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর সংসার জীবন খুবই অশান্তিময় হয়। তবু তারই মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হন। মাঝে মাঝে মানসিক অস্থিরতা

বৃদ্ধি পায়। যদিও শিবের পুজা করেন তবু প্রথম দিকে একটু নাস্তিকের মত ছিলেন। পরে ঈশ্বরীয় ভাবে মগ্ন থাকেন।

এভাবে দিন মাস বছর কাটতে থাকে। ক্রমে তাঁর সংসারেও বড় হতে থাকে। একে একে দুই পুত্র ও কন্যা হয়। সন্তানগণ বড় হতে থাকে। সাথে সাথে প্রমথনাথের সংসার জীবনে অশান্তিও বাড়তে থাকে। তাঁর স্ত্রী কঠোর বাস্তববাদিনী আর তিনি অধ্যাত্মমুখী। কিছুতেই সমন্বয় হয় না। ক্রমে তা চরম অশান্তিতে রূপ নেয়। স্ত্রী'র তীব্র কটূক্তি, সংসারের বিরাট বিরাট দায় দায়িত্ব ও অশান্তি এবং তীব্রতর অধ্যাত্ম আকর্ষণ, এসব মিলিয়ে প্রমথনাথের অবস্থা চরমে পৌঁছলো। তাঁর স্ত্রী কোনদিনই তাঁকে চিনতে পারেননি এবং চিনতে চাননিও।

এভাবে জীবনের দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছর অতিক্রম করেন প্রমথনাথ। একদিন স্ত্রী'র প্রচণ্ডতম তীক্ষ্ণ কটূক্তিতে তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হন। সংসারের ঘোর দুঃখ দারিদ্র্য অশান্তি, অপমান, মায়া মোহের কঠিনতম জাল থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করবার জন্য প্রমথনাথ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কাতরভাবে ইষ্টদেব শিবকে ডাকতে থাকেন। করুণাময় দেবাদিদেব মহাদেব মহাকালের রূপ ধরে প্রিয় ভক্ত প্রমথনাথের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন বিচিত্র ভাবে।

বর্ষাকাল। সহসা মেদিনীপুরে প্রলয়ঙ্কর বন্যা দেখা দিল। সেই ভয়াবহ বন্যায় প্রমথনাথকে এবং তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা বাড়ীঘর সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রচণ্ড জলের তোড়ের মধ্যে প্রমথনাথের দুই হাত ধরে ছিল তাঁর স্ত্রী ও কন্যা। ছোট ছেলেটি তাঁর গলা জড়িয়ে সামনের দিকে ছিল। বড় ছেলে পাশে ছিল। ফলে সাঁতারে প্রমথনাথের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল। হঠাৎ একটি বিরাট ঢেউ এসে প্রবল ভাবে পড়লো সপরিবার প্রমথনাথের ওপর। ছোট ছেলেটি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়। প্রাণভয়ে আঁকড়ে ধরা ছোট্ট হাত দু'টি প্রমথনাথের গলা থেকে খুলে জলে পঁড়ে গেল। ছেলেটির মৃতদেহ প্রবল বেগে জলে ভেসে গেল। স্ত্রী ও বড় ছেলে এবং মেয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে যায়। অনেক কষ্টে সাঁতরে পাড়ে

উঠে প্রমথনাথ সজল নয়নে ইষ্টদেব দেবাদিদেব মহাদেবকে বললেন, "ঠাকুর, সব দিয়েছিলে, আবার সবই নিয়ে নিলে।"

কিছুদূর গিয়ে একটি গাছের নীচে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এই সময় একটি অপূর্ব রূপবতী বালিকা মেয়ে তাঁকে এসে বললেন, শিব তোর মায়া ত্যাগের জন্যই সব নিয়ে গেল। ফলে আর মোহ থাকবে না। এবার মুক্ত হয়ে চলবি।"

ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রমথনাথের শান্ত হ'ল তাঁর চিত্ত। মোহমুক্ত হলেন তিনি পরিপূর্ণ ভাবে।

পরবর্তীকালে শোনা যায় যে, ভয়ঙ্কর বন্যায় প্রমথনাথের পুত্রকন্যাগণ মারাগেলেও তাঁর স্ত্রী মারা যাননি। কোনক্রমে বেঁচে যান। পরে একবার তারাপীঠে এসে স্বামীকে দেখে যান। কিন্তু স্বামীর সাধন পথে কোন বাধা সৃষ্টি না করে চিরতরে তিনি চলে যান।

যাহোক, বন্যা শেষে কয়েকদিন পর বাড়ী ফিরে আসেন প্রমথনাথ। বাড়ীর সব সম্পত্তি জমি জমা দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্যদের সব বিলিয়ে দিলেন। তিনি চিরতরে সংসার ত্যাগ করে সাধু হচ্ছেন এটা যাতে কেউ ভাবতে না পারে পুরোপুরি বাবু সেজে পয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক প্রমথনাথ তারাপীঠে উদ্দেশ্যে রওনা হলেন মেদিনীপুর থেকে তারপর তারাপীঠে এসে পূর্ববর্ণিত বাবু পোষাক সব একে একে দান করে চির মুক্ত হলেন। জীবিত কুণ্ডে মুক্তি স্নান করে পরনের বস্ত্রটিকে দু'করো করে একটি পড়লেন। অন্যটি গায়ে উত্তরীয় হিসাবে দিয়ে তারামা'র মন্দিরে প্রবেশ করে তারামাকে দর্শন করতে লাগলেন স্তব্ধ হয়ে সজল নয়নে।

এক সময় তারামা'র দর্শন শেষ হ'ল। তারপর তারামন্দিরের পশ্চিমদিকের বারপাউটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে পথের ধারে পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিকের মুদিখানার উত্তর দিকের দাওয়ায় চুপ করে বসে রইলেন।

এই সময় বামদেবের অন্যতম স্নেহধন্য নগেন পাণ্ডার শ্যালক শ্রীযতীন্দ্র মোহন পাণ্ডা সহৃদয়তার সাথে প্রমথনাথ চক্রবর্তীর সাথে আলাপ করেন এবং তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করান।

এই গৌরবর্ণ প্রৌঢ় মানহটির সাথে অধ্যাত্ম ও অন্যান্য বিষয়ে

আলাপ করে যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হন। বামদেবের কৃপাধন্য নবীন পাণ্ডাও প্রমথনাথ চক্রবর্তীর গুণাবলীতে আকৃষ্ট হন।

তারামন্দিরের নিয়ম অনুসারে তারাপীঠে আগত কোন সাধু বা ভক্ত বিনামূল্যে তিনদিনের বেশী তারামায়ের অন্ন প্রসাদ পান না। তারাপীঠে আগত প্রতিদিন সাধু ভক্তের সংখ্যা কম নয়। তাই এই ব্যবস্থা।

সেই অনুসারে তিনদিন প্রমথনাথ চক্রবর্তী তারামায়ের প্রসাদ পেলেন। তারপর মাঝে মাঝে তারামায়ের সেবায়েতদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে ডেকে মায়ের প্রসাদ দিতে লাগলেন। তিনি কারোর কাছেই কিছু চান না। অনাহারে থাকলেও না। কখনো জীবিত কুণ্ডের জল, কখনো সামান্য বেলপাতা চিবিয়ে খেয়ে থাকেন। তবু কারো কাছে কিছু চান না।

মজার কথা এই যে, প্রমথনাথ চক্রবর্তী যখন তারাপীঠে এলেন তখন তাঁকে না দেখেই বামদেব নিজ আশ্রমে বসে তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "একদিন চক্রবর্তী বাবা হবে,"—সেই বামদেবের আশ্রয়ে তিনি এলেন না!

দূর থেকে তিনি বামদেবকে দেখতে লাগলেন। চক্রবর্তীবাবা মদ খাওয়ার ঘোর বিরোধী। সেই মদ বামদেবকে অপরিমিত পরিমাণ দিন রাত খেতে দেখে তিনি বামদেবকে ভুল বুঝলেন। বামদেবকে চিনতে পারলেন না। চিনবার চেষ্টাও করলেন না। বামদেবের থেকে দূরে রইলেন। করুণাময় বামদেব সবই বুঝতে পারলেন। নীরবে হাসলেন তিনি। বুঝলেন প্রমথনাথের সময় হয়নি।

এদিকে একাধিক পাণ্ডা ও লোকের কাছে প্রমথনাথ তারাপীঠের সদাজাগ্রত শিবাবতার বামদেবের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলেন। করুণাবতার শ্রীবাম সব শুনেও মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন। তারামায়ের কি বিচিত্র লীলা, যে শিবের উপাসক প্রমথনাথ সেই শিব স্বয়ং দেহ ধারণ করে প্রমথনাথের পাশে বামদেব রূপে বিরাজ করছেন তবু প্রমথনাথ তাঁকে চিনতে পারলেন না। বামদেবের কৃপা দৃষ্টি কিন্তু রইলো প্রমথনাথের ওপর।

যাহোক, প্রমথনাথ চক্রবর্তী এবার গভীরভাবে তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনের জন্য প্রস্তুত হলেন। শশীভূষণ সিংহ নামে এক ভক্ত তারাপীঠে এসে তারামাকে দর্শন করেন। তারামা ও বামদেবের কৃপায় দিনাজপুর নিবাসী এই ভক্ত চক্রবর্তীবাবার গুণমুগ্ধ হন। তিনি চক্রবর্তীবাবার সাধনার জন্য মহাশ্মশানে একটি উচু মাচা তৈরী করে একটি হাল্কা কুটীর নির্মাণ করে দেন। তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মের অদূরে একটি বিরাট জামগাছ। তার মূল থেকে কতকটা উচুতে, যেখান থেকে মোটা ডাল বের হয়েছে তার সাথে একত্র করে এই হাল্কা কুটিরটি বাঁধা। একটি সিঁড়ির মত করা হয়েছে। তার সাহায্যে ওঠানামা করা যায়। তার পাশেই একটি উচু চাতাল গাঁথা আছে। কোন সমাধির চাতাল, তার সাথে এই কুটীরের এক অংশ মেলানো রয়েছে। আসামের জঙ্গলে অনেক স্থানে যেমন গাছের ওপর কুটির বাঁধা হয়, অনেকটা সেরূপ।

এই কুটীরেই প্রমথনাথ চক্রবর্তী তথা বামদেব কথিত "চক্রবর্তীবাবা" সাধনা শুরু করলেন। করুণাময় বামদেবের দৃষ্টি কিন্তু চক্রবর্তীবাবার ওপর যথারীতি আছে। বামদেবের সীমাহীন 'কারণ' পান ও তার সাথে মাত্রাহীন গাঁজা, আফিং খেতে দেখে চক্রবর্তীবাবা বিরক্ত হন। বামদেবকে কটুক্তি করেন একাধিকবার। মজার ব্যাপার এই যে বামদেব যেন তাঁকে দেখিয়েই আরো এসব খেতে লাগলেন। ফলে বামদেবের বহিরঙ্গের এই বিচিত্র ব্যবহার দেখে অনেকের মত চক্রবর্তী-বাবাও ভুল করলেন। কিন্তু তারামা ও বামদেবের কৃপায় অচিরে তাঁর ভুল ভাঙ্গলো। যথাসময়ে বামদেব তাঁকে কৃপা করলেন। তখন তিনি বামদেবকে উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হলেন এবং পরম আনন্দে ইষ্ট স্বরূপ গুরুকে পেয়ে গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন। 'চক্রবর্তীবাবা' গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন যে এতদিন বামদেবকে চিনতে না পারার জন্যই তার সাধনা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে বামদেবের কৃপায় নতুন উদ্যমে সাধনায় ডুব দিলেন।

বাংলা ১৩১৪ সাল থেকে ১৩১৮ সাল (২রা শ্রাবণ, ১৩১৮) পর্যন্ত তিনি বামদেবের নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে হঠযোগ ও রাজযোগ

সাধনায় মগ্ন হন। বামদেব যে হঠযোগ ও রাজযোগ সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং তন্ত্রের সর্বোচ্চ সাধনায় সিদ্ধ পূর্ণ দিব্যাচারী ও মহান কুলনাথের নাথ তা ক্রমে ক্রমে চক্রবর্তীবাবা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন।

চক্রবর্তীবাবার আধার বুঝে বামদেব তাঁকে যোগ পথে প্রথমে হঠযোগে পরে রাজযোগে সাধনা করান। গভীর রাতে চক্রবর্তীবাবা শ্রীগুরু বামদেবের কাছে গিয়ে হঠযোগ ও রাজযোগ শিখতে লাগলেন নিয়মিত ভাবে।

বামদেব পূর্ণ রাজযোগী বলেই গণ্ডি কেটে মৃত্যু স্বরূপ কালসর্প দংশন রোধ করতে পারেন, এটা ক্রমে ক্রমে চক্রবর্তীবাবা উপলব্ধি করতে পারলেন।

চক্রবর্তীবাবার প্রথম দীক্ষা কুলগুরুর কাছে থেকে হলেও তাঁর মূল গুরু স্বয়ং শিবাবতার বামদেব।

বাংলা ১৩১৪ সাল থেকে সুদীর্ঘ ১৭ বছর কাল অর্থাৎ ১৩৩১ সাল পর্যন্ত সিদ্ধসাধক চক্রবর্তীবাবা তারাপীঠে বাস করেন।

বামদেবের তিরোভাবের পর (২রা শ্রাবণ, ১৩১৮) বামদেবের অশেষ কৃপাধন্য চক্রবর্তীবাবা সিদ্ধ পুরুষ রূপে তারাপীঠে সুচিহ্নিত হন। বাক সিদ্ধ পুরুষ রূপে তাঁর বহু অলৌকিক ঘটনা তারাপীঠ ও আশে পাশের অধিবাসীগণ বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন।

যথাসময়ে (বামদেবের সমসাময়িক ও পরবর্তী সাধকবৃন্দ প্রসঙ্গে) সে সব কাহিনী বর্ণিত হবে।

বাংলা ১৩৩১ সালে তারামায়ের নির্দেশে তিনি তারাপীঠ ছেড়ে বক্রেশ্বরে চলে যান। শেষ জীবনে বক্রেশ্বরে এক প্রাচীন সিদ্ধ সাধিকা ভৈরবী জয়া মাতার নিকট পুনরায় মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাংলা ১৩৩১ সাল থেকে ১৩৩৭ সাল পর্যন্ত জীবনের শেষ ছয় বছর বক্রেশ্বরে অতিবাহিত করেন (যথা সময়ে যথা স্থানে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হবে)।

উপরোক্ত কাহিনী বামদেবের শিষ্য হরিসত্য চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ও বামদেবের কৃপাধন্য এবং চক্রবর্তীবাবার শিষ্য বৃদ্ধ কালীদাস চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৩ সালের নভেম্বর লেখককে বলেন

লেখক এজন্য তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। চক্রবর্তীবাবার আরো বহু কাহিনী তিনি বিভিন্ন সময়ে লেখককে বলেছেন। যথাসময়ে যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

শ্রীবামস্নেহধন্য যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ১৩১৪ সালের প্রথমদিকে শতাধিক বছর বয়স্ক সিদ্ধপুরুষ পাইকর নিবাসী জটাবাবার দিব্য প্রেরণায় (জটাবাবার কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে; দ্রষ্টব্য ২য় খণ্ড) ও জটাবাবার কাছে তারাপীঠের ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপার মাহাত্ম্য শুনে এবং জটাবাবার উৎসাহ ও উপদেশ অনুসারে তারাপীঠের অদূরে কণকপুর নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বামদেবের দিব্য সান্নিধ্য লাভের জন্য তারাপীঠে এলেন।

যোগেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যকাল মুরারী ষ্টেশনের নিকট কণকপুর গ্রামে অতিবাহিত হলেও তিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করবার পর তারাপীঠের নিকটবর্তী খরুণ গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। খরুণ গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়ী।

ছোটবেলা থেকেই তিনি অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী হন। কলেজ জীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ররূপে সুপরিচিত হন। বি.এ. পাশ করবার পর তিনি শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। ফতেপুর এম-ই স্কুলের হেডমাষ্টারের কাজ করবার পর তিনি সবার কাছে 'মাষ্টারমশায়' রূপে সুপরিচিত হন।

অগাধ পাণ্ডিত্য, সরলতা ও বিনয়তার জন্য তিনি সবার শ্রদ্ধা

অর্জন করেন। দেশবিদেশের দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর সুগভীর জ্ঞান অনেক জ্ঞানীগুণীকে বিস্মিত করে।

সংসার জীবনে প্রবেশ করবার পরও তিনি মূলত গৃহী সন্ন্যাসী রূপেই চিহ্নিত হলেন।

অনেকে তাঁকে উদাসী ও আধপাগলা ধরণের লোক বলে মনে করেন। আসলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নির্মোহ হয়ে তিনি সর্বদা জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করেন বলে সাধারণ লোকেরা তাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

যাহোক, ফতেপুর এম.ই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর দু'জন বন্ধুসহ তারাপীঠে এসে বামদেবকে প্রণাম করে পাশে বসলেন।

ইতিপূর্বে একাধিকবার তারাপীঠে এসেছেন শারদীয়া চতুর্দ্দশী মেলায় এবং বামদেবকেও দর্শন করেছেন একাধিকবার কিন্তু বামদেবের বহিরঙ্গ রূপ দেখে ও ব্যবহার দেখে তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হন নি। মহাপুরুষ জটাবাবার কথা ও উপদেশে নতুন করে বামদেবকে চিনতে পারেন।

তাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নবীন উৎসাহে এবার এসেছেন বন্ধুসহ। উদ্দেশ্য বামদেবের সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করা। শতবর্ষ অতিক্রান্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ জটাবাবা একদিন বামদেব প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলেন যে তারাপুরে (তারাপীঠে) গিয়ে বামদেবের সান্নিধ্য ও উপদেশ নিতে। তাতে তাঁর (যোগেন্দ্রনাথের) অধ্যাত্ম পিপাসা মিটবে। তারপর জটাবাবা হরিদ্বার চলে যান। জটাবাবাই যোগেন্দ্রনাথকে বামদেবের দিকে ঘুরিয়ে দেন।

যাহোক, বামদেব চুপ করে বসে আছেন। বামদেবের অন্যতম সেবক ভূপতি পাণ্ডা যোগেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদের সাথে বামদেবের পরিচয় করিয়ে দেন। ভূপতি পাণ্ডা বামদেবকে বললেন, "বাবা, আপনাকে ইহারা দর্শন করিতে আসিয়াছেন।"

সর্বজ্ঞ বামদেব সবই জানেন তবু না জানার ভান করে বললেন, "ইহারা কে বাবা?"

ভূপতি পাণ্ডা বললেন, "বাবা, ইহারা স্কুলের পণ্ডিত, নিবাস কনকপুর, মুরারী স্টেশনের নিকট।"

উত্তরে শ্রীবাম রহস্যভরে বললেন, "বেশ বাবা, আমরা মূর্খ বাবা, পণ্ডিত-টণ্ডিত কিছুই নয়। আমাদের পাশ-টাস নাই।"

উত্তরে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সবিনয়ে বললেন, "আপনি যে পাশমুক্তবাবা, পাশবদ্ধ জীব আর পাশমুক্ত শিব। আপনি লজ্জা ঘৃণা প্রভৃতি অষ্টপাশমুক্ত শিবস্বরূপ।

বামদেব তা শুনে বললেন, "তা বেশ বাবা, মধ্যে মধ্যে এখানে আসিবেন। তারামা দর্শন করিবেন। গাঁজার পয়সা কিছু দেন বাবা।"

যোগেনবাবু ও তাঁর বন্ধুরা গাঁজার জন্য কিছু পয়সা বামদেবের চরণে রেখে বামদেবের কাছ থেকে সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

এরপর যোগেনবাবু প্রায়ই বামদেবের কাছে আসতে থাকেন। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে দিনরাত কাটিয়ে দেন বামদেবের কাছে। বামদেবের কৃপায় দিব্যভাবে বিভোর হয়ে যান। সবসময় তিনি কালী কালী বলেন, আপন মনে। লুঙ্গির মত করে কাপড় পরেন। বামদেবের কাছে এসে কখনো নানা আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন আবার কখনো চুপচাপ শুয়ে থাকেন।

ক্রমে প্রতি সপ্তাহে শনিবার তারাপীঠে বামদেবের কাছে আসতে থাকেন এবং শনি রবি ছুটি কাটিয়ে সোমবার সকালে বাড়ী যেতে থাকেন। এভাবে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর বামদেবের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেন এবং অধ্যাত্ম সাধন পথে অগ্রসর হন। বামদেবের বহু অলৌকিক লীলাও তিনি দর্শন করে ধন্য হন।

ক্রমে ক্রমে তিনি বামদেবের বিশিষ্ট ভক্তরূপে সুচিহ্নিত হন। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী এবং উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী সদানন্দের প্রেরণায় তিনি বামদেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেন। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে রচিত হয়। গ্রন্থটির নাম, "বামাক্ষ্যাপার জীবনী ও জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী।"

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় (বাংলা ১৩৩২ সালে, ইং ১৯২৫। মূল্য আট আনা)। দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। পরে পাণ্ডুলিপিটিও হারিয়ে যায়।

এই মূল্যবান গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং বামদেব সম্পর্কে বহু তথ্যে পূর্ণ। স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র অবস্থায় তারাপীঠে বামদেবকে বন্ধুসহ দর্শন করতে আসার কাহিনীটি তার অন্যতম। যোগেন্দ্রনাথের অন্যতম পুত্র শিবপদ চট্টোপাধ্যায়ও পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বামদেবের অন্যতম বিশিষ্ট ভক্ত থরুণ নিবাসী নকড়ি রায়ের ভাইপো বামদেবের দর্শনধন্য শ্রীঅম্বুজাক্ষ রায়ের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। সংযোগের জন্য বামদেবের ভাইঝি অন্নপূর্ণাদেবীর সুযোগ্য নাতি আটলা গ্রাম নিবাসী দেবকুমার রায়ের কাছেও লেখক কৃতজ্ঞ।

—o—

নিজ বয়স সম্পর্কে বামদেবের বিচিত্র মন্তব্য

বাংলা ১৩১৪ সালের এক প্রসন্ন সকাল। বামদেব তাঁর আশ্রমে আপন মনে বসে আছেন। সামনে উপবিষ্ট রয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন পাণ্ডা, ভূপতি গাণ্ডা প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত ও দু'চার জন স্থানীয় অধিবাসী।

সহসা যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বামদেবকে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, "বাবা, আপনার বয়স কত?"

প্রশ্ন শুনে বামদেব যেন আত্মস্থ হলেন। একটু পরে বললেন, "বাবা, আমার বয়স ৫।৭ বৎসর, জোর ৯ বৎসর, ইহার বেশী হইবে না। আমি মায়ের আদুরে ছেলে, বাবু ছেলে, বয়স বেশী নয়।"

বামদেবের এই বিচিত্র উত্তর শুনে অনেকে বিস্মিত হলেন। আবার কেউ মজা পেয়ে মুচকি হাসলেন।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন খোঁজ করে জানলেন যে বামদেবের বয়স ৭০ বছর।

আসলে বামদেবের এই বিচিত্র মন্তব্যের পেছনে রয়েছে এক নিগূঢ় গভীর অখণ্ড ভাব।

যিনি ব্রহ্মময়ী তারামায়ের কোলে সর্বদা রয়েছেন তিনি তো সকল সময়েই শিশু। তাই তিনি চিরন্তনী জননীর চিরশিশু সন্তান। সুতরাং ক্ষণিক জড়দেহের বয়স তাঁর বয়স নয়। তাঁর বয়স চৈতন্যের বয়স। যা আদি অন্ত দিগন্ত বিহীন।

তাই তিনি তারামায়ের একান্ত কোলের ও আদরের ছেলে। আর 'বাবু ছেলে' এই জন্য যে তিনি চিরঅনন্তময়ী ব্রহ্মময়ী ও মহাচৈতন্যময়ী তারামায়ের অফুরন্ত শক্তি ও অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য্যের পরম অধিকারী। তাই তারামায়ের অনন্ত করুণা, স্নেহ ভালবাসা ও অধ্যাত্ম যোগবিভূতির অসীম ঐশ্বর্য নিয়েই বামদেবের দিব্যবিলাস।

তাই অধ্যাত্ম জগতে তিনি যথার্থ "বাবু" এবং চিরন্তন ঐশ্বর্য্যবান "বাবু", জাগতিক জগতের এই জড়দেহের তথাকথিত ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্ষণিক বাবু নন।

আর তিনি এই জাগতিক দেহের বয়সের যে তিনটি সংখ্যা বলেছেন ৫, ৭ ও ৯ বছর, তা-ও গভীর তাৎপর্য্যময়। পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান) এই দেহ, পঞ্চ কোষযুক্ত (অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনময় কোষ, বিজ্ঞানময় ও আনন্দ-ময় কোষ) এই দেহ, পঞ্চভূতযুক্ত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম)

এই দেহ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) এই দেহ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (পানি, পাদ, পায়ু, লিঙ্গ, গুহ্য) এই দেহ, তাই পঞ্চ তথা ৫ সংখ্যাটি সর্বতোভাবে গভীর অর্থবহ।

৭ সংখ্যাটি যে বামদেব ব্যবহার করেছেন তা-ও নিগূঢ় সংকেত। ছয় রিপু (কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য) ও তাদের পরিচালক 'মন'। এই সাতটি হ'ল এই জাগতিক জীব দেহের প্রধান শত্রু ও প্রধান কর্ম কেন্দ্র যার ফলে জীবের আসা যাওয়ার বিরাম নেই।

জন্ম মৃত্যুর পাকচক্রে জীব ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে।

আর বামদেবের শ্রীমুখ নিশ্রুত ৯ সংখ্যাটিও তাৎপর্য্যপূর্ণ।

অষ্টপাশ (লজ্জা ঘৃণা ভয় মান কুল শীল ক্ষুধা তৃষ্ণা) ও তাঁদের পরিচালিকা 'মায়া'—এই নয়টির দ্বারা জীব সর্বদা বদ্ধ।

আবার ৯টি দ্বার (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাসিকার দুই ছিদ্র, জিহ্বা, লিঙ্গ, গুহ্য) কে সংযত করে অন্তর্মুখীন হলে এই অষ্টপাশযুক্ত অবিদ্যা মায়া অর্থাৎ ৯ থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারে জীব।

অর্থাৎ ৯ দিয়ে ৯ কে 'নয়' করা যায়। সংখ্যা তত্ত্বে ৯-ই সর্বোচ্চ সংখ্যা। বামদেব তারও ইঙ্গিত দিলেন। 'নয় নয়' করেই জীব সর্বোচ্চ 'ব্রহ্ম' লাভ করতে পারে! উপরোক্ত এসব তত্ত্ব নিয়েই জড় দেহের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়। তাই এই ত্রিগুণাত্মক জড়দেহের বয়স আছে, বৃদ্ধি আছে, বিনাশ আছে।

তাই জড় দেহের বয়স বলতে হলে এদেরই বয়স বলতে হয়। বামদেব তাই ৫, ৭, ৯-এর ইঙ্গিত দিলেন। তাঁর বয়স শুনে কেউ বিস্মিত হলেন। কেউ মজা পেলেন। কিন্তু আরো মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, যে ৫, ৭ ও ৯ সংখ্যাটি তিনি উচ্চারণ করলেন তার সমন্বিত সংখ্যাটিও আশ্চর্য্য তাৎপর্য্যপূর্ণ—যার মধ্য দিয়ে বামদেবের মূল বক্তব্যটি ফুটে উঠেছে।

তা হ'ল ৫+৭+৯ এর সমষ্টি সংখ্যাটি অর্থাৎ ২১ সংখ্যাটি। এই একবিংশতি তত্ত্বটির অধিশ্বরী হলেন স্বয়ং ত্রিলোক জননী ব্রহ্মময়ী তারামা। ২১ সংখ্যাটির যোগফল ২+১=৩ এই ৩ সংখ্যাটি হ'ল দেবগুরু বৃহস্পতির সংখ্যা—যাঁর ইষ্টদেবী স্বয়ং তারামা।

তারামা-ই পরমা প্রকৃতি, তারামা-ই মহাচৈতন্যময়ী। আবার তারামা-ই আদিভূতা ব্রহ্মসনাতনী, চিরআনন্দময়ী, চিরঅমৃতময়ী। সেই চিরন্তনী পরমা চৈতন্যময়ী তারামায়ের চৈতন্যময় 'বাবু' ছেলে সদানন্দময় সদা অমৃতময় বামদেবকে জড় দেহের বয়সের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি ৫,৭ ও ৯ বছর ছাড়া আর কি বলবেন?

বামদেব এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর নিত্য আত্ম ব্রহ্মস্বরূপের ইঙ্গিত দিলেন এবং জড় প্রকৃতিযুক্ত জীব দেহের স্বরূপ বোঝালেন। কারণ বামদেবের সবই তারামা। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা তথা লয় বিদ্যা তারাবিদ্যার অধিকারী বলেই তাঁর কাছে সব ভেদই লয় হয়ে অভেদ হয়ে গেছে। তাই তাঁর কাছে জড় ও চৈতন্য এক হয়ে মহাচৈতন্যে মিশে আছে। এক অখণ্ড আনন্দ অমৃতরসে তিনি বিভোর হয়ে গেছেন। তাই তিনি এক তারামা'র মধ্যেই সব এবং সবের মধ্যে তারামাকেই দেখেন।

তাই ক্ষণিকের জড় দেহের বয়সের (৫, ৭, ৯) কথা বলতে গিয়েও সেই বয়সকে চিরন্তনী ব্রহ্মময়ী তারামা'র মধ্যেই মিশিয়ে দিয়ে একাকার করে দিলেন (৫, ৭, ৯-এর সমষ্টি ২১ তথা ৩ সংখ্যাটি) যা সৃষ্টি স্থিতি লয়, সত্ত্ব রজ তম, ও ত্রিলোকের অধিশ্বরী তারামায়েরই অনন্ত ভাব রূপ ও সংখ্যার এক মধুর নিদর্শন স্বরূপ।

শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার উপরোক্ত বিচিত্র মন্তব্য জগত ও জীবের কাছে এক শাশ্বত আলোকবর্তিকা রূপে চিরতরে সুচিহ্নিত হয়ে রইলো।

—ঃ—

শ্রীবাম কৃপাধন্যা সরোজ কুমারী দেবী

বর্ষার শুভ সূচনা হয়েছে তারাপীঠের আকাশে বাতাসে। উত্তপ্ত তৃষিত মাটি আকন্ঠ পান করেছে নববর্ষার নবানুরাগের সজল বারি ধারাকে।

বাংলা ১৩১৪ সালের এই নববর্ষার প্রারম্ভে একদিন অপরাহ্নে তারাপীঠে এলেন রাজসাহী জেলার ইসলাম গাঁ তীরের জমিদার গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের স্ত্রী ভক্তিমতী সরোজ কুমারী দেবী।

সাথে তাঁর জননী বিধুমুখী দেবী ও বিধুমুখী দেবীর মাসতুতো ভাই অন্নদাপ্রসাদ ভাদুড়ি।

বিধুমুখী দেবীর শ্বশুর কুল নাটোরের রাণী ভবানীর গুরু বংশ। এই নাটোর রাজবংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারামায়ের সেবায়েত: অপরাহ্ন কালে, তারাপীঠ মহাশ্মশানে শিমুলতলায় বামদেব তাঁর প্রিয় কুকুরদের নিয়ে তারামায়ের অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করছেন। এই সময় সরোজকুমারী দেবী বিধুমুখী দেবী ও অন্নদাপ্রসাদ ভাদুড়ি সেখানে উপস্থিত হলেন।

বামদেবকে কুকুরদের সাথে এক সাথে এক পাতে খেতে দেখে তাঁরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সরোজ কুমারী দেবী অপুত্রক। তাই তাঁর স্বামীকে তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ী পুণরায় বংশ রক্ষার জন্য বিয়ে দিতে চান। তাই সরোজকুমারী দেবীর মা বিধুমুখী দেবী তাঁর মেয়ের সকল রকম চিকিৎসা করলেন।

সবাই যখন ব্যর্থ হ'ল তখন তারাপীঠে তন্ত্র সিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অলৌকিক লীলা কাহিনী শুনে মেয়েকে ও মাসতুতো ভাই অন্নদাপ্রসাদ ভাদুড়িকে নিয়ে তারাপীঠে এলেন সুদূর রাজসাহী থেকে।

এখন বামদেবের আশীর্বাদ ও কৃপাই একমাত্র ভরসা। বামদেবের

কৃপায় পুত্র সন্তান লাভ হলে আর মেয়েকে সতীনের ঘর করতে হবে না এবং মেয়ের জীবনও পূর্ণ হবে। তাই অনেক আশা নিয়ে বিধুমুখীদেবী এসেছেন।

বামদেব আপন মনে খাচ্ছেন কুকুরদের সাথে। যেন স্নেহবৎসল পিতা তাঁর প্রিয় সন্তানদের নিয়ে খেতে বসেছেন। তিনজনে স্তব্ধ বিস্ময়ে বামদেবের এই বিচিত্র আহার দেখছেন। অষ্টপাশ মুক্ত বামদেবের এই বিস্ময়কর আহার তাঁদের মনে বামদেবের প্রতি শ্রদ্ধা আরো গভীরতর করলো।

একটু পরে বামদেবের খাওয়া শেষ হ'ল। এবার অন্তর্যামী বামদেব কৃপাদৃষ্টি মেলে সরোজ কুমারী দেবীর দিকে তাকালেন এবং তাঁর কাছে আসতে বললেন।

ভক্তিমতী সরোজকুমারী দেবী ভয়ে শ্রদ্ধায় এবং ভক্তিতে বিহ্বলা হয়ে বামদেবের সামনে উপস্থিত হলেন। কৃপাময় বামদেব তাঁর কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভাতে দেখিয়ে বললেন, "ওরে বেটি, কোন ভয় নেই। এই প্রসাদ খা।" বামদেবের এই অভয় বাণী শুনে বিনা দ্বিধায় সরোজ কুমারী দেবী ভক্তির সাথে সেই কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভাত খেলেন। তাঁর খাওয়া শেষ হলে বামদেব প্রসন্ন হয়ে বললেন। "এবার তারামায়ের চরণামৃত পান করে বাড়ী ফিরে যা। তারামায়ের কৃপায় তোর ছেলে হবে।" সরোজ কুমার দেবী বামদেবের উপদেশ মত তারামায়ের মন্দিরে গিয়ে তারামায়ের চরণামৃত পান করলেন গভীর শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে। তারপর মা ও মামার সাথে তারামায়ের পূজো দিয়ে আনন্দের সাথে বামদেবকে প্রণাম করলেন। বামদেব আশীর্বাদ করলেন। তারপর বিধুমুখী দেবী ও তাঁর মাসতুতো ভাইকেও আশীর্বাদ করলেন।

মহাআনন্দে তিন জনে দেশে ফিরে গেলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৩১৫ সালে সরোজ কুমারী দেবীর একটি সুলক্ষণ যুক্ত পুত্র হ'ল। পুত্রের নাম নির্মল চন্দ্র রায়।

সরোজ কুমারী দেবীর জীবনের সকল অশান্তি ও অপূর্ণতা দূর হ'ল বামদেবের কৃপায়। শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হ'ল তাঁর জীবন।

সরোজ কুমারী দেবী তাঁর মা বিধুমুখী দেবী ও সরোজ কুমারী

দেবীর মামা অন্নপ্রসাদ ভাদুড়ি সারাজীবন করুণাময় বামদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল থাকেন।

উত্তরকালে তারামা ও বামদেবের কৃপাধন্য মহাভাগ্যবান শ্রীনির্মল-কুমার রায় তাঁর জন্ম কাহিনী শুনে সারাজীবন তারামা ও বামদেবের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাশীল হন।

—o—

প্রেমভক্তির বিগ্রহ শ্রীবাম

একদিন বামদেব তাঁর নিজ আশ্রমে বসে আছেন। বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। বামদেবের সামনে তাঁর প্রিয় শিষ্য ময়ুরভঞ্জ নিবাসী হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, উমেশ চক্রবর্তী। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বসে আছেন।

ভক্ত উমেশ বাবু বামদেবকে আনন্দ দেবার জন্য বামদেবের প্রিয় গীত রামপ্রসাদের "মন গরীবের কি দোষ আছে" গানটি গাইতে লাগলেন।

গানটি শুনে বামদেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নিজেও গানটি গাইতে লাগলেন। সাথে অন্য সকলেও গাইতে লাগলেন।

বামদেব গান গাইতে গাইতে বললেন, "তারামা-ই তো সব হয়েছেন এই বলে সম্পূর্ণ গানটি মধুর স্বরে গাইলেন—

"মন গরীবের কি দোষ আছে
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা
যেমন নাচাও তেমনি নাচে।
তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম
মর্মকথা বুঝা গেছে।

(ওমা), তুমিই ক্ষিতি তুমিই জল মা
তুমিই ফল ফলাচ্ছ গাছে
(ওমা) তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি
তুমি শক্তি শিব বলেছে
(ওমা), তুমিই সুখ তুমিই দুখ মা
চণ্ডীতে তা লেখা আছে,
প্রসাদ বলে কর্ম সূত্র—
সে সূতায় কাটনা কেটেছে
(ওমা) মায়াসূত্রে বদ্ধজীব
ক্ষেপাক্ষেপীর খেল খেলেছে ॥

গান শেষ করে বামদেব দিব্যভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। বামদেবের সারামুখে এক অপার্থিব জ্যোতি দর্শন করে উপস্থিত সবাই আনন্দে মূক হয়ে গেলেন।

একটু পরে বামদেব তাঁর আশ্রম থেকে বের হয়ে শ্মশানে শিমুল তলায় চললেন। সাথে যোগেন্দ্রনাথ বাবু, হরিভূষণ বাবু, উমেশ বাবু প্রভৃতিগণও চললেন। বামদেবের হাতে কমণ্ডলু।

তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মের কাছে গিয়ে ঐ কমণ্ডলুর জল নিজে কিছুটা খেলেন, বাকি উচ্ছিষ্ট জলই তারা মায়ের পাদপদ্মে ঢেলে দিলেন।

কখনো কখনো পূজা করতে করতে মূত্রত্যাগও করেন। তার ছিঁটে ফোটা পাদপদ্মে গিয়েও পড়ে।

উপস্থিত শিশু ভক্তগণ ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকেন কিন্তু তারাময় বামদেবের এসবে গ্রাহ্য নেই। তারামা'র পাদপদ্মের দিকে হৃদয় মথিত করা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "মা আমার যে কিছুই নাই মা। কেবল ঐ রাঙ্গাচরণ দু'খানি সার মা। মা, যে চরণ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব আকাঙখা করেন, পাবার কত সাধনা করেন। কেমন করে ঐ চরণ পাব মা ?—বলতে বলতে বামদেবের প্রেম ঘন রঞ্জিত বিশাল আরক্ত নয়নদ্বয় থেকে অঝোর ধারায় ভক্তির অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। প্রেমভক্তির বিগ্রহ তারাময় বামদেবের ঐ দিব্য অশ্রুধারা দেখে তাঁর শিষ্য ভক্তগণও অশ্রু সম্বরণ করতে পারেন না। এই দিব্য দৃশ্য ও দিব্য অশ্রু ধারা তাঁদের জীবনের এক অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইলো।

বামদেবের নরেন মুস্তাফীর গৃহে গমন

নরেন্দ্রনাথ মুস্তাফী সিউড়ির এক স্বনামধন্য উকিল। সিউড়ি বাজারে তাঁর গৃহ।

এই ধর্মপ্রাণ লোকটি বামদেবের বিশেষ ভক্ত। বামদেবের এই প্রিয় ভক্ত নরেন মুস্তাফী মাঝে মাঝে তারাপীঠে এসে বামদেবের দিব্য সঙ্গ লাভ করেন। বামদেবের কাছ থেকে লাভ করেন নানান সাধন উপদেশ।

তারপর এক শুভ লগ্নে বামদেবের কৃপায় তিনি তারাবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে তারানামে, তারা চিন্তায় মগ্ন হতে লাগলেন।

সংসার জীবনে যথারীতি কর্তব্য পালন করে কর্মযোগী হলেন বহিরঙ্গে। কিন্তু অন্তরঙ্গে ক্রমশ অন্তর্মুখীন হতে লাগলেন। ফলে আত্মপ্রচার বিমুখ এই শিষ্যের যথার্থ পরিচয় বামমণ্ডলের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত থাকে।

যাহোক, প্রিয় শিষ্য নরেন মুস্তাফীর আন্তরিক অনুরোধে একদিন বামদেব কয়েকজন শিষ্য ভক্ত ও সেবক সহ নরেন মুস্তাফীর গৃহে পদধূলি দেবার জন্য সিউড়ি রওনা হলেন।

পাল্কীতে তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট এলেন। তারপর ট্রেনে করে সিউড়ি এলেন। নরেন মুস্তাফী সাদরে প্রিয়তম গুরুকে ও তাঁর গুরুভাইদের নিজ গৃহে বরণ করলেন মহা আনন্দে।

নরেন মুস্তাফীর গৃহে তারাপীঠের ভারত বিখ্যাত মহাযোগী শিবাবতার বামাক্ষ্যাপার পদার্পণের খবর পেয়ে স্থানীয় অনেক ধর্মপ্রাণ লোক বামদেবকে দর্শন করতে এলেন।

তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব বামদেবের আত্মভোলা দিব্যরূপ দর্শন করে সবাই মোহিত হলেন।

যথাসময়ে বাইরের লোক বিদায় নিলে বামদেব প্রিয় শিষ্য নরেন মুস্তাফীকে একান্তে সাধন সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব উপদেশ দিলেন।

সারা দিন রাত তারামায়ের নামগানে অতিবাহিত হ'ল। এক দিব্য আনন্দের প্রবাহ বামদেবের কৃপায় নরেন মুস্তাফীর গৃহে বয়ে গেল। নরেন মুস্তাফী ও তাঁর বাড়ীর লোকজন সেই পবিত্র দিব্য প্রবাহে মগ্ন হলেন।

পরদিন স্নানাহার সেরে বামদেব সদলবলে তারাপীঠ রওনা হলেন। এই সিউড়ি শহরে তিনি ইতিপূর্বে একাধিকবার এসেছেন। যৌবনে কাশী থেকে ফেরবার পথে বৈদ্যনাথ হয়ে পদব্রজে সিউড়ী এসেছিলেন। রাত্রি অতিবাহিত করেছিলেন সিউড়ির কালীমন্দিরে (দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড)।

যাহোক, সিউড়ী থেকে ট্রেনে রামপুরহাটে এলেন বামদেব সদলবলে। রামপুরহাটে নেমে বামদেব তাঁর ভক্ত মহেন্দ্র রুজের গৃহে এলেন। রামপুরহাটে বামদেবের অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত মহেন্দ্র রুজের জয় তারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার বিখ্যাত। বামদেবের শিষ্যভক্তদের সেই দোকানে অবারিত দ্বার। মহেন্দ্র রুজ সাদরে নিজ গৃহে বামদেবকে বরণ করলেন। তারপর নিজ হাতে বামদেবের সেবা করলেন। যথাসময়ে বামদেব মহেন্দ্র রুজের গৃহ থেকে তারাপীঠ রওনা হলেন পাল্কীতে।

পথে বড় শালগ্রামে ভক্ত ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে প্রসন্ন মনে বামদেব তারাপীঠে সদলবলে ফিরে এলেন। বামদেব তারাপীঠে ফিরে এলে তারামা এবং তারাপীঠও যেন আবার সজীব হয়ে উঠলো। তারাময় শ্রীবামবিহীন তারাপীঠ যেন প্রাণহীন। এই পরম সত্য সবাই উপলব্ধি করতে পারলেন। আসন্ন ভবিষ্যতে বামদেব তারাপীঠে স্থূলদেহে অপ্রকট হলেও সূক্ষ্ম-দেহে তাঁর প্রাণাধিক তারাপীঠে তিনি যে সর্বদা বিরাজ করবেন এবং তাঁর বিদেহলীলা তারাপীঠে যে অব্যাহত থাকবে এবং তারাপীঠকে সর্বদা প্রাণবন্ত করে রাখবে,—এই মহাসত্য বামমণ্ডলের অনেকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের এই উপলব্ধি যথার্থ বাস্তবে পরিণত হয়।

—ঃ—

শ্রীবামকৃপাধন্য জনৈক কুষ্ঠরোগীর আরোগ্যলাভ

মহাপীঠ তারাপীঠের দু'মাইল উত্তরে সরলপুর গ্রাম। সরলপুরের জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সপরিবারে বামদেবের ভক্ত। শুধু তিনিই নন, তাঁর প্রজাগণও বামদেবের ভক্ত। এই ছোট্ট গ্রামের অধিবাসীগণ গ্রামের নামের সার্থক নিদর্শন। সত্যিই তারা সরলপুরের সরল মানুষ। শুধু সরল নন, গ্রামের নরনারীগণ একাধারে সরল, কৃতজ্ঞ ও সহজ মানুষ। তাই এই গ্রামের নাম সরলপুর হওয়াই স্বাভাবিক।

অল্পে তুষ্ট ধর্মপ্রাণ এই সহজ শ্রমশীল মানুষগণকে বামদেবও যথেষ্ট ভালবাসেন। এই গ্রামে বামদেব যৌবনকাল থেকে বহুবার এসেছেন।

গ্রামের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে, মেলা উৎসবে, জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের গৃহে ও আরো একাধিক ভক্তের গৃহে শ্রীবাম এসেছেন। গ্রামের অন্যান্য অধিবাসীদের সাথে এই গ্রামে কয়েক ঘর শ্রমজীবি 'লেট' বাস করে। একবার এই গ্রামের এক দরিদ্র লেট গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়।

সবরকম গ্রাম্য চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় এই মহাব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার জন্য রোগগ্রস্থ দরিদ্র লোকটি অগতির গতি তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব বামাক্ষ্যাপা'র চরণে শরণাগত হ'ল।

নিয়মিত সরলপুর থেকে বামদেবের কাছে যাতায়াত শুরু করলো। মনে তার বড় আশা যদি ক্ষ্যাপাবাবা কৃপা করেন। সর্বজ্ঞ বামদেব সবই বুঝতে পারলেন। একদিন তাকে বললেন, "ওরে, পথের ধারে শ্মশানে একখানা হাড় আছে, তা সরিয়ে দিয়ে যা।"

বামদেবের এই আদেশ শুনে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ লোকটি ভক্তিভরে তা পালন করতে গেল কিন্তু তা পালন করতে গিয়ে কাঁচা হাড়ের ভীষণ দুর্গন্ধ তার নাকে গেল। তবু নাকে কাপড় দিয়ে সে হাড়খানা সরিয়ে দিল। কি আশ্চর্য্য, বামদেবের অপার কৃপায় সেইদিন থেকে তার গলিত কুষ্ঠব্যাধি কমতে লাগলো। একমাসের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। সুস্থ হবার পর একদিন সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বামদেবকে এক পয়সার গাঁজা কিনে দিল।

পরম করুণাময় বামদেব সানন্দে সেই উপহার গ্রহণ করলেন।

তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেল। লোকটি যথারীতি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল দেহে তার নিত্য কাজ কর্ম করতে লাগলো।

১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ (আষাঢ়ের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে) বামদেব স্থূলদেহের মহালীলা সম্বরণ করে অপ্রকট হলেন। বামদেবের মহাপ্রয়াণে অন্যান্যদের সাথে এই দরিদ্র লেট লোকটিও বামদেবের বিরহে শোকে অশ্রু বিসর্জন করলো। তার জীবনদাতা মুক্তিদাতা বামদেবের স্মৃতি তার অন্তরে চিরতরে রইলো। তারপর আরো দীর্ঘ বিশ বছর কেটে গেল। বামদেবের কৃপাধন্য এই প্রৌঢ় লোকটি যথারীতি সুস্থ সবল দেহে নিত্য মজুরের কাজ করে যেতে লাগলো।

বাংলা ১৩৩৮ সালে বামদেবের তিরোভাব তিথি উৎসব উপলক্ষ্যে বামদেবের প্রিয় শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রচুর জিনিষ পত্র নিয়ে তারাপীঠ যাচ্ছেন। দশ বারজন লেট নরনারী সেই জিনিষ পত্র মাথায় নিয়ে চলেছে। এই মজুরদের মধ্যে উপরোক্ত শ্রীবামকৃপাধন্য প্রৌঢ় লেট মজুরটি কথাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায়কে তার উপরোক্ত কাহিনীটি বলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে। মহাপণ্ডিত ও মহাভক্ত শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীগুরু বামদেবের এই কৃপা কাহিনী শুনে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। একটু পরে নিজেকে সংযত করে প্রৌঢ় মজুরটিকে একটু রসিকতা করে জানালেন যে এসব জিনিষ পত্র তো বামদেবের উৎসবের জন্য তারাপীঠ যাচ্ছে।

তাই বামদেবের কৃপাপ্রাপ্ত হয়ে সে নিশ্চয়ই এই 'মোট' বহন করার জন্য পয়সা নেবে না।

শাস্ত্রীমশায়ের কথা শুনে বামদেবের অশেষ কৃপাধন্য প্রৌঢ় লেট মজুরটি ভয় পেয়ে গেল।

সরল মানুষটি ভাবলো যে শাস্ত্রীমশায় তাকে সত্যিই মজুরি দেবেন না। শাস্ত্রীমশায়ের রসিকতা সে বুঝতে পারেনি। তাই সরল সহজ মানুষটি ব্যাকুলভাবে শাস্ত্রীমশায়কে বললো, "আমি ক্ষ্যাপাবাবাকে এক পয়সার গাঁজা কিনে দিয়েছিলাম।" লোকটির কথা শুনে শাস্ত্রীমশায় মনে মনে হাসলেন।

ভয়ঙ্কর ও ভীষণ দুরারোগ্য মহাব্যাধি গলিত কুষ্ঠ থেকে যাকে বামদেব রক্ষা করলেন, চিরতরে রোগমুক্ত করে সুস্থ সবল করলেন, সেই লোক প্রতিদানে এক পয়সার গাঁজা দিয়েছে বামদেবকে। তাই এখন এই মোট বইবার জন্য সে মজুরী দাবী করতে পারে। এই হ'ল সরল লোকটির বক্তব্য।

শাস্ত্রীমশায় অবশ্য তারাপীঠে বামদেবের আশ্রমে পৌঁছে শ্রীগুরুবাম কৃপাধন্য সরলপুরের এই মজুরটিকে তার প্রাপ্য মজুরি দিলেন এবং পরে বামদেবের প্রসাদ দিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করেন।

এমনিভাবে বামদেবের অফুরন্ত করুণার ঢেউ কত দিকে প্রসারিত হয়েছে তার সংখ্যা নেই। মহাসমুদ্রের মতই তা আদি অন্ত দিগন্তবিহীন।

—o—

শ্রীবামের একটি অবিস্মরণীয় লীলা

একদিন বিকেলবেলা বামদেব তারামায়ের মন্দিরের আঙিনায় প্রায়-নগ্ন হয়ে বসে আছেন। তাঁর চার পাশে তাঁর পারিষদবর্গ সারমেয়বৃন্দ বসে আছে।

এই সময় তারামায়ের অন্নপ্রসাদ জনৈক পাণ্ডা এনে দিলেন বামদেবকে। বামদেব প্রসন্ন মনে তাঁর প্রিয় কুকুর কুকুরীদের

নিয়ে একসাথে একপাতে খেতে লাগলেন। তারামাকে পুজো দেবার জন্য উপস্থিত নরনারীগণ অনেকেই বামদেবের এই ঘৃণ্য কুকুরদের সাথে খাওয়া, বিরূপ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো।

এই সময় সাঁইথিয়া থেকে চারজন শিক্ষিত যুবক বামদেবের সামনে উপস্থিত হ'ল।

বামদেবকে এই ভাবে শ্মশানের শবমাংস ভোজী ঘৃণ্য কুকুরদের সাথে খেতে দেখে তাদের ভীষণ ঘৃণা হ'ল। সর্বজ্ঞ বামদেব তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন।

বামদেব তাদের কাছে ডাকলেন। তারপর তাদের পিঠে হাত দিয়ে বললেন। "এখন আপনারা কি দেখছেন বাবা?"

মহাযোগী বামদেবের দিব্যস্পর্শে তারা মহাবিস্ময়ে দেখলো যে বামদেব জ্যোতির্ময় দেবমানব এবং তাঁর কুকুরগুলো সব যথার্থ মানব।

আর তারা চারজন ও তারামায়ের মন্দিরে অপেক্ষমান নর নারীগণ কেউ কুকুর, কেউ বেড়াল, কেউ শেয়াল। কেউ সাপ, কেউ বাঘ, কেউ বাঁদর, কেউ বা ছাগল প্রভৃতি সব। করুণাময় বামদেবের অশেষ কৃপায় এই চারজন যুবক উপস্থিত যার মধ্যে যে পশু প্রবৃত্তি প্রকট তাই প্রত্যক্ষ করে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করবার দুর্লভ সুযোগ পেল।

বামদেবের ইঙ্গিত উপলব্ধি করে তারা লজ্জায় অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলো।

একটু পরে বামদেব তাদের পীঠ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। আবার পূর্বের অবস্থা ফিরে এল। যুবক চারজন নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হৃদয়ে তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে তারাপীঠ থেকে সাঁইথিয়ায় ফিরে গেল। বামাদেবের এই অবিস্মরণীয় লীলাটি উপস্থিত এক প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন সাঁইথিয়া-নিবাসী বিধুভূষণ দত্ত।

বামদেব তাঁর এই মহান লীলার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা দিলেন যে বাইরের আকৃতি দিয়ে সব সময় বিচার করা উচিত নয়। অন্তরের প্রকৃতিই হ'ল আসল আকৃতি।

সংসারে মানুষের আকৃতি নিয়ে অনেক নরনারী রয়েছে কিন্তু তাদের ভেতরের প্রকৃতি পশুর ন্যায়।

এরা অনেকেই হিংস্র সাপ বাঘের ন্যায় বিপদজনক। এই মানবরূপী পশুদের জন্যই জগত সংসারে অশান্তি হানাহানি রক্তপাতের বিরাম নেই। এরা স্বাভাবিক পশুদের তুলনায় অনেক বেশী বিপদজনক, অনেক বেশী ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য।

—o—

চৈতন্যময় বামদেব ও ভক্ত ভূপতি পাণ্ডা

বর্ষা ঋতু অজস্র কৃপাবারি বর্ষণ করে ধরিত্রীকে তৃপ্ত ও সজল করে সানন্দে বিদায় নিল তার কর্তব্য সুসম্পন্ন করে।

এল শরৎ তার নীল আর সবুজ পাখা মেলে। সমগ্র প্রকৃতি স্নিগ্ধ সবুজ সাজে সজ্জিত। আর অনন্ত আকাশ ঘন নীল রঙে রঞ্জিত।

মাঝে মাঝে সাদা মেঘ সেই অন্তহীন নীলের বুকে ভেসে যায় শরৎ কালের আগমন বার্তা নিয়ে। মাটির বুকে সাদা কাশ ফুলও সেই ছোট ছোট সাদা মেঘের পানে তাকিয়ে হাসিমুখে সেই বার্তা শোনে। আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে শারদীয়া পূজার আগমনীর সুর। দেবী দুর্গার আসন্ন মহাপূজার আনন্দময় ধ্বনি শুধু প্রকৃতির বুকে নয়, মানুষের বুকেও ওঠে।

মহাপীঠ তারাপীঠও শারদীয়ার আসন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দ মুখর।

পবিত্র মহালয়ার পর শুরু হ'ল দেবীপক্ষের বোধন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা এলেন নিজ আলয়ে। মহাষষ্ঠীতে হ'ল তাঁর অধিষ্ঠান। মহা-সমারোহে মহাসপ্তমী পূজা সুসম্পন্ন হ'ল।

আজ মহাষ্টমী। চণ্ডীপুর তথা তারাপুর তথা তারাপীঠ উৎসব মুখর। একে দুর্গাপূজার মহাষ্টমী তাতে আসন্ন শারদীয়া চতুর্দশী

মেলা ও মহোৎসব উপলক্ষ্যে তারাপীঠ, তারামায়ের মন্দির ও বামদেবের আশ্রম বহু সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত সমাগমে পরিপূর্ণ। আর পাঁচদিন বাদেই তারাপীঠের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপূজা তারাপূজা তথা কোজাগরী চতুর্দশী মেলা (লক্ষ্মীপূজার পূর্বদিন) ও মহোৎসব (দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড) অনুষ্ঠিত হবে। তাই ভক্ত সমাগমের বিরাম নেই। বহু দূর দুরান্ত থেকে ভক্ত নর নারীর সমাগমে তারাপীঠ ক্রমেই উৎসবের সাজে সাজছে।

আজ মহাষ্টমী পূজা। বামদেবের আশ্রম সাধু সন্ন্যাসী শিষ্য ভক্ত অনুরাগী ও দর্শনার্থীর দ্বারা পরিপূর্ণ। তারামা'র বরপুত্র বামদেবকে কেন্দ্র করেই এই আনন্দ উৎসব। একাধারে সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ।

শ্যামা সঙ্গীত, বাউল গান প্রভৃতির মাধ্যমে বামদেবের আশ্রম উৎসব মুখর। মধ্যাহ্নে তারামায়ের মন্দিরে তারামায়ের ভোগ হয়ে গেল। ভোগপ্রসাদ নেবার জন্য সমাগত অতিথিবর্গ তারামায়ের মন্দিরে গেলেন।

বামদেব প্রশান্ত মনে বসে আছেন। তারামায়ের মহাপ্রসাদ তাঁর নিত্য সেবক ও ভক্ত ভূপতি পাণ্ডা তারামায়ের মন্দির থেকে নিয়ে আসবেন। কয়েকদিনের জ্বরে বামদেবের স্থূল দেহ একটু দুর্বল হয়েছে। কিন্তু দেহ বোধহীন বামদেব তারামায়ের ভাবে বিভোর। তারামায়ের মধ্যাহ্নের অন্নপ্রসাদ নিয়ে ভূপতি পাণ্ডা বামদেবের আশ্রমে এলেন।

ভূপতি পাণ্ডা ঠিক করলেন যে আজ মহাষ্টমীর পরম পবিত্র-তিথিতে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যত্ন করে ক্ষ্যাপাবাবাকে খাওয়াবেন। তাই নিজের হাতে সযত্নে তারামায়ের অন্নপ্রসাদ (ভাত ডাল ভাজা তরকারী, মাছ, মাংস, টক, পায়েস) বেড়ে দিলেন বামদেবকে। তারপর বামদেবকে সাদরে খেতে বসালেন।

বামদেবের সাথে শ্মশানের পচা মড়াখেকো কুকুরগুলোও প্রতিদিন একসাথে এক পাতে খায়। ভূপতি পাণ্ডার এটা ভাল লাগে না। কিন্তু বামদেবের জন্যে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু আজ ভূপতি পাণ্ডা ঠিক করলেন যে তারামায়ের এই মহাপ্রসাদ শুধু ক্ষ্যাপাবাবাই খাবেন। মড়াখেকো ককুরগুলোকে ধারে কাছে আসতে দেবেন না।

তাই বামদেবকে খেতে বসিয়ে ভূপতি পাণ্ডা তাঁর সামনে লাঠি হাতে বসলেন। ভূপতি পাণ্ডা মনে করেন যে এই কুকুরগুলোর জন্যই

বামদেবের ভাল করে খাওয়া হয় না। আজ তৃপ্তির সাথে বামদেবের খাওয়া হবে। তাই কালু ভুলু লালী শ্বেতফুলী প্রভৃতি কুকুরগুলো যাতে বামদেবের সাথে খেতে না পারে তার জন্য ভূপতি পাণ্ডা লাঠি নিয়ে বসলেন বামদেবের খাবার থালার সামনে।

ইতিমধ্যে যথারীতি বামদেবের কুকুর কুকুরীগণ সেখানে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ভূপতি পাণ্ডার হুঙ্কার ও লাঠির ভয়ে বেচারারা বামদেবের খাবার থালার সামনে এগুতে পারছে না। সতৃষ্ণ নয়নে করুণভাবে একবার বামদেবের দিকে আরেকবার খাবারের থালার দিকে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে নিজেদের মুখ ও পা চাটছে এবং কুঁই কুঁই শব্দ করে নিজেদের অস্থিরতা প্রকাশ করছে।

করুণাময় বামদেব মহা বিব্রত হলেন। একদিকে সেবক ও ভক্ত ভূপতি পাণ্ডার সেবা ও আন্তরিক ইচ্ছা অন্যদিকে তাঁর আশ্রিত সন্তান সম অবোধ ও ক্ষুধার্ত কুকুর কুকুরীদের সকরুণ দূরাবস্থা।

তাই বামদেব এক কৌশল করলেন। বামদেব ভূপতি পাণ্ডাকে অন্য মনস্ক করবার জন্য অহেতুক ভূপতি পাণ্ডার খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। সেই প্রশংসা শুনে ভূপতি পাণ্ডা বিগলিত হলেন। একটু অন্য মনস্ক হতেই বামদেব সাথে সাথে কাছে উপবিষ্ট কালু কুকুরের মুখে একখণ্ড মাংস গুঁজে দিলেন। কালুকে মাংস খেতে দেখেই ভূপতি পাণ্ডা উত্তেজিত হয়ে কালুর পিঠে কয়েক ঘা লাঠির আঘাত বসিয়ে দিলেন। কালু মাটিতে পড়ে চিৎকার কবতে লাগলো।

একান্ত প্রিয় ও শরণাগত কালু কুকুরের এই কষ্ট দেখে বামদেব উত্তেজিত হয়ে প্রসাদ খাওয়া বন্ধ করে বললেন, "বন্ধ্যা কি জানিবে প্রসব বেদনা।" এই বলে প্রসাদ ফেলে উঠে গেলেন। ভূপতি পাণ্ডা নিঃসন্তান, তাই অপুত্রক ভূপতি পাণ্ডা বামদেবের এই মন্তব্য শুনে বামদেবকে আর খেতে অনুরোধ করতে সাহস পেলেন না। বরং বামদেব তাঁকে 'বন্ধ্যা' তথা নিঃসন্তান বলে ইঙ্গিত করায় ভূপতি পাণ্ডার অভিমান হ'ল। তিনি অভিমান ভরে সেখান থেকে চলে গেলেন।

নগেন পাণ্ডা এসব শুনে আবার বামদেবের জন্য প্রসাদ নিয়ে এলেন

ও কুকুরদের আলাদা প্রসাদ খেতে দিলেন এবং বামদেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন পুনরায় খাবার জন্য।

কুকুরগুলো তৃপ্তির সাথে প্রসাদ গ্রহণ করবার পর বামদেব পুনরায় সানন্দে তা গ্রহণ করলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল যে বামদেব এক অখণ্ড চৈতন্যের জীবন্ত বিগ্রহ! তাঁর সর্বজীবে সমভাব, সমজ্ঞান। একই চৈতন্যের জ্যোতিতে তাঁর কাছে মানুষ জীবজন্তু সব এক ও অভেদ হয়ে গেছে। তাই তাঁর প্রাণাধিক পরম ব্রহ্মময়ী পরম চৈতন্যময়ী তারামায়ের মহাপবিত্র অন্ন মহাপ্রসাদও পবিত্র মহাষ্টমীর দিন পরিত্যাগ করলেন শ্মশানের নিত্য মড়া থেকে পচাগলা মাংস খেকো ঘৃণ্য কুকুরদের জন্য। ঘৃণিত শব মাংস ভোজী কুকুরের জন্য ইষ্টদেবীর পরম পবিত্র অন্নপ্রসাদ মহাপবিত্র তিথিতে পরিত্যাগ করার এই মহান দৃষ্টান্ত ভারত তথা পৃথিবীর সাধন জগতে আর নেই।

এই অতুলনীয় দৃষ্টান্ত শিবাবতার বামাক্ষ্যাপার পক্ষেই সর্বতোভাবে সম্ভব। এই মহান লীলার মধ্য দিয়ে সদা চৈতন্যময় ও প্রেমময় বামদেব এই দৃষ্টান্তও স্থাপন করলেন যে প্রয়োজন বোধে ধর্মের ক্ষেত্রে ইষ্ট এবং ভক্ত সেবকের চেয়েও আশ্রিত ও শরণাগতের আকুতি অনেক বেশী মূল্যবান। একান্ত শরণাগতের জন্য ইষ্ট ও ভক্তের অনুরাগ ও উপহারকেও বর্জন করা যায়। এই হ'ল সত্য ধর্ম। উপরোক্ত লীলা তারই আনন্দময় প্রকাশ।

নিঃসন্তান ভূপতি পাণ্ডাকে কেন্দ্র করেই এই অপূর্ব লীলা বামদেব ঘটালেন। তবে সন্তানহীন ভক্ত ও সেবক ভূপতি পাণ্ডার একটি দীর্ঘদিনের বাসনা কৃপাময় বামদেব পরবর্তীকালে পূরণ করেন। বামদেবের নিঃসন্তান "ভূপো বাবা" তথা ভূপতি পাণ্ডা প্রায়ই কাঁদেন বামদেবের কাছে। ঐ একদিন সজল নয়নে বামদেবকে বললেন, "আমার তো ছেলে হ'ল না। শচীর (ভূপতি পাণ্ডার ছোটভাই) মেয়ে হলে অন্তত কোলে নিয়ে ঘুরতুম।" কৃপাময় বামদেব তা শুনে কৃপা করলেন। কিন্তু বিচিত্রভাবে। কিছুকাল পর শচী পাণ্ডার স্ত্রী সুধামুখী দেবী সন্তান সম্ভবা হলেন। বামদেব তখনও স্থূলদেহে বিরাজমান। কিন্তু প্রারব্ধ বশত ভূপতি পাণ্ডা জীবিত অবস্থায় শচীপান্ডার কন্যাকে দেখে

যেতে পারলেন না। ভূপতি পান্ডার মৃত্যুর পর শচীপান্ডার স্ত্রী সুধামুখী দেবী কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। সেই মেয়ের নাম নির্মলা। শ্রীবাম-কৃপাধন্যা সেই কন্যা নির্মলার সাথে পরবর্তীকালে বামদেবের স্নেহধন্য যতীন্দ্রনাথ পান্ডার দ্বিতীয় পুত্র ভক্তপ্রবর গুরুপদ পান্ডার বিয়ে হয়।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বামদেবের কৃপাধন্য শচীপান্ডার স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুধামুখীর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। বাংলা ১৩৭৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন বৃদ্ধা সুধামুখী দেবী তারাপীঠে তাঁর স্বামীগৃহে বসে লেখককে তা বলেন। তাছাড়া বামদেবের অশেষ কৃপাধন্য ও একাধারে শিষ্য ও সেবক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচী ইংরেজী ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর লেখককে এ সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করেন। তাঁর তারাপীঠের আশ্রমগৃহে বসে। এ ছাড়াও ভক্তপ্রবর গুরুপদ পান্ডা বিভিন্ন সময়ে লেখককে এ সম্পর্কে বলেছেন। গুরুপদ পান্ডার সাধ্বী স্ত্রী নির্মলাদেবীর সাথেও লেখক সুপরিচিত। এজন্য লেখক উপরোক্ত সবার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—০—

শারদীয়া চতুর্দশী মেলায় তারাময় বামদেব এবং ভক্তবৃন্দ

শারদীয়া কোজাগরী চতুর্দশীতে তারাপূজা হ'ল তারা পীঠের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপূজা ও মহোৎসব। সুপ্রাচীন সত্যযুগে এই শারদীয়া চতুর্দশী তিথিতেই ব্রহ্মার মানসপুত্র মহামুনি বশিষ্ঠদেব ত্রিলোক জননী তারামায়ের দর্শন পান।

পরবর্তীকালে কলিযুগে এই পরম পবিত্র তিথিতেই জয়দত্ত বণিক ও তারামা'র কৃপা ও দর্শন লাভে ধন্য হন।

তাই এই মহাপবিত্র তিথিতেই তারাপজার প্রবর্তন ও প্রচলন সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে।

তাই যুগ যুগান্ত ধরে তারাপূজা তথা কোজাগরী চতুর্দশী তিথি তারাপীঠের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা ও উৎসব রূপে সুচিহ্নিত ও সুপ্রসিদ্ধ হয়ে আসছে। এবারও যথারীতি শারদীয়া দুর্গাপূজা থেকেই ভীড় শুরু হয়েছে তারাপীঠে আসন্ন তারাপূজা ও সেই উপলক্ষ্যে মেলার জন্য।

শারদীয়া চতুর্দশী থেকে মেলা শুরু হয়ে চলে এক সপ্তাহ ধরে। বর্তমানে ভীড় আরো হচ্ছে তারাপীঠের ভারতবিখ্যাত মহাযোগী ও সদাজাগ্রত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তথা বামদেবকে কেন্দ্র করে। ফলে তাঁর দর্শন অভিলাসী বহু সাধুসন্ত ও শিষ্যভক্ত এবং অনুরাগীর সমাগমে তারাপীঠ আরো উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে। বামদেবের আটচালার আশ্রমটি ইতিমধ্যে বহু সাধুসন্ত ও শিষ্যভক্ত এবং গুণমুগ্ধদের আগমনে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

তাছাড়া অনেক দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্ত নরনারী তারামা'র সাথে বামদেবকেও দর্শনের জন্য তারাপীঠে আসছেন। তাঁরা নানান ফল মিষ্টি প্রভৃতি নিয়ে এসে দিচ্ছেন বামদেবের সেবার জন্য। শিষ্য ভক্তগণ তা তারামা ও বামদেবকে নিবেদন করে বিলিয়ে দিচ্ছেন সাধুসন্ত ও উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে।

মেলার কয়েকদিন বামদেবের আশ্রমে এত দর্শনার্থীর ভীড় হচ্ছে যে ভীড় ঠেলে বামদেবের কাছে পৌঁছানো-ই কঠিন হয়ে পড়ছে।

তারাপীঠের এই সর্বশ্রেষ্ঠ তারাপূজা ও মেলা উৎসবে বামদেবকে কেন্দ্র করে এক বিরাট আনন্দের হাট বসেছে। এই মহা আনন্দের সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বামদেবের আরো বহু শিষ্য ভক্তও তাঁর কাছে ছুটে আসেন এই আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে।

যাঁর যতদিন খুশি বামদেবের আশ্রমে থাকেন। আশ্রমের আটচালার দাওয়ায় যে যার পছন্দ মত উনুন জ্বেলে সযত্নে ভোগ রান্না করেন। তারপর তারামা ও বামদেবকে ভোগ নিবেদন করে নিজেরা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই সময় একনাগারে ভোগ গ্রহণ করতে করতে বামদেবও ক্লান্ত

হয়ে পড়েন। একে নিত্য দু'বেলা তারামার মন্দির থেকে বামদেবের জন্য ভোগপ্রসাদ আসে। তার ওপর বামদেবের আশ্রমের বিভিন্ন শিষ্য ভক্তদের প্রদত্ত নানান রকম ভোগ বামদেবকে অল্প করে হলেও গ্রহণ করতে হয় অনেকবার।

আবার তার ওপর তাঁর বহু অনুরাগী, সাধুসন্ত ও দর্শনার্থীদের প্রদত্ত ভোগও বামদেবকে গ্রহণ করতে হয়।

কোজাগরী চতুর্দশী থেকে এক সপ্তাহ ধরে অবিরাম এই উৎসব চলে। ফলে বামদেবের দৈহিক ক্লেশ এই সময় যথেষ্ট হয়। বিশেষ করে তাঁর স্থূলদেহের বয়স যেখানে সত্তর বছর। তবু কৃপাময় বামদেব সকল শিষ্যভক্ত গুণমুগ্ধ অনুরাগী ও দর্শনার্থীর বাসনা পূর্ণ করেন। কাউকে বিমুখ করেন না।

অনেক সময় স্থানাভাবে বামদেবের আশ্রমে থাকতে না পেরে বামদেবের অনেক শিষ্যভক্ত ও গুণমুগ্ধগণ পাণ্ডাদের বাড়ীতে ওঠেন। কিন্তু অনেক সময় খাওয়া দাওয়াও পাণ্ডাদের গৃহে করেন কিন্তু সারাদিন বামদেবের সঙ্গে অতিবাহিত করে অনেক রাতে পাণ্ডাদের গৃহে শয়নের জন্য যান।

এই মহা আনন্দ উৎসবের মধ্যমণি হলেন বামদেব। সদানন্দময় বামদেব কিন্তু এই বিরাট সম্মান মর্য্যাদার মধ্যেও যথারীতি শান্ত নির্বিকার।

এত লোক যে তাঁকে দর্শন করছেন, এত শিষ্যভক্ত যে তাঁর দিব্য সঙ্গ করছেন, এত সাধুসন্ত জ্ঞানী গুণী মনীষী যে তাঁর সান্নিধ্যের জন্য আসছেন এবং এত লোক যে আশ্রমে দিনরাত থাকছেন, এসব ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নীরব ও অনাসক্ত।

কারোর আসা যাওয়া থাকা খাওয়া সম্পর্কে তাঁর যেমন কোন আহ্বান নেই, তেমনি বিসর্জনও নেই।

তারা নামে, তারা গানে ও তারা ভাবে তিনি সর্বদা বিভোর। দিনরাত তারামা তথা ভগবৎ প্রসঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা ও ভক্তি সংগীত হচ্ছে আশ্রমে। বামদেবকে কেন্দ্র করেই সব হচ্ছে। বামদেব সবই দেখছেন, সবই

শুনছেন, মাঝে মাঝে কারোর প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছেন আবার কখনো কিছু কিছু মন্তব্যও করছেন।

জ্ঞানের বহু উর্দ্ধে বিজ্ঞানের অভেদভাবে তিনি বিভোর। তিনি দেখছেন যে তাঁর প্রাণাধিক তারামা-ই বহু রূপ ধরে তাঁর চারপাশে বসে আছেন। তারামা-ই সব হয়েছেন। মাঝে মাঝে এই বিজ্ঞান অবস্থা থেকে অর্থাৎ ভূমা থেকে ভূমিতে নামছেন। তখন কিছুটা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছেন। সহজভাবে কোন ভক্তকে গান গাইতে বলছেন। আবার কখনো নিজেই গাইতে লাগলেন মধুরভাবে। আবার কখনো অন্যের গানের সাথে নিজেও সুর মিলিয়ে গাইতে লাগলেন। এক কথায় বামদেব তখন সহজ স্বাভাবিক। তখন উপস্থিত সবার আনন্দ আরো বেশী হয়।

এভাবে সমগ্র পরিবেশটি এক দিব্য ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

এই কোজাগরী চতুর্দশী মেলায় বামদেবের বহু বিশিষ্ট সিদ্ধ সাধক শিষ্য ভক্তদের উপস্থিতি পরিবেশকে আরো সুন্দর করে তোলে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শাওন ফকীর, কেশব সাধু, জয়তারা বাবা, ব্রহ্মচারী তারানাথ (তারাক্ষ্যাপা), রসিক গোঁসাই, জগৎক্ষ্যাপা, মণি গোঁসাই, পূর্ণক্ষ্যাপা, হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়, হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ চৌধুরী, জ্ঞানানন্দ পরমহংস, সুশীল কুমার রায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিশ্বর ভট্টাচার্য্য, হরিসত্য চট্টোপাধ্যায়, রামদাস চট্টোপাধ্যায়, সারদা সাহা, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্ঞানবাবু, ব্রজ পাঠক, উমেশ চক্রবর্তী, দুর্গাদাস চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ বাগচী, জনৈক ফকীর সাহেব, শীতল চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

তাছাড়া আরো বহু স্থানীয় ভক্তবৃন্দও এর সাথে যোগ দেন

তাছাড়া বামদেবের প্রিয় নগেন পাণ্ডা, ভূপতি পাণ্ডা, শচী পাণ্ডা, নুটু পাণ্ডা, নবীন পাণ্ডা, প্রভৃতি বামদেবের নিত্যসঙ্গধন্য পাণ্ডাগণ তো রয়েছেনই।

সব মিলে তারাপীঠ ও বামদেবের আশ্রমে বিরাট আনন্দ উৎসব চলতে থাকে বেশ কয়েকদিন ধরে।

একদিকে আধ্যাত্মিক আলোচনা, অন্যদিকে ধর্ম সংগীত দুই-ই চলতে থাকে।

আলোচনা কখনো জ্ঞানের, কখনো ভক্তির, কখনো যোগের, কখনো কর্মের পথে চলতে থাকে।

আবার কখনো পার্থিব ব্যাপারে, কখনো অপার্থিব ব্যাপারেও আলোচনা হয়। প্রেমভক্তি ও বৈরাগ্যের আলোচনাই বেশী হয়। একদিন এই চতুর্দশী মেলা উৎসবে এমনি ভাবে আলোচনা চলছে। বামদেব কখনো চুপ করে আলোচনা শুনছেন, কখনো আপন মনে 'জয়তারা' বলে তারামাকে ডাকছেন, কখনো তারামাকে গালাগালি করছেন অভিমান করে। এসবের মধ্য দিয়েও তারামাকেই তাঁর ডাকা হচ্ছে।

হঠাৎ বামদেব তাঁর উপস্থিত ভক্তদের এই শাস্ত্রীয় আলোচনায় যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, "তু শালারা অং বং করে কি বকছিস? সব ছেড়ে দিয়ে মাকে না ডাকলে, মাকে না ধরলে কি মা'র দয়া হয়?"

এই সময় জনৈক পণ্ডিত দীক্ষা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে বামদেব রহস্যভরে বললেন, "শালারা দিনে চর্ব্ব্যচোষ্য করে খেয়ে রাত্রে ঘরে পরিবার নিয়ে শোবে। আর আমার কাছে আসবে দীক্ষা নিতে। আমি সে শালাদের দীক্ষা দিই না। এই আমার মত হ, শ্মশানে থাক্। শিমুলতলায় মা মা বলে ডাক্, দেখ্ মায়ের সাড়া পাবি।"

তারপর বামদেব স্মিত হেসে বিচিত্র ভঙ্গিতে বললেন, "আরে আমি তো ক্ষেপা। শ্মশানে মশানে থাকি, ক্ষেপার কাছে দীক্ষা নিতে হলে ক্ষেপার মত হতে হয়।"

ভক্তপ্রবর হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় বললেন, "হ্যাঁ বাবা, আসক্তি থাকতে উপায় নেই, আসক্তি পতনের কারণ।

তাই গীতায় বলছে যে আসক্তি থেকেই কামনা জন্মে। সেই কামনায় বাধা পেলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে হিতাহিত জ্ঞান রহিত হয় এবং তা থেকেই জীবের পতন হয়। পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তা শুনে বললেন, "অনাসক্তি তো দূরের

কথা। এখন লোকের ব্রহ্মচর্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টি নেই। ব্রহ্মচর্য সকল তপস্যার মূল।"

বামদেব চুপ করে সব শুনছেন। এই সময় জনৈক সাধু বললেন, "আর এই অপরিমিত ইন্দ্রিয় পরিচালনার কুফল কতই না ভীষণ হয়। আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাঙ্গালী বেঁচে আছে, এই আশ্চর্য্য।" বামদেব পুনরায় বিরক্ত হয়ে বললেন, "আরে শালারা, কত কি বকছিস? বাবা অবিনাশ, তারা তারা বল, মায়ের নাম কর।"

অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়—"তারা তারা তারা, জয় তারা জয় দুর্গা, জয় কালী জয় তারা" বলতে লাগলেন।

একটু পরে বামদেব প্রিয় ভক্ত উমেশ চক্রবর্তীকে স্নেহভরে বললেন, "বাবা উমেশ, একটা মায়ের নাম লও তো বাবা।"

উমেশ চক্রবর্তী সশ্রদ্ধ চিত্তে বললেন, "যে আজ্ঞে বাবা।" তারপর মধুর স্বরে গাইতে লাগলেন,

"শরণ লইলাম চরণে তোমার
জীবনে মরণে শ্যামা মা।
একবার দে গো দেখা দীনের জননী
দিন ফুরায়ে যায় মা।।
আর কোন সাধ নাই মা চিতে
বারেক হেরিতে চাই।
আমার জীবনের সাধ মেটে গো শ্যামা
কোলে যদি যেতে পাই।।
ধূলা ঝেড়ে কোলে নেমা তুলে
আঁচলে মুছায়ে মুখ।
আর ঘুমায়ে থেকো না ঈশান ললনা
পাষাণে বাঁধিয়া বুক।।
বিত্তরতনয়ে করুণা লেশ
কর দুখহারা দুখেরি লেশ
আর কত কৃত করমের দোষে
মরণ যাতনা সব গো মা।

দীন সতীশে কর মা ত্রাণ
শীতল কর মা তাপিত প্রাণ
আমায় আর না কাঁদায়ে বাঁধা খুলে দিয়ে
আঁধারে আলোক দেখা গো মা।”

এই অপূর্ব শ্যামা সংগীতটি শুনে বামদেব আনন্দে বললেন। “আহা বেশ গান, আঁধারে আলো দেখা গো মা, মা মা মা তারা জয়-তারা মা।”

ভক্তপ্রবর হরিবাবু বললেন “লাভপুরের নিকট ‘চইটা’ গ্রামে সতীশ মুখোপাধ্যায় থাকেন। তিনি ভক্ত লোক। অনেকগুলি গান রচনা করেছেন। গানগুলি বড়ই সুন্দর।”

বামদেব গানের আনন্দে ভাসছেন। পুনরায় উমেশ চক্রবর্তীকে বললেন, “বাবা উমেশ আর একটা গান কর।

উমেশ বাবু ভক্তি ভরে গাইতে লাগলেন—

“সঘনে কানে বল কালী
মন প্রাণ ঐক্য করে দিয়ে করতালি।
অনিত্য প্রেমেতে মন মিছে কেন হও মগন
বিষয় বাসনা জলে দাও জলাঞ্জলি।
কুবাসনা কুমন্ত্রণা অন্তরেতে স্থান দিও না।
পাবে তবে শবাসনা যাবে মনের কালী
নির্মল প্রেম জলে শুদ্ধাভক্তি বিল্বদলে
দাও মায়ের চরণে অঞ্জলী অঞ্জলী।”

গান শুনে বামদেব খুব আনন্দ পেলেন।

মৃদুস্বরে বললেন, “আহা বেশ গান বাবা, প্রাণ জুড়ালো”। তারপর সমবেত ভক্তদের বললেন, “মধ্যে মধ্যে মায়ের নাম নিবি। কেমন আনন্দ পাবি দেখবি।”

ফতেপুর এম ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভক্তপ্রবর যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত সবাইকে বললেন, “বাবা আমাদের মহাপ্রেমিক, সর্বদায় প্রেম ভক্তি চলে।” সেদিনের আসর শেষ করে বামদেব

আশ্রম থেকে শিমুলতলায় চললেন। সাথে সাথে তাঁর প্রিয় শিষ্যগণও শিমুলতলায় রওনা হলেন। এক মধুর দিব্যভাবের প্রবাহ বইতে লাগলো সবার অন্তরে।

—ঃ—

শ্রীবাম করুণাধন্যা দাক্ষায়ণী দেবী

শারদীয়া পূজার পর তারা পূজার মহোৎসবে তারাপীঠ আনন্দমুখর। সাতদিন ব্যাপী তারাপূজা তথা চতুর্দশী মেলা উৎসব চলছে। এই সময় একদিন মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার অধীন ডালবুন্দি থেকে দীর্ঘ আঠারো মাইল পায়ে তারাপীঠে এসে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে উপস্থিত হলেন দাক্ষায়ণী দেবী।

দাক্ষায়ণী দেবীর দেহ ক্লান্ত শ্রান্ত কিন্তু মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত তারাপীঠে এসে পেঁছতে পেরেছেন বলে। দাক্ষায়ণীদেবীর সম্পূর্ণ নাম শ্রীযুক্তা দাক্ষায়ণী মুখোপাধ্যায়। এই মহিয়সী মহিলাকে স্বয়ং বামদেব ‘মা’ বলে ডাকেন।

বামদেবের তথাকথিত “মা” তথা দাক্ষায়ণী দেবী তাঁর সযত্নে আনা খাবারের পুটলী খুলে নিজ হাতে প্রস্তুত সব খাবার বামদেবকে দিলেন। এই খাবার গুলো বামদেবের বিশেষ প্রিয় খাবার। খাবার গুলো হ’ল, চাল ভাজা, ছোলাভাজা ও নারকেলের তৈরী নানান মিষ্টি খাবার।

করুণাময় বামদেব খাবারগুলো সানন্দে গ্রহণ করলেন। উপস্থিত সাধুসন্ত ও শিষ্য ভক্তগণে সবিস্ময়ে দেখলেন যে বামদেবকে উপরোক্ত খাবার গুলো সযত্নে খাইয়ে দিচ্ছেন “মা” দাক্ষায়ণী। আর তার সাথে

তাঁর চোখে মাতৃত্বের দিব্য আনন্দ ঝরে পড়ছে। ছোট্ট শিশুর মতই বামদেব বসে বসে খাচ্ছেন তাঁর 'মা'-র হাত থেকে। ভক্তের হাত থেকে ভগবান খাচ্ছেন ছোট্টটি হয়ে। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই মহাভাগ্যবতী মহিয়সী মহিলার পরিচয় জানবার জন্য অনেকেই উৎসুক হলেন।

বামদেবের তথাকথিত "মা" দাক্ষায়ণী দেবীর জন্ম আনুমানিক বাংলা ১২৭১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত খড়গ্রাম থানার ডালবুন্দি গ্রামে। এক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ (চট্টোপাধ্যায়) পরিবারে তাঁর জন্ম। ছোট বেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর বিবাহ হয় তারাপীঠের অদূরে চাকপাড়া গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুখার্জী পরিবারে।

এই মুখার্জী পরিবারেই বামদেবের ছোটভাই রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা সর্বমঙ্গলা দেবীর বিয়ে হয়। তাঁর স্বামীর নাম শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়। সেজন্য বামদেবের সাথে দাক্ষায়ণী দেবীর পরিচয় আরো গভীর হয়। যৌবনে দাক্ষায়ণী দেবী তাঁর একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ভয়ঙ্কর শোকে প্রায় পাগলের ন্যায় হলেন। ছুটে ছুটে তারাপীঠে চলে আসেন। তারামায়ের চরণে কিছুক্ষণ থেকে একটু শান্তি লাভ করে আবার বাড়ী ফিরে যান।

ক্রমশঃ তারামায়ের অভেদ স্বরূপ তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপা লাভ করলেন তিনি। সর্বজ্ঞ বামদেব এই সন্তান-হারা মায়ের সীমাহীন শোক উপলব্ধি করে প্রায়ই তাঁকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ক্রমশ মৃত সন্তানের জন্য জননীর সমগ্র অন্তরের অবিরাম হাহাকার বামদেবকে ব্যাথিত করে তোলে। তিনি নিজেই পুত্রভাবে "মা" বলে এই সন্তান হারা জননীকে ডাকতে শুরু করলেন। অমৃতময় বামদেবের মধুর 'মা' সম্বোধনে শোকাতুরা জননী দাক্ষায়ণী শান্ত হলেন। পুত্র জ্ঞানে এই পরম ব্রহ্মবিদ মহাযোগী দেব মানবকে তিনি দেখতে লাগলেন। তাঁর মাতৃ হৃদয়ের সকল সঞ্চিত স্নেহ রাশি ঝরে পড়তে লাগলো জগত গুরু শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ওপর। বাৎসল্য রসে আপ্লুতা হলেন মা দাক্ষায়ণী দেবী। পুত্র স্বরূপ বামদেবের জন্য বামদেবের প্রিয় খাবার প্রস্তুত করে দীর্ঘ আঠারো

মাইল পথ এক নাগাড়ে পায়ে হেঁটে, কোথাও একটুও না বসে এক ভাবে একটানা হেটে তারাপীঠে এলেন সুদূর মুর্শিদাবাদের ডালঝুপি গ্রাম থেকে। একজন শোকাতুরা মহিলার পক্ষে এই দীর্ঘ পথ একটানা হেটে আসা সাধারণ ব্যাপার নয়।

যা হোক, তারাপীঠে এসে প্রাণভরে নিজের হাতে বামদেবকে খাইয়ে দিলেন। বামদেবও শিশুর মত তা মহা আনন্দে গ্রহণ করলেন। বামদেবকে খাইয়ে স্নেহাতুরা জননী দাক্ষায়ণী অসীম তৃপ্তি ও শান্তি পেলেন।

মাঝে মাঝে এমনি ভাবে দাক্ষায়ণী দেবী তারাপীঠে আসেন। তারামাকে দর্শন করে পুত্র প্রতীম বামাক্ষ্যাপা বাবাকে প্রাণ ভরে খাইয়ে গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরে যান। এমনি ভাবে কিছুকাল কেটে গেল। এদিকে দাক্ষায়ণী দেবীর ভাই রামদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর দুই পুত্রের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক পেয়ে সংসার ত্যাগ করে সস্ত্রীক কাশী চলে যান।

কাশী বিশ্বনাথের শ্রীচরণে নিজেদের সমর্পণ করে অনাসক্ত ভাবে দিন কাটাতে থাকেন।

দাক্ষায়ণী দেবী গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন তাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর মানসিক অবস্থা। পুত্রশোকের সীমাহীন শোক তিনি ভাল করে নিজেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। ভাইয়ের বংশ না থাকলে বাড়ীতে বহুকালের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীদেবীর পূজা ও অন্যান্য পার্বণ বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া পিতৃপুরুষগণও আর তর্পনজনিত পবিত্র জল পাবেন না উত্তর পুরুষের কাছ থেকে।

তাই সব দিক চিন্তা করে ভাই রামদাস চট্টোপাধ্যায়কে সস্ত্রীক কাশী থেকে ফিরিয়ে আনলেন। তারপর তারাপীঠে এনে বামদেবের চরণ কমলে তাঁদের সমর্পণ করলেন।

কৃপাময় বামদেব দাক্ষায়ণীদেবীর মনের আর্তি উপলব্ধি করলেন। তাই তাঁর দুর্লভ পবিত্র সঙ্গ দিলেন রামদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রীকে। বামদেবের দুর্লভ দিব্য সান্নিধ্য লাভ করে রামদাস বাবু ও

তাঁর স্ত্রী'র প্রারব্ধ ক্ষয় হয়। কালক্রমে বামদেবের আশির্বাদে তাঁরা পুত্র লাভ করেন। তাঁদের বংশ রক্ষা হ'ল।

তারামা ও বামদেবের কৃপায় এই পুত্র লাভ হ'ল বলে পুত্রের নাম দিলেন 'তারাপদ'।

উত্তরকালে তারাপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর নামের সার্থকতা রাখেন (যথাস্থানে সেই কাহিনী বর্ণিত হবে)।

বামদেবের কৃপাধন্য রামদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী পরমপুরুষ বামদেবের অনেক লীলা দর্শন করে জীবন সার্থক করেছেন।

বামদেবের বহু লীলা দর্শন ধন্যা ও কৃপাধন্যা বামদেবের তথা-কথিত 'মা' দাক্ষায়ণীদেবী ১৩৫৩ সালে ৮২ বছর বয়সে স্থূলদেহ ত্যাগ করে তারামায়ের আনন্দলোক তথা তারালোকে গমন করেন, যেখানে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ধর্মপুত্র শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা মহানন্দে বিরাজমান।

পরবর্তীকালে বামভক্ত রামদাস চট্টোপাধ্যায়ও দেহত্যাগ করেন। বামদেবের কৃপাধন্যা রামদাসবাবুর পত্নীও ১৩৭৩ সালের আশ্বিন মাসে দেহত্যাগ করেন। বামদেবের আশীর্বাদপ্রাপ্ত এই ভক্তদম্পতির পুত্র তারাপদ চট্টোপাধ্যায়ও তারামায়ের এক একনিষ্ঠ ভক্তরূপে সুচিহ্নিত।

তারামা ও বামদেবের ওপর তারাপদ চট্টোপাধ্যায়ের বাল্যকাল থেকেই তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়।

বামদেবকে তিনি স্থূলদেহে দেখেননি। বামদেবের দেহত্যাগের অনেক পরে তাঁর জন্ম হয়। তবু ছোটবেলা থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে তারামা ও বামদেবের চরণে যাতায়াত করতে করতে অনেক শ্মশান বিভূতি ও অলৌকিক দিব্য দর্শন লাভ করেন।

কৌল ক্রিয়াকর্মে নিষ্ঠাবান এই ভক্তপ্রবর তারাপীঠে বামদেবের দিব্যসঙ্গধন্য অনেক প্রাচীন ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করেছেন ছোটবেলা থেকেই।

সর্বোপরি তাঁর পিসিমা দাক্ষায়ণী দেবী ও পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায় ও মাতৃদেবীর কাছ থেকে বামদেবের অনেক লীলা কাহিনী জানবার

মহাসৌভাগ্য তাঁর হয়েছে—যা তাঁর পিসিমা ও পিতামাতা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন।

১৯৭১ সালে তিনি লেখককে সেসব কাহিনী সবিস্তারে বলেন। পরবর্তীকালে আরো একাধিক কাহিনী তিনি লেখককে বিভিন্ন সময়ে বলেন। সেসব কাহিনী যথাসময়ে যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে ও হবে। লেখক এজন্য এই শিক্ষাব্রতী ও সাধকভক্তের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—০—

লীলাময় বামদেবের আশ্চর্যলীলা

লীলাময় বামাক্ষ্যাপাবাবার লীলা চলছে অবিরাম। তাঁর নিত্য-লীলা বড়ই মধুর ও সংকেতপূর্ণ।

তারাপূজা ও চতুর্দশী মেলার পর তারাপীঠ আবার শান্ত নির্জন মনোরম রূপ ধারণ করলো।

বামদেব স্বভাবত নির্জনতা প্রিয়। তাই দুর্গাপূজা থেকে প্রায় একমাস ধরে এই অসম্ভব ভীড় কোলাহলে বামদেব অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

এবার ভীড় কমে যাওয়ায় বামদেব প্রসন্ন হলেন। আশ্রমে মাত্র কয়েকজন শিষ্য ভক্ত ও সেবক রয়েছেন। শরৎ শেষ হয়ে হেমন্ত-কাল শুরু হ'ল।

দিগন্ত বিস্তৃত সোণালী ফসলের সমারোহে চারদিক আনন্দমুখর। আসন্ন নবান্নের উৎসবের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে। দিকে দিকে শীতের পদধ্বনি শুরু হয়েছে। সোণালী রোদের মিষ্টি পরশ দেহে মনে এনে দিচ্ছে সুখময় সজীবতা।

এই আনন্দময় পরিবেশে তারাপীঠও আনন্দপূর্ণ। সদানন্দময় বামদেব এমনি মধুর পরিবেশে একদিন তাঁর আশ্রম থেকে শিমুল-তলায় এসে বসলেন।

তাঁর সামনে বসে আছেন তাঁর প্রিয় ভক্ত রামদাস চট্টোপাধ্যায় ও আরো দু'একজন শিষ্য ভক্ত।

তখন অপরাহ্ণকাল। একটু পরে সন্ধ্যা নেমে এল তারাপীঠের বুকে। সহসা ঢাক ঢোল কাঁসী ঘন্টা মহাশ্মশানের মধ্যে বাজতে লাগলো। যেন মহাশ্মশানে তারামা'র পুজো হচ্ছে। অথচ মহা-শ্মশানে কোন লোকজন নেই। রামদাস বাবু ও অন্যান্যরা স্তম্ভিত হ'লেন এই বাজনা শুনে। আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার, এই অদৃশ্য বাজনার তালে তালে বামদেব বলতে লাগলেন, "তারা তারা মড়া মড়া।"

রামদাস বাবু জানতে চাইলেন এই কথার তাৎপর্য্য।

উত্তরে বামদেব প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, "সবাই তো মড়া, একমাত্র তারা-ই সজীব।"

বামদেবের এই গভীর উক্তির তাৎপর্য্য অত্যন্ত গভীর। জাগতিক জীবনে জীবমাত্রেরই শেষ পরিণতি মৃত্যু। অনিত্য জীবের ভোগের শেষ পরিণতি রোগ শোক মৃত্যু। তাই এই পার্থিব জগতের সবারই শেষ পরিণতি হ'ল মৃত্যু বা মড়া।

কিন্তু একমাত্র পরমা চৈতন্যময়ী ব্রহ্মময়ী তারামা-ই হলেন এই পার্থিব জগতে নিত্য, চিরন্তন ও সজীব। এক কথায় পার্থিব জগতে তিনিই একমাত্র অপার্থিব, শাশ্বত ও নিত্য প্রাণময়ী।

তাই এই অনিত্য তথা ক্ষণিক জড় জীবনের মধ্যে থেকে নিত্য তথা চিরন্তন মহাচৈতন্যময়ী তারামাকে সতত স্মরণ করা উচিত।

তাহলেই তারামা'র কৃপায় অনিত্য জীব নিত্য তথা শিবের সন্ধান পাবে।

বামদেবের এই কথার সারমর্ম উপলব্ধি করে উপস্থিত সবাই স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

একটু পরে রামদাস চট্টোপাধ্যায় বামদেবকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলেন। "বাবা, এই বাজনা কিসের?"

বামদেব উত্তরে বললেন, "দেবদেবীরা ব্রহ্মময়ী তারামা'র পূজা করছেন।"

তারামায়ের এই অদৃশ্য পূজারতির মধুর বাজনা বেশ কিছুক্ষণ চলতে লাগলো। বামদেব ও উপস্থিত শিষ্য ভক্তগণ স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

এক সময় বাজনা মিলিয়ে গেল মহাশ্মশান থেকে। একটু পরে বামদেব সদলবলে শিমুলতলা থেকে তাঁর আশ্রমে চলে এলেন।

আরেকদিন, সকালবেলা বামদেব দ্বারকানদীতে স্নান করতে গেলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল কিন্তু বামদেবের দেখা নেই। ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল। তবু বামদেবের দেখা পেলেন না কেউ।

চিন্তায় অস্থির হয়ে দ্বারকানদী ও চারদিকে শিষ্য ভক্ত ও পাণ্ডাগণ বামদেবের খোঁজ করতে লাগলেন। এমন কি তারাপীঠের উত্তরে মুণ্ডমালিনীতলা পর্য্যন্ত বামদেবের সন্ধান করা হ'ল কিন্তু বামদেবের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

সবাই ভেবে পাচ্ছেন না যে বামদেব কোথায় গেলেন। তারাপীঠের চারদিকে এত লোকজনের মাঝ থেকে বিশালদেহী বামদেবের অদৃশ্য হওয়া কি করে সম্ভব? বিশেষ করে যেখানে তিনি সর্বজন বিদিত। তাই কেউ না কেউ তাঁকে কোথাও দেখলে নিশ্চয়ই এসে খবর দিত।

ক্রমে শিষ্য ভক্ত ও সেবক পাণ্ডাদের ব্যাকুল আর্তি বাড়তে লাগলো। শ্রীবাম বিহনে যেন চারদিক অন্ধকার। সবাই নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করতে লাগলেন। অনেকেই দুর্ভাবনায় চিন্তায় বিরহে ব্যাকুল হয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

ক্ষ্যাপাবাবা বোধহয় চিরতরে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। এই চরম মুহূর্তে হঠাৎ দ্বারকানদীর জলের মধ্য থেকে বামদেব সিক্ত-দেহে উঠে এলেন।

সবাই একাধারে মহাবিস্ময় ও মহানন্দে মুখর হলেন। বামদেব প্রসন্নমনে আশ্রমে এসে সিক্তবস্ত্র ছেড়ে শুস্কবস্ত্র পরিধান করলেন। সেবক ভক্তগণ তাঁর সিক্তদেহ সযত্নে মুছিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, আপনি এতক্ষণ আমাদের এত দুশ্চিন্তা ভাবনা ও খোঁজাখুঁজি করালেন কেন?"

উত্তরে বামদেব হেসে বললেন, "দেখছিলাম আমাকে তোরা কত ভালবাসিস?"

লীলাময় বামদেবের এই বিচিত্র উত্তর শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

প্রিয় শিষ্য ভক্তদের ভালবাসা পরীক্ষা করবার জন্য যিনি সারা-দিন জলের মধ্যে একটানা ডুবে ছিলেন তাঁর ভালবাসার পরিমাপ কে করবে?

বামদেব হঠযোগ ও রাজযোগসিদ্ধ মহাযোগী। তাই কুম্ভক করে সারাদিন জলের মধ্যে বসে রইলেন।

সাধারণ হঠযোগী যেখানে কিছুক্ষণ পরেই দমবন্ধ হ'বার ভয়ে তথা মৃত্যুর ভয়ে জলের মধ্য থেকে উঠে আসেন, সেখানে বামদেব নিতান্ত খেলাচ্ছলে একটানা দশ ঘন্টা জলের মধ্যে ডুবে রইলেন বালসুলভ খেলার আনন্দে।

অরেকবার বামদেব তারাপীঠে দ্বারকানদীর ওপর পদ্মাসনে বসে তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে ভাসতে ভাসতে কয়েক মাইল উত্তরে উদয়পুরে গিয়ে জাগ্রতা কালী মাকে প্রণাম করে আবার জলের ওপর বসে ভাসতে ভাসতে তারাপীঠে চলে এলেন।

বামদেব যে রাজযোগী, এই পঞ্চভূতের দেহপ্রকৃতি ও মহাপ্রকৃতি যে বামদেবের বশীভূতা, উপরোক্ত লীলাকাহিনী তারই আনন্দময় নিদর্শন।

———ঃঃ———

শ্রীগুরু বাম ও শাকম্ভরী ভৈরবী মা

একদিন শ্রীবাম শিমুলতলায় বসে আছেন। সামনে কয়েকজন শিষ্য ভক্ত। নানান রকম সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে। শ্রীবাম শান্ত নির্বিকার। মাঝে মাঝে উন্মুখ হয়ে পথের পানে তাকাচ্ছেন। যেন কার আগমনের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছেন। এই সময় উপস্থিত হলেন শ্রীবামের শিষ্যা শাকম্ভরী ভৈরবী মা।

এই সিদ্ধ সাধিকা শ্রীগুরু বামের অশেষ কৃপাধন্যা। যৌবনে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তারাপীঠে এসে শ্রীগুরু বামের কৃপালাভ করেন। তাঁর জীবন যেমন অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ তেমনি তাঁর মন্ত্র প্রাপ্তি, সাধনা, সিদ্ধি লাভও বিস্ময়কর ভাবে অলৌকিক।

যাহোক, শ্রীগুরু বামদেব প্রিয় শিষ্যাকে দেখে আনন্দিত হলেন। উপস্থিত সবাই উপলব্ধি করলেন যে সর্বজ্ঞ শ্রীবাম জানেন যে তাঁর প্রিয় শিষ্যা শাকম্ভরী ভৈরবী মা আজ আসছেন তারাপীঠে।

শ্রীগুরু বামদেবকে প্রণাম করলেন সশ্রদ্ধ চিত্তে ভৈরবী মা। সানন্দে আশীর্ব্বাদ করলেন বামদেব। ভৈরবী মা জানালেন তাঁর অন্তরের প্রার্থনা। সর্বজ্ঞ শ্রীবাম সম্মতি দিলেন শান্তভাবে। এই প্রবীনা সিদ্ধ সাধিকা শ্রীগুরু বামদেবের তিরোভাবের পূর্বেই নিজের মরদেহ ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শ্রীগুরুর মহাপ্রয়াণের পূর্বে শিষ্যার দেহত্যাগের ইচ্ছা সাধারণত স্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রাণাধিক শ্রীগুরুর বিরহ সহ্য করবার চাইতে নিজেই পূর্বে মরদেহ ত্যাগ করে আনন্দে চলে যাবার দৃষ্টান্ত ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে বিরল নয়।

যেমন, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য লীলা পরিকর ও প্রধান পার্ষদ সিদ্ধ মহাপুরুষ প্রবীন যবন হরিদাস যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আসন্ন অপ্রকট হবার কথা জানতে পারেন তখন সেই দুঃসহ বিরহ সহ্য করতে চাইলেন না। তাই নিজেই স্বেচ্ছায় মহাপ্রভুর অনুমতি নিয়ে সানন্দে দেহ ছেড়ে দিয়ে নিত্যধামে চলে গেলেন।

সিদ্ধ সাধিকা শাকম্ভরী ভৈরবী মা যেন নাম সিদ্ধ মহাসাধক যবন হরিদাসের আনন্দময় বিগ্রহ। শ্রী গুরু বামদেবের অপ্রকট হবার মহালগ্ন যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে, তা তিনি আপন সাধন বলে জানতে পারেন।

তাই শ্রীগুরু বামদেবের কাছে তিনি এই বর প্রার্থনা করলেন যে তিনি গুরুদেবের তিরোভাবের পূর্বেই দেহত্যাগ করে তারামায়ের কোলে পরম আনন্দে চলে যাবেন। তাঁর এই অসীম শ্রদ্ধাভক্তি দেখে শ্রীগুরু বামদেব প্রিয় শিষ্যার অভিলাষ পূর্ণ করলেন। তিনি বর দিলেন যে যথা সময়ে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হবে। মহাসাধিকা এই বর লাভ করে মহা আনন্দিতা হলেন। কয়েক দিন তারাপীঠে থেকে শ্রীগুরুর সেবাযত্ন প্রাণ ভরে করলেন। ইতিপূর্বেও বহুবার শ্রীগুরু বামের সেবা যত্ন করেছেন মনপ্রাণ দিয়ে।

তারপর তারামাকে ও গুরু বামদেবকে প্রণাম করে যথাসময়ে নিজ আশ্রম কুটীরে ফিরে গেলেন।

এই মহাসাধিকার জীবন কাহিনী যেমন অলৌকিক তেমনি বিশাল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার সাহাগঞ্জ গ্রামে এক বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবারে এই মহা সাধিকার জন্ম। এই পরিবার দান ধ্যান, সাধুসন্তের সেবা ও নানান সৎকর্মের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। ছোটবেলা থেকেই শাকম্ভরী দেবী পরিবারের এই মহান ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হন। ফলে বাল্যকাল থেকেই তিনি বহু সাধক সাধিকার দিব্য সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন থেকেই তাঁর মধ্যে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে। কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা প্রভৃতির ছোট ছোট মূর্তি নিয়ে প্রাণভরে পুজো করতে থাকেন। বাড়ীতে যখন কোন সাধক সাধিকা আসেন তখন তিনি প্রায় সর্বক্ষণ তাঁদের সান্নিধ্যে থাকেন। এই সাধকগণ ও এই বালিকার সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যত বাণী করেন।

সেই সময়ের রীতি অনুসারে কৈশোরে শাকম্ভরী দেবীর বিয়ে হয়। নদীয়া জেলার কাঁচরাপাড়ার বিখ্যাত বৈদ্যবংশে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর স্বামীর নাম রাধাজীবন রায়। তিনি একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। কালক্রমে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। শাকম্ভরী দেবীর শ্বশুর

ছিলেন স্বনাম ধন্য কবিরাজ। তাছাড়া সুকবি রূপে তিনিও খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর নাম কৈলাস চন্দ্র রায়।

কবি রাধাজীবন রায় চুঁচড়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক রূপে খ্যাত আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র সরকারের সাহিত্য সহযোগী ছিলেন। এই সময় সহসা রাধাজীবন রায় অকাল মৃত্যু বরণ করেন। শাকম্ভরী দেবীর বয়স তখন খুবই অল্প। বিয়ের কিছু কালের মধ্যে অকালে স্বামীকে হারিয়ে বিধবা শাকম্ভরী দেবী শোকে দুঃখে পাগলের ন্যায় হয়ে যান। এই তরুণী বিধবার এই শোচনীয় দুঃখ কষ্ট ও সীমাহীন শোক দেখে তাঁর অভিভাবকগণ তাঁর সারা জীবন বৈধব্যের কথা চিন্তা করে তাঁকে পুনরায় বিয়ে দেবার জন্য বহু চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি আর সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হলেন না। অধ্যাত্ম সাধনায় ক্রমে ক্রমে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে লাগলেন।

এই চরম শোক ও নিঃসঙ্গতার সময়ে সহসা তিনি স্বপ্নে নিদেশ পান তারাপীঠের শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার। বামদেবের ঐশী কৃপায় জনৈকা ভৈরবীর সাথে তিনি তারাপীঠে গিয়ে বামদেবের দর্শন ও কৃপালাভ করলেন। যথাসময়ে দীক্ষা দিয়ে তাঁকে কৌল সাধনায় অভিসিক্ত করলেন শ্রীগুরু বামদেব।

বামদেবের নির্দেশে ও কৃপাশক্তিতে কালক্রমে তিনি শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ক্রমে ক্রমে ভৈরবী শাকম্ভরী মা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বহুদিন তিনি বামদেবের সেবা ও সাধনায় নিজেকে উজাড় করে দেন। কালক্রমে একজন উচ্চ কোটির সাধিকা রূপে তিনি বাম-মণ্ডলে সুপরিচিতা হ'ন। মাঝে মাঝে তারাপীঠে এসে ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামদেবকে দর্শন করে যান এবং সাধ্যমত সেবা যত্ন করেন। এইভাবে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন। শ্রীগুরুবামদেবের কাছ থেকে বর লাভ করে যথাসময়ে এই মহা সাধিকা বামদেবের মরলীলা ত্যাগের পূর্বেই মরদেহ ত্যাগ করে তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মে বিলীন হলেন।

বামদেবের অন্যতম শিষ্য বরদাকান্ত। তাঁর শিষ্য অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধ পাগল বাবা। এই পাগলবাবার পত্নীর কাকিমা ছিলেন শাকম্ভরী ভৈরবী মা।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক পাগল বাবার সুযোগ্য শিষ্য নদীয়া জেলার রাজীবপুর নিবাসী পাগল যোগানন্দ বাবার এবং কবিরাজ অজিত কুমার রায়ের (মিত্র পাড়া রোড, নৈহাটী) নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সংযোগের জন্য নিমাই ক্ষ্যাপার কাছেও কৃতজ্ঞ।

—০—

শ্রীবামের বক্রেশ্বর গমন
ও
পরম দিব্যলীলা দর্শন

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সতীপীঠ ও মহান সিদ্ধপীঠ রূপে সুপ্রাচীন মহাপীঠ বক্রেশ্বর যুগ যুগ ধরে বাংলা তথা ভারতের সাধক ও গৃহী সমাজে সুপরিচিত। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ষ্টেশনের সাতমাইল দূরে এই মহাপীঠ বক্রেশ্বর অবস্থিত। সত্যযুগে সতীদেবীর ভ্রূমধ্য তথা মনঃ এই মহাপবিত্র ক্ষেত্রে পতিত হয়েছে।

এই পীঠের দেবী মহিষমর্দিনী ও ভৈরব হলেন বক্রনাথ।

প্রাচীনকালে এই মহাপীঠে মহামুনি অষ্টাবক্র সিদ্ধিলাভ করেন। তাছাড়া আরো বহু সাধু মহাত্মা যুগ যুগ ধরে এই মহাপীঠে সিদ্ধিলাভ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এখানে এসে তপস্যা করেন। তাঁর চরণচিহ্ন আজো বিদ্যমান রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সিদ্ধপুরুষ খাকিবাবা, তারাপীঠ থেকে এখানে এসে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে আমৃত্যু তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

পরবর্তীকালে অঘোরীবাবা, গুহাবাবা, চক্রবর্তীবাবা এখানে অবস্থান করেন।

বক্রেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ পূর্বে প্রাচীন মহাশ্মশান। প্রবাদ আছে যে, এই শিবশক্তি সমন্বিত মহাপীঠে ঊনকোটি শিব বিরাজমান। শিবরাত্রিতে এখানে বিরাট মেলা হয়।

এই মহাতন্ত্রপীঠে বহু সাধক সাধিকা তন্ত্রমতে সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছেন।

এই প্রাচীন মহাশ্মশানে একাধিকবার চক্রানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন খাকিবাবা, দাতাসাহেব, অঘোরীবাবা, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা (দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড) ও ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী।

বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবনগুলো বহু কঠিন রোগের মহা ঔষধ রূপে ভারতবিখ্যাত।

মহর্ষি ব্যাসদেব এই মহাতীর্থকে 'গুপ্তকাশী' রূপে অভিহিত করেছেন। গঙ্গাসদৃশা পুন্যতোয়া পাবহরা নদী এই মহাপীঠের পূর্ব দিকে প্রবাহিতা।

একদিন শ্রীবাম তাঁর আশ্রমে আপন মনে তারামায়ের ধ্যানরত। সহসা ধ্যানের মাঝে এক জ্যোতির সংকেত ভেসে এল। বক্রেশ্বর থেকে তাঁকে আহ্বান করছেন সিদ্ধ মহাপুরুর প্রবীন খাকিবাবা।

এই প্রবীন মহাপুরুষ ইতিপূর্বে তারাপীঠে দীর্ঘকাল সাধনা করে ও সিদ্ধিলাভ করে জগতজননী তারামায়ের ইচ্ছায় বক্রেশ্বরে অবস্থান করছেন।

শ্রীবামের বিশেষ সুহৃদ তিনি। ইতিপূর্বে বক্রেশ্বরে খাকিবাবার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল এবং চক্রানুষ্ঠানও করেছেন একসাথে। পুনরায় আন্তরিক অনুরোধ এসেছে দীর্ঘদিন বাদে খাকিবাবার কাছ থেকে। এবার এসেছে সূক্ষ্মে। সর্বজ্ঞ শ্রীবাম সবই বুঝতে পারলেন। মৃদু হেসে তিনিও সংকেতে সম্মতি জানিয়ে দিলেন।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এই সূক্ষ্মে যোগাযোগ এক অপূর্ব ব্যাপার।

সিদ্ধযোগী, মহাযোগী, মহাত্মাগণ স্থূলদেহে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবস্থান করলেও উচ্চস্তরের বিভিন্ন সিদ্ধ মহাত্মাদের সাথে সূক্ষ্মে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন এবং ভাব বিনিময়ও কখনো কখনো করেন। এভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে সুপরিচিত। তাই ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় কোন মহাপুরুষের চিহ্নিত শিষ্য অন্য কোন মহাপুরুষের কাছে ভুলক্রমে এসে পড়লেও সেই মহাপুরুষ আন্তরিকতার সাথে সেই চিহ্নিত শিষ্যকে তাঁর চিহ্নিত গুরুর কাছে পাঠিয়ে দেন তাঁর নাম ধাম বলে। যেমন কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে গয়ায় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তাঁর চিহ্নিত গুরু পরমহংসজী'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যেমন দক্ষিনেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বামী পূর্ণানন্দর মাধ্যমে জয়তারা বাবাকে তাঁর চিহ্নিত গুরু বামাক্ষ্যাপা বাবার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

এই ধরণের পবিত্র কাজ ভারতবর্ষের উচ্চকোটির মহাত্মাগণ প্রায়ই করে থাকেন। কারণ প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সূক্ষ্মে যোগাযোগ থাকে। প্রত্যেককেই প্রত্যেকে জানেন। ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাসে এই উচ্চস্তরের অতিন্দ্রীয় সূক্ষ্ম যোগ এক পরম গৌরবের ও পরম আনন্দের অধ্যায় রূপে বহু যুগ ধরে সুচিহ্নিত। পাশ্চাত্যদেশের অধ্যাত্মবাদীগণ এই পরম উচ্চকোটির সাধনা সম্পর্কে এখনও অনেকাংশে অজ্ঞ।

যাহোক, ভারতবর্ষের উচ্চকোটির সিদ্ধ মহাসাধক ও মহাসাধিকাগণ শুধু স্থূলদেহে আপন আপন লীলাক্ষেত্রে বসেই লীলা করেন না। জগৎ কল্যাণে মানব কল্যাণে এবং মুমুক্ষু সাধকদের সাধনার সহায়তা করবার জন্য সূক্ষ্ম দেহেও লীলা করেন প্রয়োজন অনুসারে।

মহাযোগী গোরক্ষনাথ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য মহাপ্রভু, কবীর, তুলসীদাস, নানক, ত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্যামাচরণ লাহিড়ি, রামদাস কাঠিয়াবাবা, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা, শ্রীশ্রীরামঠাকুর, বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, বহেরাবাবা প্রভৃতি বহু দেব-মানবের জীবনে এই মহান ঐশীলীলা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

বিশ্বের বিস্ময় হলেও বিশ্বের চিরন্তন ধর্মগুরু পুণ্যভূমি ও দেবভূমি ভারতবর্ষে এই অতিন্দ্রীয় সূক্ষ্ম যোগ স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই পরিগণিত। যাহোক, সূক্ষ্মে আমন্ত্রণ পেয়ে প্রসন্ন মনে শ্রীবাম কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য সেবকসহ তারাপীঠ থেকে বক্রেশ্বরে রওনা হলেন।

পাল্কী করে রামপুরহাটে এলেন। সেখান থেকে ট্রেনে সাঁইথিয়া। সাঁইথিয়া থেকে সিউড়ী হয়ে মহাতীর্থ বক্রেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। শিবশক্তির পুরীতে এলেন শিবশক্তির প্রাণবন্ত প্রতীক শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। সাদরে বামদেবকে অভ্যর্থনা করে নিজ আশ্রম কুটীরে নিয়ে এলেন প্রবীন সিদ্ধ মহাত্মা খাকি বাবা। ইতিমধ্যে খাকি বাবার সক্ষ্ম আমন্ত্রণে বীরভূমের রাজনগরের পাথরচাপুড়ি থেকে এসেছেন সিদ্ধ ফকির দাতাসাহেব। তাছাড়া বক্রেশ্বরে অবস্থানরত ভৈরব অঘোরী বাবা, গুহাবাবা, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মা উপস্থিত রয়েছেন। দাতাসাহেব ও অঘোরী বাবার দিব্যজীবন কাহিনী অনবদ্য (দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)। বামাক্ষ্যাপার সাথে সবাই সুপরিচিত। সবার সাথেই রয়েছে তাঁর আত্মিক যোগ। নানান সৎপ্রসঙ্গে আনন্দে সেদিন অতিবাহিত হ'ল। পরদিন গভীর রাতে মহানিশায় বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে এক চক্রানুষ্ঠানের আয়োজন হ'ল। নিগূঢ় এই চক্রানুষ্ঠান অধ্যাত্ম জগতের এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। তন্ত্রমতে এই ক্রিয়াকলাপ অতি পবিত্র ও গোপনীয়। এই নিগূঢ় অনুষ্ঠানে তন্ত্রমতে সিদ্ধ বীরাচারীগণই কেবল অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম। অধ্যাত্ম শক্তির স্ফুরণ ও নিজ আত্মা ও বিশ্বাত্মার পরম কল্যাণ সাধনই এই নিগূঢ় চক্রানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব ও কুলনাথের নাথ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা শুধু বীরাচারী নন, তিনি পরম দিব্যাচারী ও স্বয়ং শিবস্বরূপ।

তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ খাকি বাবা। সিদ্ধ তান্ত্রিক ও যোগী দাতাসাহেব। তন্ত্র ও যোগে সিদ্ধ ভৈরব অঘোরী বাবা, সিদ্ধ সাধক ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, গুহাবাবা প্রভৃতিও সবাই পূর্ণ আপ্তকাম। তাই তাঁদের নিজেদের আত্মশক্তি বিকাশের জন্য তাঁদের এই চক্রানুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। জগত ও মানব কল্যাণের জন্যই তাঁরা সবাই এই মহান চক্রানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করলেন।

তাছাড়া যে পবিত্র ক্ষেত্রে এই পবিত্র চক্রানুষ্ঠান হয় সেই পবিত্র ক্ষেত্রেও আরো শক্তিময় হয় এবং সেই ক্ষেত্রের সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্ত-গণেরও সার্বিক কল্যাণ হয়। পরদিন এই মহাপীঠের চিরন্তন ভৈরব বক্রনাথের সামনে বসে শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা করলেন তাঁর বিচিত্র দিব্য পূজা। এই মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহিষমর্দিনীরও যথা-রীতি পূজা করলেন শ্রীবাম দিব্যাচারে। উপস্থিত সবাই স্তব্ধ বিস্ময়েও মহা আনন্দে তা প্রত্যক্ষ করলেন।

চতুর্থদিন শ্রীবাম বক্রেশ্বর থেকে রওনা হলেন শিষ্যসেবকসহ। খাকিবাবা, দাতাসাহেব, অঘোরী বাবা প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সানন্দে বিদায় জানালেন ভারতবিখ্যাত এই মহাতান্ত্রিক ও মহাযোগী শিবস্বরূপ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে।

শ্রীবাম পাল্কীতে রওনা হলেন আর পদব্রজে তাঁর শিষ্য ও সেবক বৃন্দ। সিউড়ি যাবার পথে শ্রীবামের পাল্কী এসে থামলো রাইপুর গ্রামে। বক্রেশ্বর থেকে চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত এই পুণ্যক্ষেত্র রাইপুর গ্রাম (সিউড়ি থেকে চার ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এই পবিত্র ও ঐতিহাসিক রাইপুর গ্রাম)।

রাইপুর গ্রামের পাশে চন্দ্র ভাগা নদী। স্নান করে বামদেব ভক্তদের বললেন তারা নাম হরিনাম করতে। নাম করতে করতে শ্রীবাম বিভোর হলেন। গভীর ধ্যানের মধ্যে শ্রীবাম নিমজ্জিত হলেন।

দেবমানব শ্রীবামের নয়নে ভেসে উঠলো ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের এক দিব্য জ্যোতির্ময় দৃশ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান দিব্য ঐশী লীলা শ্রীবামের প্রজ্ঞানয়নে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হ'ল, যা এই দিব্যক্ষেত্রে একদা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জগত ও জীবের পরম কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নব কলেবর রাধা ভাবে সদা বিভোর শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ায় এসে কেশব ভারতীর কাছে থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় সেদিনটি হ'ল ১৪৩১ শকের ২৯শে মাঘ শনিবার সংক্রান্তি (ইংরেজী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ)। সন্ন্যাস নিয়ে নিমাই হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

পরদিন ১লা ফাল্গুণ, রবিবার (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৫১০ খ্রীঃ)

সকালে সদ্য সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য কাটোয়া থেকে পদব্রজে কেতুগ্রাম হয়ে বীরভূমের বক্রেশ্বরের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলেন দ্রুতভাবে।

তাঁর ডান হাতে দণ্ড এবং বামহাতে কমণ্ডলু। মুখে 'কৃষ্ণ' নাম। সাথে নিত্যানন্দ অবধূত ও পার্ষদ গদাধর ও মুকুন্দ দত্ত।

সেদিন সন্ধ্যায় বীরভূমের এক চক্রাগ্রামে উপস্থিত হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্ন হৃদয় নিত্যানন্দ প্রভুর পবিত্র জন্মস্থান এই একচক্রা-গ্রাম। সেই নিত্যানন্দ প্রভুও রয়েছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে। একটি গাছ তলায় শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর দণ্ড ও কমণ্ডলু রেখে বিশ্রাম করলেন। তারপর পবিত্র দ্বারকানদীর শাখা যমুনা নদীতে স্নান করলেন। অদূরে 'মহাপীঠ তারাপীঠ' মহাতীর্থ। ছোটবেলা থেকে নিত্যানন্দ প্রভু বহুবার গেছেন অদূরবর্তী মহাপীঠ তারাপীঠে। মহাপ্রভুকে শোনালেন পরমা প্রকৃতি ও পরম পুরুষের সমন্বিত রূপ তারামায়ের ধ্যানরূপ। সীতার 'তা' এবং রামচন্দ্রের 'রা' মিলে হলেন তারা দেবী। তারাই পরমা বৈষ্ণবী, তারাই মহারাসেশ্বরী।

ত্রেতার সীতা রাম-ই দ্বাপরে এলেন রাধাকৃষ্ণ হয়ে। সেই রাধা-কৃষ্ণের যুগল ভাবরূপ হলেন পরম ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মা সনাতনী তারা মা। এইভাবে নানান সৎপ্রসঙ্গে একচক্রার সেই গাছতলায় রাত্রি যাপন করলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, ভক্ত গদাধর ও মুকুন্দ দত্ত।

পরদিন (২রা ফাল্গুন, সোমবার, ইং—১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৫১০ খ্রীঃ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সপার্ষদ মহাপীঠ বক্রেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে পড়লো ব্রহ্মক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠ। ভারতের সকল ভাব সাধনার মর্মকেন্দ্র। সর্বধর্মের সর্ব ইষ্টের মহাসমন্বয় ক্ষেত্র। নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য দণ্ড কমণ্ডলু হাতে প্রবেশ করলেন সুপ্রাচীন এই মহাপীঠে। সাথে যথারীতি নিত্যানন্দ প্রভু গদাধর ও মুকুন্দ দত্ত।

নিবিড় মহারণ্যে ঢেকে আছে চারদিক। তার মধ্যে পবিত্র মহা-শ্মশানে পবিত্র শ্বেত শিমুল বৃক্ষের নীচে রয়েছে সুদূর সত্যযুগ থেকে অবস্থিত মহাদেবী মহালক্ষ্মী তারাদেবীর ব্রহ্মশিলা। মহামুনি বশিষ্ঠের আরাধিতা তারা। তারাদেবীর শিলামূর্তিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম জানালেন

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর লীলা পরিকরগণ। তারপর পুনরায় বক্রেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। সহসা দিব্য আবেশ হ'ল মহাপ্রভুর। দিব্য আবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "রাঢ় দেশের বনের মধ্যে মহাশ্মশানে স্বয়ং বক্রেশ্বর শিব শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় রত। আমি সেই পরম বৈষ্ণব শঙ্করের কাছে যাব এবং সেখানে নির্জনে সাধনা করবো।" এই বলে বক্রেশ্বরের উদ্দেশ্যে ছুটে চললেন মাত্র দু'দিন পূর্বে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। সাথে নিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর ও মুকুন্দও ছুটতে লাগলেন।

বক্রেশ্বর ধাম যখন মাত্র চার ক্রোশ বাকি তখন শ্রীচৈতন্য রাইপুর গ্রামে এলেন। সামনে চন্দ্রভাগা নদী বয়ে চলেছে। স্নান করে আনন্দে রাইপুর গ্রামে নামগান করলেন তিনি রাইপুর গ্রামের অধিবাসী-দের সাথে। সহসা শ্রীচৈতন্য পুনরায় আবিষ্ট হয়ে সানন্দে বললেন, "জগন্নাথ প্রভুর আজ্ঞা হ'ল আমার ওপর নীলাচল যাবার জন্য। তাই আমি নীলাচল চললাম।"

এই বলে পূর্বদিকে চলতে লাগলেন। যে পথ দিয়ে তারাপীঠের অদূরে একচক্রা গ্রামে এসেছিলেন কেতুগ্রাম থেকে, সেপথ দিয়ে না ফিরে অন্যপথ দিয়ে ফিরতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীচৈতন্য গুপ্তিপাড়ার ঘাট হয়ে গঙ্গা পার হয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে যান।

পরে সেখান থেকে নীলাচলে গমন করলেন। মহাপবিত্র রাঢ়ভূমি বীরভূম মহা আনন্দিত ও ধন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনে। যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবনের প্রথম পবিত্র দিনটি পুণ্যভূমি বীরভূমেই অতিবাহিত হয় এবং দ্বিতীয় দিনে বক্রেশ্বর দর্শন ও বক্রেশ্বরে সাধনার সংকল্প গ্রহণ করে তিনি এগিয়ে যান তারাপীঠ হয়ে বক্রেশ্বরের পথে। তারপর বক্রেশ্বরের অদূরে রাইপুর গ্রামে স্নান ও নাম গানের পর জগন্নাথের আদেশ পেলেন নীলাচলে যাবার। এই নীলাচলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী চব্বিশ বছরের বিশাল ভারতব্যাপী ও মহাঐশী লীলার সূচনা হ'ল এই পবিত্র পুণ্যভূমি বীরভূম থেকেই। তাই নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও দিব্যসঙ্গ ধন্য 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থের লেখক মহাবৈষ্ণব

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন—

"কি ইচ্ছিয়া চলিলা বা বক্রেশ্বর প্রতি ।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি ॥
হেন বুঝি, করি প্রভু বক্রেশ্বর ব্যাজ ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্তলীলা ১।৯।১)

যে নাম গানে শ্রীবাম ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন সেই নামগানেই শ্রীবামের ধ্যানভগ্ন হ'ল। উপস্থিত শিষ্য ভক্তদের সানন্দে বললেন এই অপূর্ব অপার্থিব দিব্যলীলা কাহিনী, যা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই দিব্য ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারাপীঠের পথে যেতে যেতে শ্রীবাম ক্রমেই কৃষ্ণভাবে ভাবিত হতে লাগলেন। তাঁর শিষ্য ভক্তগণ তা দেখে বিস্মিত হলেন। ইতিপূর্বে তাঁর প্রিয় শিষ্য হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় একবার রাস পূর্ণিমার দিন তারাপীঠে তাঁর কাছে বৃন্দাবনের রাস উৎসব দেখতে চান—যা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে বৃন্দাবনে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল (দ্রষ্টব্য তৃতীয় খণ্ড)। শ্যাম শ্যামার অভেদ স্বরূপ শ্রীবাম সেই সুদুর্লভ বৃন্দাবনের মহারাস উৎসব মহা-ভাগ্যবান হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়কে দর্শন করালেন তাঁর জ্ঞান নয়ন উন্মোচন করে। হৃষিবাবু মহানন্দে দেখলেন সেই পরম পবিত্র দিব্য রাস উৎসব। আর সবিস্ময়ে দেখলেন রাসেশ্বর শ্যাম স্বয়ং বাম এবং রাসেশ্বরী স্বয়ং তারামা।

শ্রীবামকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করে এবং তারামাকে শ্রীরাধারূপে দর্শন করে হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় পরম আনন্দে বিভোর হলেন। ইতিপূর্বে শ্রীবামকে তিনি শিবরূপেও দর্শন করেছিলেন। পুরুষোত্তম শ্রীবামদেবকে আরো একাধিক শিষ্য শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করেছেন। শিবরূপেও দর্শন করেছেন। লক্ষণীয়, যে তারাপীঠ ও বক্রেশ্বরের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের নবকলেবর শ্রীচৈতন্য দু'বার আবিষ্ট হলেন ও জগন্নাথের নির্দেশ পেলেন সেই তারাপীঠ ও বক্রেশ্বরের মাঝেই সেই রাইপুর গ্রামেই পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ভাবাবিষ্ট হলেন ও সেই দিব্যলীলা দর্শন করে আবিষ্ট হলেন।

এ যেন কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে এক নিগূঢ় সংকেত মণ্ডিত ঐশী লীলা, যা কালজয়ী, নিত্য ও শাশ্বত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বৃন্দাবনে গিয়ে এমনি ভাবে তাঁর দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণ কলেবরের মধুর লীলা স্থান সকল দর্শন করে ভাবাবিষ্ট হন এবং জগত কল্যাণে পুণরায় সেই লীলা স্থানগুলো উদ্ধার করেন তাঁর অন্তরঙ্গ লীলা পার্ষদ রূপ সনাতন গোপালভট্ট প্রভৃতির মাধ্যমে এবং তাঁদের সেই দিব্য পবিত্র স্থান গুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেন।

পুরুষোত্তম শ্রীবাম যেন সেই সংকেত সূচক ভাবাবেশের আরেক নব কলেবর। মহাকালের স্রোতে লীলার বহিরঙ্গ রূপই শুধু পাল্টায়, অন্তরঙ্গে থাকে তার নিত্য অনাদি, অসীম, আত্মিক রূপ—যা অবিনাশী, অক্ষয় অনন্ত অমর। তাই শিবশক্তির অভেদস্বরূপ, শ্যাম শ্যামার অভেদ স্বরূপ, যুগে যুগে নব নব লীলার চির পিয়াসী পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীবামা-ক্ষ্যাপার উপরোক্ত মধুর দিব্য লীলা দর্শন যেন তারই আনন্দময় মধর সংক্ষেতরূপ।

—০—

শ্রীবামের বিষ্ণুপুর কালীমন্দিরে গমন
ও
অলৌকিক পূজা

বহরমপুর শহরের এক প্রান্তে বিষ্ণুপুর কালীমন্দির। বহু প্রাচীন এই কালীমূর্তি। সদাজাগ্রত এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করে বহুকাল ধরে বহু অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে আছে জনমানসে। ইতিপূর্বে তারাপীঠ থেকে শ্রীবাম এখানে এসে এই সদাজাগ্রত কালীমূর্তিকে বহুবার পূজা করেছেন।

এই পূজা কখনো লৌকিক আবার কখনো অলৌকিক ভাবে বামদেব করছেন। এমনও হয়েছে যে শ্রীবাম তারাপীঠে স্থূলদেহে বিরাজ করছেন এবং যথারীতি প্রতিদিন অজস্র আর্ততাপিত নরনারীর সমস্যা সমাধান করছেন। আবার ঠিক একই সময় তিনি তারাপীঠ থেকে বহুদূরে বহরমপুরে এসে বিষ্ণুপুর কালীমন্দিরে তাঁর আপন অভিরুচি অনুসারে দিব্যাচারে মা কালীকে পূজা করছেন।

একই সময় দুই দেহে দুই স্থানে থাকা কুলনাথের নাথ শিব-স্বরূপ বামাক্ষ্যাপার কাছে কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যিনি তারামায়ের অভেদ স্বরূপ, তাঁর পক্ষে এই মহালীলা সর্বদাই স্বাভাবিক।

ইতিপূর্বে তারাপীঠে অবস্থান করেও সেই সময় গঙ্গাসাগরে অবস্থান করেছেন পুণ্য মকরসংক্রান্তির মহাযোগে (দ্রষ্টব্য তৃতীয়খণ্ড)।

আবার শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করবার জন্যও বামদেব একবার একনাগাড়ে একমাস ধরে তারাপীঠে অবস্থান করেও আবার আরেক-দেহে সুদূর চট্টগ্রামে গিয়েছেন ভক্তের পরিবারকে রক্ষা করবার জন্য (দ্রষ্টব্য তৃতীয়খণ্ড)।

তাই শিবাবতার বামাক্ষ্যাপার পক্ষে একই সময় তারাপীঠ ও বিষ্ণুপুর কালীমন্দিরে থাকা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

একই সাথে তাঁর এই লৌকিক ও অলৌকিক লীলা যথার্থ আদর্শনীয়।

যাহোক, তারাপীঠ থেকে বামদেব বহরমপুরের বিষ্ণুপুর কালী-মন্দিরে এলেন। মা কালীর মূর্তি তখন মাটি থেকে অনেক নীচে অবস্থিত।

তারাময় বামদেব মা কালীকে উপর থেকে ডাকতে লাগলেন উঠে আসবার জন্য।

অলৌকিক ব্যাপার, উপস্থিত সবার সামনে বামদেবের আহ্বানে মা কালীর মূর্তি নিম্নের গর্ভগৃহ থেকে ধীরে ধীরে প্রসন্নমনে উঠে এলেন স্বেচ্ছায়। সেই থেকে মা কালী উচ্চ আসনে বসে পূজা গ্রহণ করতে লাগলেন।

বামদেবও মনের আনন্দে মা কালীকে পুজো করে তারাপীঠে ফিরে গেলেন।

বামদেবের এই অলৌকিক লীলার স্মরণে উত্তরকালে বামদেবের মূর্তি এই বিষ্ণুপুর কালীমন্দিরে স্থাপিত হয়। আজো সেই মূর্তি সগৌরবে বিরাজমান।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক ভক্তপ্রবর শীতলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—:o:—

শ্রীবাম সান্নিধ্যে বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

"আমি কি ডাক্তার না বদ্যি? রোগ ভাল করতে চাস্ তো গুসকরার ঐ ডাক্তারের কাছে যা।"—বললেন বামদেব তাঁর কাছে আগত এক রোগজর্জরিত আর্ত রোগীকে।

তারাপীঠের শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার তথাকথিত এই 'ডাক্তার' হলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস।

হিমালয়ের অতি উচ্চ স্তরে অবস্থিত সিদ্ধযোগক্ষেত্র জ্ঞানগঞ্জে দীর্ঘকাল সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। তারপর শ্রীগুরুর নির্দেশে তিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। বর্ধমানে গুসকরায় এসে ডাক্তারী শুরু করেন। তিনি সিদ্ধযোগী। তাছাড়া বহু জটীল ও কঠিন রোগও তিনি যোগবলে আরোগ্য করে দেন।

ভেষজ দ্রব্যের সম্বন্ধেও তাঁর গভীর জ্ঞান বিদ্যমান। তাই ডাক্তার হিসাবে তার সুনাম ও খ্যাতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো। শ্রীগুরুর নির্দেশে এই অর্থকরী কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হলেও মূলত তিনি ভবরোগ বৈদ্য। অবসর সময় উচ্চতর অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন থাকেন এবং তাঁর দিব্য সান্নিধ্যে আগত কিছু জ্ঞানী ও ভক্ত এবং

এবং মুমূক্ষুকে অধ্যাত্মপথের সন্ধান দিয়ে তাঁদের যোগপথে পরিচালনা করতে থাকেন।

মাঝে মাঝে গুসকরা থেকে তিনি তারাপীঠে আসেন। কয়েকদিন এই শিবকল্প মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপা বাবার পবিত্র দিব্য সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেহমনকে সতেজ ও আনন্দময় করে আবার বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস গুসকরায় ফিরে যান।

বামদেব এই উন্নত সিদ্ধ নবীন মহাত্মাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। তাঁর পবিত্র উন্নত আধারে অফুরন্ত অধ্যাত্ম কৃপা বারি সানন্দে স্বেচ্ছায় ঢেলে দেন।

যোগ্য সমর্থ আধারে অধ্যাত্মশক্তি ঢেলে দেবার মধ্যেও অনাবিল আনন্দ আছে। অসংখ্য অযোগ্য দুর্বল আধার দেখতে দেখতে শক্তিমান দাতাও দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে যান। তাই সহসা যোগ্য সমর্থ আধার পেলে সানন্দে স্বেচ্ছায় মুক্তহস্তে দান করে তৃপ্ত হন। গ্রহীতার চাওয়ার অপেক্ষাও করেন না দাতা।

সমর্থ মহান যোগী ও উন্নত মহাত্মা বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। তিনি না চাইলেও করুণাময় বামদেব তাঁর বিশাল আধারে অফুরন্ত অধ্যাত্মশক্তি সানন্দে ঢেলে দিলেন।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা একাধারে রাজযোগী এবং মহাতান্ত্রিক। কৌল সাধনায় তিনি কুলনাথের নাথ। দ্বিতীয় মহেশ স্বরূপ। তাই এই শিবকল্প মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিকের যুগ্ম অধ্যাত্ম শক্তি মহাসমুদ্রের মতই অফুরন্ত ও অন্তহীন।

সর্বজ্ঞ শ্রীবাম জানেন যে উত্তরকালে এই নবীন সিদ্ধযোগী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার জগতে বিরাটভাবে সুচিহ্নিত হবেন।

বিশুদ্ধানন্দের যুগান্তকারী ও মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'সূর্যবিজ্ঞান' যা তিনি ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার অন্যতম মহান কেন্দ্র 'জ্ঞানগঞ্জ' থেকে আয়ত্ত করে এসেছেন দীর্ঘ সাধনার শেষে, ভারতের সাধুসমাজে মহাবিস্ময় ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি করে।

সূর্য এই জগতের সকল জীবের যেমন প্রাণস্বরূপ তেমনি সকল বস্তুর সূক্ষ্ম প্রাণস্বরূপ।

তাই সূর্যরশ্মির মাধ্যমে জগতের যে কোন বস্তুকে সৃষ্টি করা যায়। জগতের জীবপ্রকৃতি ও জড়প্রকৃতি উভয়ই সূর্যরশ্মির অন্তর্গত। তাই শুধু জীবপ্রকৃতি নয়, যে কোন জড়প্রকৃতির সূক্ষ্ম প্রাণও যে কোন জড়বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। মহাত্মা বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস বহুবার ভারতের সাধুসন্ত, জ্ঞানীগুণী ও গৃহীভক্তদের সামনে তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। একটুকরো কাগজ থেকে বা তুলো থেকে যে যা বলেছেন তখনি তা সূর্যের আলোর সামনে ধরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এক টুকরো কাগজ থেকে বা তুলো থেকে যে কোন ধরণের ফুল, যে কোন ধরণের ধাতু (সোনা, রূপা প্রভৃতি), যে কোন ধরণের পাথর (হীরা, মুক্তা, প্রবাল, পান্না প্রভৃতি) প্রভৃতি তখনি সৃষ্টি করে দেন।

এমনকি সামান্য একটুকরো তুলো থেকে তিনি একবার প্রাণ সৃষ্টি করেন। সবার সামনে তা প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

ভারতের অধ্যাত্ম যোগসাধনা ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান যে কত উন্নত বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস প্রবর্তিত এই সূর্য্যবিজ্ঞান তার অন্যতম নিদর্শন। সমতল ভারতবর্ষ মূলত বিশুদ্ধানন্দের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করলো।

জ্ঞানগঞ্জের মহা যোগক্ষেত্রে দু'শো বছর থেকে দু'হাজার বছর বয়স পর্যন্ত বহু মহাসাধক ও মহাসাধিকা, সিদ্ধযোগী মহাত্মা নিরন্তর নিরলস সাধনায় ব্যাপৃত। সেখানে শুধু সূর্য্যবিজ্ঞান নয়, জলবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান প্রভৃতির ওপরও নিরলস সাধনা ও গবেষণা চলছে।

মূলত এই বিশ্বসৃষ্টি ও ধ্বংসের নিগূঢ় ক্রিয়াকর্ম এই পরম অধ্যাত্ম মহাকেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছায়।

এই পৃথিবীর অধ্যাত্ম ও পার্থিব সকল ব্যাপারে (ধর্ম, শিল্প,

সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে) সজাগ দৃষ্টি রয়েছে জ্ঞানগঞ্জের।

পৃথিবীর কে কোথায় সাধনায় রত, কে কোন স্তরে রয়েছেন, কার কখন কি প্রয়োজন উন্নত স্তরে যাবার জন্য, তাঁর ওপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রয়েছে জ্ঞানগঞ্জের সিদ্ধযোগী মহাত্মাদের। পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণকারী এই পরম কল্যাণকর সূক্ষ্মদেহী মহাত্মারা দিবানিশি জগৎহিতায়, জগৎসেবায় নিঃস্বার্থভাবে সর্বদা নিয়োজিত।

উত্তরকালে বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৃহী শিষ্য বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও মণীষী মহামহোপধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন তাঁর রচিত বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস প্রসঙ্গে (পাঁচ খণ্ড)।

যাহোক, তারাপীঠ আসা যাওয়ার ফলে শ্রীবামের সাথে বিশুদ্ধানন্দের নিবিড় অন্তরঙ্গতা ঘটে।

১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ রাত ১টা ৩৫ মিনিটে তারাপীঠে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা যখন দেহত্যাগ করেন তখন বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস তাঁর গৃহে আসীন ধ্যানতন্ময় অবস্থায়। সামনে দু'একজন সেবকভক্ত।

সহসা তাঁর গৃহে জ্যোতির্ময় দেহে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আবির্ভাব ঘটে। বামদেব তাঁর কণ্ঠের রুদ্রাক্ষের মালা বিশুদ্ধানন্দের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। চমকে ওঠেন বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী।

তাকিয়ে দেখলেন তাঁর কোলের ওপর বামদেবের গলার পবিত্র জপের মালা। সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশুদ্ধানন্দজী উপলব্ধি করলেন শিবাবতার বামাক্ষ্যাপাবাবা তাঁর মহান ঐশীলীলা সুসম্পন্ন করে অন্তর্হিত হলেন।

বিষণ্ণ কণ্ঠে বিশুদ্ধানন্দজী বামদেবের পরম পবিত্র ঐতিহ্যপূর্ণ মালাটি হাতে নিয়ে বললেন, "বামাক্ষ্যাপাবাবা চলে গেলেন।"

সেই মালা আজো বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের গৃহে বিরাজ করছে। নিত্য পূজিত হচ্ছে।

তাঁর পৌত্র ও তারামায়ের পরম সাধক সন্তান অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর বর্ধমানের গৃহে এই মালা সযত্নে রেখে পুজো করেন।

বিশুদ্ধানন্দের আবির্ভাব ক্ষেত্র বর্ধমান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে বণ্ডুল গ্রামে তাঁর পৈতৃক ভবনে। হিমালয়ে জ্ঞানগঞ্জে সিদ্ধিলাভের পর বিশুদ্ধানন্দজী জ্ঞানগঞ্জ থেকে বহু যুগ যুগান্ত ধরে নিত্যপূজিত সুপ্রাচীন এক শিবলিঙ্গ নিয়ে আসেন বণ্ডুল গ্রামে এবং নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। আজো সেই বণ্ডুলেশ্বর শিব নিত্যপূজিত হচ্ছেন। এই মহাজাগ্রত পবিত্র শিবের বহু অলৌকিক কাহিনী আজ কিম্বদন্তীতে পরিণত।

বিশুদ্ধানন্দের সুযোগ্য নাতি সিদ্ধসাধক অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর পিতামহের যোগ্য উত্তরসূরী।

যৌবনে তিনি তারামায়ের অলৌকিক কৃপালাভ করেন। যথাসময়ে সেই দিব্য কাহিনী বর্ণিত হবে (পঞ্চম খণ্ডে)।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী'র নাতি অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সংযোগের জন্য ভক্তপ্রবর নির্মল ভট্টাচার্য্যের কাছে লেখক আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবামের ভেলিয়ানা গ্রামে গমন

অগ্রহায়ণ মাস। এক শান্ত শীতল মনোরম সকাল। শ্রীবাম ভেলিয়ানা গ্রামে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আটলা গ্রামের পাশে ভেলিয়ানা গ্রামে বামদেবের কুলগুরু বংশের নিবাস।

যৌবনে পিতার ইচ্ছানুসারে বামদেব এই কুলগুরুর থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ভড্ডাপুরে গিয়ে বামদেব এই দীক্ষা গ্রহণ করেন নিজ কুলগুরুর কাছ থেকে। ভেলিয়ানায় এই গুরুবংশের বসতি।

প্রতি বছর মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণ মাসে বামদেবের কুলগুরুবংশ মহাসমারোহে কালীপূজা করেন। এবারও যথারীতি অগ্রহায়ণ মাসে তাঁরা কালীপূজা শুরু করলেন। বামদেবকেও যথারীতি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

শ্রীবামও কয়েকজন ভক্তসহ তারাপীঠ থেকে অদূরে অবস্থিত ভেলিয়ানা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। প্রায় প্রতিবছরই তিনি কালীপূজা উপলক্ষে ভেলিয়ানায় যান।

যথাসময়ে সদলবলে ভেলিয়ানায় পৌঁছে তিনি কালীপূজা দর্শন করলেন। তাঁকে সাদরে বরণ করলেন তাঁর গুরুবংশের লোকেরা।

ভারতবিখ্যাত এই অবতারকল্প মহাপুরুষকে দেখতে গ্রামের লোক ভীড় করলেন। কিন্তু শ্রীবাম এখানে অত্যন্ত দীনহীনের ন্যায় রইলেন। তিনি যে গুরুগৃহে এসেছেন সেই শিষ্যভাব তিনি সর্বদা বজায় রাখলেন। তাঁর বিনয় নম্র ভাব দেখে উপলব্ধি করা কঠিন যে ভারতবিখ্যাত এই দেবমানবের কত অজস্র শিষ্যভক্ত সারা দেশে বিরাজ করছেন। ভারতের কত সাধু মহাপুরুষ তাঁর গুণমুগ্ধ। কত লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁর কৃপাধন্য।

পূজাশেষে বামদেবকে মা কালীর মহাপ্রসাদ দিলেন তাঁর কুলগুরু বংশের লোকেরা।

বামদেব সযত্নে সমস্ত প্রসাদ খেলেন। তারপর প্রসাদের পাতা সাথে রাখলেন। ফেলতে দিলেন না।

কুলগুরুর বংশের প্রতি তাঁর এতই গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি যে তাঁর খাওয়া প্রসাদের পাতাটা পর্যন্ত গুরুস্থানে ফেলে রাখলেন না। সযত্নে তারাপীঠে নিয়ে এলেন।

বামদেব জগৎ কল্যাণেই আদর্শ শিষ্য হয়েছিলেন। তাই আদর্শ গুরু রূপে জগৎ সংসারে প্রকাশিত হলেন। যুগগুরু ও জগৎগুরু রূপে সুপ্রসিদ্ধ ও সুচিহ্নিত হলেন।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য শরৎকুমার সেন এবং একটি সিদ্ধ সাধক বংশের কাহিনী

কলকাতার অন্যতম অভিজাত পরিবারের কর্তা প্রসন্নকুমার সেন ও তাঁর স্ত্রী ধর্মপ্রাণা বসন্তকুমারী দেবী খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের ধর্মপ্রাণ যুবকপুত্র শরৎকুমার সেনের ফুসফুসে দুরারোগ্য জল জমেছে। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা ও তার সাথে আনুসাঙ্গিক উপসর্গ সব প্রকট হয়ে উঠেছে। সকল রকম চিকিৎসা করানো হ'ল কিন্তু সবই ব্যর্থ হ'ল। অশেষ দুঃশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন সবাই।

সহসা একদিন রাতে স্বপ্নে নির্দেশ পেলেন শরৎকুমার। স্বপ্নে দৈববাণী শুনলেন, "তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপার কাছে যাও, ভাল হয়ে যাবে।"

এই নির্দেশ পেয়ে শরৎকুমার তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন। বামদেবের চরণতলে শুয়ে পড়েন। অন্তরে তাঁর রোগমুক্তির আকুতি। সর্বজ্ঞ বামদেব সবই বুঝতে পারলেন। তিনি একটি শশা হাতে নিয়ে শরৎকুমারকে বললেন, "শশাটা নিয়ে যা", এই বলে শশাটা ছুঁড়ে দিলেন শরৎকুমারের দিকে। ঠিক ফুসফুসে গিয়েই লাগলো। যুবক শরৎকুমার উপলব্ধি করলেন যে বামদেব অন্তর্যামী। তাই বামদেব তাঁর রোগের স্থানেই তাঁর কৃপা বর্ষণ করলেন। তিনি তখনি তা সানন্দে খেলেন। আশ্চর্য শশার ভেতরটা সম্পূর্ণ সাদা। খাবার সাথে সাথে ফুসফুসের অসহ্য যন্ত্রণা কমে গেল।

পরদিন জীবিতকুণ্ডে স্নান করে তারামাকে প্রণাম করে বামদেবের কাছে এলেন। সশ্রদ্ধচিত্তে বামদেবের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন সুস্থ দেহে।

কয়েকদিন পর তিনি তাঁর গুরুদেব সিদ্ধমহাপুরুষ দীননাথ ন্যায়রত্নের গৃহে এলেন। দীননাথ ন্যায়রত্নের গৃহ বর্ধমান শহর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে শাকরাইল গ্রামে অবস্থিত।

তিনি তাঁর গুরু প্রাচীন সিদ্ধ মহাপুরুষকে প্রণাম করে বললেন, "আমি তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপার কাছে গিয়েছিলুম। তাঁর কৃপা লাভ করেছি।" তাই শুনে আনন্দিত হয়ে দীননাথ ন্যায়রত্ন বললেন, "বেশ করেছিস, বেশ করেছিস। আমাদের চোখে চোখে দেখা হয়তো।"

এই চোখে চোখে দেখা হওয়া মানে সূক্ষ্ম তাঁর সাথে তারাপীঠের শিবাবতার বামাক্ষ্যাপার যোগাযোগ রয়েছে।

ভারতের সকল উচ্চকোটির সিদ্ধ মহাত্মারা-ই এভাবে সূক্ষ্মদেহে পরস্পরের সাথে আলাপ পরিচয়, ভাব বিনিময় ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। অথচ প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধনক্ষেত্রে স্থূলদেহে বসে আছেন। অনেকে সারাজীবনেও অন্য কোথাও যাননি। কিন্তু সবার ব্যাপারেই তাঁরা সর্বজ্ঞ। বড় জোর দু'একবার তীর্থভ্রমণ শুধু করেছেন। সিদ্ধ মহাত্মা দীননাথ ন্যায়রত্ন তাঁদেরই অন্যতম।

তিনি তাঁর সুদীর্ঘ পঁচানব্বই বছরের মহাজীবনে একবার কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শন করে ফিরে এসেছিলেন। বাকি প্রায় সারাজীবনই সিদ্ধবংশজাত এই বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁর নিজ গ্রামে ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করেন।

একবার তারাপীঠের এক প্রাচীন সাধু বর্ধমানের শাকরাইল গ্রামে দীননাথ ন্যায়রত্নের গৃহে আসেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কথা উঠলো। সহসা সেই প্রাচীন সাধু দীননাথ ন্যায়রত্নকে বললেন, "আপনি তারাপীঠে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে যাননি কেন?"

উত্তরে মৃদুহেসে তিনি বললেন, "বামদেব যাঁকে মা মা বলে ডাকছেন, আমিও তাঁকেই ডাকছি। আমি তাঁকে ঘরে বসেই পাচ্ছি। তবে আমি কেন আর তারাপীঠে যাবো? তাছাড়া চোখে চোখে তো দেখাই হয়।"

অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষ দীননাথ ন্যায়রত্ন বুঝিয়ে দিলেন সেই সাধুকে যে বামদেবের সাথে তাঁর সূক্ষ্ম দেখা সাক্ষাত হয়। তার মানে সূক্ষ্মদেহে তিনি তারাপীঠে বামদেবের কাছে যান। বামদেবও তাঁর কাছে সূক্ষ্মদেহে আসেন। তাই আর স্থূলদেহে যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

এই সিদ্ধ মহাত্মার মহান জীবনী অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাঁর অলৌকিক যোগ বিভূতি কলকাতা, বর্ধমান প্রভৃতি বহু স্থানের বহু বিশিষ্ট নরনারী দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রিয় শিষ্য শরৎকুমার সেনের জীবনেও তা বহুবার ঘটেছে। শরৎকুমারের পিতা প্রসন্নকুমার সেন ও মাতা বসন্তকুমারী দেবীও মহাত্মা দীননাথ ন্যায়রত্নের কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেছেন।

যা হোক, মাস খানেক পর শরৎকুমার সেন আবার তারাপীঠে এলেন বামাক্ষ্যাপা বাবার কাছে। এবার গুরু দীননাথ ন্যায়রত্নের সম্মতি নিয়ে তারাপীঠে এলেন।

বামদেব বসে আছেন শিমুলতলায়। আশে পাশে কয়েকটি কুকুর। শরৎকুমার বামদেবের সামনে বসলেন। বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। শরৎ-কুমার পরম শ্রদ্ধার সাথে বামদেবের পা দু'টো জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের ওপর রাখলেন।

বামদেবকে একটু পূর্বে একজন ভক্ত মহিলা বড় বড় সাদা বাতাসা দিয়ে গিয়েছিলেন। বামদেব সেই বাতাসা থেকে ৪।৫টি বাতাসা তুলে শরৎকুমারকে দিলেন।

পরম শ্রদ্ধার সাথে শরৎকুমার তা খেলেন। সাথে সাথে বুকের যন্ত্রণাও কমে গেল।

তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে সানন্দে তারাপীঠ থেকে সোজা বর্ধমানে তাঁর গুরু গৃহে এলেন শরৎকুমার।

গুরু দীননাথ ন্যায়রত্নকে শ্রীশ্রী বামাক্ষ্যাপার কৃপার কথা বলতেই আনন্দিত হয়ে দীননাথ ন্যায়রত্ন বললেন, "ফল কি আমি একাই নেবো? সবাই ভাগ করে নিচ্ছে, এই তো ভাল। তোর বুকে জল হচ্ছে। সবাইকেই তা ভাগ করে নিতে হচ্ছে। সবাই মিলে তোর ফল খাওয়া হ'ল। ভালই হ'ল। "তুই একলা ফল ভোগ করবি (অর্থাৎ শরৎ কুমার সেনের পূর্ব পূর্ব জীবনের কর্মফলের দরুণ) কেন?" অর্থাৎ কঠিন প্রারব্ধের দরুণ বুকে জল জমেছে। এই কঠিন রোগের হাত থেকে শরৎকুমারকে শুধু দীননাথ ন্যায়রত্নই বাঁচাচ্ছেন না। শ্রীশ্রী বামাক্ষ্যাপাও বাঁচাচ্ছেন। আরো অনেকে বাঁচাচ্ছেন। প্রারব্ধস্বরূপ এই ফলকে তাই দীননাথ ন্যায়-

রত্ন, বামদেব প্রভৃতি ভাগ করে নিলেন। তার ফলে শরৎকুমার সেনকে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হতে হ'ল না। তাঁর প্রারব্ধ তাঁর গুরু দীননাথ ন্যায়রত্ন ও কৃপাময় বামদেব প্রভৃতি গ্রহণ করে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন।

সিদ্ধ মহাপুরুষ দীননাথ ন্যায়রত্ন তাঁর শিষ্য শরৎ কুমার সেনের প্রারব্ধ কর্মফল নিজে টেনে নেবেন এটা স্বাভাবিক। বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ কৃপা করে তা করেন। স্বয়ং বামদেবও তাঁর বহু শিষ্যের প্রারব্ধ টেনে নিয়ে অবধারিত মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে শিষ্যদের রক্ষা করেছেন। কিন্তু শিষ্যদের প্রারব্ধ থেকে যত রক্ষা করেছেন বামদেব, তার চেয়ে শত সহস্র গুণ রক্ষা করেছেন তাঁর কাছে আগত শরণাগত ভক্তদের। অথচ তাঁরা অনেকেই অন্য সাধক পুরুষের দীক্ষিত। যেমন শরৎ সেন। কিন্তু করুণাময় শ্রীবাম এসব বিচার করেন নি। যে তাঁর শরণাগত হয়েছেন তাঁকেই কৃপা করেছেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে অবিরাম অফুরন্ত বৃষ্টি ধারার ন্যায় বামদেবের এই কৃপা ধারা সর্বত্র বর্ষিত হয়েছে।

দীননাথ ন্যায়রত্ন তাঁর শিষ্য শরৎকুমার সেনের প্রারব্ধ ফল একা ভোগ করবার পক্ষপাতি ছিলেন না। অন্য মহাপুরুষরাও তাঁর সাথে এই ফল গ্রহণ করুক এটা তিনি চেয়েছিলেন। অন্তর্যামী করুণাময় বামাক্ষ্যাপা তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করলেন।

এখানেই শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার বিশেষ মাহাত্ম্য। দীননাথ ন্যায়রত্ন স্থূল দেহে তারাপীঠে এক বামদেবের সাথে সাক্ষাত করতে না চাইলেও বামদেব তাঁর ইচ্ছাপূরণ করেন। তাছাড়া অন্য মহাসাধক ও মহাসাধিকা-গণও শরৎ কুমারের প্রারব্ধ কিছু কিছু কৃপা করে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, মা সারদামণি, ত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়, অচলানন্দ স্বামী প্রভৃতি। 'সাধুসঙ্গে প্রারব্ধ পুড়ে যায়'—এই মহাবাণীর প্রাণবন্ত নিদর্শন শরৎকুমার সেন। দীননাথ ন্যায়রত্নও তাই চেয়েছিলেন। তাই এসব অবতার কল্প মহামানবদের দিব্য সান্নিধ্যে এসে এই মহাসৌভাগ্যবান শরৎকুমার সেন তাঁর জন্ম জন্মান্তরের বিশাল প্রারব্ধ রাশির হাত থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করেন। তাঁর সকল প্রারব্ধ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সাধুসঙ্গের সফল

তিনি সারাজীবন পরম আনন্দে ভোগ করেন। ঈশ্বর কৃপা ও দর্শনের মধ্য দিয়ে তিনি উত্তরকালে আদর্শ গৃহী সাধকরূপে অধ্যাত্ম ও পার্থিব জগতে সুপ্রসিদ্ধ হন।

এই গৃহী সাধক শরৎ সেনের জন্ম কলকাতায় ১৮৬৭ সালে। মাত্র সতের বছর বয়সে (১৮৮৪ সালে) তরুণ শরৎকুমার সেন কলকাতার বাড়ী থেকে পালিয়ে কাশী চলে যান। সেখানে পঞ্চগঙ্গার ঘাটে ত্রৈলঙ্গস্বামীর সাথে দেখা করেন। কাশীর শিবকল্প মহাযোগী ত্রৈলঙ্গস্বামী এই উন্নত আধার সম্পন্ন তরুণ শরৎ সেনকে স্বেচ্ছায় নিজের হাতে সন্দেশ খেতে দেন। শরৎ সেন সন্দেশ খেলে পর অন্তর্যামী ত্রৈলঙ্গস্বামী স্নেহ ভরে হিন্দিতে তাঁকে বলেন "তুমারা মাতা পিতা রোতা হ্যায়, তুম ঘরমে ওয়াপাস যাও" অর্থাৎ তোমার মা বাবা কাঁদছেন, তুমি ঘরে ফিরে যাও।"

ত্রৈলঙ্গস্বামীর নির্দেশে কাশী বিশ্বনাথকে প্রণাম করে ও কাশীর পরম পবিত্র গঙ্গায় স্নান করে শরৎ সেন কলকাতায় ফিরে এলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৫ সালের প্রথম ভাগে আঠারো বছর বয়সে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা শুনে যুবক শরৎ সেন কলকাতা থেকে পায়ে হেটে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে এলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীর মধ্যাহ্ন কালীন অন্নপ্রসাদ খাচ্ছিলেন। সেদিন খিচুঁড়ি ভোগ হয়েছিল। ঠাকুরের খাবারের সামনে বসে মা সারদামণি পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন। সর্বজ্ঞ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লান্ত শ্রান্ত যুবক শরৎ সেনকে দেখে সস্নেহে বললেন, "আহা, ছেলেটির বড় ক্ষিধে পেয়েছে।" তারপর তাঁর ভাইপো রামলালকে ডেকে প্রসাদ দিতে বললেন। তিনি কলা পাতায় খিচুড়ি প্রসাদ এনে দিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের পাতের থেকেও একটু প্রসাদ দিতে বললেন। সাক্ষাত জগত জননী মা সারদামণি নিজের হাতে তা তুলে মহা-ভাগ্যবান শরৎ সেনকে দিলেন। পরম তৃপ্তি করে প্রসাদ খেলেন শরৎ সেন। প্রসাদ পাবার পর ঠাকুর বিশ্রাম করতে লাগলেন। একটু

পরে শরৎ সেন মা ভবতারিণী ও ঠাকুরকে প্রণাম করে কলকাতায় ফিরে এলেন।

পরবর্তীকালে একদিন ট্রেনে যাচ্ছেন। সেই ট্রেনে একই কামরায় কাশীর ভারত বিখ্যাত মহাযোগী যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ও যাচ্ছেন। তাঁর তিন মেয়ের বিয়ে তিনি বঙ্গদেশে দিয়েছেন, তাছাড়া তাঁর বহু শিষ্য ভক্তও রয়েছেন বঙ্গদেশে। সেই সূত্রে ও বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি কাশী থেকে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। কর্তব্য সম্পাদন করে ফিরে যাচ্ছেন কাশীতে। মহাযোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় এই উন্নত আধার সম্পন্ন যুবক শরৎ সেনের সাথে স্নেহ ভরে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং নিগূঢ় অধ্যাত্ম উপদেশ দান করেন।

ভারত বিখ্যাত এই মহাযোগীর উপদেশ ও আশীর্বাদ শরৎ সেনের অধ্যাত্ম জীবনের পরম পাথেয় হয়ে রইলো।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ বিখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ কোতরং-এর অচলানন্দ স্বামীর দিব্য সান্নিধ্যও দীর্ঘদিন লাভ করেন শরৎ সেন। এই বীরাচারী উগ্র তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ অচলানন্দ স্বামী ছিলেন শরৎ সেনের শ্বশুর বিখ্যাত এটর্নী কেদার মিত্রের গুরু। তাই শরৎ সেন ও তাঁর স্ত্রী অচলানন্দ স্বামীর বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। অচলানন্দস্বামীর জামাতা রামকুমার বিদ্যারত্ন (পরবর্তীকালে রামানন্দ ভারতী) শ্রীশ্রীবামা-ক্ষ্যাপার কৃপাধন্য হয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড)।

অচলানন্দ স্বামীর কাছে প্রায়ই যেতেন শরৎ সেন। চমৎকার গান করতেন অচলানন্দ স্বামী। তাই শরৎ সেন মাঝে মাঝে অচলানন্দস্বামীকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসতেন। অচলানন্দ স্বামী শরৎ সেনের গুরুদেব দীননাথ ন্যায়রত্নের অশেষ গুণ মুগ্ধ ছিলেন। দীননাথ ন্যায়রত্ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন—“দীনের নাথ তাই দীননাথ।” শরৎ সেন যৌবনেই দীননাথ ন্যায়রত্নের কাছে থেকে দীক্ষা লাভ করেন। ইতিপূর্বে তাঁর পিতামাতাও দীননাথ ন্যায়রত্নের কাছে থেকে দীক্ষিত হয়েছিলেন। দীননাথ ন্যায়রত্নের কাছে থেকে যখন শরৎ সেনের স্ত্রী মন্ত্র নিচ্ছেন তখন একদিকে অচলানন্দ স্বামী চণ্ডীপাঠ করছেন, তাঁর পাশে শরৎ সেনের শ্বশুর তথা অচলানন্দের শিষ্য কেদার মিত্র বসে আছেন। অন্যদিকে শরৎ সেন ও তাঁর স্ত্রী বসে আছেন। পাশে দীননাথ ন্যায়রত্ন উপবিষ্ট।

শরৎ সেনের গুরু ভক্তি ছিল অসাধারণ। আজীবন শ্রীগুরুর প্রদত্ত জপ ধ্যান, গুরু সেবা, সাধু সেবা তীর্থদর্শন, সংসারের প্রতি কর্তব্য প্রভৃতি সব কাজ সুষ্ঠভাবে পালন করেন।

বৃদ্ধ বয়সেও প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করতেন দীর্ঘ চার মাইল হেঁটে। তারপর পশু পাখীকে খাওয়াতেন। চারজন কুমারীর পাদোদক পান করতেন। তারপর নিত্য কাজে প্রবৃত্ত হতেন। এইভাবে সাতাত্তর বছর বয়সে পূর্ণ সজ্ঞানে এই মহাভাগ্যবান গৃহীসাধক, বহু ভারত বিখ্যাত মহাসাধক মহাসাধিকার দিব্য সান্নিধ্য ধন্য, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অশেষ কৃপাধন্য শরৎ সেন মরদেহ ত্যাগ করে অমৃত লোকে গমন করেন। উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক শরৎ সেনের নাতি বৃদ্ধ মাণিক সেনের কাছে চির কৃতজ্ঞ। লেখকের সাথে ছিলেন সংযোগকারী শিবাজী গুপ্ত। এই প্রসঙ্গে তাঁর মহান গুরু ও বিখ্যাত গুরু বংশের কথা উল্লেখযোগ্য।

বামদেবের সাথে যাঁর সূক্ষ্ম যোগাযোগ এবং বামদেবের সাথে যাঁর "চোখে চোখে দেখা হয়" সেই সিদ্ধ পুরুষ দীননাথ ন্যায়রত্ন ও তাঁর সাধক বংশের কথা যথার্থ অবিস্মরণীয়। শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার এই 'সূক্ষ্ম সুহৃদ' দীননাথ ন্যায়রত্ন স্বয়ং এবং তাঁর পূর্ব পুরুষ পিতাম্বর ভট্টাচার্য্য, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং দীননাথ ন্যায়রত্নের পুত্র হরিদাস ভট্টাচার্য্য, পৌত্র শশধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সবাই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে বিশেষ করে সিদ্ধ গৃহী মাতৃ-সাধকদের ইতিহাসের এমন পরপর ছয় পুরুষ সিদ্ধ পুরুষ তা প্রায় দেখা যায় না। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেও যে ঈশ্বর লাভ করা যায় এবং অপরিসীম আনন্দে থাকা যায় তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই মহান সিদ্ধ পুরুষের বংশ।

সাধারণত, এটা সর্বজনবিদিত যে, জগত সংসারে এই তথাকথিত ভীষণ দারিদ্র্য মানুষের দেহ মন প্রাণের শান্তি নাশ করে। মানুষকে ঈশ্বরের পথ থেকে সরিয়ে আনে, মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য ও কর্তব্য পালন করবার জন্য অসৎ হতে বাধ্য করে। এক কথায় এই দারিদ্র্য, মানুষের জীবনে চরম অভিশাপ।

কিন্তু দীননাথ ন্যায়রত্নের মহান জীবন ও তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সিদ্ধ পুরুষগণ তাঁদের সুদীর্ঘ জীবন ও সাধনার দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশ পরম্পরায় প্রমাণ করেছেন যে দারিদ্র্য ঈশ্বরের পথে বাধা নয়, দারিদ্র্যকে অতিক্রম করে অনায়াসে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। বরং দারিদ্র্য ঈশ্বরের পথে পরম সহায়।

ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে পরম তত্ত্ব অবশ্য নতুন নয়। জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বামাক্ষ্যাপা প্রভৃতি সবাই তা আপন আপন জীবনে প্রমাণ করেছেন। গৃহী জীবনেও যে তা সম্পূর্ণ সম্ভব তা-ও দেখিয়েছেন মাতৃসাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সিদ্ধ গৃহী মহাপুরুষগণ।

কিন্তু পরপর ছয় পুরুষ ধরে ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে সুদীর্ঘ জীবন যাপন করেও কঠোর সাধনার দ্বারা জগত জননীর দর্শন লাভ করে চরম অনাসক্ত ভাবে ও পরম আনন্দের সাথে বংশ পরম্পরায় জীবন অতিবাহিত করেছেন এমন সিদ্ধ পুরুষের বংশ প্রায় বিরল। বিশেষ করে পরপর ছয় পুরুষ সিদ্ধ পুরুষ খুবই বিরল। জগতে ক্রমেই তা দুর্লভ হয়ে উঠছে।

তাই শুধু বর্তমান যুগেই নয়, সর্ব যুগের আদর্শ এই মহান সিদ্ধ বংশের কথা তাই সদাই অমৃত সমান। এই বরণীয় স্মরণীয় সিদ্ধ মাতৃসাধকদের নির্লোভতা, অনাসক্তি, তেজস্বিতা, যোগবিভূতি প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নরনারীর আদর্শনীয়। সাধনার পথের পাথেয় স্বরূপ।

স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা বাবা এই সিদ্ধ বংশের চতুর্থ পুরুষ দীননাথ ন্যায়রত্নের সাথে সূক্ষ্ম যোগাযোগ রেখেছেন বরাবর। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অশেষ কৃপাধন্য শরৎ সেনের গুরুদেব এই সিদ্ধ মহাপুরুষ দীননাথ ন্যায়রত্ন কত বড় মাতৃসাধক ও বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন তা তাঁর জীবনী পর্য্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করা যায়।

মহাত্মা দীননাথ ন্যায়রত্নের আবির্ভাব ক্ষেত্র বর্ধমান জেলার শাকরাইল গ্রামে, বর্ধমান থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। তার জন্ম বাংলা ১২২৫ সালে। তাঁর পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণও এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সাধনা ও সিদ্ধি সবই এখানে

ঘটেছে। কুলদেবী শাকরাইল চণ্ডী খুবই জাগ্রতা। প্রবাদ এই যে বসন্ত চণ্ডী ও শাকরাইল চণ্ডী দুই বোন। একদা দৈববাণী হয় যে বসন্ত দেবীর মন্দির হবে কিন্তু শাকরাইল চণ্ডীদেবীর মন্দির হবে না। জঙ্গলে থাকবেন।

দীননাথ ন্যায়রত্নের প্রপিতামহ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁর বাড়ীর অদূরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত প্রস্তর খণ্ডরূপিনী শাকরাইল চণ্ডীর আরাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পুত্র দুর্গাশঙ্কর ও পৌত্র পিতাম্বরও সিদ্ধি লাভ করেন।

একবার পূজার ৪/৫ দিন পূর্বে কাঠামো বাঁধা হচ্ছে। আট ইঞ্চি ছোট হয়ে গেছে নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে। সময়ও আর নেই যে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে ঠিক করবার। কারিগর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। তখন বিকেল বেলা। গাড়ু নিয়ে সিদ্ধ সাধক দুর্গাশঙ্কর শৌচে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থা দেখে গাড়ুর জল কাঠামোতে ছিঁটিয়ে বললেন, "কাঠ তুমি জঙ্গলেই বাড়বে? এখানে বাড়বে না?" আশ্চর্য্য ব্যাপার। মুহূর্তে কাঠামোটি আট ইঞ্চি বেড়ে গেল।

এই সিদ্ধ মহাত্মা দুর্গাশঙ্করের নাতি দীননাথ ন্যায়রত্ন। যৌবনেই তিনি শাকরাইল চণ্ডীর আরাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। অপরিসীম যোগ বিভূতি লাভ করেও অতি সাধারণ ভাবে কখনো অনাহারে কখনো অর্ধাহারে থাকতেন সপরিবারে। তবু অর্থের চিন্তা করতেন না। অর্থ রোজগারের চেষ্টা করতেন না।

একবার কলকাতা থেকে বিখ্যাত এটর্নী কেদার মিত্র এসেছেন। কেদার মিত্র দীননাথ ন্যায়রত্নের ভক্ত। সাথে তাঁর কন্যা (শরৎ সেনের স্ত্রী)। তিনি দীননাথ ন্যায়রত্নের নবদীক্ষিতা শিষ্যা।

দীননাথ ন্যায়রত্নের পরনে ছেঁড়া কাপড়, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোফ। কেদার মিত্রের তরুণী কন্যা ভাবছেন, 'পাগল নাকি'? সাথে সাথে অন্তর্যামী দীননাথ বলে উঠলেন, "মা আমি পাগল নই। মা শাকরাইল চণ্ডী আমায় পাগল করে দিয়েছে।"

দীননাথ ন্যায়রত্নের সাধ্বী স্ত্রী সখেদে বললেন, "এমন শিষ্যা এসেছে, অথচ ঘরে একটি বাতাসাও নেই। কি দেব?"

হঠাৎ দু'টো মেয়ে ঝাঁকা করে সিধে দিয়ে গেল। তাতে চাল ডাল তেল নুন ঘি তরকারী সবই আছে। মেয়ে দু'টো বললো যে জমিদারের বাড়ী থেকে পাঠিয়েছে। সৌদামিনী খুশি হয়ে সিধে নিলেন কয়েক পলকে মেয়ে দু'টো অদৃশ্য হলেন। সৌদামিনী দেবী বিস্মিত হয়ে স্নানরতা শরৎ সেনের স্ত্রীকে বললেন, "মা এখান দিয়ে দু'টো মেয়ে চলে গেল কি?" তিনি তা শুনে বললেন, "না।" সব শুনে দীননাথ ন্যায়রত্ন মৃদু হাসলেন। কলকাতার বিরাট ধনী এটর্নী কেদার মিত্র হুগলীর বিখ্যাত বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী কালীমন্দিরের সম্পত্তি মামলা করে হস্তগত করতে চাইলেন। সত্যদ্রষ্টা দীননাথ ন্যায়রত্ন তাঁকে গম্ভীর স্বরে বললেন, "মা ওখানে সদা জাগ্রতা। তুমি মা'র সম্পত্তি নিও না। মামলায় তুমি জিতবে কিন্তু সম্পত্তি নিলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

পরবর্তী কালে তাই হ'ল। কোটি পতি কেদার মিত্র একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন কিছু কালের মধ্যে।

দীননাথ ন্যায়রত্ন কাশী বৃন্দাবন প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে বের হলেন। পথব্রজে রওনা হলেন। তখন ট্রেন হয়নি। তাঁর সাথে একভক্ত।

মা শাকরাইল চণ্ডীর ওপর নির্ভর করে কপর্দক শূন্য অবস্থায় দুর্গম পথে বের হলেন।

রাতে এক ধনী গৃহস্থ ঘরে আশ্রয় নিলেন। সেই গৃহকর্তা মিথ্যে খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। সব শুনে দীননাথ ন্যায়রত্ন যজ্ঞ করলেন। পূর্ণাহুতির সময় মায়ের হাসিমুখ দেখতে পেলেন।

সানন্দে বললেন "কাল মামলায় ছাড়া পেয়ে যাবে। রায় লেখা হয়ে গেছে। তাই হ'ল। গৃহকর্তা মুক্তি পেলেন। এই বাকসিদ্ধ মহান পুরুষকে প্রচুর অর্থ দিতে চাইলেন।

কিন্তু চিরঅনাসক্ত দীননাথ বললেন, "চারখানা কম্বল দাও, দু'জনের জন্য।" তাঁরা সানন্দে তা দিলেন। তবু বারবার অনুরোধ করলেন কিছু টাকা নেবার জন্য এই দুর্গম তীর্থ পথের পাথেয় স্বরূপ।

দীননাথ বললেন, "টাকা আমি ছুঁইনা। আমার সেবকের হাতে পনের টাকা দিতে পার।" তাই দেয়া হ'ল।

দীর্ঘদিন পথব্রজে ভ্রমণ করতে করতে গয়া এলেন। গয়ায় পিতৃ-পুরুষের কাজ সুসম্পন্ন করে কাশী এলেন। কাশী বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করে তিনি তৃপ্ত হলেন।

একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে কাশীর বিখ্যাত দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে দীননাথ ন্যায়রত্ন ধ্যান করছেন। হঠাৎ জল থেকে উঠে এলেন কাশীর সচল শিব ত্রৈলঙ্গস্বামী। দীননাথের উপস্থ নিজ কপালে ঘষে তারপর এক কোশা গঙ্গাজল সেই উপস্থে ঢেলে দিয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামী সানন্দে বললেন "গঙ্গোদকং। দীননাথ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

এরপর ত্রৈলঙ্গস্বামী সাগ্রহে দীননাথের হাত ধরে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে চললেন। স্বয়ং কাশীর সচল শিব একজন মহাপুরুষকে হাতে ধরে বিশ্বনাথের মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছেন দেখে তাঁর বিশাল গুণমুগ্ধ কাশীর ভক্ত জনগণের অনেক তাঁদের পেছনে পেছনে চললো। প্রায় পাঁচশো লোক। বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করবার কিছু পূর্বে সহসা দু'টো বিশাল ষাঁড় এসে বিশ্বনাথের গলির পথ আটকে দাঁড়ালো। সব লোক আটকে গেল। নির্বিঘ্নে ত্রৈলঙ্গস্বামী ও দীননাথ ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সাথে সাথে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটলো। মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। দিব্য অলৌকিক ভাবে পূজো করে সেখান থেকে চলে গেলেন তাঁরা।

কাশী থেকে বৃন্দাবন হয়ে তারপর দীননাথ ন্যায়রত্ন দীর্ঘকাল পর গৃহে ফিরে এলেন।

উত্তরকালে কাশী বৃন্দাবন প্রসঙ্গে প্রিয় শিষ্য শরৎ সেনকে বলেন, "কাশী কে সৃষ্টি করেছে? মা-ই তো। বৃন্দাবনে কি শুধু কৃষ্ণই আছে? মা নেই? তাই মাকেই নতুন দেশে নতুন বেশে দেখে এলাম।"

দীননাথ ন্যায়রত্নের শিষ্য শরৎ সেনের যখন সাতাশ বছর বয়স তখন তাঁর বুকে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হ'ল। সব রকম চিকিৎসা ব্যর্থ হ'ল। তখন দীননাথ ন্যায়রত্নের কাছে এলেন। তিনি প্রিয় শিষ্য শরৎ সেনকে বললেন, "তোমার বুকে ক্যান্সার হয়েছে। তুমি সাহেব

ডাক্তার দিয়ে অপারেশন করাও, ভয় নেই। সাতাত্তর বছর বাঁচবে। আমি একটি মাদুলি দেব। মাদুলি যেদিন ফাটবে। সেদিন তুমি মারা যাবে।"

গুরু দীননাথের নির্দেশ অনুসারে শরৎ সেন সাহেব ডাক্তার কপিঙ্গোকে দিয়ে অপারেশন করালেন। তিনি ভাল হয়ে গেলেন। গুরু প্রদত্ত মাদুলি ধারণ করলেন। তখন তাঁর বয়স সাতাশ বছর। তারপর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বেঁচে রইলেন। সাতাত্তর বছর বয়সে এক-দিন তাঁর মাদুলিটি ফেটে যায়। সেদিনই শরৎ সেন দেহত্যাগ করলেন।

আর একদিন। শরৎ সেন বসে আছেন। তাঁর গুরু দীননাথ ন্যায়রত্নের কাছ থেকে চিঠি এসেছে। তাতে দীননাথ ন্যায়রত্ন বললেন, "শরৎ, বুধবারে কুকুরে তোমায় কামড়াবে। ১২টা থেকে ১টার মধ্যে কামড়াবে। তারজন্য ভয় পেওনা।"

ঠিক তাই হ'ল। বুধবারে ঐ সময়ে কুকুরে কামড়ালো।

দীননাথ ন্যায়রত্ন ভয়ঙ্কর 'কারণ' পান করতেন। একবার সাত-দিন 'কারণ' পান করে রইলেন। মাঝে মাঝে 'তারা' 'তারা' বলছেন আর শিশুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। সেই সময় ঘন ঘন বিদুৎ চমকাচ্ছে। অদূরে বসে শরৎ সেন ও দীননাথ ন্যায়রত্নের পুত্র হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

শরৎ সেন ভীতকন্ঠে বললেন গুরুপুত্র হরিদাস ভট্টাচার্য্যকে, "দাদা কি হচ্ছে?"

সাধক হরিদাস ভট্টাচার্য্য শান্তভাবে বললেন, "ওখানে যেওনা। জ্বলে যাবে। আমরা তো এই ব্যাপার প্রায়ই দেখছি।" দীননাথ ন্যায়রত্ন শুধু পর্য্যাপ্ত 'কারণ'ই পান করতেন না, তার সাথে মাত্রাহীন গাঁজা, সিদ্ধিও খেতেন।

মাঝে মাঝে মধুর স্বরে গান করতেন তাঁর প্রিয় শ্যামাসংগীত "আপনাতে আপনি থেক, যেওনা মন কারো ঘরে" গানটি করতেন।

মাঝে মাঝে চণ্ডী থেকে তাঁর প্রিয় শ্লোক সব আবৃত্তি করতেন। কখনো প্রাণভরে ত্রাহী মাং মধুসদন বলতেন।

অধিকাংশ সময় দেবী শাকরাইল চণ্ডীর ধ্যানে আত্মমগ্ন থাকতেন।

একবার বর্ধমানের এক জমিদার বাড়ী থেকে দুর্গাপূজার সময় বিশেষ অনুরোধ করে দীননাথ ন্যায়রত্নকে নিয়ে গেলেন দুর্গাপূজা করবার জন্য। মহাসাধক দীননাথ ন্যায়রত্ন পূজো করে দক্ষিণা নিতেন না। জমিদার শিবনারায়ণের বিরাট ঠাকুর দালানে দুর্গাপূজা করতে বসলেন দীননাথ। শত শত নরনারী তাঁর পূজা দর্শন করছে। সিদ্ধ মহাপুরুষ দীননাথ ন্যায়রত্নের নাম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে জনমানসে। দীননাথ ন্যায়রত্নের পূজা দিব্যভাবের পূজা। 'কারণ' খেতে খেতে পূজো করছেন তিনি। দিব্য ভাবে বিহ্বল হয়ে রয়েছেন। চোখে আরক্তিম : উদাত্ত স্বরে মন্ত্রপাঠ করছেন। কিন্তু দর্শকগণ তাঁকে 'কারণ' পান করতে দেখে অসন্তুষ্ট হ'ল। স্বয়ং জমিদারও হলেন। তাঁর মনে হ'ল এই পূজো যথার্থ দুর্গাপূজা নয়।

তিনি সহসা দীননাথ ন্যায়রত্নের সামনে এসে বললেন, "ঠাকুরমশায়, আমার প্রজারা সন্তুষ্ট নয় এই পূজায়। আমার মনে হচ্ছে এই পূজা মা নিচ্ছেন না।"

মহাতেজস্বী দীননাথ ন্যায়রত্ন জমিদারের এই কথা শুনে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, "মা যা বললেন, তাই করছি।" এই বলে মা দুর্গার কড়ে আঙ্গুল খুঁচিয়ে দেখালেন। উপস্থিত শত শত নরনারী ও জমিদার সভয়ে দেখলেন মা দুর্গার মাটির আঙুল দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে। সিদ্ধমহাপুরুষ মাতৃসাধক দীননাথ ন্যাররত্ন তাঁর অসীম সাধনার বলে মৃন্ময়ী প্রতিমাকে চিন্ময়ীতে পরিণত করেছেন। তাই জীবন্ত দুর্গাদেবীর দিব্য হস্ত থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো মাটিতে। দীননাথ ন্যায়রত্ন সেখান উঠে চলে গেলেন। জমিদার ও অন্য সবাই তাঁকে ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল। প্রায় দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। কয়েকবছরের মধ্যে জমিদার শিবনারায়ণ সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেল এবং নির্বংশ হয়ে গেল।

এই হলেন মহাসাধক দীননাথ ন্যায়রত্ন। তিনিই বলতে পারেন মহাযোগী শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা প্রসঙ্গে যে "চোখে চোখে দেখা

হয়তো।” এত বড় কথা বলার শক্তি তাঁরই আছে। এই বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ দীননাথ ন্যায়রত্ন অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করেন। তাঁর গৃহের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়, অথচ স্বয়ং জগতজননী চণ্ডীদেবী তাঁর করায়ত্ত। তিনি একবার মুখ ফুটে মা চণ্ডীকে বললেই চিরতরে তাঁর দারিদ্র্যকে দূর করে দিতে পারেন মাচণ্ডী। কিন্তু ভুলেও তা কোনদিন বলেননি দীননাথ। অষ্টসিদ্ধি যাঁর করায়ত্ত, স্বয়ং জগত জননী যাঁর করায়ত্ত, তাঁর কাছে তুচ্ছ দারিদ্র্য, কোন ব্যাপারই নয়। অথচ দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাত তিনি তাঁর সুদীর্ঘ পঁচানব্বই বছর ধরে শান্তভাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ একমুহূর্তে এই মানবজীবনের সর্বাধিক অভিশাপ ও বিভীষিকা দারিদ্র্যকে চিরতরে তাঁর গৃহ থেকে দূর করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা কখনোই তিনি করেন নি। এ যে কত বড় সংযম ও শক্তি তা উপলব্ধির ব্যাপার। কোন কোন দিন তাঁর গৃহে কিছুই থাকেনা। পত্নী সৌদামিনীর মানসিক কষ্ট চরমে পৌঁছায়। নিজে না হয় অভুক্ত রইলেন কিন্তু স্বামী পুত্রকে অভুক্ত রাখার যন্ত্রণা কি ভীষণ তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। মহাসাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের স্ত্রী'র জীবনে এই অসহ্য যন্ত্রণা বার বার এসেছে।

যাহোক, সেদিন স্ত্রী সৌদামিনীদেবী সজল নয়নে স্বামীকে বললেন, “ঘরে আজ যে কিছুই নেই।”

তাই শুনে শান্তভাবে দীননাথ ন্যায়রত্ন বললেন, “চালে (মাটির ঘর, ওপরে খড়ের চাল) দু'টো লাউ হয়েছে। পুকুরে কলমী শাক রয়েছে। তাই সেদ্ধ কর।”

দীননাথ ন্যায়রত্ন বংশ পরম্পরায় বসতবাটী ছাড়াও কিছু জমির ভোগস্বত্ব পেয়েছিলেন কিন্তু সেই জমির চাষবাস দেখা তো দূরের কথা কোনদিন সেই জমি দেখতেও যাননি। যিনি টাকা স্পর্শ করেন না, পূজা করে দক্ষিণা নেন না, তিনি কি করে জমিজমা দেখাশুনা করবেন? এই দারিদ্র্য তাঁর নিত্যসঙ্গী তবু দারিদ্র্যকে গ্রাহ্য করেননি কোনদিন। অথচ তাঁর ধনী শিষ্য ভক্তের অভাব ছিলনা। কিন্তু কারো কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না কোনদিন।

অধ্যাত্মিক বলে অসীম বলিয়ান না হ'লে গৃহী হয়ে এতবড় আদর্শ সারাজীবন ধরে বজায় রাখা অসম্ভব হ'ত। গৃহস্থ হয়ে লক্ষ্মীরূপী অর্থকে সারাজীবন অগ্রাহ্য করা অসীম শক্তির পরিচায়ক।

তাই সচল শিব ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁর হাত ধরে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে নিয়ে যান। স্বয়ং শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা তাঁর সাথে সূক্ষ্মে যোগাযোগ করেন।

বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ দীননাথ ন্যায় রত্নের দীর্ঘ জীবন বহু অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ।

তাঁর প্রিয়শিষ্যা বসন্তকুমারীদেবী (শরৎ সেনের মাতৃদেবী) একবার তাঁর কাছে বর চান যে অন্তিম সময়ে তাঁর যেন গঙ্গা যাত্রা হয়। দীননাথ তাঁকে সেই বর দিলেন।

তাঁর বহু বছর পর একদিন দীননাথ ন্যায়রত্ন অলৌকিক ভাবে এসে উপস্থিত হলেন। বসন্ত কুমারী দেবীর মামাতো ভাই জীবন-বাবুকে বললেন, "জীবন, কাল ১২টার সময় তোমার দিদি মারা যাবে। গঙ্গা যাত্রা করিও।"

গঙ্গা যাত্রার কিছু পূর্বে সহসা বসন্তকুমারী দেবী বললেন, "জীবন, ঘর আলো হয়ে গেছে। গুরুদেব এসেছেন। আসন দাও, গঙ্গাজল দাও।" ১২ টার পূর্বে গঙ্গায় নিয়ে অন্তর্জলী দেয়া হ'ল। পঞ্চাশ জন লোক দেখতে গেল ঠিক বারটার সময় মৃত্যু হয় কিনা। ঠিক ১২ টায় গঙ্গার তীরে বসন্ত কুমারী দেবী দেহত্যাগ করলেন (১৩১৮)। সেই সময়ে বর্ধমানে নিজ গৃহে বসে দীননাথ বললেন পুত্র হরিদাসকে, "হরিদাস, মা আমার কথা শুনেছে।"

চির স্মরণীয় ১৩২০ সালে মহাসাধক দীননাথ ন্যায়রত্ন পঁচানব্বই বছর বয়সে মহাসমাধিতে চিরতরে মগ্ন হলেন। পূর্ব থেকেই দিনক্ষণ সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। খবর পেয়ে সবাই এলেন। মহাসমাধিতে যাবার পূর্বে শেষবার এই মহাসিদ্ধ পুরুষ তাঁর প্রিয় পুত্র হরিদাসকে বললেন, "ভাল জিনিষ একটা কিছু দাও।" গুড়ের জল তাঁকে দেয়া হ'ল। তার সাথে নিজের উচ্ছিষ্ট ভাত নিয়ে সিদ্ধ মহাপুরুষ বীর মাতৃসাধক শেষবার ইষ্টদেবী শাকরাইল চণ্ডীদেবীকে নিবেদন করে বললেন, "মা খা"।

তারপর উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে শেষবার বললেন, "যুগ যুগ ধরে ছেলে মা মা বলে ডেকেছে, সাধনা করেছে। ছেলে কাঁদবে, আর মা শাকরাইল চণ্ডী আসবে।"

তারপর চিরতরে মহাসমাধিতে মহামগ্ন হলেন।

এই সিদ্ধ বংশের পঞ্চম সিদ্ধপুরুষ তথা দীননাথ ন্যায়রত্নের পুত্র সিদ্ধপুরুষ হরিদাস ভট্টাচার্য্যের জীবনও অপূর্ব সাধন মণ্ডিত। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর পিতা দীননাথ ন্যায়রত্নের নির্দেশে তিনি মাতৃ সাধনায় ব্রতী হলেন। শাকরাইল চণ্ডীর দিব্য প্রস্তর খণ্ডের সামনে বসে গভীর রাতে জপ করছেন। এক লক্ষ জপে সিদ্ধ হবেন। পিতার নির্দেশে একলক্ষ জপ করছেন।

ক্রমে নব্বই হাজার জপ করবার পর দেখলেন সামনের এক গাছের নিচে বসে এক সাধু জপ করছেন। তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে বড় বড় সাপ যাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে সাধক হরিদাস উঠে পড়লেন। পিতা দীননাথ ন্যায়রত্নের কাছে এসে বললেন সব কথা।

সব শুনে গম্ভীর স্বরে দীননাথ বললেন, "ঐ সাধু হলেন রুরু ভৈরব। মা কালীর দক্ষিণ হস্ত। তুমি কতটা পাকা হয়েছ তাই দেখছেন। যাও, এখনি গিয়ে সেখানে বসে বাকি দশ হাজার জপ শেষ কর।" তখন গভীর রাত, পিতার নির্দেশে আবার সেখানে বসে বাকি দশ হাজার জপ শেষ করে মা চণ্ডীর কৃপা লাভ করলেন।

সিদ্ধ সাধক হরিদাস ভট্টাচার্য্যের মানসিক শক্তি কত গভীর তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। দীননাথ ন্যায়রত্নের প্রবীণ সাধক শিষ্য প্রসন্ন কুমার সেন (শরৎ সেনের পিতা) দেহত্যাগ করছেন নিজ গৃহে কলকাতায়। সহসা যুবক হরিদাস ভট্টাচার্য্য বর্ধমান থেকে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। চোখ বুজেই প্রসন্ন কুমার সেন বললেন, "গুরুপুত্র এসেছে? পা-টা বুকের ওপর দাও।"

এই প্রবীন গৃহী সাধকের বুকে পা রাখতে একটু দ্বিধা করলেন

তারপর সবার সামনে দৃঢ়ভাবে পা রাখলেন যুবক হরিদাস ভট্টচার্য্য। গুরুস্বরূপ গুরুপুত্রের পা বক্ষে ধারণ করে সজ্ঞানে সানন্দে দেহত্যাগ করলেন বীর সাধক প্রসন্ন কুমার সেন।

সিদ্ধপুরুষ হরিদাস ভট্টচার্য্যের পুত্র তথা এই মহান সিদ্ধ বংশের ষষ্ঠ পুরুষ শশধর ভট্টাচার্য্যও বাকসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

তাঁর যখন বার বছর বয়স তখন পিতামহ দীননাথ ন্যায়রত্ন মরদেহ ত্যাগ করেন (১৩২০ সালে) বাংলা ১৩০৮ সালে শশধর ভট্টাচার্য্য এই সিদ্ধ বংশের ষষ্ঠ সিদ্ধপুরুষ রূপে আবির্ভূত হলেন। পিতৃ-পিতামহের মহান ঐতিহ্য তিনি অব্যহত রাখেন। সারাজীবন তিনি আপন সাধনায় মগ্ন থাকেন। তাঁর পিতামহ দীননাথ ন্যায়রত্নের প্রিয় শিষ্য ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপাধন্য শরৎ সেনের সুযোগ্য নাতি চিরকুমার মাণিক সেনকে তিনি দীক্ষা দান করেন। এই মহাপুরুষ শশধর ভট্টাচার্য্য কত বড় সিদ্ধপুরুষ ও মহাপ্রেমিক ছিলেন তাঁর দেহত্যাগের পূর্ব ঘটনাটি তার অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন।

বাংলা ১৩৭৮ সালে (ইং ১৯৭১) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার কিছু পূর্বে সত্তর বছর বয়স্ক সিদ্ধসাধক শশধর ভট্টাচার্য্য নিজ গৃহে ঘুমিয়ে আছেন। সহসা মা শাকরাইল চণ্ডী প্রিয় সাধক সন্তান শশধরকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন "আমি তোর দুর্গাপূজাকে উদ্বোধন করে আসি। জাগ্রত মনসা গাছের সামনে আমি দাঁড়াবো।" এই সময় মা তাঁর দেহত্যাগের ইঙ্গিত দেন। সিদ্ধপুরুষ শশধর ভট্টাচার্য্য সানন্দে সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করেন। সেই জাগ্রত মনসা গাছ বিরাজ করছে শরৎ সেনের নাতি ও তাঁর শিষ্য মাণিক সেনের কলকাতার মাণিক-তলার বাড়ীর ছাদে।

তাই দেহত্যাগের চারদিন পূর্বে সুস্থ সবল নিরোগ দেহে প্রসন্ন মনে সিদ্ধসাধক শশধর ভট্টাচার্য তাঁর ইহজীবনের শেষ আধ্যাত্মিক কাজ সুসম্পন্ন করতে কলকাতায় এলেন।

প্রিয় শিষ্য মাণিক সেনকে বললেন মা শাকরাইল চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ সকাল নটায় পূজো শুরু করবেন। সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। সবাই চিন্তিত। সহসা পৌনে ৯ টায় বৃষ্টি সম্পূর্ণ

থেমে গেল। রোদ উঠলো। অপূর্ব পূজো করলেন সত্তর বছর বয়স্ক সিদ্ধপুরুষ শশধর ভট্টাচার্য। তিন ঘন্টা ধরে ভাবে বিহ্বল হয়ে অবিরাম নয়নের জল দিয়ে দিব্য পূজা করলেন তিনি। তিনি দেখলেন সাক্ষাত মা দুর্গা দাঁড়িয়ে প্রসন্ন নয়নে এই পূজা গ্রহণ করলেন।

পূজা শেষে বললেন, "একবার মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে যাব। গঙ্গা-স্নান করতে।" শিষ্য মাণিক সেন ও তাঁর অনুজভ্রাতারা এবং ভ্রাতৃবধূ ও তাঁদের পুত্রকন্যাগণ সবাই এই প্রবীণ সিদ্ধপুরুষকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে এলেন। মা ভবতারিণী ও যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহমন্দির দর্শন করে গঙ্গার ঘাটে এলেন। জীবনে কখনো গায়ে তেল মাখেন না। কিন্তু এই সময় বললেন 'তেল মাখিয়ে দাও'। তাই করা হল। তখন বললেন, "আমার ঘন্টা বেঁজে গেছে।" উপস্থিত গভীর দুঃখে এই মর্মান্তিক সংবাদ শুনলেন সবাই। যাহোক, স্নান করবার সময় বললেন, "তোদের গুরুগঙ্গা করিয়ে দিই।" শিষ্য মাণিক সেন ও তাঁর ছোট ভাইদের হাত ধরে গঙ্গাজলে ডুব দেবার পূর্বে বললেন, "তোদের জ্ঞানে অজ্ঞানে তোরা যত পাপ করেছিস, সব আমি হরণ করলাম"—এই বলে ডুব দিতে লাগলেন। দেহত্যাগের পূর্বে এই মহাপ্রেমিক তাঁর শিষ্য ভক্তদের সবার পাপ নিজ সিদ্ধ শরীরে গ্রহণ করলেন।

গঙ্গা স্নান করে কলকাতায় ফিরলেন সবাই।

তারপর প্রিয় শিষ্য মাণিক সেনের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করে বর্ধমানে রওনা হলেন।

যথা সময়ে গৃহে পৌঁছে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে বললেন "আমাকে বিছানা করে দাও। আমি এই শাকরাইল চণ্ডীর কাছেই থাকবো।" তাই করা হ'ল। তিনদিন পরে সেখানেই সুস্থদেহে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে মা শাকরাইল চণ্ডীর চিরন্তন কোলে চলে গেলেন।

উপস্থিত সবাই সজল নয়নে এই ইচ্ছামৃত্যু প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন।

যে দিব্য সাধন শিখা একদা সিদ্ধপুরুষ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, শত শত বছর ধরে পর পর ছয় পুরুষ সেই মহান সাধন শিখা অব্যহত রাখেন।

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্বলিত মহাশিখা হলেন এই সিদ্ধবংশের চতুর্থ পুরুষ মহাসাধক দীননাথ ন্যায়রত্ন।

তারাপীঠ ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে স্থূল দেহে কখনো না গিয়েও সারাজীবন সূক্ষ্মে যাতায়াত করলেন এই মহাসাধক। মহাতান্ত্রিক মহাযোগী বামাক্ষ্যাপার স্থূলদেহে তাঁর গৃহে কখনো না গিয়েও সারা-জীবন সূক্ষ্মে আসা যাওয়া করলেন। আর স্থূলে বার বার কৃপা করলেন দীননাথ ন্যায়রত্নের উন্নত শিষ্য শরৎ সেনকে। এ এক বিচিত্রলীলা। বিচিত্র আনন্দময় যোগ। নিত্য অমৃতময় মহাযোগ।

উপরন্তু কাহিনীর জন্য লেখক দীননাথ ন্যায়রত্নের সুযোগ্য শিষ্য, শরৎ সেনের নাতি, অসাধারণ শ্রুতিধর পুরুষ মাণিক সেনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি দীননাথ ন্যায়রত্নের পুত্র হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও পৌত্র শশধর ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তা সব স্মরণে রেখে সত্তর বছর বয়সে তা লেখককে বলেন। এজন্য এই প্রবীণ প্রাজ্ঞ ভক্তের কাছে লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ও ক্ষ্যাপাবাবার বিচিত্রলীলা

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চারদিক নিবিড় আঁধারে ধীরে ধীরে ঢেকে যাচ্ছে। শ্রীবাম শিমুলতলায় বসে আছেন। প্রশান্ত গম্ভীর তাঁর রূপ। সহসা শ্রীবাম ধুনি জ্বালাতে আদেশ করলেন উপস্থিত শিষ্যভক্তদের।

শ্রীবামের সামনে অদূরে বসে আছেন এক প্রাচীন সাধু। কয়েকদিন পূর্বে তারাপীঠে এসেছেন। আপনমনে থাকেন। কারো

সাথে বিশেষ কথা বলেন না। এমনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব যে কেউ তাঁর কাছে বসে গল্প গুজব করবার সাহস পায় না। দূর থেকেই তাঁর ওপর লক্ষ্য রাখেন। এই সাধুর নাম ক্ষ্যাপাবাবা। তাঁর কাজকর্ম সবই বিচিত্র। শ্রীবামদেব তাঁকে দূর থেকে দেখেছেন, তিনিও বামদেবকে দেখেছেন কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার কেউ কারো সাথে কথা বলেন নি।

সাধারণত তারাপীঠে যাঁরা সাধনা করতে আসেন তাঁরা তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব বামাক্ষ্যাপার কাছে প্রথমে আসেন। তাঁকে প্রণাম করে এবং প্রণামী স্বরূপ সাধ্যমত ফলমূল বা 'কারণ' দিয়ে তারপর মহাশ্মশানে তপস্যা করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অন্তর্যামী শ্রীবাম সেই মুমুক্ষু সাধকের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু দেখে এবং তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে তপস্যা করবার উপযুক্ত মনে করলে তবেই অনুমতি দেন। যে মহাভাগ্যবান একবার অনুমতি পান তাঁর ইষ্টদর্শন অনিবার্য। কারণ তাঁর সাধনার সকল বাধাবিঘ্ন স্বয়ং বামদেবই কৃপা করে কাটিয়ে দেন এবং সাধকের আধার অনুসারে তাঁর মধ্যে কৃপাশক্তি সঞ্চার করে দেন—যাতে সিদ্ধিলাভ হয়।

এই সময় তারাপীঠে শ্রীবামের দিব্য কৃপাধন্য অনেক সাধক সাধিকা দীর্ঘদিন ধরে তপস্যারত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্চানন মিশ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী, চক্রবর্তীবাবা, ললিত গোঁসাই, সুখানন্দ, কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, জানগুরুবাবা, নাপিত গোঁসাই, জটামা (কবিচন্দ্রপুর), চটক বাবাজী, রাধারাণী ভৈরবী, ইটে গোঁসাই প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারামা ও শ্রীবামদেবের কৃপায় এঁরা যথাসময়ে আপ্তকাম হন।

যাহোক, কিন্তু এই সাধু—ক্ষ্যাপাবাবা বামদেবের অনুমতি নিলেন না। এমনকি বামদেবের সাথে কথাও বললেন না। আরো বিচিত্র ব্যাপার বামদেবও তাঁকে কিছু বললেন না। শ্রীগুরু বামের নির্দেশে শিমুলতলায় ধুনি জ্বালানো হ'ল। শ্রীবাম 'হোম' শুরু করলেন।

মহাপীঠ তারাপীঠের মহাজাগ্রত মহাশ্মশানে হোম করছেন স্বয়ং তারাপীঠ ভৈরব শিবাবতার—এই দৃশ্য এক অপর্ব দিব্য ভাবের সৃষ্টি

করলো। যথাসময়ে হোম শেষ হ'ল। কিন্তু শ্রী ই সে'র নির্দেশে ধুনি প্রজ্বলিত রইলো। শ্রীবাম ধ্যানমগ্ন হলেন। ন গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো। ভীষণ মহাশ্মশান .ম জেগে উঠতে লাগলো। উপস্থিত সবাই একে একে সেই স্থান ত্যাগ ক রে চলে গেলেন।

তাঁরা জানেন এরপর শ্মশান বিভূতি শুরু হবে। এই শ্মশান বিভূতি সহ্য করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সবাই সেখান থেকে বামদেবের আশ্রমে চলে গেলেন।

ধুনি জ্বলতে লাগলো, সামনে বামদেব ধ্যানমগ্ন। অদূরে বসে আছেন সেই প্রাচীন সাধু ক্ষ্যাপাবাবা। চারদিক ভয়ঙ্কর স্তব্ধ। মৌন যেন মুখর হয়ে চারদিকে বিরাজ করছে।

একটু পরে বামদেবের ধ্যান ভাঙ্গলো। তিনি তাকিয়ে দেখলেন আশে পাশে তাঁর সেবক ভক্ত কেউ নেই। সামনে ধুনি জ্বলছে। ধুনির ওপাশে সেই প্রচীন সাধু ক্ষ্যাপাবাবা শুধু বসে আছেন। বামদেব কিছু বললেন না। সহসা সেই প্রাচীন সাধু ক্ষ্যাপাবাবা ধুনির প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে একটি জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলেন তাঁর গাঁজার কলকে ধরাবার জন্য। পবিত্র হোমাগ্নির থেকে এভাবে অগ্নি নেয়ায় বামাক্ষ্যাপাবাবা মুহূর্তে রুদ্র রূপ ধারণ করলেন। ধুনি থেকে একটি জ্বলন্ত চেলা কাঠ নিয়ে সবলে সেই সাধুর পেটে ঢুকিয়ে দিলেন। সাধু শান্তভাবে সেই জ্বলন্ত কাঠ-দেহে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। শ্রীবাম নিজ আসনে ফির এসে বসলেন। কিন্তু শ্রীবাম বাইরে রুদ্র হলেও অন্তরে তিনি করুণার মহাসমুদ্র।

জ্বলন্ত চেলা কাঠ পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে শ্রীবামের কোমল হৃদয় কেঁদে উঠলো। সাধুটির দিকে কৃপা ভরে তাকালেন কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার সাধুটি শান্তভাবে চুপ করেই বসে আছে। মুখে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নেই। সম্পূর্ণ দেহবোধহীন সাধু এই ক্ষ্যাপাবাবা। শ্রীবাম বিস্মিত হলেন। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে দেখলেন এই সাধু সামান্য সাধক নন। এক উচ্চ কোটির সাধু। সম্পূর্ণ দেহ বোধহীন না হলে জ্বলন্ত চেলা কাঠ পেটের মধ্যে নিয়ে এভাবে কেউ শান্ত ভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

গুণীর সম্মান শ্রীবাম চিরদিনই দিয়ে থাকেন। তখনি শ্রীবাম উঠে সেই প্রাচীন সাধুর কাছে গেলেন। শ্রীবাম তবু মনের ভাব

গোপন রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুই?" বিস্ময়ের ব্যাপার, সাধুটি মৃদু মৃদু হাসছেন। তারপর বললেন "তুমিও যা, আমিও তাই।" শ্রীবাম এই উত্তর শুনে খুবই খুশী হলেন। তখন এই ব্রহ্মবিদ মহা পুরুষের জ্বলন্ত চেলা কাঠ তাঁর পেট থেকে বের করে ফেললেন। তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন এই প্রাচীন মহাত্মাকে। শ্রীবামের দিব্য স্পর্শে প্রাচীন মহাতাপস ক্ষ্যাপা বাবার পেটের বিশাল উত্তপ্ত গর্ত বুজে গেল এবং সকল জ্বালাযন্ত্রণা মিলিয়ে গেল। শুধু পেটের দীর্ঘস্থান জুড়ে জ্বলন্ত পোড়া দাগ রয়ে গেল।

উত্তরকালে ক্ষ্যাপাবাবা তাঁর বহু শিষ্যভক্তকে তাঁর পেটের এই পোড়া দাগ দেখিয়ে বলেন, "এই দাগ হ'ল বামাক্ষ্যাপা বাবার মহান আশীর্বাদ। যখনি এই দাগ স্পর্শ করি তখনি তাঁর ভালবাসার কথা মনে হয়।" ক্ষ্যাপাবাবা কান্দিতে একটি ক্ষুদ্র আশ্রমে অবস্থান করেন।

এই প্রাচীন সাধু তথা মুর্শিদাবাদের ক্ষ্যাপাবাবার জীবন ইতিহাস গভীর রহস্যে আবৃত। তাঁর সম্পর্কে নানান কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে ভক্ত সমাজে। তাঁর নিজ মুখ থেকেও শোনা যায় যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্ম সাধনার গুরু শ্রীশ্রীতোতাপুরী মহারাজের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্ম সাধনা তথা নির্বিকল্প সমাধির সময়। কিছুদিন সেখানে থেকে তিনি চলে আসেন। তোতাপুরী মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করতে থাকেন। দীর্ঘ সাত মাস পর তোতাপুরী মহারাজও দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় নিয়ে গঙ্গাসাগর হয়ে উত্তরা পথে চলে যান।

এই প্রাচীন মহাত্মা ক্ষ্যাপাবাবার বয়স কত তা সঠিকভাবে জানা যায় না। বয়স সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু তাঁর শিষ্য ভক্তগণের বিশেষ করে লালগোলার রাজ পরিবার ও কান্দির জমিদারগণ মনে করেন ক্ষ্যাপাবাবার বয়স দু'শতাধিক বছর। এর কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে ক্ষ্যাপাবাবা কান্দিতে এসেছেন ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে। বংশ পরম্পরায় তাঁরা ক্ষ্যাপাবাবাকে দর্শন করছেন দীর্ঘকাল ধরে। তাই যিনি বর্তমান কাল থেকে (১৯৯০) অর্থাৎ ১৭৪ বছর পূর্বে কান্দিতে এসে বসবাস করছেন তাঁর বয়স দু' শতাধিক হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে

তাঁর পূর্বেই তাঁর সাধনা সিদ্ধি যেখানে সম্পন্ন হয়েছে সেখানে তাঁর বয়স দু'শতাধিক হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া যিনি বর্তমান সময় (১৯৮৯) থেকে প্রায় একশো পঁচিশ বছর পূর্বে তোতাপুরীর সাথে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্ম সাধনার সময়ে তাঁর বয়স দু'শতাধিক হওয়া অসম্ভব নয়। যা হোক, ক্ষ্যাপাবাবার বহু অলৌকিক লীলা তাঁর শিষ্যভক্তগণ বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু নিজে তিনি গুপ্ত থাকতে পছন্দ করেন। আজো এই প্রাচীন সিদ্ধ মহাসাধক নীরবে নিভৃতে আপন কাজে মগ্ন রয়েছেন তাঁর কান্দির ক্ষুদ্র আশ্রম গৃহে। ক্ষ্যাপাবাবার কৃপাধন্য উপরোক্ত কাহিনীর সংযোগের জন্য লেখক শ্রীমান চট্টরাজ ও চিদানন্দ-দাসের কাছে কৃতজ্ঞ।

—০—

করুণাময় শ্রীরাম ও ভাগ্যবান নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ১৩১৪ সালের পৌষ মাস (ডিসেম্বর, ১৯০৭ খ্রীঃ)। শীত বেশ জাকিয়ে বসেছে তারাপীঠের আকাশে বাতাসে মাঠে ঘাটে। এমনি এক সুন্দর পরিবেশে এক ছুটীর দিনে হুগলী থেকে তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন ভক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দুই বন্ধু রজনীকান্ত সেন গুপ্ত ও হৃষিকেশ মজুমদার। মল্লারপুর থেকে পায়ে হেঁটে এলেন এই তিন বন্ধু। স্বভাবতই এঁরা শ্রান্ত ক্লান্ত।

নন্দবাবু হুগলী জেলার সরকারী স্কুলের শিক্ষক (পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট) এবং তাঁর উপরোক্ত বন্ধুগণ হুগলী

কোর্টের উকিল। হুগলীর রায়বাজার নিবাসী নন্দবাবুর সাথে বামদেবের প্রধান শিষ্য তারাক্ষ্যাপার (ব্রহ্মচারী তারানাথ) বিশেষ পরিচয় রয়েছে। নন্দবাবু তাঁর কাছে থেকে তাঁর গুরুদেব বামাক্ষ্যাপা-বাবার অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনেছেন।

নন্দবাবুকে তিনি তারাপীঠে গিয়ে বামাক্ষ্যাপা বাবাকে দর্শন করতেও বলেছেন। ইতিমধ্যে নন্দবাবুর বাবা অধরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূত্রাশয়ের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। অধরবাবুর বয়স প্রায় বাহাত্তর বছর। নন্দবাবুর ইচ্ছা যে অপারেশন করে তাঁর বাবাকে ভাল করেন। এজন্য হুগলীর খ্যাতনামা সিভিল সার্জন থারণ্টেন সাহেবকে দেখালে তিনি এত বেশী বয়সে রোগীকে অপারেশন করবার ঝুঁকি নিতে রাজী হলেন না।

ফলে অসুস্থ পিতার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে পিতৃভক্ত নন্দবাবু বিষণ্ণ হয়ে পড়েন।

এই সময় তাঁর উপরোক্ত বন্ধুদ্বয় তারাপীঠ যাচ্ছেন শুনে নন্দবাবুরও বামদেবকে দর্শন করবার ইচ্ছা হল। তার সাথে বিশেষ করে ব্রহ্মচারী তারানাথের উপদেশ মনে পড়লো। কিন্তু নন্দবাবুর পিতা অসুস্থ। কি করে পিতাকে ছেড়ে তারাপীঠে যাবেন? নন্দবাবুর পিতা কিন্তু সানন্দে সাধু দর্শনের জন্য যেতে বললেন।

নন্দবাবু আনন্দিত হয়ে বন্ধুদের সাথে তারাপীঠে এলেন। নন্দবাবু দেখলেন যে শিমুল তলায় বামদেব বসে আছেন। তাঁর পাশে বসে বসে আছেন নগেন পাণ্ডা, অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়, নগেন বাগচি প্রভৃতি।

অবিনাশবাবু বামদেবকে তারানাম দুর্গানাম শোনাচ্ছেন। নগেন পাণ্ডা তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন যে কেন তাঁরা এসেছেন? উত্তরে তাঁরা জানালেন যে তাঁরা মহাপুরুষ দর্শন করতে এসেছেন। উত্তরে নগেন পাণ্ডা জিজ্ঞেস করলেন যে বামদেবের জন্য তাঁরা কি এনেছেন?

নন্দবাবুরা বামদেবের জন্য চার আনার গাঁজা কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই বামদেবের চরণে নিবেদন করলেন। বামদেব সেই গাঁজা নিয়ে চিবুতে লাগলেন। তা দেখে তিন বন্ধু বিস্মিত হলেন।

যথাসময়ে বামদেব তাঁর সেবক পাণ্ডাকে নির্দেশ দিলেন তারামায়ের অন্নপ্রসাদ নন্দবাবু ও তাঁর বন্ধুদের দিতে। প্রসাদ পাবার পর তাঁরা এক

পাণ্ডার গৃহে বিশ্রাম নিলেন। রাতে তারা এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলেন। রাতে তারামায়ের মহাপ্রসাদ কলাপাতায় করে বামদেবের জন্য পাণ্ডা নিয়ে এলেন। তারাময় বামদেব শ্মশানের শেয়াল কুকুর প্রভৃতিকে নিয়ে এক সাথে এক পাতে পরম আনন্দে খেতে লাগলেন। বাবা যেমন ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক পাতে আনন্দ করে খান শ্রীবামও তেমনি এই পশুদের নিয়ে সেভাবে আনন্দ করে খেতে লাগলেন।

পরদিন জীবিত কুণ্ডে স্নান করবার সময় অবিনাশ বাবুর সাথে নন্দলালবাবু ও তাঁর দুই বন্ধুর পরিচয় হ'ল। অবিনাশ বাবু তাঁদের জানালেন যে কেউ মনে মনে কিছু চিন্তা করে বামদেবকে স্মরণ করলেই বামদেব তার সঠিক উত্তর দিয়ে দেন। একথা শুনে নন্দবাবু ঠিক করলেন যে বামদেবের কাছে বসে তার বাবার অসুখের কথা চিন্তা করবেন। যথাসময়ে শিমুল তলায় বামদেবের সামনে বসে তাঁর বাবার অসুখের কথা নন্দবাবু চিন্তা করলেন।

তারাভাবে বিভোর বামদেব কিছুক্ষণ পর হঠাৎ উঠে এসে নন্দবাবুর পিঠে আস্তে করে পা দিয়ে আঘাত করে বললেন, "এখনও পনের বছর।"

নন্দবাবু বুদ্ধিমান হয়েও এই কথার তাৎপর্য্য ধরতে পারলেন না। একটু পরে বামদেব নন্দবাবু ও তাঁর বন্ধুদের জানালেন যে তাঁদের সুপরিচিত এবং তাঁর শিষ্য তারাক্ষ্যাপা আসছেন। রাত প্রায় ১২টার সময় মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা মাদ্রাজ থেকে জুড়ানপুরে ফেরবার পথে তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন। নন্দবাবুদের দেখে তিনি বিস্মিত হলেন।

কিছুক্ষণ পর বামদেবের সাথে তারাক্ষ্যাপার ইঙ্গিত পূর্ণ কথাবার্তা হ'ল। তারপর তারাক্ষ্যাপা প্রসন্ন মনে নন্দবাবুকে বললেন, "তোর বাবা তো ভাল হয়ে গেছেন। এখনও পনের বছর বাঁচবেন। বাবা তাই বললেন।" নন্দবাবু এই আশাতীত সংবাদে খুবই খুশি হলেন গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় তিনি বামদেবের চরণ কমলে প্রণত হলেন।

পরের দিন বামদেবের দিব্য সঙ্গলাভ করে চতুর্থ দিন নন্দবাবু ও তাঁর দুই বন্ধু বাড়ী ফিরে গেলেন।

নন্দবাবু বাড়ী ফিরে দেখলেন তাঁর বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে আছেন।

নন্দবাবু তারাপীঠ থেকে ফেরবার সময় বামদেবের একটি ছবি নিয়ে এসেছিলেন। সেই ছবি সযত্নে ঘরে বাঁধিয়ে রাখলেন।

এরপর প্রায় দীর্ঘ পনের বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে বামদেব স্থূলদেহে অপ্রকট হয়েছেন। মাঝে মাঝে নন্দবাবু প্রয়োজন বোধে যখনই বামদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বামদেবের স্মরণ করেছেন তখনি বামদেবের অভয় রূপ মানস নয়নে দেখতে পান। বাকসিদ্ধ দেবমানব বামদেবের কথানুযায়ী দীর্ঘ পনের বছর সুস্থ থাকার পর (পৌষ ১৩১৪ থেকে পৌষ ১৩২৯ সন পর্যন্ত) নন্দবাবুর বাবা প্রায় সাতাশী বছর বয়সে পরলোক গমন করলেন। ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে তিনি পরলোক গমন করলেন। তাঁর পূর্বদিন এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি অসুস্থ হলেন। তাঁর সেবা চিকিৎসা যথারীতি হতে লাগলো। তাঁর পুত্র নন্দবাবু তখন কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট। ১৮ই ডিসেম্বর তিনি হঠাৎ একটি জরুরী কাজের ব্যাপারে কলকাতায় এলেন। রাত হয়ে যাওয়ায় তিনি হুগলীতে ফিরতে পারলেন না। তাঁর পিসতুতো ভাই মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে রাতে রইলেন। মন্মথনাথ বাবু প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ছিলেন। পরে বিচারপতি হন। যাহোক, নন্দবাবু পিতার জন্য চিন্তিত রইলেন। সামান্য কিছু আহার করে তিনি তাঁর পিসতুতো ভাই মন্মথনাথ বসুর শোবার ঘরে বাইরের দিকে সযত্নে বাঁধানো বামদেবের ছবির দিকে এগিয়ে গেলেন।

বামদেবের এই ছবিটি মন্মথনাথ বাবুকে উপহার দিয়েছেন বামদেবের অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মন্মথনাথ বাবুর অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

নন্দবাবু ভক্তিভরে বামদেবের ফটোটিকে প্রণাম করে মনে মনে জানালেন যে তাঁর বাবা যেন এই যাত্রাতেও বেঁচে যান। সহসা এক অলৌকিত ব্যাপার ঘটলো। নন্দবাবু সবিস্ময়ে দেখলেন যে বামদেবের ছবিটি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং কাঁচের মধ্য থেকে মাথা নেড়ে জানালেন 'না'।

নন্দবাবু ভাবলেন যে তিনি ভুল দেখলেন বোধ হয়। তাই তিনি

দ্বিতীয়বার আবার প্রার্থনা জানালেন। বামদেবও যথারীতি পুণরায় মাথা নেড়ে 'না' জানালেন।

পরম বিস্ময়ে নন্দবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর পিসতুতো ভাই মন্মথনাথ বাবুকে ডেকে আনলেন সেখানে। নন্দবাবু তৃতীয়বার নিজে প্রার্থনা করলেন।

তৃতীয়বারও বামদেব ফটোর মধ্যে বসে যথারীতি মাথা নেড়ে 'না' জানালেন।

চরম বিস্ময় ও বিষণ্ণতা নিয়ে উভয়ে বিছানায় শুতে গেলেন। বিছানায় শুয়ে নন্দবাবু সজল নয়নে বামদেবের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলেন যে, তিনি যেন কাল হুগলীতে ফিরে গিয়ে তাঁর বাবার শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করতে পারেন।

করুণাময় বামদেব নন্দবাবুর সেই ইচ্ছাপূরণ করলেন। পরদিন (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২২) নন্দবাবু হুগলীতে রওনা হলেন। বাড়ী পৌঁছে দেখলেন যে পিতৃদেব পরলোকগমন করেছেন। মাত্র আধঘন্টা পূর্বে তিনি পরলোকগমন করেন। শেষকৃত্যের জন্য বাড়ীর লোকজন তাঁর অপেক্ষায় বসে রয়েছেন।

যথাসময়ে নন্দবাবু তাঁর পিতার শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করলেন।

পরবর্তীকালে বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত আশ্চর্য ঘটনাটি বামদেবের মহোৎসব উপলক্ষে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে আয়োজিত স্মৃতিসভায় সশ্রদ্ধ চিত্তে বর্ণনা করেন।

করুণাময় বামদেবের এই অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে প্রকৃতির রাজ্যে যা স্বাভাবিক, প্রকৃতির অধীন মানুষের কাছে তাই স্বাভাবিক মনে হয়।

কিন্তু অবতার, অবতারকল্প ও মহাসাধকগণ প্রকৃতির অধীন নয়, প্রকৃতির অতীত। বরং বলা যায় প্রকৃতি তাঁদের বশীভূতা। তাই তাঁদের ইচ্ছা, কাজ ও কথা প্রকৃতি পালন করতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রকৃতির দাস মানুষের কাছে তা অস্বাভাবিক মনে হয়। তাই এই অস্বাভাবিককে তাঁরা তাঁদের সীমিত ও অনিত্য বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে না পেরে তা অলৌকিক বলে চিহ্নিত করেন। আসলে সেটাই সত্য সহজ স্বাভাবিক ও নিত্য।

শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজমান। তিনি

চিরদিন ছিলেন আছেন থাকবেন। কখনো স্থূলে কখনো সূক্ষ্মে, তাঁর লীলা চলছে। নিত্য থেকে লীলায় আবার লীলা থেকে নিত্যে। এই অন্তহীন লীলা চলছে অনন্তকাল ধরে।

—o—

বিচিত্র প্রভু শ্রীবাম ও বিচিত্র ভৃত্য 'নোদা'

বামদেবের প্রিয় সেবক ও ভক্ত এবং ভৃত্য 'নন্দদাই' তথা 'নন্দাহাড়ি' তথা 'নন্দপাটনী' তথা 'নোদা'র কথা ইতিপূর্বে একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)। বামদেবের আদরের এই "নোদা" একাধারে বামদেবের নিত্য সেবক ভক্ত ও বামলীলার অন্যতম বিশিষ্ট অংশীদার ও রসজ্ঞ লীলা পরিকর রূপে বামমণ্ডলে সুপরিচিত।

প্রভু বামদেবের বহু বিচিত্র লীলা, বহু অমৃত কথা, বহু অপার্থিব দিব্য ভাব একাধারে দর্শন ও শ্রবণ করেছে এই মহাভাগ্যবান তথাকথিত মাসিক তিন টাকা মাইনের বিচিত্র ভৃত্য নোদা।

সুদীর্ঘকাল ধরে এই মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে 'নোদা'—যা বামদেবের বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত শিষ্য ভক্তেরও সৌভাগ্য হয়নি। অথচ পার্থিব জীবনে 'নোদা' বামদেবের এক সামান্য ভৃত্য রূপে সুপরিচিত। তবু এই 'নোদা'কে কেন্দ্র করে বহু অপার্থিব লীলা শ্রীবাম ঘটিয়েছেন। শুধু ভৃত্য 'নোদা'কে নিয়েই নয়। 'নোদা'র মা, স্ত্রী, প্রভৃতিকে নিয়েও ঘটিয়েছেন গভীর আদর্শমণ্ডিত ও উপলব্ধিপূর্ণ দিব্য লীলাসকল। 'নোদা' তাই বামলীলার এক বিচিত্র সৃষ্টি। মানে অভিমানে, সুখে দুঃখে, হাসি কান্নায়, তিরস্কার পুরস্কারে এই বিচিত্র লীলা নিত্য স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল।

প্রভু শ্রীবাম জাতিতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তার ওপর ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ রূপে সুপ্রসিদ্ধ।

ভৃত্য নোদা জাতিতে বর্ণনিকৃষ্ট ডোম। শ্রীবামের কাজ করবার পর অবসর সময় মড়া পোড়ায়।

প্রভু শ্রীবামের সুস্থ সবল ভাগবতী দেহ। তাঁর দিব্য পবিত্র দেহের স্পর্শে কত আর্ত নরনারী রোগমুক্ত হয়েছে, কত মৃত্যুপথযাত্রী প্রাণ ফিরে পেয়েছে, কত মুমুক্ষু সাধক ঈশ্বর দর্শন করেছে, কত দরিদ্র ধনী হয়েছে, কত পাপী পাপমুক্ত হয়েছে, কত অজ্ঞানী জ্ঞানী হয়েছে, ভোগী যোগী হয়েছে তাঁর সংখ্যা নেই।

এই সুস্থ সবল দেহের অধিকারী প্রভু শ্রীবামের ভৃত্য 'নোদা'র দেহ হ'ল ভীষণ কুষ্ঠরোগগ্রস্থ। মহাব্যাধি গলিত কুষ্ঠের জন্য 'নোদা'র দু'হাতের দশটি আঙুলের মধ্যে আটটি আঙুলই খসে পড়ে গেছে। বাকি দু'আঙুল দিয়ে 'নোদা' তাঁর প্রভু শ্রীবামের দেবদেহের সেবা করে এবং সেই সেবা প্রভু শ্রীবাম মনের আনন্দে নির্বিচারে নিত্য গ্রহণ করেন।

সবার ঘৃণিত এই কুষ্ঠরোগগ্রস্থ ভৃত্য নোদার হাতের জল ও নোদার হাত ও পা দিয়ে সাজা তামাক, গাঁজা প্রভৃতি শ্রীবাম মনের আনন্দে খান। আবার কুষ্ঠরোগী নোদার দাঁত দিয়ে মদের বোতলের ছিপি খোলা না হলে শ্রীবাম সেই মদ খেয়ে তৃপ্তি পান না।

'নোদা'র দু'হাতের আটটি আঙুল না থাকায় তার দু'পা দিয়ে তামাক ও গাঁজার কল্কি চেপে ধরে তারপর দু'হাতের দু' বুড়ো আঙুল দিয়ে যথাক্রমে তামাক ও গাঁজা কল্কিতে ভরে দেয় প্রভু বামদেবকে। তারপর বামদেবের কোন শিষ্য বা ভক্ত তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

এই ভীষণ গলিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ভৃত্য 'নোদা'র ওপরে প্রায় সকলে বিরক্ত। মনে প্রাণে তাকে ঘৃণা করে প্রায় সবাই। অনেকে অনেক চেষ্টা করেছেন এই বিভৎস নোদাকে বামদেবের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে কিন্তু পারেন নি বামদেবের জন্য।

বামদেব হলেন নোদার অগতির গতি। তাই এই ডোম জাতীয় কঠিন কুষ্ঠরোগগ্রস্থ অসহায় সেবক নোদাকে করুণাময় শ্রীবাম সর্বদা রক্ষা করেছেন। কোন কারণেই তাকে পরিত্যাগ করেন নি। নোদা আমৃত্যু প্রাণভরে প্রভু শ্রীবামের সেবা করে গেছে সপরিবারে। দয়াল বামদেব শুধু নোদার নয়, নোদা, নোদার মা, নোদার স্ত্রী, নোদার ছেলেদের সবার ইহকাল পরকালের সব ভার গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছায়।

আরো বিচিত্র ব্যাপার, এই নোদার মা প্রায় প্রতিদিন ঝাঁটা নিয়ে বামদেবকে তীব্র স্বরে কর্কশ গালাগালি করতো—বামদেবও রেগে গিয়ে তার উত্তর দিতেন। তারাপীঠের স্থানীয় লোক ও আগত লোকজন এই বিচিত্র বাগযুদ্ধ দেখতেন।

কিন্তু এর অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য জানতেন শুধু বামদেব ও নোদার ভক্তিমতি বুড়িমা (দ্রষ্টব্য তৃতীয় খণ্ড)।

যাহোক, বামদেবের বহু গৃহী শিষ্য ভক্তগণ চেয়েছিলেন 'নোদা'র পরিবর্তে তাঁরা বামদেবের নিত্য সেবা করবেন কিন্তু বামদেব নানা কৌশলে তাঁদের সেবা গ্রহণ না করে 'নোদা'র সেবাই পরম তৃপ্তিভরে গ্রহণ করেন। এমনকি ভৃত্য নোদার শত অপরাধও বামদেব ক্ষমা করেন হাসিমুখে।

তিন টাকা মাইনের ভৃত্য 'নোদা'র দৈনন্দিন কাজ হ'ল সকালবেলা বামদেবের আশ্রমে এসে বামদেবের বিছানাপত্র পরিস্কার করা, ঘর ঝাঁট দেয়া, বামদেবের কাপড় গামছা কাঁচা, জল আনা, কালু কুকুরের জন্য মাংস আনা, তামাক সাজা, গাঁজা সাজা, কারণ আনা ও কারণের বোতল খোলা (দাঁত দিয়ে) প্রভৃতি।

বিকেলে আবার এর সাথে নানান ফাই ফরমাস খাটা প্রভৃতিও আছে। রাতে বামদেবের শয়নের পর নোদা বাড়ী চলে যায়। কোন কোনদিন 'নোদা' সকালে আসতে দেরী করে। 'নোদা'র ওপর বিরক্ত বামদেবের একাধিক ভক্ত এই সুযোগে নোদার বিরুদ্ধে বামদেবকে নানা কথা বলেন ওকে তাড়িয়ে দেবার জন্য।

উত্তরে প্রভু শ্রীবাম বলেন, "ওর দু'টো মাগ, আসে কি করে?"

নোদার দুই স্ত্রী, তাই আসতে প্রায়ই দেরী হয়। যেহেতু নোদার দু'টি স্ত্রী তাই নোদার দেরীতে আসা কোন অপরাধ নয়। শ্রীবাম এই বিচিত্র যুক্তি দিয়ে ভৃত্য নোদাকে রক্ষা করলেন নোদার ওপর সদা বিরক্ত লোকদের হাত থেকে।

বামদেবের আশ্রমের পূর্বদিকে মহাপবিত্র জীবিতকুণ্ড। সত্যযুগে ব্রহ্মার মানসপুত্র মহামুনি বশিষ্ঠদেবের দিব্যভাব অশ্রু থেকে এই পবিত্র কুণ্ডের উৎপত্তি। যুগ যুগ ধরে এই বিশাল জীবিতকুণ্ডের মহিমা কীর্ত্তিত হয়ে আসছে। মৃত ব্যক্তিও এই কুণ্ডের জলে জীবন লাভ করেছে (দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড)। এই পরম পবিত্র কুণ্ডের জলে যুগ যুগ ধরে তারামায়ের সেবা পূজা ও নিত্য ভোগ রান্না হয়। তারাময় শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা স্বয়ং এই কুণ্ডের জলে ঘন্টার পর ঘন্টা স্নান করেন। কখনো দীর্ঘক্ষণ জলের মধ্যে ডুবে থাকেন, কখনো আঁজলা আঁজলা এই কুণ্ডের জল খান। তাছাড়া তারাপীঠে সাধনরত সাধুসন্ত ও তারাপীঠে আগত সাধকসাধিকাগণ, তারাপীঠের অধিবাসীগণ ও বামদেবের শিষ্যভক্তগণ নিত্য স্নান করেন এই পরম পবিত্র কুণ্ডের জলে।

বামদেবের ভৃত্য কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ভৃত্য নোদা এই মহাপবিত্র কুণ্ডের জলে নিয়মিত হাত পা ধোয়। একবার এই ব্যাপার নিয়ে অনেকে আপত্তি করেন। বামদেবকে এই ব্যাপারে অনুযোগ করলে বামদেব মৃদু হেসে যা বললেন তাতে তাঁরা ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বামদেব বললেন, "জীবিতকুণ্ডের জল? 'ও' তো বাবা নোদার পাদোদক।" "ছোট্ট কথা, কিন্তু কি অসীম রহস্যময় বাণী।

যে পবিত্র কুণ্ডের জলে নিত্য তারামায়ের স্নান পূজা ভোগ রান্না হয়, স্বয়ং বামদেব স্নান করেন এবং অন্যান্য সাধুভক্ত স্নান করেন সেই চিরপবিত্র জীবিতকুণ্ডের জলকে নোদার পা ধোয়া জল বলে অভিহিত করলেন বামদেব।

বামদেব এই উক্তির মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ভক্ত ভালবাসার দ্বারা ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে পুরে রাখেন কিন্তু ভগবান ভক্তকে রাখেন মাথায় করে। এই ভক্তের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবটা-ই ভগবানের কাছে সদা পবিত্র। তাই নীচজাতীয় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ নোদার আপাদমস্তক

বামদেবের কাছে চিরপবিত্র। তাই মহাপবিত্র জীবিতকুণ্ডের জলও রূপান্তরিত হয় নোদার পাদোদকে। পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসে এই অভূতপূর্ব উক্তির কোন তুলনা নেই। পার্থিব জগতের তথাকথিত সাম্যের বাণী বামদেবের এই মহাবাণীর কাছে নিতান্ত শিশু। বামদেবের এই অধ্যাত্ম সাম্য দর্শন ও বাণীকে উপলব্ধি করতে জাগতিক সাম্যদর্শনকে কত সহস্র বছর অপেক্ষা করতে হবে তা উপলব্ধি সাপেক্ষ।

বামদেবের এই অধ্যাত্ম সাম্যদর্শন মানুষকে শুধু তাঁর চরম মর্য্যাদাই দেয় না, তার সাথে পরম দেবমানবতার মর্য্যাদাও দেয়। তাই বামদেবের কাছে অতি দীন মানুষও শুধু ভগবানই নয়, ভগবানের চেয়েও বড়।

তাই তার পাদোদক স্বয়ং ভগবানও গ্রহণ করেন। বামদেবের ন্যায়, মানুষকে এতবড় মর্য্যাদা জগতে ইতিপূর্বে আর কেউ দিয়েছেন বলে জানা যায় না।

শুধু অধ্যাত্ম জগতেই নয়, পার্থিব জগতেও এর নজীর নেই। প্রভু শ্রীবামদেব যে জলে স্নান করেন, যে জল পান করেন, তাঁর প্রাণাধিক ইষ্টদেবী ত্রিলোকজননী তারামা'র নিত্য সেবাপূজা ভোগ রান্না যে পরম পবিত্র জলে হয়, যে জলে বহু সাধুসন্ত ভক্ত নিত্য স্নান করেন সেই মহাপবিত্র জলকে তাঁর ভৃত্য, অতি দীন অতি নীচজাতীয় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ 'নোদা'র পাদোদক বলে অভিহিত করতে জগতে আর কোন প্রভু পেরেছিলেন বলে জানা যায় না।

ইতিপূর্বে চৈতন্যদেব ষোড়শ শতাব্দীতে দীনদরিদ্র অস্পৃশ্য মানুষকে হরির জন অর্থাৎ 'হরিজন' বলে কোলে টেনে নিয়েছিলেন মানবতার জয়গান গেয়ে।

'নরনারায়ণ' অর্থাৎ নরই নারায়ণ রূপে অভিহিত হয়েছে ভারতের অধ্যাত্ম জগতে বার বার।

জীবই শিব। তাই শিবজ্ঞানে জীব সেবা করতে বলেছেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর প্রিয়তম শিষ্য তথা মানবতার মহান পূজারী স্বামী বিবেকানন্দকে।

কিন্তু মানুষ শুধু ভগবান নয়, ভগবানের চেয়েও বড়—এই অনির্বচনীয় তত্ত্ব শোনালেন বামদেব। আরো শেখালেন মানুষের স্থান ভগবানের মাথায়। তাই ভক্ত ও শরণাগতের পাদোদক ভগবান আনন্দে খান। এবার ভৃত্যের পাদোদক প্রভু গ্রহণ করেন।

জগতে এই তিনটি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা তাঁর অমর বাণী ও কর্মের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম স্থাপন করলেন।

ভক্ত ও ভৃত্য আসলে কি বস্তু তাও বামদেব নিগূঢ়ভাবে প্রদর্শন করলেন। পার্থিব জগতে যে ভক্ত, আধ্যাত্মিক জগতে সে প্রথমে ভগবান স্বরূপ এবং পরে ভগবানের চেয়েও বড়। তাঁর স্থান ভগবানের মস্তকে (তন্ত্রমতে মানবদেহের মস্তকে অর্থাৎ সহস্রারে ভগবান বাস করেন। সেই হিসাবে ভক্ত হলেন সহস্রারের সহস্রার)।

আর পার্থিব জগতে যে দীনহীন ভৃত্য। আধ্যাত্মিক জগতে সেই হ'ল প্রভুর প্রভু। তাই পার্থিব জগতে ভৃত্যর পাদোদক অক্লেশে প্রভু গ্রহণ করেন জেনে শুনে।

বামদেবের এই দিব্য দর্শন ও উপলব্ধি এবং বাণী পার্থিব ও অপার্থিব জগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

তাই তারাময় বামদেব যেমন বিচিত্র প্রভু তেমনি তাঁর বিচিত্র ভৃত্য হল 'নেদো'।

আসলে 'নোদা' বামলীলার এক অতি আশ্চর্য্য লীলা পরিকর। তাই নোদাকে কেন্দ্র করে বার বার বামদেব ঘটিয়েছেন আশ্চর্য্য সব লীলা। সেই সকল লীলার মধ্য দিয়ে বামদেব জগত সংসারকে দিয়েছেন গভীর জ্ঞান ও নিগূঢ় তত্ত্ব সকল। আর রেখেছেন অভূতপূর্ব সব দৃষ্টান্ত এবং বলেছেন বহু কালজয়ী অমৃতময় মহাবাণী।

বিচিত্র প্রভু শ্রীবামের বিচিত্র ভৃত্য 'নোদা'র কার্য্যকলাপও কম বিচিত্রতর নয়। 'নোদা' বামদেবের নিত্যসেবা যেমন করে তেমনি প্রয়োজন বোধে বালক স্বভাব প্রভু শ্রীবামকে বেশ ধমকও দেয়।

একবার 'নোদা'র আসতে বহু বিলম্ব হওয়ার কয়েকজন ভক্ত বামদেবকে জানালেন যে নোদাকে সরিয়ে দেয়া হোক। মাসিক তিন

টাকা দিলে অনেক ভাল ভৃত্য পাওয়া যাবে। লীলাময় বামদেবও রহস্য ভরে রাজী হলেন। দূর থেকে নোদা আসতে আসতে তা শুনতে পেল। নোদা চাকরী যাবার কথায় ভয় তো পেলই না, উল্টে সগর্বে চিৎকার করে প্রভুকে বললো, "কি হইছে গোসাই, এত চেঁচাইছ কেনে? তোমার মত কত গোঁসাই আমি এই দু'হাতে তৈরী করেছি গো।"

এই বলে সগর্বে সবার সামনে নিজের কুষ্ঠরোগপূর্ণ আটটি আঙুলহীন দু'হাত তুলে ধরলো। বিচিত্র ব্যাপার, প্রভু শ্রীবাম ভৃত্যের এই স্পর্ধার প্রতিবাদ না করে উল্টো বালকের ন্যায় ভয় পেয়ে বললেন, "আর বোলবোনি 'নোদা'। একটু তামাক দে বটে।" নোদা খুশি হয়ে তামাক সাজতে লাগলো। বামদেবের শিষ্য ভক্তগণ এই বিচিত্র ব্যাপার দেখে হতবাক হলেন।

করুণাময় বামদেব জানেন 'নোদা' মনে প্রাণে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর শরণাগত। তাই ভক্ত ও সেবক শরণাগত 'নোদা'র সকল ইচ্ছাই তিনি পূরণ করেন। তিনি ছাড়া 'নোদা'র ইচ্ছা আর কে পূর্ণ করবেন। নোদা অভাবী লোক। তাই প্রায়ই টাকা পয়সার দরকার হয়। ঘরে বৃদ্ধা মা, দুই স্ত্রী, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি তিন ছেলে। তার ওপর বাড়ীতে প্রায়ই আত্মীয় কুটুম্ব আসে। তাই মড়া পুড়িয়ে, নৌকা চালিয়ে, সাপের খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে অবসর সময়, তাতেও কুলোয় না।

তখন বাধ্য হয়ে নানান কৌশল করে বামদেবের থেকে টাকাপয়সা নেয়। সর্বজ্ঞ প্রভু বামদেব সবই জানেন তবু না জানার ভান করে দেন। অভাব কি নিষ্ঠুরতম জিনিষ তা বামদেব জানেন।

তাই নানান ভাবে নোদা ও তাঁর সমগ্র পরিবারটিকে তিনি বাঁচিয়ে রাখেন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের হাত থেকে। তাই সেবক ও শরণাগত ভক্ত 'নোদা' নির্ভয়ে থাকে। সে জানে তার চাকরী কখনো যাবেনা। তাই প্রভু বামদেবের এই নিত্যসেবা সম্পূর্ণ তাঁর অধিকার। তারাপীঠে বামদেবের কোন শিষ্য ভক্তের শক্তি নেই 'নোদা'র এই সেবার অধিকার কেড়ে নেয়।

তাই সে অকুতোভয়। চিরনির্ভীক।

তাই 'নোদা' ছাড়া বামদেবের চলেনা।

'নোদা'র সেবা প্রতিদিন পরম তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করেন।

এই সেবা করতে যখনি বামদেবের কোন শিষ্যভক্ত বা পাণ্ডা এগিয়ে আসেন তখনি বামদেব তাঁর বিশাল প্রেমময় বক্ষ দিয়ে নোদাকে আগলিয়ে রাখেন। কৌশলে তাঁদের সরিয়ে দেন।

আসলে বামদেবের নিত্য সেবার অধিকারী যে এই বীভৎস কুষ্ঠ-ব্যধিগ্রস্থ নন্দ ডোম তথা 'নোদা' তা বামদেব পরোক্ষভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'নোদা'র এই সেবার মধ্য দিয়ে কৃপাময় বামদেব 'নোদা'র জন্ম জন্মান্তরের প্রারদ্ধকর্মও ধীরে ধীরে শেষ করে দেন।

সেদিন বামদেব শিমুলতলায় বসে আছেন। বসন্তকাল, অপরাহ্নের মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। তার চারপাশে কতকগুলো মড়ার খুলি সাজানো রয়েছে। মড়ার খুলিগুলো তিনি তাঁর প্রিয় সহচর কালু ভুলু বাঘা প্রভৃতি কুকুরদের দিয়ে তাঁর হাতের সামনে আনিয়ে রেখেছেন। এর উদ্দেশ্য হল, কোন অবাঞ্ছিত লোক এই মহাপবিত্র শ্মশানে এলে তাকে এই মড়ার খুলি ছুঁড়ে তাড়াবেন বামদেব।

পূর্বে চিমটে নিয়েই তাড়া করতেন অসৎ উদ্দেশ্যে আগত লোকদের কিন্তু বর্তমানে তাঁর দেহের বয়স সত্তর বছর হয়ে গেছে। কঠিন বার্ধক্যের সাথী নিষ্ঠুর জরাভারে তাঁর স্থূল দেহ ভারাক্রান্ত। তাই উঠতে বসতে শিষ্য ভক্তদের সাহায্য নেন। দিনে রাতে নোদা যতক্ষণ উপস্থিত থাকে তখন সে একাই বামদেবকে ধরে ধরে নিয়ে যায়। উঠতে বসতে সাহায্য করে। অন্য সময় শিষ্য ভক্তগণ করেন।

বামদেব শিমুলতলায় বসে 'কারণ' পান করছেন। চারপাশে মড়ার খুলি। একটু পূর্বে একজন ভক্ত তাঁকে দর্শন করে 'কারণ' দিয়ে গেছেন। শ্রীবাম তাই পান করছেন। বামদেবের এই 'কারণ' পানও বিচিত্র। সর্বভূতে সমদর্শী তারাময় শ্রীবাম তারা জ্ঞানে নিজে কিছু খেলেন, কিছু উপস্থিত ২।৪ জন শিষ্য ভক্তকে দিলেন। কিছু তাঁর প্রিয় পার্ষদ কুকুরদের দিলেন এবং বাকিটা মড়ার খুলিগুলোর মধ্যে ঢেলে দিলেন—যেন মড়ার খুলিরাও খায়। অর্থাৎ মড়ার খুলির মধ্যেও তারামা আছেন। সর্বভুতে

তারামাকে দেখে দেখে অভ্যস্ত বামদেব এই মড়ার খুলির মধ্যেও তারামাকে বিচিত্র ভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তাই জড় মড়ার খুলিকেও প্রাণবন্ত মনে করে 'কারণ' দিলেন। পূর্ণ ব্রহ্মবিদ বামদেবের কাছে তাই জড় চৈতন্য সবই সমান।

তাই সজীব নির্জীব সবের মধ্যেই একা তারামাকে দর্শন করে জড় ও চৈতন্যের অপূর্ব সমাহার করলেন তারাময় বামদেব।

এই ভাবে 'কারণ' পান করবার পর প্রভু বামদেব তাঁর নিত্য ভৃত্য নোদাকে আদেশ দিলেন গাঁজা তৈরী করবার জন্য। কুষ্ঠরোগী নোদার গাঁজা তৈরী করা একটা দেখবার ব্যাপার। উপস্থিত সবাই তা দেখতে লাগলেন।

কুষ্ঠরোগের জন্য নোদার দু'হাতের আটটি আঙুল খসে পড়ে গেছে। বাকি আছে শুধু দু'হাতের দু'বুড়ো আঙুল। নোদা সেই দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে গাঁজার জটা থেকে প্রথমে বিঁচি ফেলে দিল। তারপর দু'পায়ের গোড়ালি দিয়ে গাঁজার কলকেটা চেপে ধরে তার ওপর দু'হাতের তালু দিয়ে গাঁজা ডলতে লাগলো। তারপর যথাসময়ে দু'বুড়ো আঙুল ও তালুর সাহায্যে গাঁজায় আগুন ধরিয়ে বামদেবকে দিল। বামদেব পরম সুখে গাঁজা টানতে লাগলেন। উপস্থিত সবাই তা দেখে স্তম্ভিত হলেন। নোদা একে কুষ্ট ব্যাধিগ্রস্থ, তাতে ডোম, তাতে ভৃত্য অথচ প্রভু বামদেব নোদার পায়ের গোড়ালির মধ্যে রাখা দুষিত স্পর্শ-যুক্ত কলকের মুখটি বামদেব পরম সুখে টানতে লাগলেন। কোন বিকার নেই। বামদেব যে সম্পূর্ণ দেহ বোধহীন তা সবাই উপলব্ধি করলেন। তবু এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখে কোন কোন শিষ্য ভক্ত প্রতিবাদ করলে বাদদেব তখনি বলেন, "আমি তো ওর পদস্পর্শ খাচ্ছি, তোরা তো শালা ওর পাদদোক খাস্।" অর্থাৎ বামদেবের শিষ্য ভক্তগণ পবিত্র জীবিত কুণ্ডের জল পান করেন। সেই কুণ্ডের জলে নোদা প্রতিদিন হাত পা ধোয়। তাই জীবিত কুণ্ড নোদার পাদোদক। সেই জীবিত কুণ্ড জল পান করলে নোদার পাদোদক খাওয়াই হ'ল।

বিচিত্র প্রভু বামদেবের এই বিচিত্রতম যুক্তির কাছে বামদেবের শিষ্যভক্ত ও পাণ্ডাগণ হার মানেন।

সুদীর্ঘকাল ধরে নোদার বিরুদ্ধে শত ষড়যন্ত্র করেও নোদাকে কেউ বামদেবের চাকরী থেকে সরাতে পারেনি। এমনকি নোদার জীবিত কুণ্ডে হাত পা ধোয়াও বন্ধ করতে পারেনি। সর্বত্র এই তিনটাকা মাইনের কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ নন্দ ডোম তথা ভৃত্য নোদা'র জয়।

যাহোক গাঁজা খাওয়া শেষ হ'ল। একটু পরে বামদেব মলমূত্রের বেগ অনুভব করলেন। এবার তাঁকে আসন থেকে তুলে ধরতে হবে এবং তারপর তাঁকে ধরে দ্বারকা নদীর তীরে নিয়ে যেতে হবে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সানন্দে তাঁকে ধরতে এলেন। বামদেব নানা ছুঁতোয় তাঁদের সরিয়ে দিলেন। তাঁদের বোঝালেন যে নোদা না থাকলে তিনি উঠতে পারবেন না। নোদাই তাঁকে তুলে ধরতে পারবে এবং ধরে নিয়ে যেতে পারবে দ্বারকা নদীর তীর পর্যন্ত এবং আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে।

বামদেবের একথা শুনে উপস্থিত সবাই ভীষণ আশ্চর্য হলেন। বামদেবের বিশাল দেহ। বসলে মনে হয় বিশমণি পাথর। এই বিশাল ভৈরব কান্তি বিরাটকায় বামদেবকে ওঠাতে কমপক্ষে ৭।৮ জন সুস্থ সবল লোকের দরকার। সেখানে কিনা নোদার ন্যায় এক কৃশকায় বেঁটে লোক বামদেবকে একাই আসন থেকে তুলবে এবং ধরে নিয়ে যাবে দ্বারকানদী পর্যন্ত আবার ফিরিয়েও নিয়ে আসবে। এই অসম্ভব ব্যাপার কখনো সম্ভব হতে পারে না। তাই উপস্থিত ভক্তগণ পুনরায় বামদেবকে অনুরোধ করলেন তাঁদের ধরতে দেবার জন্য। এটুকু সেবা তাঁরা করতে চান। কিন্তু বামদেব দৃঢ়ভাবে তাঁদের জানালেন যে 'নোদা'ই পারবে। তাছাড়া একাজ নোদাকেই করতে হবে। কারণ 'নেদো'ই তাঁর কাজ করে। তাঁর থেকে মাইনে নেয়। তামাক, গাঁজা, কারণ পায়। সুতরাং নোদার কাজ নোদাকেই করতে হবে।

ভক্তরা প্রভু বামদেবের এই বিচিত্র যুক্তি শুনে চুপ করে রইলেন। আসলে নোদাকে তিনি যে নিত্য সেবার অধিকার দিয়েছেন তা থেকে নোদাকে বঞ্চিত করতে চান না। এটা বামদেবের অন্তরের কথা। কিন্তু মুখে তিনি তাঁর বিপরীত কথা বললেন সবার সামনে। নোদা

তাঁর কাজ করে, মাইনে নেয়, তাই নোদার কাজ নোদাকেই করতে হবে। সাথে সাথে নোদার উদ্দেশ্যে তিনি ডাকাডাকি গালাগালি সরবে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে কৃশ দেহ কালো বর্ণ মধ্য বয়সী নোদা ওর হাতের লাঠিটি নিয়ে ঠক ঠক করে চলে এসেছে তাঁর প্রভু বামদেবের কাছে, বামদেবকে ধরে ওঠাবার জন্য।

সেবক ও ভক্তের ভগবান বামদেব তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে বসে আছেন। একাধারে ভৃত্য ও ভক্ত নোদা তার হাতের লাঠিটি মাটিতে রেখে বামদেবের পেছনে দাঁড়ালো। তারপর তার কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ দুই হাতের অবশিষ্ট দুই শীর্ণ বুড়ো আঙুল দিয়ে বামদেবের বিশাল দুই বাহু স্পর্শ করা মাত্র বামদেবের ভীম কান্তিদেহ সচল হ'ল। সটান তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর তিনি চলতে শুরু করলেন। আর তাঁর পেছনে পেছনে বেঁটে ও কৃশকায় নোদা বামদেবের দুই বিরাট বাহুকে ওর শীর্ণ বুড়ো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে চলতে লাগলো।

এ যেন বিশাল চলমান হিমালয় পর্বতকে স্পর্শ করে একটি অতি ক্ষুদ্র টিলা চলেছে। উপস্থিত সবাই সবিস্ময়ে এই বিচিত্র দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

এই হ'ল নোদার বামদেবকে ধরে ওঠানো এবং বামদেবকে মলমূত্র ত্যাগের জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া।

আসলে ভক্তের সেবা নেবার নাম করে কৃপাময় ভগবানই স্বয়ং ভক্তকে স্পর্শ করলেন তাঁর দিব্য ভাগবতী তনু দিয়ে। ভক্ত ভগবানের উভয়ের আনন্দ হ'ল উভয়কে স্পর্শ করে। বিচিত্র প্রভু শ্রীবাম ও বিচিত্র ভৃত্য নোদা আসলে ভগবান ও ভক্তের আনন্দময় রূপ।

ভগবান ও ভক্তের এই নিগূঢ় লীলা নিত্য দ্বন্দ্ব মধুর। মৌন মুখরতায় তা চির সমুজ্জ্বল।

উপরোক্ত কাহিনীটি শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য কৃপাধন্য সিদ্ধ মহাসাধক ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত (তেলিখানা শ্মশান, হরিপাল, হুগলী) বাংলা ১৩৮০ ২৭শে চৈত্র বুধবার লেখককে বলেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

ভাগ্যবান মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

হাওড়া জেলার ব্যাঁটরা থেকে একদিন তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন এক পিতৃভক্ত যুবক। যুবকের নাম মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। বামদেবের চরণে প্রণত হয়ে যুবক জানালেন তাঁর কাতর প্রার্থনা। তাঁর পিতার দুরাবস্থার কথা সকাতরে নিবেদন করলেন করুণাময় বামদেবের কাছে।

মন্মথনাথের পিতা প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বার্ণ কোম্পানীর এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। দীর্ঘকাল সুনামের সাথে কাজ করেছেন। সহসা অফিসের হিসাবের ব্যাপারে গোলমাল হওয়ায় তিনি মামলাতে জড়িয়ে পড়েন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর গৌরবময় কর্মজীবনের ওপর নেমে আসে অখ্যাতির কালোমেঘ।

দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় প্রসন্নবাবুর দেহমন ভেঙ্গে পড়লো। সহসা জানতে পারলেন তারাপীঠের বিখ্যাত ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপার কথা। নিবিড় আঁধারের মধ্যে তিনি যেন আলো দেখলেন। যোগ্যপুত্র মন্মথনাথকে পাঠালেন বামদেবের কাছে কৃপা লাভের জন্য। তাই মন্মথনাথ এসেছেন শ্রীবামের চরণে তাঁর পিতার মামলা থেকে মুক্তি লাভের জন্য।

কৃপাময় বামদেব সব শুনলেন। সজল নয়নে মন্মথনাথ জানালেন তাঁর নির্দোষী পিতা যেন এই কঠিন মামলা থেকে মুক্তি লাভ করে তাঁর সুনাম ফিরে পান।

সর্বজ্ঞ বামদেব দেখলেন মন্মথনাথ সত্য কথা-ই বলেছেন। তাঁর পিতা সত্যিই নির্দোষ। অচিরে কৃপা করলেন তিনি। বললেন, "তোমার পিতা মামলা থেকে শীঘ্রই রেহাই পাবে। কোন ভয় নেই।"

শ্রীবামের ঐশী শক্তি মিথ্যার মেঘ থেকে সত্যের সূর্যকে উদ্‌ভাসিত করলেন। মন্মথনাথ তারামা ও বামদেবের আশীর্বাদ লাভ করে

তারাপীঠ থেকে শান্ত চিত্তে সানন্দে বাড়ী ফিরে গেলেন। শীঘ্রই মামলা উঠলো আদালতে। মামলায় প্রসন্নকুমার নির্দোষ প্রমাণিত হ'ল। মামলা মিটে গেল। করুণাময় বামদেবের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় পিতাপুত্রের হৃদয় ভরে গেল।

আমৃতু তাঁরা শিবস্বরূপ বামদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল থাকেন।

এভাবে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে কত নির্দোষী লোককে যে করুণাময় বামদেব মিথ্যার নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছেন তার সংখ্যা নেই। যেখানে সত্য সেখানেই বামদেব। তাই সত্যই বামদেব, বামদেবই সত্য

—o—

শ্রীবামকৃপাধন্য শালখের ভক্তবৃন্দ

বসন্তকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর তারাপীঠের সুন্দর প্রকৃতি। চৈত্রের প্রথম ভাগ চলছে। গুড ফ্রাইডের ছুটি আসন্ন।

হাওড়া জেলার শালখের অধিবাসী অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র হালদার, কপিলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল ঘোষ এবং তিনকড়ি ঢোল ঠিক করলেন যে তারাপীঠের বহুখ্যাত পুরুষ মহাতান্ত্রিক মহাযোগী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দেখতে যাবেন। যথা-সময়ে গুড ফ্রাইডের ছুটিতে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপা বাবাকে দর্শন করে তাঁরা অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সর্বভূতে সমভাব, শিশুর ন্যায় সরলতা, আকাশের মত উদারতা, অপার ক্ষমাশীলতা এবং অসীম করুণা দেখে তাঁরা বিশেষ ভাবে মোহিত হ'ন।

শিমুলতলায় বশিষ্ঠের আসনে বসে আছেন বামদেব। যেন সাক্ষাত শিব শ্মশানে বসে আছেন। বালক, পিশাচ, জড় ও উন্মাদ, এই চারটি ভাব একই সাথে বামদেবের মধ্যে বিরাজ করছে। ভক্ত-দের অনুরোধে বামদেব তাঁর মধুর কন্ঠে তাঁদের শ্যামাসংগীত গেয়ে শোনাতে লাগলেন। গানের সাথে সাথে বামদেবের বিশাল নয়নদ্বয় থেকে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। এই দিব্য দৃশ্য দর্শন করে ভক্তদের নয়ন সকলও সজল হয়ে উঠলো। সহসা একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। বামদেব গান গাইছেন ভাবে বিভোর হয়ে। হঠাৎ কোথা থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ ভেসে এল উপস্থিত সবার নাকে। অসহ্য এই দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে তাঁরা বামদেবকে বললেন, “বাবা, এই ভীষণ দুর্গন্ধে টিকতে পারছিনা।”

বামদেব কিন্তু এসব গ্রাহ্য না করে গেয়েই যেতে লাগলেন। কি আশ্চর্য, সহসা সেখানে এক অপার্থিব দেবদুর্লভ সুগন্ধ ভেসে এসে সেই দুর্গন্ধকে দূর করে দিয়ে সবার দেহমন প্রাণকে স্নিগ্ধ মধুর ও আনন্দপূর্ণ করে দিল। এই পর পর আশ্চর্য্য ঘটনায় সবাই উপলব্ধি করলেন যে এসব বামদেবেরই আনন্দময় লীলা।

এরপর আরেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। রামপুরহাট থেকে এক-জন ধনবান ময়রা (খুব সম্ভবত মহেন্দ্ররুজ) এলেন সপরিবারে। তিনি তারামায়ের নিকট পূর্বসংকল্প অনুযায়ী পাঁঠা বলি দিলেন। অবিনাশবাবু বামদেবকে সবিনয়ে বললেন যে বামদেবকে ভোগ দিয়ে এই মাংস মহাপ্রসাদ উপস্থিত সবাই গ্রহণ করবেন। বামদেব সম্মত হলেন। ওদিকে বামদেবকে ভোগ দিয়ে ধনী ময়রাটি সেই মহাপ্রসাদ শুধু তিনি সপরিবারে গ্রহণ করবেন ঠিক করলেন এবং তা বামদেবকেও জানালেন। বামদেব কিছু বললেন না। যাহোক, অবিনাশ বাবুও সেই ময়রার পাঁঠাবলির মাংস সব আলাদা আলাদা করে রান্না চাপানো হ'ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ময়রার পাঁঠাবলির মাংস রান্না চলাকালীন কড়াই থেকে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত। অবিনাশ বাবুর পাঠাবলির মাংস যথারীতি রইলো। রান্না শেষে তাই বামদেবকে ভোগ দিয়ে সবাই প্রসাদ নিলেন। সেই ময়রাও সপরিবারে সেই প্রসাদ পেলেন।

বামদেব শুধু মৃদু হাসলেন। এটা যে বামদেবের এক ইঙ্গিতপূর্ণ যোগবিভূতি তা অবিনাশ বাবু এবং তাঁর বন্ধুগণ এবং উপস্থিত সবাই উপলব্ধি করতে পারলেন।

এক অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে বামদেব সেই ময়রাকে এই শিক্ষা দিলেন যে, যে ভক্ত দেবতাকে ভোগ নিবেদন করে সেই প্রসাদ সবাইকে দিয়ে তারপর নিজে গ্রহণ করেন, তিনিই সৎ এবং তাঁর দেয়া ভোগই দেবতা সানন্দে গ্রহণ করেন।

আর যে লোক দেবতাকে ভোগ দিয়ে নিজেই শুধু খেতে চান অপর কাউকে না দিয়ে সেই লোকের ভোগ দেবতা গ্রহণ করেন না। স্বার্থপরতা যেখানে, সেখানে দেবতা নেই। আত্মসুখ যেখানে, সেখানে দেবতা থাকেন না। সেই অবিদ্যার ভোগও গ্রহণ করেন না।

তাই নিঃস্বার্থপরতা যেখানে সেখানেই সার্বিক সুখ ও আনন্দ। সেই বিদ্যার ক্ষেত্রেই দেবতা ভোগ গ্রহণ করেন সানন্দে। বামদেব এই শিক্ষাই অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর একদিন বামদেবকে শিমুলতলায় নিয়ে এলেন অবিনাশবাবু। অবিনাশ বাবুর একান্ত অনুরোধে তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মের সামনে বসে বামদেব দিব্যভাবে পূজা করলেন। প্রেম ভক্তির এই সর্বশ্রেষ্ঠ পূজার পর বামদেব দু'হাতে ফুল নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর বিশাল আরক্তিম নয়নদ্বয় থেকে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ছে। মেঘমন্দ্রিত স্বরে বামদেব উদাত্ত কন্ঠে বললেন, "ওঁ তারা ওঁ তারা ওঁ তারায়ৈ বৌষট স্বাহা।"—এই মহাপবিত্র মন্ত্র বলে তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিলেন। বামদেবের নাদধ্বনি 'জয়তারা' শুনে উপস্থিত সকল ভক্তগণ আবেগে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। অবিনাশ বাবু ব্যাকুলভাবে বামদেবকে বললেন, "বাবা, নাস্তিবিনাশ, রক্ষ অবিনাশ।" পরম ব্রহ্মবিদ্ দেবমানব বামদেব বুঝতে পারলেন যে তাঁর ভক্ত অবিনাশ এই অনিত্য জীবন থেকে নিত্য শাশ্বত মহাজীবনে যাবার জন্য বর চাইছে। যে বর তাঁকে জাগতিক থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে, জড় থেকে চৈতন্যে, ক্ষণিক থেকে চিরন্তনে পৌঁছে দেবে।

কৃপাময় বামদেব ভক্ত অবিনাশ বাবুর এই প্রার্থনা পূর্ণ করলেন।

কয়েকদিন পরে পরম আনন্দে ও শান্তিতে অবিনাশবাবু ও তাঁর বন্ধুগণ তাঁরামা ও বামদেবকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে তারাপীঠ থেকে শালখে তে ফিরে এলেন মধুর স্মৃতি হৃদয়ে নিয়ে।

পরবর্তীকালে উপরোক্ত ভক্তগণ শ্রদ্ধাভক্তির সাথে বামদেবের গুণ কীর্তন করেন এবং আরো একাধিকবার তারাপীঠে যাতায়াত করে বামদেবের অফুরন্ত কৃপালাভ করেন।

—o—

শ্রীবাম করুণাধন্য বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ১৩১৫ সালের এক স্নিগ্ধ সকাল। হুগলী থেকে তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন মহাপুরুষ কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের দু'জন সুযোগ্য শিষ্য শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়।

এই শিষ্যদ্বয় একাধারে হুগলী আদালতের খ্যাতনামা উকিল ও গৃহী সাধক রূপে সুপ্রসিদ্ধ। তারাপীঠে এসে উভয়ে বামদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। কিন্তু তাঁদের প্রণামের পূর্বেই সর্বজ্ঞ বামদেব স্নিগ্ধ-স্বরে বললেন, "আমার কালীর ছেলে এসেছে।" এই 'কালীর ছেলে' নামটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বামদেব উভয়কে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন যে তাঁদের ইষ্টদেবী 'কালী' এবং গুরুর নাম 'কালীদাস' এবং এসব তিনি জানেন।

তাই 'কালীর ছেলে'র মধ্য দিয়ে তাঁরা যে মা কালীর সন্তান এবং গুরু কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তান স্বরূপ শিষ্য তা-ও বুঝিয়ে দিলেন।

যাহোক, বামদেবকে উভয়ে প্রণাম করলে কৃপাময় তাঁর চরণকমল তাঁদের মাথায় স্থাপন করতেই তাঁরা এক অতুলনীয় দিব্যভাবে ও দিব্যানন্দে বিভোর হয়ে গেলেন।

যথাসময়ে বামদেব তাঁদের শিমুলতলায় নিয়ে গিয়ে তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মের সামনে বশিষ্টের সিদ্ধাসনে বসিয়ে দিলেন।

ধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁদের ইষ্টদেবীর দর্শন করালেন।

এর পূর্বে বিষ্ণুবাবু ধ্যানে বসে নীল জ্যোতি দর্শন করতেন এবং সেই জ্যোতি তাঁর গুরু কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম জ্যোতিরূপ ভেবে তিনি প্রণাম করতেন। কিন্তু বামদেবের অপার কৃপায় তিনি মূল মূর্তিকেই দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তা ধ্যানের মাধ্যমে নিত্যস্থায়ী হয়।

শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় যদিও সুকন্ঠের অধিকারী কিন্তু ধ্যানের মাধ্যমে কিছু দেখতে না পাবার বেদনা তাঁর ছিল। কৃপাময় বামদেব তাঁর সেই অভাব মোচন করে তাকে বিষ্ণুবাবুর মতই সৌভাগ্যবান করেন।

কয়েকদিন বামদেবের দিব্যসঙ্গ ও কৃপালাভ করে তাঁরা মনের আনন্দে তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে গভীর আনন্দে হুগলীতে ফিরে গেলেন।

বামদেবকে তাঁরা সর্বদা গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। বামদেবের কৃপায় যথাসময়ে তাঁদের ইষ্টদর্শন হয়।

ভক্তপ্রবর শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে বামদেবের প্রধান শিষ্য মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা (ব্রহ্মচারী তারানাথ) এবং বামদেবের অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য জগৎক্ষ্যাপা এবং বামদেবের কৃপাধন্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যাতায়াত ছিল। শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য প্রসঙ্গে শ্রীশবাবুর গৃহ পূর্ণ হয়ে যেত।

আমৃত্যু শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় বামদেবের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্যা সন্ধ্যাজোলের ভক্তিমতী মহিলা

"যা যা পালা, আমি কি ডাক্তার বদ্যি বটে? আমি কি সন্তান তোর পেটে ভরে দেব?"—এই বলে বামদেব বীরভূমের সন্ধ্যাজোল থেকে আগত ভক্তিমতী মহিলাটিকে চিমটে দিয়ে বাড়ি মারলেন। ভদ্রমহিলা চুপ করে দাঁড়িয়ে মার খেলেন। ভদ্রমহিলার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। নিঃসন্তানা তিনি। দীঘ বিবাহিত জীবনে কোন সন্তান হয়নি। একটি সন্তানের জন্য তিনি প্রায় পাগলেব মত হয়ে গেছেন। বহু লোকের মুখে বামাক্ষ্যাপা বাবাব অলৌকিক যোগবিভূতির কথা শুনে এবং তাঁর গ্রামের আরো পাঁচ জনেব কথায় তিনি তারাপীঠে এলেন বামদেবের কৃপা লাভের জন্য।

বামদেবকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বামদেব উগ্রস্বরে উপরোক্ত কথা বলে ভদ্রমহিলাকে চিমটে দিয়ে মারলেন। ভদ্রমহিলা তখনও কিছুই বলেননি কিন্তু অন্তর্যামী বামদেব সবই বুঝতে পারলেন। ভদ্রমহিলার অন্তরে রয়েছে সন্তান কামনার তীব্রতম আর্তি।

কিন্তু শ্রীবামের লীলা বিচিত্র রহস্যময়। তাঁর অন্তরে অপার করুণা আর মুখে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভাস্রোত। তবে এরও কারণ আছে। যে ধৈর্য্য দৃঢ়ভাবে ভাবে সহ্য করতে পাববে সেই পাবে তার আকাঙ্খিত বস্তু। তার সাথে সেই লোকের পূর্ব্বজন্মার্জিত সঞ্চিত প্রারব্ধও খণ্ডন হয়ে যাবে। তাতে সেই ভাগ্যবান লোক-মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। তাই করুণাময় বামদেবের এই কঠিন কোমল লীলা। ভক্তের সার্বিক কল্যাণের জন্যই তাঁর এই কাঠিন্যের লীলা।

বামদেবের চিমটির বাড়ি খেয়ে ভদ্রমহিলা স্তব্ধ হয়ে সজল নয়নে বামদেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বামদেব তাই দেখে আরো উগ্ররূপ ধারণ করে এবার চেলা কাঠ দিয়ে ভদ্রমহিলাকে বাড়ি মারলেন। উপস্থিত শিষ্য ভক্তগণ ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। বামদেবকে চেলা কাঠ দিয়ে কোন মহিলাকে আঘাত করতে ইতিপূর্বে কেউ প্রায় দেখেন নি। ভদ্র-মহিলা পরপর আঘাত খেয়ে বামদেবের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত সবাই স্তব্ধ হয়ে এই বিরল দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

একটু পরে কৃপাময় বামদেব শান্ত স্বরে বললেন ভদ্রমহিলাকে, "বোস্।" মহিলাটি ভয়ে বসলেন। করুণাময় বামদেব তাঁর দিব্য হাত দিয়ে ভদ্রমহিলার গায়ে হাত বুলিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, "কি বলছিস্ বল্"?

বামদেবের দিব্য স্পর্শে মুহূর্তে ভদ্রমহিলার দেহের সকল জ্বালা যন্ত্রণা মিলিয়ে গেল। তিনি অভয় পেয়ে করুণ স্বরে বললেন, "বাবা, আমার সন্তান হয় না।"

কৃপাময় বামদেব তা শুনে স্নেহভরে বললেন, "কাল আসিস্, দু'টি বেল নিয়ে।" তা শুনে ভদ্রমহিলা আশ্বস্থ হয়ে বামদেবকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

পরদিন দু'টো বেল নিয়ে উপস্থিত হলেন বামদেবের কাছে। বামদেব ঐ দু'টো বেল থেকে একটি বেল নিয়ে শুঁকে ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে বললেন, শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষে দু'টি একাদশী করিস্। করলেই তোর সন্তান হবে।"

ভদ্রমহিলা বাক্‌সিদ্ধ দেবমানব বামদেবের একথা শুনে অসীম আনন্দ পেলেন। বামদেবকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করে বাড়ী ফিরে গেলেন। বামদেবের নির্দেশমত যথারীতি শ্রাবণ মাসে শুক্ল পক্ষে দু'টি একাদশী নিষ্ঠার সাথে করলেন।

যথাসময়ে তিনি পুত্র সন্তান লাভ করলেন। সন্ধ্যাজোলের এই সৌভাগ্যবতী ভদ্রমহিলাটি সন্ধ্যাজোলের স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী ও বামদেবের বিশেষ ভক্ত নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতা। ভদ্রমহিলার সেই পুত্র দীর্ঘ জীবন লাভ করে বহু সুকীর্তি অর্জন করে।

উপরোক্ত কাহিনীটি বাংলা ১৩৭৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন, একাশী বছর বয়স্কা শ্রীযুক্তা সুধামুখী দেবী লেখককে তাঁর তারাপীঠের নিজ গৃহে বসে বলেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সুধামুখী দেবীর স্বামী শচী পাণ্ডা ছিলেন বামদেবের অন্যতম সেবক ও ভক্ত। শচী পাণ্ডার গৃহে একাধিক বার বামদেব পদার্পণ করেছেন। সুধামুখীদেবী নিজের হাতে রেঁধে বামদেবকে খাইয়েছেন। যথা সময়ে সে কাহিনী বর্ণিত হবে। সংযোগের জন্য সুধামুখীর পুত্র শিশির পাণ্ডার কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবামের সেবায় সস্ত্রীক শচী পাণ্ডা

বাংলা ১৩১৩ সালের এক স্নিগ্ধ মধ্যাহ্নকাল।

"মা পদ্মময়ী খেতে দাও"—ভক্ত ও সেবক শচী পাণ্ডার বাড়ীর আঙ্গিনায় পা দিয়েই বামদেব শচী পাণ্ডার স্ত্রী সুধামুখী দেবীর উদ্দেশ্যে একথা বললেন। শচী পাণ্ডা সাদরে বামদেবকে অভ্যর্থনা করলেন। বামদেবের সাথে এসেছেন নগেন পাণ্ডা ও ভূপতি পাণ্ডা এবং বামদেবের প্রিয় কালুভুলু তিলু ও ধলু—এই চারটি কুকুর কুকুরী। নগেন পাণ্ডা ও ভূপতি পাণ্ডা বামদেবকে তাঁর আশ্রম থেকে শচীপাণ্ডার বাড়ী পর্যন্ত সযত্নে ধরে ধরে নিয়ে এসেছেন।

পূর্বে বামদেব নিজেই চলাফেরা করতে পারতেন। কিন্তু ইদানিং চলতে ফিরতে অপরের সাহায্য দরকার হয় (এই সময় বামদেবের বয়স প্রায় উনসত্তর বছর)।

শচী পাণ্ডার বাড়ীর দাওয়ায় এসে বামদেব নগেন পাণ্ডাকে বললেন, "লগেন কাকা, বসিয়ে দাও।" নগেন পাণ্ডা ধীরে ধীরে বামদেবকে

দাওয়ায় বসিয়ে দিলেন। তাঁকে সহযোগিতা করলেন তাঁর দু'ভাইপো ভূপতি পাণ্ডা ও শচী পাণ্ডা।

নগেন পাণ্ডা, ভূপতি পাণ্ডা ও শচী পাণ্ডার সম্পর্কে কাকা। নগেন পাণ্ডার পিসতুতো ভাই রামচাঁদ পাণ্ডার দুই ছেলে হলেন ভূপতি ও শচী পাণ্ডা।

বামদেব নগেন পাণ্ডাকে "লগেন কাকা" বলেন। নগেন পাণ্ডার বাবা রামেশ্বর পাণ্ডাকেও 'রামেশ্বর বাবা' বলতেন। যে নিয়মে লর্ডের ছেলে লর্ড হয় সেই নিয়মে বামদেব যাঁকে 'কাকা' বলতেন তাঁর ছেলেকেও "কাকা' বলেন। যাকে 'দাদা' বলতেন তাঁর ছেলেকেও 'দাদা' বলেন। বামদেবের এই রকম বিচিত্র সম্বোধন সর্বজন বিদিত শচী পাণ্ডা তাঁর দাদা ভূপতি পাণ্ডাকে এবং কাকা নগেন পাণ্ডাকে বামদেবের সামনে বসিয়ে অন্দর মহলে গেলেন স্ত্রী সুধামুখী দেবীকে খাবার দিতে বলবার জন্য।

তরুণী ষোড়শী সুধামুখী দেবী ইতিমধ্যে বামদেবের প্রিয় সব খাবার পরম শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে তৈরী করে রেখেছেন। বামদেবের প্রিয় খাবার হ'ল পোস্তর বড়া, পোনা মাছ ভাজা (বড় পোনা মাছকে মাঝখান দিয়ে লম্বা করে কেটে দু'ভাগ করে ভাজা), মাংস (পাঁঠার মাথা সেদ্ধ করে মাংসের মত নরম করে) এবং বর্কাল ভোগ (ক্ষীর, ময়দা, পাটালীগুড়, বাতাসা, ও কিসমিস মিশিয়ে সিন্নির মত তৈরী করা)। সুধামুখীদেবী ইতিপূর্বে একাধিক বার এই বর্কাল ভোগ তৈরী করে বামদেবের সেবার জন্য পাঠিয়েছেন বামদেবের আশ্রমে। তাঁর স্বামী শচী পাণ্ডা সযত্নে তা নিয়ে গেছেন। ষোল বছরের তরুণী বধু সুধামুখী দেবী তাঁর স্বামীর কাছ থেকেই বামদেবের এই প্রিয় খাবার সব জেনে নিয়েছেন।

যথাসময়ে সুধামুখী দেবী বামদেবের এই প্রিয় খাবার সব এবং তার সাথে দই ক্ষীর ও ছানা এবং অন্যান্য খাবার সব সযত্নে একটি বড় থালায় ও নানান বাটিতে করে বেড়ে দিলেন। তারপর থালাটি তাঁর স্বামী শচী পাণ্ডার হাতে দিলেন। শচী পাণ্ডা সেই খাবার থালা নিয়ে এসে বামদেবের সামনে রাখলেন।

ভূপতি পাণ্ডা সযত্নে বামদেবকে খাইয়ে দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে শিশুর মত বামদেব বলছেন, "খাবোনা।" ভূপতি পাণ্ডা আদর করে বলছেন, "খাও বাবা"। এই বলে পুনরায় বামদেবকে খাইয়ে দিতে লাগলেন।

উপস্থিত সবাই পরম আনন্দে দেখতে লাগলেন ভক্ত ও ভগবানের এই মধুর রূপ।

ষোল বছরের তরুণী বধূ সুধামুখীদেবী পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ও আনন্দের সাথে দেখতে লাগলেন তাঁর হাতের রান্না বামদেব সানন্দে গ্রহণ করছেন।

তাঁর ভাসুর ভূপতি পাণ্ডা ধীরে ধীরে বামদেবকে খাইয়ে দিচ্ছেন। বামদেবের আশে পাশে বসে এই খাওয়া দেখছে কালু ভুলু তিলু (তৈলকা) ও ধলু (শ্বেতফুলী)। এবার ওরাও খেতে শুরু করলো। ওদের খাবার ইতিমধ্যে দেয়া হয়েছে কিন্তু বামদেব যতক্ষণ না খাচ্ছেন ততক্ষণ এই কুকুর কুকুরীও খাবেনা। আশ্চর্য সংযম ওদের। বামদেব খাওয়া শুরু করবার পর এবার ওরাও শুরু করলো ; বামদেব একটু একটু করে খাচ্ছেন। সুধামুখীদেবী প্রাণ ভরে এই বিরাট মহাপুরুষকে দেখছেন। বহু অলৌকিক লীলা ও বহু কিম্বদন্তীর প্রবাদ-পুরুষ, অসীম শক্তিধর, ক্ষমাসুন্দর, ভারতবিখ্যাত মহাতান্ত্রিক ও মহাযোগী, তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব, তারামায়ের অভেদ স্বরূপ, শিবাবতার বামাক্ষ্যাপাবাবা তাঁর সামনে বসে আছেন। এ যে কত বড় মহা-সৌভাগ্য তা সুধামুখীদেবী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন।

বামদেব বসে আছেন। ভূপতি পাণ্ডা ধীরে ধীরে এক একটি খাবার থালা থেকে তুলে বামদেবের মুখে দিচ্ছেন। বামদেব তা খাচ্ছেন।

বামদেব বসে আছেন যেন সাক্ষাত শিব। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, বিশাল ভুড়ি। শ্যামবর্ণ। আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাট, বিশাল তেজদৃপ্ত নয়ন আর শিশুর মত নগ্ন (তাঁর পুরুষাঙ্গটি ছোট্ট শিশুর মত ক্ষুদ্র। প্রায় দেখাই যায় না)। গলায় রুদ্রাক্ষের ও স্ফটিকের দুটি বৃহৎ মালা বিরাজমান। পাশে ত্রিশূল ও চিমটে শোভা পাচ্ছে।

বামদেব যখন চলাফেরা করেন তখন তাঁর ডান হাতে ত্রিশূল ও বাম হাতে চিমটে থাকে। বামদেবের এই অপূর্ব দিব্যমূর্তি দেখে সুধামুখী দেবীর মনে হ'ল যেন কৈলাস থেকে সাক্ষাত শিব নেমে এসেছেন।

যথা সময় বামদেবের খাওয়া শেষ হ'ল। তাঁর নিত্য সহচর কুকুররা-ও খাওয়া শেষ করলো। বামদেবের সন্তানতুল্য এই সারমেয়দের এক বিচিত্র ব্যবহার হ'ল যে এরা বামদেবের খাওয়া শেষ হলে পর তাঁর গাল চাটতে থাকে পরম আনন্দে।

বিকারহীন পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বামদেব সস্নেহে এদের এই আদর গ্রহণ করেন। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন ছোট্ট শিশু খাওয়া শেষে তার বাবাকে আদর করছে।

খাওয়া শেষ করে বামদেব উঠলেন দাওয়া থেকে! যথারীতি নগেন পাণ্ডা ও ভূপতি পাণ্ডা বামদেবকে ধরে ওঠালেন আসন থেকে।

"খুব ভাল খেলাম, মা পদ্মময়ী"—বামদেব সুধামুখী দেবীর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেন। করুণাময় বামদেবের এই কথায় তরুণী সুধামুখী দেবীর প্রাণ মন আনন্দে তৃপ্তিতে পূর্ণ হল।

তারপর বামাদেব শচী পাণ্ডার বাড়ী থেকে নগেন পাণ্ডা ও ভূপতি পাণ্ডা এবং কালু ভুলু তিলু ধলু সহ তাঁর নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন।

তারাময় বামদেবের মহাপবিত্র পদরজে ভক্ত ও সেবক শচী পাণ্ডার গৃহ পবিত্র হ'ল। কৃপাময় বামদেব পরবর্তীকালে আরো একাধিকবার শচী পাণ্ডার গৃহে এসে সস্ত্রীক শচী পাণ্ডার সেবা গ্রহণ করে তাঁদের ধন্য করেছেন।

এই মহাসৌভাগ্যবতী সুধামুখী দেবীর জন্ম বাংলা ১২৯৭ সালে। ১৩১১ সালে চৌদ্দ বছর বয়সে শচী পাণ্ডার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ১৩১১ সাল থেকে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর তিনি বামদেবকে দেখেন। একাধিকবার বামদেবকে রান্না করে খাইয়ে অশেষ তৃপ্তি লাভ করেছেন।

বাংলা ১৩৭৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন একাশী বছর বয়স্কা সুধামুখী দেবী তারাপীঠে তার স্বামীগৃহে বসে উপরোক্ত কাহিনী

অশেষ আনন্দের সাথে লেখককে বলেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি বামদেবের আরো একাধিক লীলা কাহিনী লেখককে বলেছেন। তা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সংযোগের জন্য লেখক সুধামুখী দেবীর সুযোগ্য পুত্র শিশির পাণ্ডার কাছে কৃতজ্ঞ।

—o—

মুণ্ডমালিনী তলায় লীলাময় শ্রীবাম

তারাপীঠ মহাশ্মশানের প্রাণকেন্দ্র শিমুলতলায় তারামার শ্রীপাদপদ্মের সামনে বসে আছেন বামদেব। এই সময় বামদেবের অন্যতম সেবক পাণ্ডা শচী পাণ্ডার স্ত্রী সুধামুখী দেবী ও আরো চারপাঁচ জন পাণ্ডার পরিবার তারামার পাদপদ্মে এলেন প্রণাম করতে। এসে দেখেন, বামদেব বসে আছেন শান্ত সমাহিত চিত্তে। তাঁর আশে পাশে কয়েকজন শিষ্যভক্তও বসে আছেন। তাছাড়া ললিত গোঁসাইও বসে আছেন। পরবর্তীকালে ক্রিয়াবান ললিত গোঁসাই শচী পাণ্ডা ও তাঁর স্ত্রী সুধামুখী-দেবীকে দীক্ষাদান করেন।

যাহোক, তরুণী সুধামুখী দেবী ও অন্যান্য মহিলাগণ তারামা'র শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম ও পূজো করলেন। তারপর বামদেবকেও প্রণাম করলেন। দেহবোধহীন বামদেব একটি মড়ার খুলিতে 'কারণ' পান করছেন।

সুধামুখী দেবীর মনে হ'ল যে বামদেব যেন অন্তরঙ্গে তারামাকেই পূজো করছেন। বহিরঙ্গ জপতপ আহ্নিক প্রভৃতি বৈধীপূজা বামদেব করেন না। তাঁর পূজা হ'ল পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গের পূজা। এই অন্তরঙ্গের

পূজাই হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। সর্বদা ব্রহ্মময়ী তারামা'র ধ্যানে তন্ময় থেকে, তারামা'র ভাবে ভাবিত হয়ে। তাঁরই স্মরণে মননে একাত্ম হয়ে থাকাই হ'ল অন্তরঙ্গের পূজা। এই ভাবমুখে শ্রীবাম সর্বদা রয়েছেন। তাই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তারামা'র সাথে বামদেবের সম্পর্ক হ'ল পেটের ছেলের মত। তারাময় বামদেবের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে।

এমনকি বামদেবের প্রাত্যহিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ মলত্যাগের ব্যাপারেও বামদেব তারামা ছাড়া কিছু জানেন না। যেদিন বামদেবের মলত্যাগ পরিস্কার হ'ল সেদিন খুশি হয়ে বামদেব নগেন পাণ্ডাকে বলেন, "লগেন কাকা, তারামা আজ আমায় ক্ষীরসা মাখন দিয়েছেন।"

আর যেদিন তা হয় না অর্থাৎ কোষ্ঠ পরিস্কার ঠিক মত হয় না, সেদিন বলেন, "তারামা আজ কুঁচলে বড়ি দিয়েছেন।"

বামদেবের ন্যায় এমন ভাবে দেহে মনে প্রাণে আত্মায় স্মরণে মননে ধ্যানে চিন্তায় কর্মে বাক্যে সর্বতোভাবে সর্বক্ষণ সম্পূর্ণভাবে নিজ ইষ্টের সাথে মিশে যেতে ও মিশে থাকতে আর কোন দেবমানবকে দেখা যায় না। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এ এক অনন্য নজীর।

যাহোক, সুধামুখী দেবী ও অন্যান্য মহিলাগণ বামদেবকে প্রণাম করে বাড়ী চলে গেলেন। আজ অষ্টমী তিথি। তারা মন্দিরে বলি হবে।

শনিবার, মঙ্গলবার, অষ্টমী, সংক্রান্তী প্রভৃতি পর্বদিনে পাঁঠা বলি হয়। মাসে ১৫ টা বলি হয়।

সেই অনুসারে আজ অষ্টমীর রাতে পাঁঠা বলির পর মার ভোগ হ'ল। দশ সের চালের অন্ন, আড়াইসের ময়দার লুচি ও দুধের পায়েস ভোগ হ'ল।

বলির দিনে বামদেবের আশ্রমেও মা'র ভোগ হয় সাড়ম্বরে। বলির দিনে তিনটে মালসা ভোগ তৈরী হয়। প্রথমটি মাংসের, দ্বিতীয়টি পায়েসের, তৃতীয়টি তরকারীর।

আজ অষ্টমীর রাতে যথারীতি এই তিনটি মালসা ভোগ তৈরী হ'ল। বামদেব মালসা ভর্তি করে সব স্বয়ং মাথায় করে নিয়ে

চললেন মুণ্ডমালাতলা তথা মুণ্ডমালিনীতলায় তারামাকে ভোগ দিতে। এই মুণ্ডমালিনীতলা তারা মন্দিরের উত্তরে অদূরে অবস্থিত। মূল তারাপীঠ মহাশ্মশানের অংশ। তারাপীঠের বিশাল মহাশ্মশানের অঙ্গ হিসাবে সুপ্রাচীনকাল থেকে সুচিহ্নিত (পরবর্তীকালে সাঁইথিয়া রোড নির্মিত হওয়ায় এই মহাশ্মশান তারাপীঠের মূল মহাশ্মশান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে)। মূলত তারাপীঠ মহাশ্মশানের উত্তরাংশ এই মুণ্ডমালিনীতলা। এখানেও বহুকাল ধরে বহু সাধক সাধিকা তপস্যা করে ইষ্ট দর্শন করে আপ্তকাম হ'ন। তাঁদের অনেকের সমাধি মন্দির এই মহাশ্মশানে রয়েছে।

বামদেবের অশেষ প্রিয়স্থান এই ছায়াঘন পবিত্র মনোরম নির্জন মহাশ্মশানটি। প্রায়ই তিনি আপন মনে এই জাগ্রত মহাশ্মশানে চলে আসেন। তারামায়ের দিব্যলীলা সুপ্রাচীনকাল ধরে এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

'মুণ্ডামালাতলা' নামের পেছনেও রয়েছে সত্য যুগে অনুষ্ঠিত মহামুনি বশিষ্ঠদেবকে কেন্দ্র করে তারামা'র এক করুণাঘন লীলা। ব্রহ্মার মানসপুত্র মহামুনি বশিষ্ঠদেব মহাবিদ্যা তারা বিদ্যায় সিদ্ধি করবার জন্য সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেও সফল হলেন না। কামাখ্যা, নীলাচল প্রভৃতি স্থানে তপস্যা করবার পর অবশেষে তারামা'র দৈববাণী অনুসারে মহাচীনে এলেন বুদ্ধরূপী শ্রীবিষ্ণু জনার্দনের কাছে। তিনি বশিষ্ঠদেবকে নির্দেশ দিলেন বক্রেশ্বরের ঈশান কোণে পবিত্র দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে তারাপীঠ মহাশমশানে তপস্যা করতে চীনাচারে।

বশিষ্ঠদেব তারাপীঠ মহাশ্মশানে এলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তারাসাধনা করে ব্যর্থ হবার জন্য বশিষ্ঠদেবের মনে সংশয় দেখা দিল যে এই মহাশ্মশানেই উগ্রতারা দেবী যথার্থ বিরাজ করছেন কিনা। সাধক বশিষ্ঠদেবেব এই সন্দেহ বুঝতে পেরে ত্রিলোক জননী তারামা একদিন পবিত্র দ্বারকা নদীতে স্নান করলেন। স্নান করবার পূর্বে তারামা তাঁর মুণ্ড মালাটি খুলে রাখলেন দ্বারকা নদীর তীরে। তারপর স্নান করে তারামা অদৃশ্য হলেন। একটু পরে বশিষ্ঠদেব সেই মুণ্ডমালা দেখে উপলব্ধি করলেন তাঁর ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ী উগ্রতারা-

দেবী এখানে সর্বক্ষণ বিরাজমানা। তখন বশিষ্ঠদেবের সকল সন্দেহ দূর হ'ল।

তিনি মনের আনন্দে তারামা যেখানে তাঁর পরম পবিত্র দিব্য মুণ্ডমালাটি খুলে রেখেছেন সেখানেই তপস্যা শুরু করলেন। কিন্তু সহসা মহাদেব দৈববাণীর মাধ্যমে বশিষ্ঠদেবকে নির্দেশ দিলেন যে তারাপীঠ মহাশ্মশানের এই উত্তরাংশে তপস্যা না করে দক্ষিণাংশে মহাপবিত্র শিমুল বৃক্ষের নীচে তারামা'র ব্রহ্মশিলায় তপস্যা করতে। বশিষ্ঠদেব সেই নির্দেশ অনুসারে তপস্যা করে তারামা'র দর্শন লাভ করলেন।

বশিষ্ঠদেব যে স্থানে মুণ্ডমালা পেয়েছিলেন, সেই সমগ্র স্থানের নাম কালক্রমে 'মুণ্ডমালাতলা' নামে সুচিহ্নিত হয়। যে ঘাটে মুণ্ডমালাটি পেয়েছিলেন সেই ঘাটের নাম 'সতীমায়ের ঘাট'।

বামদেব বহুবার এই সদাজাগ্রত তারাপীঠ মহাশ্মশানের উত্তরাংশ মুণ্ডমালাতলায় এসে তারামাকে পূজা করেছেন, ভোগ নিবেদন করেছেন। উদয়পুর কালীবাড়ী যাবার পথে বহুবার মুণ্ডমালাতলা মহাশ্মশান দিয়ে যাতয়াত করেছেন। সরলপুর যাবার পথে ও রামপুরহাট যাবার পথে বহুবার এসেছেন মুণ্ডমালাতলায়। তাঁর একাধিক শিষ্যবৃন্দকে এবং তাঁর শরণাগত সাধক সাধিকাদের এই মুণ্ডমালাতলা মহশ্মশানে তপস্যা করতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা অনেকেই এখানে তারামায়ের দর্শন ও কৃপা লাভ করেছেন। এই পবিত্র মুণ্ডমালাতলায় বহু উন্নত সাধক-সাধিকা বহুকাল ধরে তপস্যা করেছেন। যথাস্থানে সেসব বিবরণ (পঞ্চম খণ্ডে) দেয়া হবে।

কখনো তারাপীঠ থেকে দ্বারকানদী দিয়ে পদ্মাসনে আশ্চর্য ভাবে জলের ওপর বসে ভাসতে ভাসতে মুণ্ডমালাতলায় এসে তারামাকে পূজো করে আবার উদয়পুর কালীবাড়ী গেছেন ভাসতে ভাসতে। সেখানে সদাজাগ্রতা মা কালীকে পূজা করে আবার একই ভাবে ভাসতে ভাসতে তারাপীঠে ফিরে এসেছেন।

মুণ্ডমালাতলা সম্পর্কে একটি প্রচলিত কিম্বদন্তী আছে। তাহ'ল, প্রায়ই গভীর রাতে তারামা 'রণ'-এ (লীলা অভিসারে) বের হ'ন।

তারামন্দির থেকে বের হয়ে তারামা মুণ্ডমালাতলা দিয়ে উদয়পুরের বিখ্যাত কালীমন্দিরে যান। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে পুনরায় শেষ রাতে তারাপীঠে ফিরে আসেন।

একবার তারামা তাঁর মুণ্ডমালা মণ্ডিত হার খুলে রেখে মুণ্ডমালাতলার একটি ছোট্ট পুকুরে স্নান করেন। তারপর সেই হার সেখানে রেখেই উদয়পুরে চলে যান। এক মহাভাগ্যবান সাধক এই সুদুর্লভ হার দর্শন করে তাঁর মানব জীবন সার্থক করেন।

সেই পবিত্র ছোট্ট পুকুরটি আজো সেই দিব্য স্মৃতি বুকে নিয়ে অবস্থান করছে। তাই এই পবিত্র সাধন ক্ষেত্র মুণ্ডমালাতলা সুপ্রাচীন তারাপীঠ মহাশ্মশানের অম্লান স্মৃতি ও সম্পদ-স্বরূপ।

মুণ্ডমালিনী তারামা'র লীলাস্থল বলে এই দিব্য স্থান 'মুণ্ডমালিনীতলা' নামেও অভিহিত হয়। তপোবন সদৃশ এই ছায়াঘন শান্ত নিস্তব্ধ মনোরম সাধন ক্ষেত্রটি বামদেবের একান্ত প্রিয় স্থান।

অনেক সময় তারাপীঠের জনকোলাহল থেকে কিছুক্ষণ এই শান্ত নির্জন স্থানে থাকবার জন্য বামদেব চলে আসেন নিভৃতে।

যাহোক, গভীর রাতে সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে বামদেব মালসা মাথায় নিয়ে এলেন মুণ্ডমালিনীতলায়। সাথে দু'একজন শিষ্যভক্ত।

তারামাকে পরম আনন্দে সেই ভোগ নিবেদন করলেন। তারামায়ের অশরীরী 'গণ' ও প্রমথ গণও বাদ গেল না। তারপর মনের আনন্দে নিজের আশ্রমে বামদেব শিষ্য ভক্তসহ ফিরে গেলেন।

উপরোক্ত কাহিনীটি শচী পাণ্ডার স্ত্রী সুধামুখী দেবী ১৩৭৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন লেখককে বলেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

— ঃ—

শ্রীবাম স্নেহধন্য অবিনাশ চৌধুরী

বামমণ্ডলের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা রূপে অবিনাশ চৌধুরী সুচিহ্নিত। তিনি দীর্ঘকাল ধরে বামদেবের দুর্লভ সঙ্গ লাভ করে ধন্য হল। বামলীলার অন্যতম লীলাপরিকর রূপেও তিনি সুপরিচিত।

অবিনাশ বাবু বামদেবের অন্যতম সেবক রূপেও সুচিহ্নিত। একজন সুকবি রূপেও তিনি পরিচিত।

বামদেবের জীবন কাহিনী তিনি সংক্ষেপে পদ্যছন্দে ১২/১৪ পৃষ্ঠায় রচনা করেন। যদিও বামদেবের বিশাল জীবনলীলার এক সামান্যতম অংশ তিনি মাত্র ১২/১৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন পদ্যের আকারে তবু বামদেবের এই বিশিষ্ট ভক্ত সেবক ও কবি অবিনাশ চৌধুরীকে বামদেবের স্থূলদেহে থাকাকালীন প্রথম জীবনীকার রূপে অভিহিত করা যায়। যদিও অবিনাশ চৌধুরী বামদেবের সার্থক জীবনীকার নন তবু তাঁর এই প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য।

পরবর্তীকালে বামদেবের জীবনী রচনা করেছেন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক মহিমাচরণ, নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা (ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপির আকারে), যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত, যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা (এঁরা সকলেই বামদেবের সঙ্গধন্য) এবং সুশীলকুমার বন্দোপাধ্যায়, শঙ্করনাথ রায় প্রভৃতিগণ।

এঁদের মধ্যে বামদেবের জীবনলীলা কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিখতে ব্রতী হয়েছিলেন শাস্ত্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ('বামলীলা একখণ্ডে সমাপ্ত) ও সুশীলকুমার বন্দোপাধ্যায় 'তারাপীঠ ভৈরব' একখণ্ডে সমাপ্ত) এছাড়া বামদেবের বিশিষ্ট শিষ্য পরমহংস নিগমানন্দ সরস্বতী এবং বামদেবের দিব্য সঙ্গধন্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় বামদেবের দীব্যলীলা ও বাণী সম্পর্কে এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সারগর্ভ তথ্য

পরিবেশন করেছেন মনোজ্ঞ ভাষায় (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার জীবনী ও জীবন বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা দ্রষ্টব্য)।

যাহোক, অবিনাশ চৌধুরী বামদেবের জীবনী ১২/১৪ পৃষ্ঠায় পদ্য আকারে লিখেছেন, যা মূলত অসম্পূর্ণ ও অসফল চেষ্টা মাত্র। তবু বামদেবের স্থূলদেহে থাকাকালীন অবিনাশ চৌধুরীর এই আন্তরিক প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য এবং বামদেবের প্রথম জীবনীকার রূপে অবিনাশ চৌধুরীর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলা ১৩১৫ সালের ১০ই পৌষ শুক্রবার সকাল বেলা অবিনাশ চৌধুরীর সাথে বামদেবের অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাত হয় দ্বারকা নদীতে স্নান করতে গিয়ে। এই আন্তরিক আলাপ উভয়ের মধ্যে নিবিড় হয়। শ্রীবামভক্ত ও সুকবি অবিনাশ চৌধুরী শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর উপরোক্ত বাম-দেবের ক্ষুদ্র জীবনীটি (পাণ্ডুলিপির আকারে) দেন।

পরবর্তীকালে শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বামলীলা গ্রন্থে সকৃতজ্ঞ চিত্তে অবিনাশ চৌধুরীর এই লেখার কথা উল্লেখ করেছেন।

অবিনাশ চৌধুরী প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বামদেবের বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে বামদেবের শিষ্য ভক্তদের মধ্যে চারজনের নাম 'অবিনাশ' দেখতে পাওয়া যায় তারা হলেন,—

১। অবিনাশ চন্দ্র রায় (মুন্সেফ, বারিপাদা, ময়ূরভঞ্জ)

২। অবিনাশ চট্টোপাধ্যায় (মাশুল গ্রাম, মুর্শিদাবাদ)

৩। অবিনাশ চৌধুরী (বীরভূম)

৪। অবিনাশ ঘোষ (শালখে, হাওড়া)।

উপরোক্ত প্রথম দু'জন বামদেবের শিষ্য রূপে সুপরিচিত। পরবর্তী দু'জন বামদেবের ভক্ত রূপে পরিচিত। বামদেবের ভক্ত সেবক ও প্রথম জীবনীকার কবি অবিনাশ চৌধুরী বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন বলে জানা। আমৃত্যু তিনি বামদেবের নামগানে মুখরিত ছিলেন।

—ঃ—

ভক্তপ্রবর জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য

বামদেব বসে আছেন তাঁর আশ্রমে। সামনে বসে আছে কয়েক-জন শিষ্য ভক্ত। এই সময় কলকাতার খিদিরপুর নিবাসী শ্রীজানকী-নাথ ভট্টাচার্য্য তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন।

ধর্মপ্রাণ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য লুটিয়ে পড়লেন বামদেবের চরণ কমলে। কিছুকাল বামদেবের দিব্য সঙ্গ লাভ করবার বাসনা তাঁর। অন্তর্যামী বামদেব বুঝতে পারলেন ভক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যের মনের বাসনা।

অচিরে কৃপা করলেন। দিলেন তাঁর চরণাশ্রয়। কিছুদিন বামদেবের সঙ্গলাভ করে ও তাঁর সেবা করে তিনি তাঁর প্রাণের বাসনা পূর্ণ করলেন। যথাসময়ে বামদেব এই শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভক্তকে কৃপা করে দীক্ষাদান করলেন।

বামদেবের নির্দেশে তিনি সংসার জীবনে ফিরে গিয়ে সাধন পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। কর্মজীবনে জানকীনাথ বাবু সরকারী কাজ করেন। অবসর সময় জপ ধ্যানে অতিবাহিত করতে লাগলেন।

যথাসময়ে অবসর গ্রহণ করলেন। তারপর ইষ্টদেবী তারামাকে দর্শন করবার জন্য ও শ্রীগুরু বামদেবের চরণ ও দিব্যসঙ্গ লাভের জন্য প্রায়ই তারাপীঠে যাতায়াত করতে লাগলেন।

এই কৃষকায় প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বহিরঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশে না থাকলেও অন্তরঙ্গ নিজের মনকে বৈরাগ্যের আনন্দময় প্রতীক গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে নিলেন।

১৩১৬ সালে বর্ষাকালে একবার তিনি তারাপীঠে যাচ্ছেন। তখন বামদেবের কৃপাধন্য তিন ভাগ্যবান ভক্তের সাথে তাঁর ট্রেনে সাক্ষাত হয়। পরে এই তিন ভক্ত বামদেবের কৃপায় দীক্ষালাভ করে জীবন সার্থক করেন।

জানকীনাথ সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করতে থাকেন। প্রায় সর্বদা তারানামে তারাধ্যানে ও শ্রীগুরু বামের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন।

অবশেষে এক শুভ অমৃতযোগে এই দিব্য ভাব অবস্থায় তিনি সমাধি লাভ করে নিজ ইষ্ট ও গুরুর কোলে চলে গেলেন।

একদা যে শুদ্ধ বাসনা নিয়ে জানকীনাথ ভট্টাচার্য এসেছিলেন বামদেবের কাছে—সেই শুদ্ধ বাসনা তথা বামদেবের সঙ্গলাভের বাসনা তারামা ও বামদেব তাঁকে চিরতরে পূর্ণ করে দিলেন। বামদেবের চির-সঙ্গী হলেন মহাভাগ্যবান শিষ্য জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য।

সৎ চিন্তা, সৎ বাসনা ও সৎকর্মের সুফল সর্বদাই ব্রহ্মময়ী তারামা ও শিবাবতার বামদেব দেন। সৎ-ই ব্রহ্ম, সৎ-ই নিত্য। তাই ব্রহ্মময়ী তারামায়ের নিত্য লীলা নিকেতন মহাপীঠ তারাপীঠ পরম ব্রহ্মক্ষেত্র রূপে পরম আনন্দময় কল্পতরু রূপে যুগ যুগ ধরে সকল সাধক ও ভক্তের পবিত্র আধারে চিরচিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

—o—

শ্রীবামানুজ রামচন্দ্রের দেহত্যাগ

বাংলা ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাস। আসন্ন দুর্গাপূজা ও তারাপূজার আনন্দময় প্রস্তুতি চলছে তারাপীঠ তথা বীরভূমে।

আগমনীর এই আনন্দের মাঝে নিরানন্দের এক বিচ্ছেদ সুর আটলা গ্রামে বামানুজ রামচন্দ্রের গৃহে বেজে উঠলো।

সাতান্ন বছর বয়স্ক রামচন্দ্রের দেহ সাধারণত সুস্থ সবল। একাধারে সাধক ও গায়ক রামচন্দ্র মূলত অনাসক্ত পুরুষ। সংসারের

অভাব। দায় দায়িত্ব প্রভৃতি সব থাকলেও রামচন্দ্র শান্তভাবে তাঁর কর্তব্য পালন করে যান।

চার কন্যার জনক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জ্যেষ্ঠ কন্যা সর্বমঙ্গলা ও দ্বিতীয়া কন্যা শুভঙ্করীর বিয়ে দিয়েছেন। বাকি দুই কন্যা রয়েছে। তৃতীয়া কন্যা অন্নপূর্ণার বয়স প্রায় ছয় বছর। চতুর্থ কন্যা শিবসুন্দরীর বয়স বছর দুয়েক মাত্র।

রামচন্দ্রের পত্নী ইন্দুমতীদেবী সাধ্যমত সংসারকে সুশৃংখল ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অভাবের মধ্যেও যে মাধুর্য্য আছে তা ইন্দুমতীদেবীর সংসারে প্রত্যক্ষ করা যায়। পবিত্র ও নিঃস্বার্থ প্রেম ভালবাসা ও সেবার মাধুর্য্য ধারা দিয়ে তিনি সংসারে অভাবের সর্বগ্রাসী লেলিহান অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করে দিয়েছেন আদর্শ গৃহিনী রূপে।

তাই শিল্পী ও সাধক রামচন্দ্রের শান্তির সংসারে অভাব আছে অশান্তি নেই। বরং প্রেম প্রীতি ভালবাসার স্নিগ্ধ লাবণ্য ও মাধুর্য্য রামচন্দ্রের গৃহে বিরাজমান।

এক প্রসন্ন লক্ষ্মী শ্রীরামচন্দ্রে ঘর আলো করে রেখেছে।

কিন্তু সংসারে সুখ শান্তি বর্ষার মেঘের মতই ক্ষণস্থায়ী। সাতান্ন বছর বয়স্ক সুস্থ সবল রামচন্দ্রের সংসারে নেমে এল সহসা নিয়তির অমোঘ আহ্বান।

হঠাৎ আশ্বিনের শুরুতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সামান্য অসুস্থতা, রামচন্দ্র গ্রাহ্য করলেন না। কয়েকদিনের মধ্যে তা গুরুতর আকার ধারণ করলো। তবু রামচন্দ্র তাঁর অগ্রজকে এই সংবাদ জানিয়ে বিব্রত করতে চাইলেন না।

কিন্তু রামচন্দ্র না জানালেও অগ্রজ বামদেব সবই জানতে পারলেন। তিনি দেখতে পেলেন তারামায়ের ডাক এসে গেছে রামচন্দ্রের। তারামায়ের কৃপায় এ ভালই হ'ল। দেহ ধারণের নিত্য যন্ত্রণা, অভাবজনিত দুশ্চিন্তা, কন্যাদের বিবাহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা, সংসারের নিত্য দায়িত্ব, রোগ, শোক, দুর্ভাবনা, সামাজিকতা প্রভৃতি সব থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে জগত জননীর কোলে চির আনন্দে চির শান্তিতে থাকা,—সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শিবাবতার বামদেবের কাছে দেহধারণ ও দেহ ত্যাগ আসা যাওয়া মাত্র। তারামায়ের কোল থেকে আসা আবার তারামায়ের কোলে ফিরে যাওয়া। ব্রহ্মবিদ্ বামদেবের কাছে আত্মাই ব্রহ্ম। তাই জগতে প্রতিটি আত্মাই অবিনাশী, অক্ষয়, অনন্ত, অমর।

আত্মা কর্মবশে দেহে আসে, দেহে থাকে এবং কর্মশেষে দেহত্যাগ করে কর্মফল অনুসারে গতি প্রাপ্ত হয়।

তাই বামদেবের কাছে মৃত্যুবলে কিছু নেই। মৃত্যু মানে শেষ— তা নেই। মৃত্যু আত্মার স্থান পরিবর্তন করতে আত্মাকে সাহায্য করে মাত্র। সে আত্মার চিরন্তন সাহায্যকারী বন্ধু। তাই বামদেবের কাছে জনম মরণ তারামায়ের দু'টি চরণ।

তাই বামদেব মৃত্যু সম্পর্কে চির উদাসীন। চির দেহ বোধহীন ব্রহ্মময় তারাময় বামদেব চিরদিন অমর আত্মাকেই দেখেন, দেহকে দেখেন না।

তাই তিনি মানস নয়নে দেখলেন যে তারামা এবার তাঁর স্নেহের অনুজ রাজচন্দ্রকে সংসারের সকল চিন্তা ভাবনা জ্বালা যন্ত্রনা দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিজের চির শান্তির কোলে কৃপা করে তুলে নিচ্ছেন। বামদেব খুশিই হলেন। তাঁর থেকে তের বছরের ছোট রামচন্দ্র সংসার জীবনে ছোট বেলা থেকে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছে। তাঁর সাথে একত্রে কৃষ্ণযাত্রা করেছে। অভাবের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও বড় হয়ে সাধ্যমত মাতৃসেবা করেছে, সংসারে সুখ শান্তি এনেছে। মাতৃশ্রাদ্ধের গুরুদায়িত্ব বহন করেছে সমাজের প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে। সংসার ধর্ম পালন করেছে। এতদিনে তারামা'র কৃপায় সে মুক্ত হচ্ছে। চিরশান্তির কোলে চলে যাচ্ছে। বামদেব শুধু তারামাকে জানালেন যে রামচন্দ্র যেন বেশী দৈহিক কষ্ট ভোগ না করেন। তারামা তাঁর আদরের দুলাল বামদেবের সব কথাই রাখেন। এবারও রাখলেন।

তারামা সামান্য অসুখ ভোগ করিয়ে রামচন্দ্রকে তাঁর কোলে তুলে নিলেন। দেহ ত্যাগের পূর্বে সাধক রামচন্দ্র সজ্ঞানে 'তারা' নাম জপ করতে করতে মহাসমাধি লাভ করলেন। ২৫শে আশ্বিন (১৩১৪) তাঁর মরদেহের সকল কর্মের অবসান হ'ল।

আত্মীয় ও প্রতিবেশীগণ সজল নয়নে সাধক রামচন্দ্রের মরদেহ নিয়ে তারাপীঠে এলেন। বামদেবের সামনে নিয়ে আসা হ'ল অনুজ রামচন্দ্রের মরদেহ। বামদেব শান্তভাবে একবার দেখলেন রামচন্দ্রহীন রামচন্দ্রের শবদেহকে। তিনি দেখলেন রামচন্দ্র তারামায়ের কোল লাভ করে পরম শান্তি ও আনন্দে রয়েছেন।

বামদেব শান্তভাবে রামচন্দ্রের শবদেহের অন্তেষ্ঠিক্রিয়া সুসম্পন্ন করতে শ্মশানযাত্রীদের নির্দেশ দিলেন।

যথাসময়ে তারাপীঠ মহাশ্মশানে রামচন্দ্রের শব দাহ করা হ'ল। বামদেব শান্তভাবে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাঁর অনুজ রামচন্দ্রের মরদেহের শেষকৃত্য। এমনি ভাবে শান্তভাবে তারাময় বামদেব তাঁর পিতার মরদেহ, মাতার মরদেহ, দিদি জয়কালীর মরদেহ এই মহা-শ্মশানে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের সবাইকে দেখেছেন এমনিভাবে তারামায়ের নিত্য কোলে লাভ করতে।

শব দাহ করে শ্মশান যাত্রীরা ফিরে গেলেন আটলায়। বাম-দেব শান্ত ভাবে অনাসক্ত ভাবে নিজ আশ্রমে ফিরে এলেন।

রামচন্দ্রের শ্রাদ্ধের পূর্বে বামদেব রামচন্দ্রের স্ত্রী ইন্দুমতী দেবীর কাছে শ্রাদ্ধের জন্য অনেক টাকা ও চাল পাঠিয়ে দিলেন। রামচন্দ্রের শ্রাদ্ধ ভাল ভাবে সুসম্পন্ন হ'ল। রামচন্দ্রের অভাবে রামচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও কনিষ্ঠ দুই কন্যা অন্নপূর্ণা ও শিব সুন্দরীর জন্য বামদেব মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্য করতে লাগলেন। তারপর রামচন্দ্রের সংসার চালাবার জন্য কিছু টাকা দিয়ে জমি কিনিয়ে দিলেন রাম-চন্দ্রের পত্নী ইন্দুমতী দেবীকে। সেই জমি চাষবাসের ব্যবস্থাও করা হ'ল। ফলে আর অভাব রইলো না।

রামচন্দ্রের তৃতীয় কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী একটু বড় হলে বামদেব তাঁর এই স্নেহের ভাইঝিকে বিয়ে দিলেন আটলার অদূরে দেখুরিয়া গ্রামের রাখালদাস রায়ের সাথে।

চিরঅনাসক্ত চিরউদাসীন চিরসন্ন্যাসী বামদেব পার্থিব জগতের সকল উর্দ্ধে থেকেও তাঁর কর্তব্য অনাসক্ত ভাবেই পালন করলেন। কারণ তাঁর অনুজ রামচন্দ্রও যে তারামায়ের শরণাগত সন্তান। সারা-

জীবন রামচন্দ্র তারামাকে অজস্র গান শুনিয়েছে। যে তারামায়ের শরণাগত, তাঁর দায়িত্ব যে বামদেবের। যে তারামাকে ভজনা করে সেই বামদেবের প্রাণ। বামদেবের বহু লৌকিক ও অলৌকিক লীলা তার প্রাণবন্ত নিদর্শন। তাঁর এই প্রেমময় নিত্যলীলা চিরপ্রবাহমান।

—০—

শ্রীবাম দর্শনে মহাত্মা ভুলুয়াবাবা

শিবাবতার বামদেব তারামায়ের ধ্যানে গভীর ভাবে মগ্ন রয়েছেন। সামনে চুপ করে বসে আছেন কয়েকজন শিষ্যভক্ত। শ্রীবামের ধ্যান তন্ময় অবস্থা স্তব্ধ হয়ে প্রত্যেক্ষ করছেন স্বয়ং মহাপ্রকৃতি। তারাপীঠের আকাশ বাতাস স্তব্ধ নীরব। এক আশ্চর্য মহামৌন মুখর হয়ে আছে তারাপীঠের সর্বত্র।

একটু পরে ধ্যান ভঙ্গ হ'ল বামদেবের। 'তারা তারা' বলে ডেকে উঠলেন। মেঘগর্জনের ন্যায় এই মহানাদ ধ্বনি আকাশ প্রকম্পিত করে দূর নীলিমায় বিলীন হয়ে গেল।

এই সময় তারাপীঠে এসে প্রবেশ করলেন অবধূত চূড়ামণি মহাত্মা ভুলুয়া বাবা। বামদেবকে প্রণাম করে তাঁর পাশে বসে বামদেবকে সানন্দে দেখতে লাগলেন।

বামদেবও এই মধ্যবয়স্ক সৌম্য দর্শন সিদ্ধ সাধককে দেখে প্রসন্ন হলেন। সাগ্রহে আলাপ করলেন। শিবাবতার বামদেব অন্তর্যামী মহাপুরুষ। তিনি জানেন ভুলুয়াবাবা পূর্বজন্মে এই তারাপীঠেই সাধনা করে গেছেন। তাঁর সাথে ছিলেন আরেক মহান সাধক কামদেব তার্কিক। ভুলুয়াবাবার পূর্বজন্মের নাম ছিল যাদবেন্দ্র

ঘোষ। উভয়ে তারাপীঠে কঠোর সাধনা করেন সুদীর্ঘকাল ধরে। সে আজকের কথা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীত তখন সবে শুরু হচ্ছে (১৭০০ খৃষ্টাব্দ)। বাংলার অন্যতম স্বাধীন রাজা তখন ভূষণার অধিপতি রাজা সীতারাম। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব রবি তখন অস্তমিত। বৃটিশ বণিকেরা তখনও ভারতের রাজদণ্ড হাতে নেবার স্পর্ধা করেনি। এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার মূলাধারে মহাপীঠ তারাপীঠে এসে কঠোর সাধনা শুরু করেন কামদেব তার্কিক ও যাদবেন্দ্র ঘোষ। তাঁদের সেই সাধনার ইতিহাস অপূর্ব (দ্রষ্টব্য কামদেব তার্কিক ও যাদবেন্দ্র ঘোষ—প্রথম খণ্ড)।

সেই মহান সাধনা শেষে তারামায়ের নির্দেশে তাঁরা পূর্ববঙ্গে ভূষণায় রাজা সীতারামের রাজ্যের বিখ্যাত চাঁপাদহে সপ্ত শ্মশানে এবং বিখ্যাত কয়ড়ার সাধন আসনে দীর্ঘ সাধনা করে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেন।

তারপর দীর্ঘকাল দীক্ষাদান, অধ্যাত্ম জ্ঞান দান প্রভৃতি সকল মহান কর্মশেষে দেহত্যাগের সময় প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্য থেকে অলৌকিক ভাবে সহস্র শিষ্য ভক্তের সম্মুখে দু'হাত তুলে অভয় দিয়ে কামদেব তার্কিক বলেন,

"দুই কুলে মোরা আবার আসিয়া জনমিব দুইজন।
সাধনার তত্ত্ব প্রচার করিব, না হইও বিস্মরণ।"

(সংকীর্তন বন্দনা)

বাকসিদ্ধ মহাপুরুষের কথা যথা সময়ে সত্য হ'ল। এই ঘটনার প্রায় দু'শো বছর পর কামদেব তার্কিক ও যাদবেন্দ্র ঘোষ তাঁদের বংশেই পুনরায় আবির্ভূত হলেন। কামদেবের বংশে জন্মগ্রহণ করলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। এই মহান মাতৃসাধক ও 'তন্ত্র তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা যৌবনে পুনরায় তারাপীঠে এসে সাধনা করেন। বামাক্ষ্যাপা বাবার কৃপালাভ করে ধন্য হ'ন। প্রায় দু'শো বছর পূর্বে তিনি যে কামদেব তার্কিকরূপে তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনা করে গেছেন, সেই দিব্য স্মৃতি তাঁর হৃদয়ে জাগরিত হ'ল। যোগবলে তা তিনি প্রত্যক্ষও করলেন। তারাপীঠ যে তাঁর জন্ম জন্মান্তরের সাধনার ক্ষেত্র তা তিনি পরম

আনন্দে উপলব্ধি করলেন। তাঁর জীবন কাহিনীও অনবদ্য। যথাস্থানে তা বর্ণিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড)।

যাদবেন্দ্র ঘোষ আবির্ভূত হলেন তাঁর বংশের ষষ্ঠ পুরুষ রূপে। তিনিই এবার হলেন কালিদাস ঘোষ তথা অবধূত ভুলুয়া বাবা। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও ভুলুয়া বাবা সমসাময়িক। শিবচন্দ্র এবার আগে তারাপীঠে এসে সাধনা করেন এবং বামদেবের আশীর্বাদ ও কৃপালাভ করে ধন্য হ'ন। তারপর অবধূত ভুলুয়া বাবা এখন এলেন। বামদেবের দিব্য কৃপায় ভুলুয়া বাবারও পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হ'ল। প্রায় দু'শো বছর পূর্বে তাঁর এই প্রিয় পরিচিত ক্ষেত্রে তিনি তারামায়ের সাধনা করে গিয়েছিলেন। আবার এবার তারামা তাঁকে নিয়ে এলেন পরিপূর্ণ ভাবে আপ্তকাম হ'বার জন্য।

মহাপীঠ তারাপীঠ শ্যামশ্যামার অভেদ স্বরূপ। এই পরম ব্রহ্মক্ষেত্রর আধার দিয়েই যেন অবধূত ভুলুয়া বাবার আধার তৈরী।

তিনি একই সাথে শ্যামশ্যামার যুগল সাধনায় রত। তিনি বৈষ্ণবচারী মহান শাক্ত। তাঁর সমগ্র জীবন সাধনা যেন তারই বাণী।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীশ্রীব্রজ মাধুরী, শ্রীশ্রীকালী কুলকুণ্ডলিনী, সসদ্ভাব তরঙ্গিনী, হরিবোল ঠাকুর, দক্ষযজ্ঞ, উচ্ছ্বাস তরঙ্গিনী, স্তোত্রামৃত প্রভৃতি গ্রন্থরাজি তাঁর এই জীবন দর্শনেরই আনন্দময় প্রকাশ।

কিছুদিন তারাপীঠে বামদেবের দিব্যসঙ্গ লাভ করে এবং আপন নিভৃত সাধনা সুসম্পন্ন করে প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্মবিদ্ ভুলুয়া বাবা বামদেব ও তারামাকে প্রণাম করে মনের আনন্দে তারাপীঠ থেকে পুনরায় পরিব্রাজনার পথে বের হলেন। এই মরমী সাধক, ঈশ্বর প্রেমিক, মানব প্রেমিক এবং বহু মহাপুরুষের সঙ্গধন্য অবধূত ভুলুয়া বাবার জীবন কাহিনী আশ্চর্য বৈচিত্র্যময়। ইষ্টচরণে শরণাগত এক মহাজ্ঞানী ভক্তের অপূর্ব বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনা বহুল সে জীবন কাহিনী।

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন ভূষণা তথা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঘোষপুরে বাংলা ১২৬৯ সালে (ইংরেজী ১৮৬২) চৈত্র মাসে পূর্ণিমার দিন এই মহান সাধকের আবির্ভাব ঘটে।

রত্ন প্রসবিনী এই পবিত্র ফরিদপুর জেলা। যুগে যুগে প্রসব করেছে কত ভারত বিখ্যাত, বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ, মহামানব, মনীষী, জ্ঞানীগুণী প্রভৃতি সন্তানগণকে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীশ্রীরামঠাকুর, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর, স্বামী প্রণবানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রসব করেছে এই পবিত্র ভূমি। মহাত্মা ভুলুয়া বাবা হলেন তার আরেক আনন্দময় সংযোজন।

অবধূত ভুলুয়া বাবার গৃহীনাম কালিদাস ঘোষ। তাঁর পিতার নাম শ্রীনীলমণি ঘোষ। মাতার নাম মনমোহিনী দেবী।

'কালিদাস' নামের পেছনেও রয়েছে এক অপূর্ব ব্যাপার। শিশু ভূমিষ্ঠ হ'ল বিচিত্ররূপ নিয়ে। শিশুর জিহ্বা প্রসারিত রয়েছে, দু'হাত তোলা—যেন কালীমূর্তি। বাড়ীর ও পাড়া প্রতিবেশী এই 'কালী'র কথা বলায় পিতা নীলমণি ঘোষ প্রসন্ন মনে পুত্রের নাম রাখলেন 'কালিদাস'।

গৃহদেবতা জনার্দন রয়েছেন শালগ্রাম শিলা রূপে। গৃহের নিত্য পুরোহিত কালিদাসের মধ্যে কৃষ্ণগোপালকে প্রায়ই দর্শন করেন। কালিদাস জনার্দনের ভক্ত। কিন্তু তাঁর মা ছোটবেলা থেকে ঈশ্বরকে মা বলে ডাকতে শেখালেন। শ্যামই শ্যামা হয়ে তাঁর জীবনে উদয় হলেন। 'জয়মা কালী', 'জয় জনার্দন', 'হরিবোল', 'জয় বিশ্বনাথ' সবই একাকার হয়ে গেল বালক কালিদাসের কাছে।

কৈশোরে ফরিদপুর জেলা স্কুলে পড়বার সময় প্রধান শিক্ষক ভুবন মোহন সেনগুপ্ত বিশেষ আকৃষ্ট হলেন এই সৌম্যদর্শন অধ্যাত্মবাদী ও উদাসীন কিশোর কালিদাসের প্রতি।

ব্রাহ্ম ভুবন মোহন ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণ করালেন কালীদাসকে। শ্যাম শ্যামা ব্রহ্ম সব এক মা কালীর মধ্যে মিশিয়ে দিলেন উচ্চ আধার সম্পন্ন তরুণ কালিদাস।

কালিদাস সহজাত কবিপ্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। আপন মনে প্রাণ ভরে কালী, কৃষ্ণ, শিব, ব্রহ্ম, রাম নিয়ে অফুরন্ত উচ্চভাব সমৃদ্ধ গান রচনা করতে লাগলো। সুরের প্রতি সহজাত প্রতিভা থাকায় সেই গান তৈরী করে নিজে গাইতে লাগলো।

এই আনন্দের মধ্যে সহসা নিয়তির অমোঘ আঘাত নেমে এল। আঠারো বছর বয়সে কালিদাসের মাতৃদেবী সহসা পরলোক গমন করলেন।

চিরমাতৃভক্ত কালিদাস মাতৃশোকে প্রায় পাগল হয়ে গেল। এই সময় আশ্চর্যভাবে যোগাযোগ ঘটে নর্মদার তীরবর্তী ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর প্রধান সিদ্ধ মহাসাধক শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ সরস্বতীর সাথে। তিনি চিনতে পারলেন তাঁর ঐশী নির্দিষ্ট আধারকে। তাঁরই ইচ্ছায় কালিদাস সানন্দে গৃহত্যাগ করে তাঁর সাথে অধ্যাত্মপথে বের হলেন। গুরু মহারাজ পূর্ণানন্দজীর সাথে প্রায় দু'শো সন্ন্যাসীর দল রয়েছে। এই সময় কালিদাস রানাঘাট এন্ট্রাস স্কুলের ছাত্র। বাংলা ১২৮৮ সালে (ইং ১৮৮১ খৃঃ) ফাল্গুন মাসে কালিদাস গৃহত্যাগ করলেন শ্রীগুরুর সাথে। গুরু সঙ্গে কামাখ্যাধামে উপস্থিত হ'ল কালিদাস। কামাখ্যা-দেবীকে দর্শন করে দেহমন শান্ত হ'ল কালিদাসের। কালীর উপাসক কালিদাস কালী ও কৃষ্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলো সমবেত সাধুমণ্ডলীর সামনে। কালিদাস বললো যে, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলেছেন, "আমি লোকক্ষয়কারী কাল।" এই কালই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তা। জীবজগত কালেই সৃষ্টি কালেই লয় প্রাপ্ত হয়। এই কালের আন্তনিহিত শক্তির নাম কালী। তাই কাল আর কালী অভেদ। সুতরাং কৃষ্ণ আর কালী অভেদ। যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী। যিনি কালী তিনিই কৃষ্ণ।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ মাস গুরু সঙ্গ করে এবং ভারতের বহু তীর্থ ও মহাপুরুষ দর্শন করে আত্মদর্শনের জন্য কালিদাস নিজ গৃহে ফিরে এল।

পরবর্তী কালে ১২৯০ সালের ফাল্গুন মাসে এই শক্তিতীর্থ কামাখ্যা-ধামে কামাখ্যাদেবীর দর্শন লাভ করে কালিদাস। আবার গৃহে ফিরে এনট্রান্স পরীক্ষা দিল। বৃদ্ধ পিতা ও ছোট ছোট ভাই বোনদের দিকে তাকিয়ে গৃহকর্মে মন দেবার চেষ্টা করলো কিন্তু অমোঘ নিয়তি আবার যুবক কালিদাসকে পরিব্রাজনায় টেনে নিয়ে গেল। এবার কালিদাস এক শক্তিমান মাতৃ সাধকের সাথে বের হ'ল। গুরু হল

আবার পরিব্রাজনা। বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল কালিদাসের। এই সময় কালিদাস মহাত্মা কাঙ্গাল হরিনাথের দিব্য সান্নিধ্যে আসে। তাছাড়া আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অক্ষয় মিত্র, জলধর সেন, সাধক শরৎচন্দ্র প্রভৃতির সান্নিধ্যে আসে।

কলেজে এফ-এ পড়বার সময়ও মাতৃসংগীত রচনা ও নাম গানে বিভোর থাকে সাধক প্রবর কালিদাস।

পিতা নীলমণি ঘোষ প্রিয় পুত্রকে সংসার আশ্রমে থেকে ঈশ্বর সাধনা করতে অনুরোধ করলেন। সেই মত বিয়ে দিলেন কালিদাসের।

কিন্তু স্বামীর বিরহে পত্নী সরোজিনী একদিন দেহত্যাগ করলেন। নীলমণি ঘোষ তবু চিরউদাসী কালিদাসকে পুনরায় বিয়ে দিলেন। সাময়িক ভাবে কালিদাস সংসার জীবনে প্রবেশ করলেন এবং কুণ্ডীর গোপালপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু ১৩০৪ সালে জৈষ্ঠ মাসে এই পদ ত্যাগ করে কালিদাস চন্দ্রনাথ তীর্থে গমন করলেন।

অবশেষে ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর প্রধান শ্যামানন্দ সরস্বতী পঞ্চাশজন সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে ১০ই শ্রাবণ (১৩০৪) সাধক কালিদাসকে 'অবধূত আশ্রম' প্রদান করলেন। কালিদাস চিহ্নিত হলেন 'ভুলুয়া বাবা' রূপে।

পরিব্রাজক অবধূত ভুলুয়া বাবা ভারতের পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ পরিভ্রমণ করেন। এই সুলেখক, সুবক্তা, সাধক পরিব্রাজক ও ব্রহ্মবিদ ভারতের বহু বিশিষ্ট মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ সরস্বতী, রামদাস কাঠিয়াবাবা, খাকিবাবা, হনুমানদাস বাবাজী, কাঙ্গাল হরিনাথ, স্বামী আভীরানন্দ সরস্বতী, পাগল শ্রীশ্যামচন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই শ্যাম শ্যামার অভেদ সাধক দ্বিতীয়বার ইষ্টদেবীর দর্শন লাভ করেন। শ্যামা তাঁকে দর্শন দিলেন এবার শ্যামরূপে। অবধূতের দিব্য জীবন হ'ল চরম সার্থক। এই সময় ভুলুয়া বাবার দিব্য জীবনকে ঘিরে অনেক অলৌকিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

ক্রমে একে একে ভুলুয়া বাবার দ্বিতীয়া পত্নী কিরণময়ীদেবী ও ভুলুয়া বাবার ছোট ভাইগণ পরলোকে গমন করলেন। ভুলুয়াবাবার বয়স প্রায় আশী হ'ল। ইষ্টদেবী জগত জননীর উদ্দেশ্যে প্রবীন মাতৃসাধক ভুলুয়া বাবা লিখলেন—

"আমার দিন তো ফুরায়ে গেল তারা।
সান্ধ্য গগনে দেখা দিল সন্ধ্যা তারা।।"

এই সময় এক ভক্তিমতী মহিলা সহসা স্বপ্নাদেশ পেয়ে ভুলুয়া বাবার কাছ থেকে 'সমাধান যোগ' গ্রহণ করে তাঁকে অপরিসীম সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। জগত জননীর চিরশিশু ভুলুয়া বাবাকে পরম যত্নে সেবা করবার জন্যই যেন এই ভক্তিমতী প্রেরিতা হয়েছেন। ভুলুয়া বাবার কাছে সবই মা। মা-ই জীবজগত হয়েছেন। তাই সর্বত্র সমভাব ও সমদর্শী ভুলুয়া বাবা লিখেছেন—

"মা-টি মোর প্রতি মা-টি, প্রতি মা প্রতিমা।
প্রতি মা লইয়া বিশ্ব, বিশ্বই প্রতিমা।"

এই মা ময় মহান ব্রহ্মবিদ মাতৃসাধক ১৩৪৭ সালের ১৩ই চৈত্র অমাবস্যার মহাযোগে মহাযোগময়ী জগন্মাতার নিত্য কোলে চিরতরে অধিষ্ঠিত হলেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক ভুলুয়া বাবার জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

—ঃ—

শ্রীরাম করুণাধন শশী মোড়ল

বাংলা ১৩১৪ সালের হেমন্তকাল। একদিন সকালে শ্রীরাম প্রসন্ন মনে আশ্রমে বসে আছেন। তাঁর সামনে বসে আছে একটি সুদর্শন কিশোর ছেলে। নাম করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য্য। করুণাসিন্ধুর

পিতা সরলপুর গ্রামের জমিদার। নাম গোবিন্দ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য। তিনি সপরিবারে বামদেবের ভক্ত। বামদেবের কৃপাধন্য। বামদেব একাধিকবার তাঁর গৃহে পদার্পণও করেছেন।

গোবিন্দ প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র এই কিশোর করুণাসিন্ধু বামদেবকে প্রায় রোজ ফুল এনে দেয়। বামদেব সানন্দে তা গ্রহণ করেন। স্নেহভরে তাঁকে "ও ছোঁড়া" বলে ডাকেন।

বামদেব যেমন চুপ করে বসে আছেন তেমনি কিশোর করুণাসিন্ধুও চুপ করে বসে বামদেবের দুর্লভ দিব্য সঙ্গ লাভ করছে মনের আনন্দে। হঠাৎ খবর এল যে সরলপুর গ্রামের শশী মোড়ল অসুস্থ অবস্থায় মারা গেছেন।

শশী মোড়ল বামদেবের অ৷ত প্রিয় ভক্ত। করুণাময় বামদেব তাঁর এই ধর্মপ্রাণ ভক্তটিকে খুবই স্নেহ করেন। বার বছর বয়স থেকে শশী মোড়ল বামদেবের দিব্য সঙ্গ লাভ করেছেন। দীর্ঘ আঠাশ বছর বামদেবের সঙ্গ লাভ করবার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে শশী মোড়ল দেহত্যাগ করলেন। শশী মোড়লের চেয়ে তিরিশ বছরের বয়োজেষ্ঠ সত্তর বছরের বৃদ্ধ বামদেব তারামায়ের ধ্যানে বিভোর রয়েছেন। হঠাৎ বামদেবের তন্ময়তা ভাঙ্গলো।

সামনে বসে থাকা কিশোর করুণাসিন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে মারা গেল?"

করুণাসিন্ধু উত্তরে বললো, "শশীমোড়ল"।

বামদেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর করুণাসিন্ধুকে বললেন, "ও ছোড়া, দেখে আয় তো, যাকে খাটিয়ায় বেঁধে রেখেছে, সত্যিই মরেছে কিনা?"

কিশোর করুণাসিন্ধু এ কথা শুনে মহা বিস্ময়ে তখনি এক ক্রোশ দূরবর্তী সরলপুর গ্রামে তার প্রতিবেশী শশী মোড়লের বাড়ী ছুটলো।

এদিকে তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো শশী মোড়লের বাড়ীতে।

শশী মোড়ল মারা গেছেন কয়েক ঘন্টা পূর্বে। মৃত্যুকালে তিনি দেখছেন ভগ্নীপতি পটল ও তাঁর বাবা দোকানে লুচি ভাজছেন। পাঁচ সের ময়দার লুচি ভাজা হ'ল।

শশী মোড়লের মৃত্যু ঘটলে যথারীতি কান্নাকাটির পর শশী মোড়লের মৃতদেহ খাটিয়াতে বেঁধে শ্মশান যাত্রীরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে আসবার জন্য। তার সাথে আবার প্রথানুসারে শ্মশান যাত্রীদের জন্য লুচি ভাজাও হচ্ছে। লুচি খেয়ে শ্মশানযাত্রীরা রওনা হবেন শশী মোড়লের শব নিয়ে।

এই সময় সহসা খাটিয়াটি নড়ে ওঠে। শশী মোড়ল চোখ মেলে তাকালেন। দেখলেন তাঁর দেহ খাটিয়াতে বাঁধা রয়েছে। সহসা তাঁর বোধগম্য হ'ল না এর কারণ কি? যেন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। শশী মোড়ল চেষ্টা করতে লাগলেন বাঁধন খুলবার জন্য। ডাকতে লাগলেন বাড়ীর লোকদের।

ইতিমধ্যে এই অভূতপূর্ব ঘটনা দেখে বাড়ীর সবাই ও প্রতিবেশীগণ ছুটে এলেন। বাঁধন খুলে দিলেন শশী মোড়লের। শশী মোড়ল মনের আনন্দে উঠে বসলেন। এই সময় কিশোর করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য্যও তারাপীঠ থেকে এসে উপস্থিত হ'ল। পরম বিস্ময়ে করুণাসিন্ধু দেখলো শশী মোড়ল খাটিয়ায় বসে রয়েছেন। তাঁর দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ। সবাই অবাক হয়ে শশী মোড়লকে দেখছেন এবং এই অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন। কিশোর করুণাসিন্ধু তখন সবাইকে বামদেবের কথা বললো। উপস্থিত সবাই মনে গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে বামদেবের অপার করুণা ও অলৌকিক শক্তিই আজ শশী মোড়লকে মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরিয়ে এনেছে।

শশী মোড়লের গৃহ আনন্দে মুখরিত হ'ল। কিশোর করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য্য পুনরায় সরলপুর থেকে তারাপীঠে এসে বামদেবকে জানালো যে শশী মোড়ল বেঁচে উঠেছে। বামদেব তা শুনে চুপ করে রইলেন।

পরদিন শশী মোড়ল তারাপীঠে এসে সানন্দে বামদেবের চরণে পতিত হলেন। প্রিয় ভক্তকে দেখে বামদেবও আনন্দিত হলেন। ভক্ত শশী মোড়ল প্রদত্ত খাবার বামদেব সানন্দে গ্রহণ করলেন। আশীর্বাদ করলেন শশী মোড়লের দীর্ঘ জীবনের জন্য। বামদেবের আশীর্বাদ সর্বাংশে সত্য হ'ল। মহাভাগ্যবান শশী মোড়ল শতাধিক বছর সুস্থ সবল দেহে অতিবাহিত করলেন।

বামদেবের অশেষ কৃপাধন্য শশী মোড়লের (মণ্ডলের) জন্ম বাংলা ১২৭৪ সালে সরলপুর গ্রামে। তাঁর পিতা সর্বানন্দ মণ্ডলের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। বাল্যকাল থেকেই শশী মোড়ল ও তাঁর ভাই রাম মণ্ডল পিতাকে চাষ আবাদের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহার্য্য করতেন।

তারাপীঠের এক ক্রোশ উত্তরে সরলপুর গ্রাম অবস্থিত। এই শান্ত নির্জন গ্রামের উত্তরে সুপ্রাচীন ধর্ম ঠাকুরের মন্দির। মন্দিরের দুই পাশে সুপ্রাচীন বিশাল বিশাল বট বৃক্ষের অপূর্ব সমাহার। এই পবিত্র ও প্রাচীন বটবৃক্ষরাজি স্থানটিকে আরো পবিত্র ও মনোরম করে রেখেছে।

শিবাবতার বামদেব ছোটবেলা থেকে এই ধর্মঠাকুরের মেলা উৎসবে ও অন্যান্য সময়ে বহুবার সরলপুর এসেছেন। ধর্মঠাকুরের পূজা উৎসবে এখানে বেশ ভীড় হয়।

সেবার শিবের বটপূজার সময় বামদেব তারাপীঠ থেকে এলেন সরলপুরে (বাংলা ১২৮৬ সালে)। বার বছরের বালক শশী মোড়ল মহাবিস্ময়ে দর্শন করলো বহু কাহিনী ও অলৌকিক লীলার নায়ক তারাপীঠের তারামায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে বামাক্ষ্যাপাকে। বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক বামাক্ষ্যাপার ভীম ভৈরবকান্তির ভয়ংকর সৌন্দর্য দেখে বালক শশী মোড়ল মুগ্ধ হ'ল। শুদ্ধ আধারের এই বালক বামদেবের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলো। বামদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করে ধন্য হ'ল শশী মোড়ল।

করুণাময় বামদেব সস্নেহে তাঁর কৃপা দৃষ্টি দিয়ে বালক শশী মোড়লকে অভিসিক্ত করলেন। এভাবে প্রথম পরিচয় হ'ল বামদেবের সাথে বালক শশী মোড়লের।

বামদেবের দিকে তাকিয়ে বালক শশী মোড়ল ভাবতে থাকে যে এই বামাক্ষ্যাপার সম্পর্কে কত কাহিনী কত অলৌকিক ঘটনা সে শুনেছে, এতদিন তার বাড়ীর ও গ্রামের প্রাচীন লোকদের কাছে।

এই বামাক্ষ্যাপা বাবা ছোটবেলায় নিদারুণ অর্থাভাবে তাঁর বাবার সাথে গান বাজনা করে বাবুদের বাড়ী ঘুরে বেড়াতেন।

চণ্ডীপুর থেকে (তারাপীঠ থেকে) সরলপুর গ্রামের বাবুদের বাড়ীতেও অনেকবার গান বাজনা করে গেছেন সেই সময়ে। মোষের চুল লাগিয়ে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন কিশোর বামাক্ষ্যাপা তাঁর বাবার সাথে। তারপর তারামায়ের কৃপায় মহাশক্তিধর বামদেব কত অলৌকিক কাজ সব করলেন। আজ তারামায়ের সেই বরপুত্র সেই মহাসিদ্ধ পুরুষ বামদেবের পাশে দাঁড়িয়ে বালক শশী মোড়ল রোমাঞ্চিত হ্তে লাগলো।

তারপর থেকে শশী মোড়ল তারাপীঠে বামদেবের কাছে যাতায়াত শুরু করলো। প্রায় রোজই তারাপীঠে গিয়ে ফলটল দিয়ে আসতে লাগলো বামদেবকে।

সেই সময় (বাংলা ১২৮৬ সালে, ইং ১৮৮০ খৃঃ) তারাপীঠ মহাশ্মশান ঘোর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দিনের বেলাতেও গ্রামের লোক তারাপীঠ মহাশ্মশানে একা প্রবেশ করতে সাহস পেত না! দল বেঁধে মহশ্মশানে যেত। শ্মশানযাত্রীরা কোনমতে শববের মুখে আগুন দিয়েই ফেলে রেখে চলে আসতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেয়াল কুকুর ও শকুনীর দল সেই শবকে খেয়ে শেষ করে দিত।

এই বিশাল মহাশ্মশানে দিনের বেলাতেও অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হ'ত না। এই তারাপীঠ মহাশ্মশানে মাঝে মাঝে বাঘও আসতো আশেপাশের জঙ্গল থেকে। সেই সময় এই ঘোর মহাশ্মশানের মধ্যে একটি মাটির ঝুপড়িতে মাঝে মাঝে বামদেব থাকতেন।

নির্ভীক বালক শশী মোড়ল সেই ঝুপড়িতে গিয়ে প্রায়ই বামদেবকে দর্শন করে ধন্য হ'ত।

তাছাড়া মহাভাগ্যবান কিশোর শশী মোড়ল তারাপীঠ মহাশ্মশানের বহুপ্রাচীন সুবিখ্যাত শ্বেতশিমুল বৃক্ষটিকে পোড়া অবস্থায় দেখতে পায়। যৌবনে বামদেব এই সুপ্রাচীন শ্বেতশিমুল বৃক্ষটিকে ঐশী নির্দেশে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড)।

বামদেবের অনেক লীলা কিশোর শশী মোড়ল এই সময় প্রত্যক্ষ করতে থাকে।

বামদেব প্রায়ই দ্বারকানদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে উদয়পুরে গিয়ে

কালী মন্দিরে মা কালীকে পুজো দিয়ে আসতেন। কখনো পায়ে হেঁটে সরলপুরের ধর্মরাজ মন্দিরে গিয়ে ধর্মরাজকে দর্শন করে উদয়পুর যেতেন। মাঝে মাঝে খুশি মত জীবিত কুণ্ডেও ভেসে থাকেন। কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা ডুবে থাকতেন। মাঝে মাঝে সরলপুর থেকে তিন মাইল দূরে বন্দীপুরে (বামদেবপুরে) বামদেব যেতেন তাঁর শিষ্যাসমা মহাসাধিকা জটামার আশ্রমে।

তাছাড়া এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের শিশুসুলভ আচরণ নিয়ে মাঝে মাঝে মজাও করেন কিশোর শশী মোড়ল ও তার সাথীরা।

কৈশোরের চাপল্যই তাদের এই মজার পথে টেনে নেয়। বামদেবকে "কর্তাবাবা" বললে খুশি হ'ন তিনি। কিন্তু শুধু 'বাবা' বললে রেগে গিয়ে বলেন, "ফট্ ফট্"। বামদেবকে রাগাবার জন্য শশী মোড়ল ও তার বন্ধুরা শুধু 'বাবা' বলে ডাকতেই বামদেব রেগে গিয়ে বলেন, "ফট্ শালা ফট"।

তাই শুনে কিশোর দল মজা পেয়ে যায়। কখনো বামদেবকে রাগাবার জন্য কিশোর শশী মোড়ল বামদেবের পা ধরে টানাটানি করতো। লীলাময় বামদেব এই কিশোর ভক্তের চাপল্য কখনো হাসিমুখে চুপ করে সহ্য করতেন, কখনো আবার রেগে যাবার ভান করে "ফট্ ফট্" বলতেন। কেউ যদি বামদেবকে বলতো, "বাবা, ঠ্যাংটা একটু সরাও তো।"

উত্তরে রেগে গিয়ে বামদেব বলতেন, "ফট্ শালা"। এমনি ভাবে নানান খেলা ও আনন্দে কিশোর শশী মোড়লের দিন কাটতে লাগলো।

ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করলো শশীমোড়ল। কৈশোরের চাপল্য আর নেই। মহাযোগী বামদেবের অপার মাহাত্ম্য ক্রমেই উপলব্ধি করতে লাগলো শুদ্ধ আধার সম্পন্ন যুবক শশী মোড়ল। বামদেবের নিবিড় সান্নিধ্যও মাঝে মাঝে পেতে লাগলো।

তারা মন্দিরের তারামা আর শিমুলতলার বামাক্ষ্যাপা। এই শশী মোড়লের ধ্যান জ্ঞান হ'ল। একদিন তারামন্দিরে এসে তারামাকে প্রণাম করলো যুবক শশী মোড়ল। এই সময় কথা প্রসঙ্গে সে জানতে পারলো যে তারামন্দিরে তিনবার বাজ পড়েছিল।

আরেকদিন শিমুলতলায় বসে আছে শশী মোড়ল। দু'জন প্রাচীন সাধু কথা বলছেন। তাঁদের কথা থেকে শশী মোড়ল জানতে পারলো যে শিমুলতলায় একটি বহু প্রাচীন গাছ ছিল। সেই গাছের গোড়ায় তারামায়ের পাদপদ্ম রাখা ছিল। আর এই উত্তর বাহিনী দ্বারকানদী গঙ্গার মতই পবিত্র। মহাশ্মশানের পশ্চিমে প্রবাহিতা গঙ্গাস্বরূপা এই নদী বামদেবের একান্ত প্রিয়। প্রায়ই এই নদীতে বামদেব দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান করেন। কখনো দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকেন আবার কখনো দীর্ঘক্ষণ ডুবে থাকেন। বিশ পঁচিশ বছর পর পর একবার দ্বারকা-নদীতে প্রবল বান আসবেই।

বামদেবের কাছে যাতায়াত করতে করতে যুবক শশী মোড়ল দেখতে পেল যে বামদেবের কাছে প্রায় সব সময় নগেন পাণ্ডা থাকলেও সেবক ভূপতি পাণ্ডাই বামদেবের সেবাযত্ন প্রধানত করেন। বামদেবের বিশেষ প্রিয়ভাজনও তিনি।

একদিন শশী মোড়ল শুনতে পেল যে বামদেবের অন্যতম ভক্ত হরিহর রায় বামদেবের গাঁজা ভরা ও মদ ঢালার জন্য শচী পাণ্ডাকে মাসিক চৌদ্দটাকা করে দেন।

এইভাবে শচীমোড়ল বামদেবের কাছে যাতায়াত করতে করতে অনেক কিছু দেখতে ও জানতে পারলো।

বামদেবের সেবার জন্য শশী মোড়ল প্রায়ই চাল ডাল তরকারী মাছ প্রভৃতি তারাপীঠ নিয়ে যায়।

এই শুদ্ধ সাত্বিক আধার সম্পন্ন ভক্তটিকে বামদেব খুবই স্নেহ করেন। বামদেব একাধারে বিরাট মহাপুরুষ, পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ এবং শশীমোড়লের চেয়ে তিরিশ বছরের বড় হওয়া সত্বেও তিনি তাঁর এই ভক্ত যুবক শশী মোড়লের প্রণাম নিতেন না। সরলপুর গ্রামের মোড়ল হিসাবে শশীমোড়লকে সবাই ভালবাসেন। বিপদে আপদে গ্রামবাসীরা শশী মোড়লের পরামর্শ নেন। তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত মেনে কাজ করেন। এমন কি জমিদার গোবিন্দ প্রসাদ ভট্টাচার্য্যও শশীমোড়লের পরামর্শ প্রয়োজন মত গ্রহণ করেন।

শশী মোড়ল একজন বর্ধিষ্ণু চাষী। এই সৎ, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী,

তেজস্বী, কর্তব্যপরায়ণ ধর্মপ্রাণ ও কঠোর পরিশ্রমী লোককে শুধু সরলপুরের নরনারী নয়, তারাপীঠের লোকজন ও বামদেবের শিষ্য ভক্তগণও ভালবাসেন।

ক্রমে শশী মোড়ল সংসার ধর্মে প্রবেশ করলেন। যথারীতি পুত্র কন্যা পরিবৃত হলেন। কিন্তু বামদেবের প্রতি তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা ও যাতায়াত ও সেবাকর্ম যথারীতি চলতে লাগলো।

কিছুকাল পর সহসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন শশী মোড়ল। যথারীতি গ্রাম্য চিকিৎসা করা হ'ল। কিন্তু সুস্থ হলো না। মাত্র কিছুদিন অসুস্থ থেকে হঠাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। কিন্তু করুণাময় বামদেব শুধু একটি মুখের কথায় তারাপীঠে বসে অলৌকিক ভাবে শশী মোড়লকে বাঁচিয়ে দিলেন উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে।

করুণাময় বামদেবের কৃপায় নবজীবন লাভ করে শশী মোড়ল যথারীতি বামদেবের কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন। করুণাময় বামদেব একাধিকবার শশী মোড়লের গৃহেও পদার্পণ করেন।

বাংলা ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি বামদেব দ্বিতীয়বার ভাগলপুর থেকে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার দু'সপ্তাহ পর বামদেব তাঁর বিশাল মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। এই সময় শশী-মোড়ল প্রায় নিয়মিত তারাপীঠে বামদেবের কাছে যাতায়াত করেন।

বামদেবের অসুস্থতা, চিকিৎসা ও তিরোভাব মুহূর্তে থেকে সমাধি দেবার সময় পর্যন্ত শশী মোড়ল উপস্থিত থাকেন এবং বহু আশ্চর্য্য ও অভূতপূর্ব দৃশ্য ও বিরল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। বামদেবের তিরোভাব প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী শশী মোড়ল উত্তরকালে লেখককে যা বলেন তা সত্যিই মহাবিস্ময়কর। তিনি বলেন যে, বামদেবের দেহত্যাগের দিন প্রচণ্ড জল ঝড় হয়।

সেদিন শশী মোড়ল, তাঁর বন্ধু যোগীন্দ্র বিশ্বাস ও বলরাম ভাণ্ডারী এই তিন জন ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টির মধ্যে জীবন হাতে নিয়ে তারাপীঠে বামদেবের আশ্রমে যান। বামদেবের দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব থেকে এক বিকট কায় সন্ন্যাসী তারাপীঠের মহাশ্মশানে এসে বাস করছিল।

বামদেবের অসুস্থতাকালীন বামদেবের হাটুর উর্দ্ধে (থাই-এ) একটি ঘা হয়। সেটা বামদেব তাঁর এক ভক্ত ডাক্তারকে নিয়ে অপারেশন করিয়ে ছিলেন তাঁর দেহত্যাগের পনের দিন পূর্বে। ডাক্তারের অপারেশন করবার ইচ্ছে ছিল না। দু'তিনবার ঘুরিয়েছে অপারেশনের তারিখ। শেষে বামদেবের ইচ্ছায় ভয়ে ভয়ে অপারেশন করেন।

যাহোক, শশী মোড়ল ও তাঁর দুই বন্ধু যখন ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তারাপীঠে বামদেবের আশ্রমে উপস্থিত হলেন তখন দেখলেন যে বামদেব মহাসমাধি লাভ করেছেন। চারজন সাধু বামদেবের মরদেহ ধরে ঘর থেকে বের করছেন। আর ঠিক সেই সময় সেই বিকটকায় সন্ন্যাসী মহাশ্মশান থেকে বেরিয়ে এসে বামদেবের মরদেহ ধরলেন। এই পাঁচজন সাধু বামদেবকে নিয়ে মহাশ্মশানে তারামায়ের পাদপদ্মের পাশে নিম গাছের নিচে এলেন। দু'জন হাত ও দু'জন পা, ও একজন মাথা ধরে নিয়ে এলেন সমাধি দেবার জন্য। সমাধি দেবার পর সেই বিকটকায় সন্ন্যাসী বললেন, "আমার কাজ শেষ, আমি চললাম।"

সেই সন্ন্যাসী কোথা থেকে এসেছিলেন এবং কোথায় চলে গেলেন তা কেউ জানতে পারলেন না। প্রত্যক্ষদর্শী শশী মোড়লের মতে বামদেবের দেহত্যাগের দিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির সময় কোন পাণ্ডা বা কেউ ছিল না। এমনকি সমাধিতে নিয়ে যাবার সময়ও চণ্ডীপুরের (তারাপীঠের) কোন লোকই ছিল না।

যাহোক, বামদেবের সমাধি দেবার পর গভীর দুঃখ ও বেদনায় সজল নয়নে শশী মোড়ল ও তাঁর বন্ধুরা সরলপুরে ফিরে গেলেন।

বামদেবের তিরোভাবের পর সুদীর্ঘ বাষট্টি বছর শশী মোড়ল বেঁচে থাকেন। তাঁর জীবন দাতা তাঁর উপাস্য দেবতা বামদেবের অমৃতময় স্মৃতি বুকে নিয়ে এই দীর্ঘকাল শশী মোড়ল অতিবাহিত করেন।

প্রায় প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সরলপুর থেকে তারাপীঠে গিয়ে তারামাকে দর্শন করে তারপর বামদেবের স্মৃতি বিজড়িত আশ্রম মন্দিরে গিয়ে বসে থাকেন দীর্ঘক্ষণ।

সেই সময় স্মৃতি চারণ করেন, বামদেবকে ঘিরে তাঁর ছেলেবেলা ও যৌবনের মধুর সোনালী দিনগুলোর। এই মধুর স্মৃতি রোমন্থনে কেটে যায় দীর্ঘক্ষণ। তারপর বৃদ্ধ শশী মোড়ল দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর শতাব্দীর স্মৃতি বিজড়িত জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে লাঠি হাতে ধুলো পায়ে আবার ধীরে ধীরে হাটতে হাটতে ফিরে যান তারাপীঠ থেকে দু'মাইল দূরে সরলপুর গ্রামে নিজগৃহে।

বাংলা ১৩৭৭ সালে এই গ্রন্থ লেখকের সাথে তারাপীঠে এই একশো তিন বছরের বৃদ্ধ শশী মোড়লের প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁর আন্তরিক ব্যবহার, তাঁর সরলপুরের গৃহে অপরিসীম আতিথেয়তা, গভীর সহৃদয়তা এবং সর্বোপরি বামদেবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ভালবাসা ও তারামা'র প্রতি একান্ত নির্ভরতা লেখককে গভীর ভাবে মুগ্ধ করে। বাংলা ১৩৭৭ সাল থেকে ১৩৮০ সাল পর্য্যন্ত লেখক বহুবার তাঁর গৃহে গেছেন। বামদেব ও তারাপীঠ সম্পর্কে উপরোক্ত বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলী তিনি বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে লেখককে বলেন।

তাঁর পুত্রগণও সহৃদয় ভাবে সহযোগিতা করেন। তাঁদের আতিথেয়তা যথার্থ উল্লেখযোগ্য। বামদেবের দিব্যসঙ্গ ও কৃপাধন্য এবং শশী মোড়লের প্রতিবেশী ও সরলপুর গ্রামের জমিদার বৃদ্ধ করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য্যও এই সময় শশী মোড়ল সম্পর্কে উপরোক্ত একাধিক ঘটনা লেখককে সহৃদয় ভাবে বলেন। এজন্য লেখক শশী মোড়ল ও করুণাসিন্ধু ভট্টচার্য্যের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

তারাপীঠের বহু সেবামূলক কাজে, মহশ্মশানে সেবাকার্য্যে ও মহাশ্মশানে বামদেবের কৃপাধন্য চক্রবর্তীবাবার ঘরের উন্নয়নে ও অন্যান্য সাধুসেবা প্রভৃতি কাজে গুপ্ত ভাবে অর্থ ও সামর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন শশী মোড়ল ও করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য্য।

তারামায়ের অশেষ কৃপাধন্য ও বামদেবের বিশেষ করুণাধন্য পরম ভক্ত ও অন্তর্মুখীন সাধক এবং বামলীলার অন্যতম প্রত্যক্ষ দর্শক তথা তারাপীঠের শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস শশী মোড়ল বাংলা ১৩৮০ সালে একশো ছয় বছর বয়সে মরদেহ ত্যাগ করে বামমণ্ডলে চলে গেলেন। তাঁর মরদেহের শেষকৃত্য তারাপীঠ মহাশ্মশানে সুসম্পন্ন হয়।

একই জীবনে দু'বার মৃত্যুর অপূর্ব ইতিহাস রচনা করে ও করুণাময় বামদেবের এক করুণাঘন লীলার মধুর নিদর্শন রূপে শতাব্দীর অধিক জীবন কাটিয়ে অবশেষে শশী মোড়ল বামদেবের চিরন্তন কোলে ফিরে গেলেন।

মহাভাগ্যবান এই শশী মোড়ল। তাঁর এক জীবনে, প্রথমবার মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়ে শশী মোড়লকে কাছে রাখলেন বামদেব। দ্বিতীয়বার মৃত্যুকে দিয়ে শশী মোড়লকে ফিরিয়ে আনলেন নিজের কাছে চিরতরে। পরম সৌভাগ্যবান শশী মোড়ল তাই একাধারে বামলীলার ও মৃত্যু লীলার এক আনন্দময় প্রাণবন্ত বিগ্রহ।

—o—

লীলা তরঙ্গে শ্রীবাম

জনৈক গ্রামবাসীর শূলের রোগ হয়েছে। খুবই কষ্ট পাচ্ছে। পেটের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বামদেবের কাছে এল। মনে সংশয় রয়েছে তার। ক্ষ্যাপা বাবা কি এর ওষুধ জানেন? তবু বামদেবকে বললেন, "বাবা, আমার পেটে যন্ত্রণা হয়েছে। পেটে ভাত থাকেনা।"

একথা শুনে বামদেব উপস্থিত শিষ্য ভক্তবৃন্দের সামনেই লোকটিকে চিমটের বাড়ি মারলেন। তারপর আবার লোকটির পাশে গেলেন। আবার মারলেন। তিনবারের বার বামদেব লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই, তোর কি হয়েছে?"

তখন লোকটি আবার তার পেটের যন্ত্রণার কথা সব বললো। সব শুনে কৃপাময় বামদেব বললেন, "বোস, পাশে বোস"। এই বলে

বামদেব লোকটিকে পাশে বসালেন। তারপর যেখানে বামদেব বসে রয়েছেন সেই জায়গার ধুলো নিয়ে লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, "খেয়ে নে, তারামা'র দয়ায় ভাল হয়ে যাবি"।

লোকটি তাই ভক্তি করে খেল। অচিরেই সে ভাল হয়ে গেল। বামদেবের ওপর এই রোগমুক্ত মানুষটির মনপ্রাণ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় ভরে গেল।

আমৃত্যু বামদেবের এই কৃপার কথা সে সবাইকে শ্রদ্ধাভক্তি'র সাথে বলতো।

উপরোক্ত কাহিনীটি বামদেবের কৃপাধন্য শচীপাণ্ডার স্ত্রী সুধামুখী-দেবী বাংলা ১৩৭৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন তারাপীঠে তাঁর স্বামী গৃহে বসে লেখককে বলেন।

লেখক এজন্য তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ।

—o—

চৈতন্যময় শ্রীবাম ও জড়মুখী ললিত গোঁসাই

বামদেবের আশ্রমের অদূরে দক্ষিণে তারামন্দিরের কাছে ললিত গোঁসাই থাকে। দু'ঘর যুক্ত আশ্রম। পশ্চিম দিকে দাওয়া। ফুলে ফলে সজ্জিত। এই শাস্ত্রজ্ঞ ও তন্ত্রজ্ঞ পুরুষ ললিত গোঁসাইয়ের মূল নাম ললিত চক্রবর্তী।

এই বীরাচারে ব্রতী ললিত গোঁসাই কিন্তু বামদেবকে চিনতে পারেনি। চিনবার চেষ্টাও কখনো করেনি। বরং তার কাছে আগত লোকদের কাছে বামদেবের যথেচ্ছা নিন্দা করে মনের সুখে।

বামদেবের এত কাছে থেকেও বামদেবকে চেনা বা উপলব্ধি করা তার ভাগ্যে হয়নি। জগতে এটাই স্বাভাবিক। তাই দেখা যায়

যে প্রদীপের নিচেই থাকে অন্ধকার। মন্দিরের কাছে যারা থাকে তারাই দেবতার থেকে দূরে থাকে। দেবতার কাছে যায়না।

যাহোক, বামদেবের ওপর ললিত গোঁসাইয়ের ক্রোধের মূল কারণ বামদেবের অসীম জনপ্রিয়তা। বামদেবের ভারত জোড়া খ্যাতি, যশ, সম্মান ও অগণিত ভক্ত শিষ্য ও দর্শনার্থীর অবিরাম আসা যাওয়া ললিত গোঁসাইয়ের কাছে অসহ্য মনে হয়।

বামদেবের এমন কি গুণ আছে যার জন্য এত লোকজন তাঁর কাছে আসে তা ললিত গোঁসাই বুঝে উঠতে পারেনা। আবার অনেক সাধু সন্ন্যাসী গৃহী ভক্ত বামদেবের কাছে দীক্ষা চান, এতে ললিত গোঁসাই আরো বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। তার এই মনোভাব সে অনেকের কাছে প্রকাশ করেছে। এমন কি বামদেবের শিষ্য ভক্ত দের কাছেও প্রকাশ করেছে। ললিত গোঁসাই জানেনা যে তাঁরা বামদেবের শিষ্যভক্ত। তাঁরাও ললিত গোঁসাইয়ের অক্ষম আস্ফালন শুনে মৃদু হেসে বামদেবের কাছে ফিরে গেছেন। সর্বজ্ঞ বামদেব সবই জানেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলায় জটিলা কুটিলা ছিল। জটিলা কুটিলা না থাকলে লীলা স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ হয়না। তাই এসবের প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলায় যেমন 'হাজরা' ছিল।

শিবাবতার বামদেবের এবারের এই মর্ত্য লীলায় 'জটিলা কুটিলা'র অভাব কখনো হয়নি। এই শাস্ত্র ও আচার সর্বস্ব পরশ্রীকাতর ও সঙ্কীর্ণমনা ও হৃদয়হীন এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ললিত গোঁসাই শ্রীবামলীলার অন্যতম জটিলা রূপে চিহ্নিত। ললিত গোঁসাই যাঁদের কাছে বামদেবের নিন্দা করেছে তাঁদের অন্যতম হ'ল শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (বামদেবের শিষ্য ও বামা মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও 'বামলীলা'র লেখক) এবং প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (বামদেবের বিশিষ্ট ভক্ত ও তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গের লেখক)।

বাংলা ১৩১১ সালের ৮ই শ্রাবণ, শনিবার অপরাহ্নে ললিত গোঁসাই শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বামদেব প্রসঙ্গে বলে, "আরে ওটা গণ্ডমূর্খ, তন্ত্রের সাধনা কি জানে? কেন লোকে ওর কাছে আসে জানিনা। আপনার মত পণ্ডিত কখনো ভুলিবেন না, মূর্খগুলো ভুলে।" ইত্যাদি।

মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিক বামদেব যে একাধারে রাজযোগী ও কুলনাথের নাথ তথা সকল শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অতীত ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের বহু উর্দ্ধে তা যোগ ও তন্ত্রের সামান্য প্রাথমিক স্তরে আবদ্ধ ললিত গোঁসাইয়ের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাই বামদেবকে দেখে ও দীর্ঘদিন সঙ্গ করেও উপলব্ধি করতে পারেনি।

সুতরাং নির্বিকার, চিরমুক্ত পুরুষ, সদা ব্রহ্মময় তথা তারাময়, নিত্য আনন্দময়, কুলনাথের নাথ, শিব স্বরূপ বামদেব ললিত গোঁসাইয়ের মত পুঁথি সর্বস্ব, ক্রিয়া সর্বস্ব, পরশ্রীকাতর, সংকীর্ণমনা, হৃদয়হীন, ক্রোধ ও লোভের বশিভূত লোকের চোখে একটি মূর্খ ও ক্রিয়াকর্মহীন লোক ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

ললিত গোঁসাই তার সামান্য শাস্ত্র জ্ঞান ও তান্ত্রিক ক্রিয়া কর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত অহংকার ও ক্রোধ পোষণ করে। তার সাথে লোকের ওপর কর্তৃত্ব করার অহেতুক চেষ্টার জন্য তারাপীঠের স্থানীয় অধিবাসীগণ তার ওপর আরো বেশী বিরক্ত। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও সাধন পথের লোক ও ক্রোধী লোক বলে লোকে তাকে ভয়ও করে। বিশেষ করে সাধারণ সরল গ্রামবাসীরা তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করলেও ভয় করে বেশী। ললিত গোঁসাইয়ের সীমাহীন ক্রোধ ও অহঙ্কার তাকে একবার নরহত্যা পর্যন্ত করিয়েছে।

স্বয়ং চৈতন্যময় বামদেবের সামনে এই জড়মুখী ক্রোধী ও অহঙ্কারী ললিত গোঁসাই এই নরহত্যা করে। ঘটনাটি তারাপীঠে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ঘটনাটি হ'ল—একদিন বামদেব তার আটচালা আশ্রম ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন। কৃষ্ণ লেট নামে একজন ঘরামী আটচালা ঘরের ছাদে উঠে খড় দিয়ে ঘর সারাচ্ছে। এই সময় ললিত গোঁসাই বামদেবের আশ্রমের সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

প্রচুর মদ্যপান করেছে ললিত গোঁসাই। তার চোখ মুখ আরক্ত। হঠাৎ কর্মরত কৃষ্ণ লেট ঘরামীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ললিত গোঁসাই। তারপর কৃষ্ণ লেটকে বললো, "তুই তো ভাল ঘর সারাতে পারিস।"

কৃষ্ণ লেট তা শুনে খুশি হয়ে কাজ ফেলে চালাঘরের ছাদ থেকে নেমে এল ললিত গোঁসাইকে প্রণাম করবার জন্য। কৃষ্ণ লেট অতি সাধারণ সহজ সরল লোক। কৃতজ্ঞতা ভরা তার অন্তর।

ললিত গোঁসাইয়ের মত একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও সাধু লোক তারে কাজের প্রশংসা করেছে, এতে কৃষ্ণ লেটের মনপ্রাণ খুশিতে ভরে গেছে। তাই এই প্রশংসার জন্য কৃষ্ণ লেট কৃতজ্ঞ চিত্তে ললিত গোঁসাইকে প্রণাম করলো। সাথে সাথে মদ্যপ ললিত গোঁসাই পা দিয়ে কৃষ্ণ লেটের মাথাটা চেপে ধরলো। আকস্মিক এই ব্যবহারে কৃষ্ণ লেট মর্মাহত হ'ল। সরল প্রাণ কৃষ্ণ লেট বুঝতে পারলো না তার অপরাধ কোথায়।

কিন্তু কথা বলবারও অবকাশ নেই। তার মাথাটা খড়ম সুদ্ধু পা দিয়ে কঠিনভাবে চেপে রেখে দিয়েছে তথাকথিত সাধু ললিত গোঁসাই। কিন্তু এভাবে মাথা নীচু করে বেশীক্ষণ থাকা অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়ে কৃষ্ণ লেট ললিত গোঁসাইয়ের চেপে রাখা খড়ম সুদ্ধু পায়ের তলা থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিল।

এতে পানমত্ত ললিত গোঁসাইয়ের রাগ হ'ল। তাব মনে হ'ল যে কৃষ্ণ লেট তাকে অপমান করলো। সাথে সাথে সে ভীষণ রেগে গেল। স্বভাবত সে উগ্র প্রকৃতির লোক। যুক্তি বিচার চিন্তাগুলিকে ভাবনা সহৃদয়তা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলিকে সে গ্রাহ্য করেনা। তার ওপর প্রচুর মদ খেয়ে মত্ত হয়ে রয়েছে। তাই পুরোপুরি সে ভয়ঙ্কর ক্রোধ রিপুর দাস হয়ে গেল।

হতভাগ্য কৃষ্ণ লেটকে অকারণে খড়ম দিয়ে সজোরে পেটাতে শুরু করলো ললিত গোঁসাই।

কৃষ্ণ লেট নিতান্ত দুর্বল নয়। অনায়াসে ললিত গোঁসাইয়ের হাত থেকে নিজেকে সে রক্ষা করতে পারে। উপরন্তু ললিত গোঁসাইকে উত্তম মধ্যম দক্ষিণাও দিতে পারে প্রয়োজন হলে। কিন্তু কৃষ্ণ লেট ধর্মপ্রাণ লোক। এসব কিছুই সে করলো না। কারণ ললিত গোঁসাই একে ব্রাহ্মণ, তাতে সাধু লোক। তাই প্রাণ থাকতে ললিত গোঁসাইয়ের গায়ে হাত দেবার কথা কৃষ্ণ লেট চিন্তাও করতে পারলো না। এমনকি

বাধাও দিল না। তাহলে ললিত গোঁসাইয়ের গায়ে হাত লাগতে পারে। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুঁজে মার খেতে লাগলো।

কৃষ্ণ লেটকে নিষ্ঠুর ভাবে মারতে মারতে সুরা পানে উন্মাদ ও অমানুষ ললিত গোঁসাই ক্ষেপে উঠলো। মারবার নেশা তাকে পেয়ে বসলো। বনের বলবান হিংস্র পশু যেমন নিরীহ দুর্বল পশুকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে ঠিক তেমনি হিংস্রভাবে অবিরাম মারতে মারতে কৃষ্ণ লেটের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দিল পানমত্ত ললিত গোঁসাই। অসহ্য ও অপরিমিত মারের চোটে ক্ষত বিক্ষত ও জর্জরিত হয়ে রক্তাক্ত দেহে কৃষ্ণ লেট মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেই অজ্ঞান অবস্থাতেও বৃষ্টি ধারার ন্যায় খড়ম দিয়ে কৃষ্ণ লেটের রক্তাক্ত দেহকে পিটিয়ে যেতে লাগলো মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট একটি জীবন্ত পাপরূপ ললিত গোঁসাই।

অদূরে বামদেব তাঁর দাওয়ায় বসে চুপ করে দেখছেন এই বীভৎস দৃশ্য। তাঁর দৃষ্টি স্তব্ধ গম্ভীর কঠোর। ললিত গোঁসাইয়ের চিৎকার ও মারের শব্দে ইতিমধ্যে আশেপাশের থেকে অনেক লোক ছুটে এসেছে। কিন্তু ললিত গোঁসাইয়ের ভয়াবহ উগ্র মূর্তি কেউ তাকে থামাতে সাহস পেল না। অসহায়ের মত আর্তনাদ করতে লাগলো তারা সবাই।

সেই আর্তনাদে কান দেবার মত অবস্থা ললিত গোঁসাইয়ের নেই। মানুষের আর্তনাদ পশু শুনতে পারে কিন্তু যে পশুর অধম সে কি করে শুনবে? তাই সে নির্বিকার ভাবে সবার সামনে জ্ঞানহীন অসহায় কৃষ্ণ লেটের সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহটাকে মেরে মেরে থেতলে দিল। কৃষ্ণ লেটের দেহটা একটা রক্তপিণ্ডে পরিণত হ'ল। সব শেষে কৃষ্ণ লেটের রক্তাক্ত মাথা ও বুকে কঠিনভাবে বার বার খড়ম দিয়ে আঘাত করতেই কৃষ্ণ লেটের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। হতভাগ্য কৃষ্ণ লেটের মৃত্যু ঘটলো।

তারপর কৃষ্ণ লেটের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটাকে সবার সামনে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে বীরবিক্রমে তথাকথিত বীরাচারী সাধক বলে পরিচিত এবং ক্রোধ রিপুর ঘৃণ্যতম দাস ললিত গোঁসাই চলে গেল।

হতভাগ্য কৃষ্ণ লেট একটি মাত্র সশ্রদ্ধ প্রণাম করবার অপরাধে এমনি নৃশংস ভাবে প্রাণ দিল। কৃষ্ণ লেটের এটা অপরাধ বই কি। আপাতদৃষ্টিতে এটা অপরাধ না হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটা অপরাধ।

যে ক্রোধী, যে অহংকারী, যে নরকের দ্বারস্বরূপ কাম ক্রোধ লোভ এই তিন রিপুর সম্পূর্ণ দাস, যে পরশ্রীকাতর, যে মদের দাস—সেই সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়, অসত্যের নিত্য পূজারী ও সার্বিক অসংযমী লোককে কৃষ্ণ লেট শ্রদ্ধা ও প্রণামের মত পরম পবিত্র জিনিষ অর্পণ করেছিল—যা সম্পূর্ণ অপাত্রে দান।

এই অপাত্রে দানের ফল কি সাংঘাতিক তা কৃষ্ণ লেট নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করলো। তাই তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'প্রশংসা মৃত্যুর অগ্রদূত'—এই আপ্তবাক্যও কৃষ্ণ লেটের জীবনে ঘটলো সম্পূর্ণ ভাবে। কৃষ্ণ লেট যদি তার প্রশংসা শুনে তার কর্তব্য জ্ঞান না হারাতো তবে এমন নৃশংস ভাবে তাকে মরতে হত না। কৃষ্ণ লেট মাতাল ললিত গোঁসাইয়ের মুখে তার প্রশংসা শুনে তার কর্তব্য ভুলে গেল। সে বামদেবের আটচালা-ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে খড় দিচ্ছিল। সে যদি নীচে না নেমে এসে, আপন মনে তার কাজ করে যেত অর্থাৎ বামদেবের আটচালা আশ্রমের ছাদ সারিয়ে যেত খড় দিয়ে আপন মনে চুপ করে তবে ললিত গোঁসাই তাকে মারতে পারতো না। হয়তো একটু দাঁড়িয়ে থেকে মাতাল ললিত গোঁসাই চলে যেত। কিন্তু প্রশংসা শুনে আপন কাজ ফেলে তথা কর্তব্য ভুলে কৃষ্ণ লেট নীচে নেমে এসে নিজের জীবন বিসর্জন দিল।

এই উর্দ্ধ থেকে পতন, স্থিতি থেকে বিচ্যুতি, যেন মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি থেকে সরে যাবার ও চরম মাশুল দেবার এক অমোঘ প্রতীক। এই প্রতীক যেন সমগ্র জগত জীবনের প্রতি এক গভীর সংকেত ও নীরব সতর্কবাণী।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণ লেটের মৃতদেহ ঘিরে কৃষ্ণ লেটের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের কান্না ও আর্তনাদে চারদিক মুখর হ'ল। তারাপীঠের পাণ্ডা

বর্গ ও স্থানীয় গ্রামবাসীগণ খুনী ললিত গোঁসাইয়ের উপযুক্ত শাস্তির জন্য তৎপর হলেন। পুলিশে খবর দেয়া হ'ল। খবর পেয়ে রামপুর হাট থেকে দারোগা পুলিশ এলেন। দারোগা বামদেবের ভক্ত। তিনি বামদেবকে বললেন, "বাবা, আপনার সামনে ললিত গোঁসাই কৃষ্ণকে মেরে ফেললো, আপনি কিছু বললেন না?"

উপস্থিত সবাই বামদেবের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন। সত্যিই তো, যে বামদেব হাজার হাজার আর্ত তাপিত রোগগ্রস্থ নর-নারীকে অনায়াসে অলৌকিক শক্তিতে বাঁচিয়েছেন, যিনি অজস্র মৃতকল্প বা মৃত লোককে বাঁচিয়েছেন সানন্দে স্বেচ্ছায়, যিনি অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকেও বাঁচিয়েছেন কত শত লোককে, সেই করুণাময় ও মহাশক্তিধর বামদেবের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে কৃষ্ণ লেটের মত সুস্থ সবল লোককে পিটিয়ে মেরে ফেললো এক সাধুবেশী হিংস্র মাতাল ললিত গোঁসাই, অথচ বামদেব কৃষ্ণ লেটকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই করলেন না। এমন কি ললিত গোঁসাইকে তিরস্কার পর্যন্ত করলেন না। সব থেকে বড় কথা, তিনি একটি কথাও বললেন না। সব কিছু ধীর স্থির গম্ভীর ভাবে শুধু চুপ করে বসে দেখলেন।

যে বামদেবের অপার করুণা শুধু মানুষে নয়, প্রকৃতিতে নয়, সমগ্র পশু পাখী কীট পতঙ্গেও সমান ভাবে প্রবাহমান, সেই বামদেব তাঁরই স্নেহাস্পদ মানুষ কৃষ্ণ লেটের মৃত্যু বসে বসে প্রত্যক্ষ করলেন। বিশেষ করে যে কৃষ্ণ লেট তাঁরই আশ্রম ঘরের ছাদ সারাচ্ছিল। এ এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। তাই বামদেবের এই অভূতপূর্ব নির্বিকার ও উদাসীন ভাব ও ব্যবহার উপস্থিত সবার কাছেই বিরাট রহস্যময় ব্যাপার মনে হ'ল।

এমন নয় যে বামদেব জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আর ললিত গোঁসাই এক ভীষণ শক্তিমান যুবা পুরুষ। বামদেব সত্তর বছরের বৃদ্ধ হলেও অসীম শক্তির অধিকারী। আর তাঁর অফুরন্ত আধ্যাত্মিক শক্তিরও সীমা নেই। তাই বামদেবের এক পলকের ভ্রূকুটিতে এই মধ্য বয়স্ক ললিত গোঁসাই জগত জীবন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারতো চিরতরে।

সুতরাং উপস্থিত সবার মনে একই প্রশ্ন যে এসব সত্ত্বেও বামদেব কেন এমন নির্বিকার ও উদাসীন হয়ে রইলেন? তাই দারোগার প্রশ্নের উত্তরে বামদেব কি বলেন তাই শোনবার জন্য সবাই সাগ্রহে বামদেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বামদেব প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে দারোগাকে বললেন, "কৃষ্ণ বৃন্দাবন গিয়েছে বাবা।"

বামদেবের এই নিগূঢ় উত্তর শুনে দারোগা ও উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেলেন। দারোগা ললিত গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেলেন।

এই উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করবার ক্ষমতা দারোগা ও উপস্থিত গ্রামবাসীদের ছিল না। তারা এটাকে বামদেবের প্রলাপ ভাবলো। কেবল বামদেবের অন্তরঙ্গ লীলা পরিকরদের মধ্যে কয়েকজন এই গভীরতত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন।

বামদেবের এই উক্তি যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর অর্থবহ! কৃষ্ণ লেট তার নশ্বর দেহের মায়া কাটিয়ে, প্রাণের মায়া কাটিয়ে শান্তভাবে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করলো। তাই তার নশ্বর দেহকে বাঁচাবার কোন রকম চেষ্টা না করে তারামায়ের চরণে শরণগত হয়ে তারাপীঠে তারামায়ের কোলেই মৃত্যুকে বরণ করে নিল।

তাই মৃত্যুঞ্জয়ী কৃষ্ণ লেট তারামায়ের অমৃতময় কোলেই চিরতরে রয়ে গেল। তারামায়ের অভেদ স্বরূপ বামদেব মহাভাগ্যবান কৃষ্ণ লেটের এই অমোঘ নিয়তি প্রত্যক্ষ করে শান্তভাবে কৃষ্ণকে দেহ ছাড়তে দিলেন। তাই বামদেবের কৃপায় কৃষ্ণ লেট দেহবোধ বিবর্জিত হয়ে দেহত্যাগ করলো তারাপীঠে।

বহিরঙ্গে রূপ ভেদ থাকলেও অন্তরঙ্গ শ্যামশ্যামা অভেদ। অন্তরঙ্গে বৃন্দাবন ও তারাপীঠ অভেদ। তাই তারামায়ের বহিরঙ্গ তারাপীঠ থেকে অন্তরঙ্গ তারাপীঠে, যা আনন্দময় ও অমৃতময় বৃন্দাবনস্বরূপ, যা তারামায়ের নিত্যলীলার স্থান, সেই দিব্য পবিত্র স্থানে কৃষ্ণ লেট তার আত্মস্বরূপ লাভ করে পরম আনন্দে ফিরে গেছে। জন্মজন্মান্তরে কঠোর সাধনার দ্বারাও যা পাওয়া যায় না। ত্রিলোক জননী পরমা করুণাময়ী তারামায়ের কৃপায় এই দিনমজুর কৃষ্ণ লেট শুধু শরণাগতির মধ্য দিয়ে তা লাভ করলো অনায়াসে।

শিবাবতার বামদেব তা প্রত্যক্ষ করে সানন্দে কৃষ্ণ লেটকে পাথিব জীবনের দুবিষহ জন্ম মৃত্যুর কালচক্র থেকে, বার বার অশান্তিময় আসা যাওয়া থেকে চিরতরে মুক্তি দানের অনুমতি দিলেন।

ভাবনয়নে বামদেব প্রত্যক্ষ করলেন মহাসৌভাগ্যবান কৃষ্ণ লেট তাঁর আনন্দময় আত্মস্বরূপ লাভ করে মধু বৃন্দাবনস্বরূপ নিত্যধাম স্বরূপ তারামায়ের অন্তরঙ্গ তারাপীঠে চিরতরে অমৃত কোল লাভ করলো। শিবস্বরূপ বামদেবের সামান্য সেবা করে কৃষ্ণ লেট লাভ করলো এই মুনি ঋষি বাঞ্ছিত তারামায়ের এই নিত্য অমৃতময় দিব্য ধাম।

তাই কৃষ্ণ লেটের পাথিব দেহ কিভাবে কার দ্বারা ত্যাগ হ'ল তা বামদেবের ভাবনয়নে বিশেষ প্রতিফলিত হয়নি। করুণাময় বামদেবের স্থূল দৃষ্টি সেদিকে যথার্থ পতিত হলে হয়তো কৃষ্ণ লেটের এভাবে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ ঘটতো না। কৃষ্ণ লেট তার অত্মস্বরূপ ফিরে পেতনা। কঠিন শাস্তি লাভ করে মাতাল ললিত গোঁসাই ফিরে যেত। দিনমজুর কৃষ্ণ লেট যথারীতি বাদদেবের আটচালা ঘরের ছাদ খড় দিয়ে সারাতো।

কিন্তু অনন্তভাবময়ী লীলাময়ী তারামায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই তিনি করুণাময় বামদেবের মূল দৃষ্টি কৃষ্ণ লেটের আত্মাস্বরূপ লাভের দিকেই রাখলেন। বামদেব তাই প্রত্যক্ষ করে বিভোর হয়ে গেলেন আনন্দে। এই দুঃখময় অশান্তিময় মোহময় যন্ত্রণাময় সংসার থেকে একটি জীব চিরতরে মুক্তি পেয়ে গেল, এ তো করুণাময় বামদেবের কাছে বিশেষ আনন্দের ব্যাপার।

বিশ্বের সর্বজীবের সাবিক মুক্তিকামী বামদেব তাই আনন্দ পেলেন একটি বদ্ধজীবের মুক্তি দেখে। দেহ বোধহীন বামদেব দেহস্থ আত্মাকেই দেখলেন। তাই আত্মার মুক্তিতে মহা আনন্দ পেলেন। শিবস্বরূপ বামদেবের প্রতিটি কথা দ্ব্যর্থ ব্যঞ্জক। তাই তার উপরোক্ত "কৃষ্ণ বৃন্দাবন গিয়েছে" উক্তিটিও যথার্থ দ্ব্যর্থ ব্যঞ্জক।

বামদেবের এই উক্তির দ্বিতীয় অন্তর্নিহিত অর্থটিও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কৈশোরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে কংস-

বধের জন্য বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যাত্রা করলেন। বৃন্দাবন ত্যাগের পূর্বে বললেন, "বৃন্দাবন পরিত্যাজ্যং পাদমেকং ন গচ্ছামী" (বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে আমি এক পা ও যাবোনা।) অর্থাৎ সবসময় কৃষ্ণ বৃন্দবনে বিরাজ করবেন। অথচ বহিরঙ্গে আর তিনি কখনো বৃন্দবনে ফিরে আসেননি স্থূল দেহে। কংস বধ, মথুরা উদ্ধার, দ্বারকায় রাজ্য স্থাপন, জরাসন্ধ, শিশুপাল বধ, কুরুক্ষেত্র মহাসমর পরিচালনা, মহাসমরে অর্জুনকে উপদেশ, বিশ্বরূপ দর্শন প্রদান, দ্বারকায় প্রস্থান ও রাজ্য পরিচালনা প্রভৃতি অসংখ্য লীলা সুসম্পন্ন করে যথাসময়ে মর্ত্যলীলা সম্বরণ করলেন। তাই আপাত দৃষ্টিতে তিনি আর কোনদিন বৃন্দাবনে ফিরে যাননি। তাই 'কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গিয়েছে' অর্থাৎ কৃষ্ণ সর্বদা বৃন্দাবনেই রয়েছেন। তাই শ্রীরাধা শতবর্ষব্যাপী দীর্ঘ বিরহে সর্বদাই সূক্ষ্মে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেছেন অমৃত যন্ত্রণায়। স্থূল দেহে শ্রীকৃষ্ণ উপরোক্ত সকল লীলা দীর্ঘকাল ধরে সর্বত্র করে গেছেন। কিন্তু সূক্ষ্মে তিনি বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে যথারীতি তাঁর নিত্য বৃন্দাবনে মধু বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করেছেন। আজো সেই নিত্যলীলা অম্লান রয়েছে। বামদেব তাঁর একাধিক ভাগ্যবান শিষ্যকে তা প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। শ্যাম শ্যামার অভেদ ক্ষেত্র, পরম ব্রহ্মক্ষেত্র মহাপীঠ তারাপীঠ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেই নিত্য বৃন্দাবনের আনন্দময় অমৃতময় স্বরূপ। পরমা বৈষ্ণবী মহা-রাসেশ্বরী তারামা তারই চিরঅধিশ্বরী। তিনি যে একাধারে সচ্চিদানন্দময়ী, মহাভাবময়ী, চিরআনন্দময়ী চিরঅমৃতময়ী, পরমা প্রকৃতি, পরম ব্রহ্মময়ী, ত্রিলোক জননী, মহামায়া ভগবতী।

কৃষ্ণ লেটের উপরোক্ত কাহিনীটির জন্য লেখক বামদেবের অন্যতম সেবক ও শিষ্য এবং লীলা পরিকর শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচির কাছে চির কৃতজ্ঞ।

বাংলা ১৩৮২ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ, রবিবার (ইংরেজী ৩০শে নবেম্বর, ১৯৭৫) তিনি লেখককে বলেন তাঁর তারাপীঠ আশ্রম গৃহে বসে। তিনি বামদেবের আরো একাধিক লীলা কাহিনী লেখককে বলেছেন। যথা সময়ে যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

— ০ —

সাধক প্রবর শীতলচন্দ্র ঘোষ

রামপুরহাটের শীতল চন্দ্র ঘোষ বামদেবের ভক্ত। তিনি কর্মসূত্রে পুলিশে কাজ করেন। পুলিশের দারোগা হয়েও তিনি একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান এবং ধর্মপরায়ন লোক, যা সাধারণত বিরল ব্যাপার।

ইতিপূর্বে তিনি বহুবার বামদেবকে দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছেন। সংসার জীবন ও বিষয় সম্পর্কে বীতরাগ শীতল চন্দ্র ঘোষ ঠিক করলেন যে বামদেবের কাছ থেকে মন্ত্র নেবেন। এত বড় সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছ থেকে মন্ত্র লাভ করতে পারলে তাঁর মানব জীবন সার্থক হবে বলে তিনি উপলব্ধি করলেন।

যথা সময়ে তারাপীঠে এসে বামদেবের চরণ কমলদ্বয় দু'হাতে ধরে কাতর ভাবে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন। বামদেব তাঁকে সহসা কঠিন ভাবে 'না' বলে দিলেন। ভক্ত শীতল চন্দ্র ঘোষও ছাড়বার পাত্র নন।

এভাবে কিছুক্ষণ প্রার্থনা ও 'না' চললো। কিছুক্ষণ পর সহসা বামদেব উগ্ররূপ ধারণ করলেন। যে কপাল পাত্রে তিনি 'কারণ' পান করছিলেন, তা সজোরে ছুঁড়ে মারলেন তাঁর পদতলে উপবিষ্ট শীতল চন্দ্রের মাথায়। কঠিন কপাল পাত্রের আঘাতে শীতল চন্দ্রের মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। সেই রক্তাক্ত অবস্থায় হাসি মুখে শীতল চন্দ্র বামদেবের শ্রীচরণ ধরে থেকেই বললেন, "এই চরণ-কমল আমি ছাড়বো না।"

উপস্থিত সবাই তাঁর এই ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলেন। বামদেব প্রসন্ন হলেন শীতল চন্দ্রের ভক্তি নিষ্ঠা দেখে। এতক্ষণ বামদেব উগ্র রূপের অভিনয় করে শীতল চন্দ্রকে পরীক্ষা করলেন। শীতল চন্দ্র উত্তীর্ণ হলেন সসম্মানে। যথা সময়ে বামদেব শীতল চন্দ্রকে দীক্ষা দান করে কৃতার্থ করলেন। বামদেব তাঁর

এই নব দীক্ষিত শিষ্যকে সংসারেই রাখলেন। কিন্তু অনাসক্ত ভাবে কর্ম করে যেতে বললেন। সংসার কর্তব্য সুসম্পন্ন করলেন নির্মোহ ভাবে। গুরুবাক্য শিরোধার্য করে তাই করে যেতে লাগলেন। অবসর সময় জপ ধ্যানে নিমগ্ন রইলেন।

যথা সময়ে কর্ম জীবন থেকে অবসর নিয়ে সংসারের কর্তব্য চুকিয়ে আপন সাধনায় মগ্ন হলেন। শেষ জীবনে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করলেন সংসারে থেকেও।

অন্তিম লগ্নে ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু বামদেবের নাম জপ করতে করতে বামদেবের কোলে স্থান লাভ করলেন।

সংসারের ঘোর বিষয়পঙ্কে থেকেও, অর্থ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির বিকারের মধ্যে থেকেও যে সৎপথে থাকা যায়, সৎ চিন্তা ও সৎ কাজ করা যায় এবং সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় এবং আপ্তকাম হওয়া যায়, তার আনন্দময় নিদর্শন বামদেবের কৃপাধন্য এই সাধক প্রবর শীতল চন্দ্র ঘোষ।

—o—

শ্রীবামের সেবায় চণ্ডীপুরের পালগণ

চণ্ডীপুরের (তারাপীঠের) পালগণ বেশ ধনী ও ভক্তলোক। একদিন তাঁদের ইচ্ছা হ'ল যে বামদেবকে সেবা করবেন অন্ন দিয়ে। বামদেবের কাছে এসে তাঁরা তাঁদের মনের বাসনা জানালেন। কৃপাময় বামদেব ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারা সম্মিলিত-ভাবে বামদেবকে খাওয়াবেন ঠিক করলেন। বামদেবকে খাওয়ানো মানে তারামাকেই খাওয়ানো। তাই এই দুর্লভ পুণ্য সবাই কিছু করে নেবেন।

এসব ব্যাপারে নগেন পাণ্ডা তাঁদের উৎসাহ দিলেন। বামদেবের কাছে যাঁরা আসেন তাঁরা বামদেবকে কেন্দ্র করে যে সব ক্রিয়াকর্ম ও পূজো অনুষ্ঠান করেন সেই সবের প্রধান কর্মকর্তা হলেন নগেন পাণ্ডা।

তাই নগেন পাণ্ডার মতামত ছাড়া ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে বামদেবের কাছে কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

এই ব্যাপারেও দেখা গেল সেই একই ব্যাপার। নগেন পাণ্ডা পালদের জানালেন রাত্রে ভোগ হবে। সেই রকম ব্যবস্থা করলেন পালবাবুরা। চাল ডাল আলুর খিঁচুড়ি হ'ল। রাত প্রায় ১১টায় খিঁচুড়ি রান্না হ'ল।

বামদেবকে সযত্নে খিঁচুড়ি ভোগ দেয়া হ'ল। বামদেব প্রসন্ন মনে তারামাকে ভোগ নিবেদন করলেন। নিজেও গ্রহণ করলেন কিছু। বামদেব প্রসাদ করে দেবার পর বামদেবের কাছে যে সব সাধু রয়েছেন (তারাপীঠে তপস্যা করছেন বামদেবের কৃপায়) সেই সাধুদেরও (সংখ্যায় ১০।১২ জন) প্রসাদ দেয়া হ'ল।

তারপর পাণ্ডাগণ ও বামদেবের উপস্থিত শিষ্য ভক্তগণ প্রসাদ পেলেন। সবশেষে পালবাবুগণ সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। এক স্নিগ্ধ ও মাধুর্যময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে এই সেবা ভোগ সুসম্পন্ন হ'ল।

ভক্তি দিয়ে ভক্ত যে অর্ঘ্যই দেন, ভগবান তা সানন্দে গ্রহণ করেন। অর্ঘ্যটা উপলক্ষ্য মাত্র। চণ্ডীপুরের পালগণ একাধারে ভক্ত ও ধনী লোক। বামদেব তাঁদের ভক্তিটাই দেখেছেন। ধন ঐশ্বর্য দেখেন নি। ধন ঐশ্বর্য দেখলে শুধু মাত্র খিঁচুড়ি ভোগ আনন্দের সাথে গ্রহণ করতেন না। পালদের চেয়ে অনেক কম আর্থিক সঙ্গতি যাঁদের, তাঁরাও বামদেবকে নানান রকম ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন দিয়ে বহুবার ভোগ দিয়েছেন।

কিন্তু বামদেব ভক্তের ভক্তিই দেখেন, তাঁর প্রেম ভক্তিপূর্ণ নয়নে আর কিছু ধরা পড়ে না। তাই তিনি সদা আনন্দময়, তারাময় তথা ব্রহ্মময়।

তবে পার্থিব জীবনে যে ভক্ত যতটুকু অর্থের সদ্ব্যবহার করেছেন বামদেবের সেবা করে, তিনিই ধন্য হয়েছেন। তাঁর ইহকালে পরকালে সেই অর্থই পরমার্থ হয়ে তাঁকে অগাধ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দিয়েছে।

অর্থ থাকলেই হয় না, যে অর্থ দেব সেবা, সাধু সেবা, মহাপুরুষের এবং দরিদ্র নরনারায়ণের সেবায় লাগে না, সেই অর্থ থাকা না থাকা সমান। বন্ধ্যা নারীর মতই সেই অর্থের মূল্যবোধ নিস্ফল হয়ে যায়।

তাই 'হয় জপ নয় মাপো'—সাধন জগতে বহু প্রচলিত এই উক্তিটি যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ।

জগতে সবাই জপ ধ্যান করতে পারেন না। যাঁরা পারেন না তাঁরা যদি অর্থের মাধ্যমে উপরোক্ত সেবার কাজ সকল সুসম্পন্ন করেন তবে লক্ষ কোটি জপের ফল তাঁরাও লাভ করবেন। এই 'মাপা'র দ্বারা তাঁরাও ঈশ্বরের পথে সানন্দে অগ্রসর হতে পারবেন। করুণাময় ঈশ্বর তাঁকে পাবার জন্য সকল রকম পথই উন্মুক্ত করে রেখেছেন। কেউ জপ ধ্যানের দ্বারা কেউ সেবার দ্বারা তাঁকে লাভ করেন।

তাই সাধনার পথে আরেকটি প্রচলিত উক্তি রয়েছে "যার অর্থ আছে সে অর্ধমুক্ত।"

অর্থের দ্বারা সেই ভাগ্যবান তথা অর্থবান লোক সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে পারেন।

যাঁর অর্থ নেই, তাঁকে অর্থ রোজগার করে সংসারের দায়-দায়িত্ব মেটাতেই জীবনের বেশীর ভাগ সময় চলে যায়। তাই সে সম্পূর্ণ বদ্ধ। কিন্তু অর্থ যাঁর আছে, সে বদ্ধ তো নয়ই, বরং অর্ধমুক্ত। অর্থের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সেবার মধ্য দিয়ে পূর্ণ মুক্তি লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। কিন্তু যারা অর্থ থাকা সত্ত্বেও অর্থের সদ্ব্যবহার না করে, কৃপণের মত অহেতুক জমিয়ে যায় বা আত্মসুখ সর্বস্ব হয়ে যায় তারা অর্থের মর্য্যাদা নষ্ট করে। তারা বদ্ধ জীবের চেয়েও বদ্ধ।

তাদের অর্থ থাকা সত্ত্বেও তাদের জীবন অর্থহীন। তারা ইহকালে পরকালে সব হারায়। দেহত্যাগের পরেও তারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত

হয়ে সেই অর্থের পেছনে ঘুরে বেড়ায়। কারণ, অর্থের অভিশাপে তারা অভিশপ্ত হয়। তাই সংসারে অর্থের সদ্‌ব্যবহার করা প্রত্যেকের কর্তব্য। তাতে ইহলোক ও পরলোকের পরম কল্যাণ হয়। সাধন-পথ লাভ হয়। ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরীয় কৃপা কালক্রমে লাভ হয়। অর্থ যে ঈশ্বরের এক মহান ঐশ্বর্য। যে ভাগ্যবান সেই ঐশ্বর্য পেয়েছে, সে যদি অর্থের সদ্‌ব্যবহার করে তবে ঈশ্বর প্রসন্ন হ'ন।

করুণাময় বামদেব ভক্ত ও ধনী পালবাবুদের প্রদত্ত সামান্য সেবা গ্রহণ করে তারই আনন্দময় দৃষ্টান্ত ভক্তদের সামনে স্থাপন করলেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বামদেবের দিব্যসঙ্গ ও করুণাধন্য শচীপাণ্ডার সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা সুধামুখী দেবীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বাংলা ১৩৭৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন ৮১ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা সুধামুখী দেবী তাঁর স্বামী গৃহে বসে লেখককে উপরোক্ত কাহিনী সানন্দে বলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীবামের অলৌকিক পূজা

শিবাবতার শ্রীশ্রীবামদেবের নাম ভারতের দিকে দিকে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। সারা ভারতবর্ষ থেকে তাঁর কাছে দীর্ঘকাল ধরে অগণিত সিদ্ধ সাধক সাধিকা ও তপস্যাপরায়ন সাধকবৃন্দ তাঁর কাছে আসছেন তারাপীঠে। শুধু তাই নয় নানান বিপদে আপদে পড়ে অনেক দূর দূরান্ত থেকে আর্তলোক ছুটে আসেন বামদেবকে নিয়ে যাবার জন্য। কারণ বামদেব বিপদ ভঞ্জনকারী। তিনি বিপদের স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেই বিপদ পালিয়ে যায়। সাধারণ নরনারী বিপদ থেকে ত্রাণ পান।

এভাবে বামদেবকে দেশের বহুস্থানে বহুবার যেতে হয়েছে।

শ্রীবামের দিব্য ভুবন মঙ্গল বিগ্রহ দর্শনেই সর্ব বিপদ, সর্ব অশান্তি দূর হয়ে যায়। দেবদেবীর মূর্তিও প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এবার আবার ব্যাকুল আহ্বান এল সুদূর উত্তর প্রদেশ থেকে। উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত মহাতীর্থ বৃন্দাবনের পাশে একস্থানে ভীষণ মড়ক লেগেছে। প্রতিদিন বহুলোক মারা যাচ্ছে। সব রকম চেষ্টা চালিয়েও মড়ক বন্ধ করা যাচ্ছে না। বৃটিশ সরকার গ্রামে গ্রামে ওষুধপত্র পাঠাচ্ছেন। চিকিৎসক পাঠাচ্ছেন। কিন্তু লোক প্রতিদিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মরছে যথারীতি। ক্রমে ক্রমে এই ভয়াবহ মড়ক মহামারির আকার নিল। চারদিকে শুধু কান্না আর আর্তনাদ।

এই সময় কয়েকজন সাধু ও পণ্ডিতগণ স্থির করলেন যে এবার রটন্তী কালীপূজা করা হবে একজন তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষকে দিয়ে। বিগত চার বছর ধরে এই পূজা যে পুরোহিতকে দিয়ে করানো হয়েছে তাতে কোন ফল হয়নি। প্রতিবারই মড়কে বহুলোক মারা গেছে। তাই এই সিদ্ধান্ত এবার নেয়া হ'ল। তাছাড়া এবার মড়কও ভীষণ আকার ধারণ করেছে। ইতিমধ্যেই মহামারী ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এই ভীষণ অবস্থায় কোন তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ এখানে আসতে রাজী হবেন কিনা সন্দেহ। প্রাণের মায়া তো সবারই আছে।

যাহোক, ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশই হ'ল তন্ত্রপ্রধান ক্ষেত্র। শক্তি সাধনার প্রধান ক্ষেত্র। বঙ্গদেশে বহু তন্ত্রসিদ্ধ মহাতান্ত্রিক রয়েছেন। তাই পূর্ব ভারতের মধ্যে (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম) বাংলাতেই সর্বাধিক সিদ্ধ শক্তি সাধক রয়েছেন।

তাই তাঁরা স্থির করলেন যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষকে আমন্ত্রণ জানাবেন এই ঘোর বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য। তিনি যদি কৃপা করে রটন্তী কালীপূজা করে মা কালীকে প্রসন্ন করতে পারেন তবেই মড়ক আপনা থেকে বন্ধ হ'তে পারে। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

এই সময় কয়েকজন সাধু জানালেন যে বীরভূম জেলার বিখ্যাত তন্ত্রপীঠ তারাপীঠে ভারত বিখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা

রয়েছেন। তাঁর অলৌকিক যোগবিভূতির কথা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনিই বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাতান্ত্রিক এবং কুলনাথের নাথ। তন্ত্রের সর্বোচ্চ মহাসিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত। তিনি সাক্ষাত শিব স্বরূপ।

তখন শ্রীশ্রীবামদেবকে আমন্ত্রণ করবার জন্য কয়েকজন সাধু ও পণ্ডিত বঙ্গদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

যথাসময়ে তাঁরা বৃন্দাবন থেকে তারাপীঠে এলেন।

শ্রীবাম মহাশ্মশানে শিমুল তলায় বসে আছেন। সাথে কয়েকজন শিষ্যভক্ত। শ্রীবাম তারামায়ের ভাবে বিভোর। ত্রিলোক জননী ব্রহ্মময়ী তারামায়ের দিব্যরূপ ধ্যানে তিনি মগ্ন। মাঝে মাঝে 'জয়তারা', 'জয়তারা' বলে বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকছেন। মেঘ গর্জনের ন্যায় চারদিক কাঁপিয়ে দূর আকাশে নভমণ্ডলে তা মিলিয়ে যাচ্ছে।

সাধু ও পণ্ডিতগণ ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তারাপীঠের সদাজাগ্রত ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে দেখছেন আর এই মহানাদ ধ্বনি শুনছেন।

একটু পরে বামদেব তাঁর বিশাল আরক্তিম নয়ন মেলে তাকালেন। দেখলেন সামনে দণ্ডায়মান কয়েকজন সাধু ও পণ্ডিত। করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত। গ্রীষ্মের এই প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে তাঁরা বহুদূর থেকে এসেছেন। তাঁদের সর্বাঙ্গে তার ছাপ রয়েছে।

অন্তর্যামী শ্রীবাম সবই বুঝতে পারলেন। শিষ্যদের বললেন এঁদের স্নান, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে।

তাঁরা সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করে জানালেন তাঁদের প্রার্থনা। করুণাময় বামদেব সব শুনলেন। সহৃদয় চিত্তে তিনি যেতে সম্মত হলেন। জীবকে দুঃসহ রোগ শোক পাপ তাপ বিপদ থেকে ত্রাণ করবার জন্যই তো তিনি অবতীর্ণ। তাই আর্তের আকুলতায় সাড়া দিলেন করুণাঘন শ্রীবাম।

কয়েকদিন পর ব্রহ্মময়ী তারামাকে প্রণাম করে বামদেব সেই সাধু ও পণ্ডিতগণ সহ বৃন্দাবন রওনা হলেন। বামদেবের সাথে তাঁর কৃপাধন্য কয়েকজন সাধু ও ভক্তগণও চললেন বৃন্দাবনে।

যথা সময়ে বৃন্দাবন পৌঁছলেন শ্রীবাম ও তাঁর সহযাত্রীগণ। তারপর বিশ্রামান্তে সেখান থেকে নিকটবর্তী মড়ক স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে একটি শ্মশানে শ্রীবাম কিছু ক্রিয়া করেন। মহাপীঠ তারাপীঠের মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিক ভারত শ্রেষ্ঠ তন্ত্র সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে অভ্যর্থনা করলেন স্থানীয় বিশিষ্ঠ ব্যক্তিগণ।

তারপর বামদেবকে নিয়ে যাওয়া হ'ল পূজা মণ্ডপে যেখানে রটন্তী কালীদেবীর বিরাট মূর্তি বিরাজিতা। পূজার উপাচার ও ভোগ থরে থরে সাজানো রয়েছে।

বামদেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রটন্তী কালী মূর্তির দিকে। রটন্তী কালিকাদেবীর গম্ভীর মুখ মণ্ডল ধীরে ধীরে প্রশান্ত রূপ ধারণ করলো।

আকুমার ব্রহ্মচারী, মহাবীর্যবান, শিবকল্প মহাযোগী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা পূজায় বসলেন।

উপস্থিত বিশাল দর্শক মণ্ডলী তাঁর পূজা দেখবার জন্য পরম আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু শ্রীবামের পূজা অন্তরঙ্গের। বহিরঙ্গের নয়। তাই তিনি বিচিত্র পূজা শুরু করলেন। তিনি বিরাট কোষার সব জল খেয়ে ফেললেন। তারপর রটন্তী কালীদেবীর অন্নভোগ ধীরে ধীরে প্রায় অনেকখানি খেলেন। তারপর বাকি অন্ন ভোগটা রটন্তী কালীমাকে নিবেদন করলেন।

এই অভূতপূর্ব বিচিত্র পূজা দেখে স্থানীয় পণ্ডিত, সাধুবর্গ ও অধিবাসীগণ সবাই বামদেবকে নানান বিদ্রূপ করতে লাগলেন।

শ্রীবাম বুঝলেন যে তাঁর এই অন্তরঙ্গ পূজার নিগূঢ় তত্ত্ব এসব বহিরঙ্গ পূজা সর্বস্ব অন্তঃসার শূন্য লোকেরা উপলব্ধি করতে পারেনি। উল্টে বামদেবকে বিদ্রূপ করছে। তিনি বিরক্ত হলেন। দেবী মূর্তির দিকে তাকিয়ে 'তিনি, "তারা তারা" বলে তিন বার ডেকে উঠলেন।

আকস্মিক বাজ পড়লে যে শব্দ হয় সেইরূপ ভয়ঙ্কর বজ্র নিনাদে শ্রীবাম তারা ধ্বনি দিলেন।

সমগ্র পূজামণ্ডপ ও সমগ্র অঞ্চল কেঁপে উঠলো সেই ভীষণ নাদ ধ্বনিতে। স্বয়ং রটন্তী কালীমূর্তি প্রকম্পিত হ'ল। উপস্থিত সমবেত দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে গেল ভয়ে বিস্ময়ে।

শ্রীবাম উগ্রমূর্তি ধারণ করে পূজার খাঁড়া নিয়ে এক কোপ মারলেন রটন্তীকালী মূর্তির গায়ে।

সবাই সভয়ে দেখলো কালীমূর্তির গা বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সবাই আর্তনাদ করে উঠলো। ভীষণ অমঙ্গলের চিন্তায় সবাই অস্থির হয়ে পড়লো। শ্রীবামের চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো। না জেনে না বুঝে শ্রীবামকে ঠাট্টা করার জন্য তাঁরা অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলো। করুণাময় শ্রীবাম এই অবোধ জীবদের ক্ষমা করে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, "আজ থেকে আর কেউ মড়কে মরবে না এই পূজার জন্য।"

শিবাবতার শ্রীবাম যে মৃন্ময়ী মূর্তিকে চিন্ময়ী করে দিয়েছেন তাঁর এই অলৌকিক বিচিত্র পূজার মধ্য দিয়ে তা তারা উপলব্ধি করতে পারলো। অলৌকিক ব্যাপার, শ্রীবামের একথা বলার সাথে সাথে সেই দিন সেই মুহূর্ত থেকে মড়ক বন্ধ হয়ে গেল। আর একটি লোকও সেদিন সেই সময় থেকে মড়কে মারা গেল না।

কয়েকদিন পর শ্রীবাম সদলবলে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। স্থানীয় সাধুসন্ত পণ্ডিতবর্গ ও অধিবাসীগণ পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে শ্রীবামকে বিদায় জানালেন।

শ্রীবামের এই বিচিত্র দিব্য পূজা তাঁদের অন্তরে চিরতরে গেঁথে রইলো। যে দেবমানব নিজে ভোগ খেয়ে তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভয়ঙ্করী দেবী রটন্তী কালিকাকে খাওয়াতে পারেন এবং এই বিচিত্র পূজার মধ্য দিয়েই মৃন্ময়ী কালী মূর্তিকে চিন্ময়ী দেবীতে রূপান্তরিত করতে পারেন এবং দেবী মূর্তিকে আঘাত করে রক্ত ঝরাতে পারেন তাঁর মহাশক্তির পরিমাপ কে করতে পারে?

তাই ভারতবর্ষের সর্ব শ্রেষ্ঠ তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের দর্শন ও এই অলৌকিক পূজা ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম প্রত্যক্ষ করে তাঁরা চিরতরে ধন্য হয়ে গেলেন। তার সাথে তাঁরা লাভ করলেন তাঁদের প্রার্থিত বর।

ভয়াবহ মড়ক ও মড়ক জনিত ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে তাঁরা মুক্তি লাভ করলেন করুণাঘন শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কৃপায়।

শ্রীবাম বৃন্দবনে কয়েকদিন পরম আনন্দে অতিবাহিত করলেন। গোবিন্দ মন্দির, নিধুবন, বংশীবট, যমুনা নদী দর্শন করে ভাব বিহ্বল হলেন। তারপর সদলবলে তারাপীঠে ফিরে এলেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক হাওড়া নিবাসী মহোপাধ্যায় মুরারী মোহন বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ১৯৮৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী তিনি লেখককে বলেন। তিনি উপরোক্ত কাহিনী লাভ করেন দুর্গাচরণ শাস্ত্রীর কাছ থেকে। শাস্ত্রী মহাশয়কে এই কাহিনী বলেন সেই রটন্তী পূজার পুরোহিতের ছোট ভাই অঘোরানন্দ স্বামী। পরবর্তীকালে দুর্গাচরণ শাস্ত্রী (বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর রচিত 'চারধাম' নামক পুস্তকে এই কাহিনীটি প্রকাশ করেন। পুস্তকটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

—০—

শ্রীবামের আশির্বাদধন্য সস্ত্রীক নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাংলা ১৩১৫ সালের উত্তপ্ত বৈশাখের মধ্যাহ্নকাল। বামদেব তারাপীঠ মহাশ্মানের প্রাণ কেন্দ্র শিমুলতলায় বসে আছেন। শিমুল-তলায় চারদিকে নিবিড় বৃক্ষরাজির সুনিবিড় ছায়া। সেই স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে তারাময় বামদেব তারামায়ের ধ্যানে বিভোর হয়ে রয়েছেন। বামদেবের আসে পাশে বসে আছে তাঁর প্রিয় সারমেয় বর্গ।

এই সময় বীরভূমের সন্ধ্যাজোল গ্রামনিবাসী ও কান্দি রাজ হাই স্কুলের শিক্ষক তেইশ বছরের যুবক শ্রীনবীনচন্দ্র মখোপাধ্যায় তাঁর তরুণী স্ত্রী সর্বমঙ্গলা দেবীকে নিয়ে বামদেবের শ্রীচরণ দর্শনে এলেন।

সর্বমঙ্গলাদেবী দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীরোগে ভুগছেন। সকল জাগতিক চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাছাড়া এই দম্পতির কোন পুত্র সন্তানও নেই। তাই পুত্র ও রোগমুক্তির কামনা নিয়ে অগতির গতি বাকসিদ্ধ মহামানব শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে এসে উপস্থিত হলেন এই দম্পতি।

এই ভক্ত দম্পতিকে দেখে কৃপাময় বামদেব প্রসন্ন হলেন। সস্নেহে তাঁদের আশির্বাদ করে সর্বজ্ঞ বামদেব বললেন, "ওরে, তোদের একটি পুত্রসন্তান হবে বাবা।"

বাকসিদ্ধ মহাপুরুষের এই মহান আশির্বাদে নবীনবাবু ও তাঁর স্ত্রী সর্বমঙ্গলাদেবী আনন্দে আপ্লুতা হলেন। ভক্তিমতী সর্বমঙ্গলাদেবী তাঁর আনন্দাশ্রু দিয়ে অসীম কৃতজ্ঞতার সাথে দু'হাতে বামদেবের শ্রীচরণকমল ধরলেন। তারপর সেই পবিত্র চরণধূলি সানন্দে সাগ্রহে নিজের মাথায় মুখে চোখে দিলেন। সর্বজ্ঞ বামদেব স্নেহমধুর কন্ঠে সর্বমঙ্গলা দেবীকে বললেন, "পা ছেড়ে দে মা। তারা মা'র কৃপায় তোর সব রোগ সেরে যাবে। মায়ের চরণামৃত ভক্তি ভরে খা মা। তা হলেই তোর মনের বাসনা পূর্ণ হবে।"

অপার করুণাময় বামদেবের কাছে পর পর দু'টি বর লাভ করে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সর্বমঙ্গলাদেবী পরমানন্দে কেঁদে ফেললেন। পরমশ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সাথে বামদেবকে প্রণাম করে উভয়ে তারা মায়ের মন্দিরে গেলেন। তারামাকে ভক্তি ভরে দর্শন করে তারামায়ের চরণামৃত নিয়ে তাঁরা বাড়ী ফিরে গেলেন।

বামদেবের কথা যথারীতি ফললো। অল্প দিনের মধ্যে সর্বমঙ্গলা দেবী রোগমুক্ত হলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৩১৬ সালে এই ধর্ম-পরায়ন দম্পতির একটি সুলক্ষণ যুক্ত পুত্র সন্তান হ'ল।

বামদেবের কৃপায় এই পুত্র সন্তান লাভ করায় পুত্রের নাম রাখা হয় কৃপানাথ মুখোপাধ্যায়।

আমৃত্যু ভক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সাধ্বী স্ত্রী সর্বমঙ্গলা দেবী বামদেবের এই অসীম কৃপার কথা সানন্দে সবাইকে বলেছেন।

করুনাসিন্ধু বামদেবের এই অহেতুকী করুণার এক মধুর আনন্দ লহরি রূপে এই দম্পতি বামমণ্ডলে চিরচিহ্নিত হয়ে আছেন।

—ঃ০ঃ—

ভাগ্যবান শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুরের অধিবাসী শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ত্র সাধনার জন্য ব্যাকুল হলেন। তারাপীঠের ভারতবিখ্যাত মহাতান্ত্রিক বামাক্ষ্যাপার অলৌকিক যোগবিভূতির কথা শুনে শশধর বাবু বামদেবের দিব্য সান্নিধ্য লাভের জন্য ও তন্ত্রসাধনার জন্য তারাপীঠ রওনা হলেন।

যথাসময়ে তারাপীঠে পৌঁছে বামদেবের চরণে প্রণত হয়ে বামদেবের চরণে জানালেন তাঁর প্রাণের আকুতি।

সর্বজ্ঞ বামদেব বুঝতে পারলেন যে শশধরের আধার এত সুদৃঢ় নয় যে তাঁর কাছ থেকে শশধর তন্ত্রসাধনা লাভ করে। তাই তিনি সস্নেহে বললেন, "ওরে, তুই কুমার খালির শিবচন্দ্রের কাছে যা (বামদেবের কৃপাধন্য তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড)। ওখানে গেলে তুই শায়েস্তা হবি।"

বামদেবের নির্দেশে শশধর বন্দোপাধ্যায় নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালিতে গেলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে। একাধারে তন্ত্রসিদ্ধ ও

তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুলেখক ও সুবক্তা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব বামদেবের নির্দেশ জেনে শশধর বন্দোপাধ্যায়কে গ্রহণ করলেন।

শ্মশানে বিশেষ বিশেষ তিথিতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব যে সকল তান্ত্রিক ক্রিয়া করেন, তা দেখাবার ও শেখাবার জন্য শশধর বাবুকে তাঁর সহকারী রূপে গ্রহণ করলেন।

একদিন রাতে এই ধরণের এক বিশেষ ক্রিয়ায় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশ্মশানে শশধরকে নিয়ে গেলেন এবং বার বার তাঁকে দেখিয়ে ও শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শশধর বন্দোপাধ্যায় ভুল করতে লাগলেন। ফলে অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তখন শশধরকে চিমটে দিয়ে মারলেন। তারপর পুনরায় সেই প্রক্রিয়াটি সুন্দর করে শশধরকে বুঝিয়ে দিলেন। এবার শশধর এই ক্রিয়ার সঠিক রূপটি বুঝতে পারলেন এবং ক্রিয়াটি করায়ত্ত করলেন।

কিছুকাল এভাবে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের আন্তরিক সাহচর্য্য লাভ করে শশধর বন্দোপাধ্যায় বামদেবের কৃপায় তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনেক কিছু আয়ত্ত করলেন।

তারপর মনের আনন্দে গৃহে ফিরে গেলেন। আমৃত্যু তিনি বামদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

সৎ ইচ্ছা ও সৎ প্রার্থনা নিয়ে যাঁরা তারাপীঠে বামদেবের কাছে এসেছেন। কল্পতরু বামদেব সবার মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন।

সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ব্যাপী তাঁর এই কৃপাধারা বৃষ্টিধারার ন্যায় অব্যাহত থাকে।

—o—

শ্রীবামের করুণাধন্য সস্ত্রীক গোপীনাথ নরসুন্দর

তারাপীঠের অদূরে পোপাড়া সাহাপুর গ্রাম। সেই গ্রামের অধিবাসী গোপীনাথ নরসুন্দর। দীর্ঘদিন বিবাহিত জীবন যাপন করা সত্ত্বেও পুত্রমুখ দর্শন হ'ল না। এই নিদারুণ দুঃখ গোপীনাথ ও তাঁর স্ত্রী কর্পূরী দাসীর অন্তরে সব সময় রয়েছে।

সন্তানের জন্য স্বামী স্ত্রী বহু জায়গায় ঘুরেছেন কিন্তু কোন ফল হয়নি।

কর্পূরীদাসীর পিতা উত্তম নরসুন্দরের অন্তরেও নাতিমুখ দর্শন করতে না পারার বেদনা রয়েছে। তাঁর কন্যা কর্পূরীদাসীর বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে।

অবশেষে গোপীনাথ ও কর্পূরীদাসী ঠিক করলেন সর্ব দুঃখহর ও বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার শ্রীচরণে তাঁদের মনের বাসনা নিবেদন করবেন।

কিন্তু কি করে যাবেন বামদেবের কাছে? সব সময় তাঁর দর্শন প্রার্থী হয়ে আসছেন একদিকে সাধুসন্ত, জ্ঞানী গুণী লোক অন্যদিকে গৃহীভক্ত ও সর্বস্তরের আর্ততাপিত নরনারী। তাছাড়া বামদেবের শিষ্য ভক্ত ও পাণ্ডারা সব সময় বামদেবকে ঘিরে রয়েছেন। তাই এই বিরাট জনারণ্যের মধ্যে কি করে তাঁরা বামদেবের কাছে গিয়ে পৌঁছবেন?

অবশেষে তাঁরা বামদেবের অন্যতম প্রিয় পাণ্ডা শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাণ্ডাকে ধরলেন। সব শুনে নগেন পাণ্ডা সহৃদয়তার সাথে গোপীনাথ নরসুন্দর ও তাঁর স্ত্রী কর্পূরীদাসীকে বামদেবের কাছে নিয়ে গেলেন।

১৩১৫ সালের প্রারম্ভের এক প্রসন্ন প্রভাত। বামদেব শিষ্যভক্ত পরিবৃত হয়ে তাঁর আশ্রমে বসে আছেন। নগেন পাণ্ডার সাথে সস্ত্রীক

গোপীনাথ নরসুন্দর বামদেবের কাছে এলেন। বামদেবকে দর্শন ও প্রণাম করে স্বামী স্ত্রী করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নগেন পাণ্ডা বামদেবকে জানালেন তাঁদের পুত্র সন্তান বাসনার কথা এবং অনুরোধ করলেন বামদেবকে যেন আশীর্বাদ করেন যাতে পুত্র সন্তান হয়।

সব শুনে বামদেব গোপীনাথের স্ত্রী কর্পূরীদাসীকে বললেন, "আমার ঘরের মধ্যে কলাই ভাঁজা আছে। কোথায় কলাই ভাঁজা আছে, যদি খুঁজে নিয়ে আসতে পারিস তবে তোর সন্তান হবে।"

বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ বামদেবের একথা শুনে অসীম আনন্দে ও আগ্রহে কর্পূরীদাসী বামদেবের আশ্রম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ঘরটি প্রায় অন্ধকার,। তিন দিক বন্ধ ও পূর্ব দিকে একটি মাত্র দরজা। সেই দরজায় প্রায়ই তালা থাকে। এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে মড়ার খুলি, মড়ার চাটাই, একটি বড় লোহার সিন্ধুক প্রভৃতি রয়েছে। তাছাড়া অনেক বিষধর সাপ এই নির্জন, নিস্তব্ধ ও প্রায়ান্ধকার ঘরে সানন্দে বিরাজ করে।

শ্রীবামের কৃপায় কর্পূরীদাসী সেই প্রায় অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলেন। এক অপার্থিব শক্তিতে তিনি যেন আজ শক্তিময়ী। তাই নির্ভয়ে এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে মড়ার খুলি, মড়ার চাটাই, সিন্ধুক ও সাপের আবাসের মধ্যে কলাই ভাঁজা খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে পরশমণি বাবার মত সেই কলাই ভাঁজা সুদ্ধ পাত্রটি খুঁজে পেলেন। আনন্দে কলাই ভাঁজা ভর্তি পাত্রটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বামদেবের পায়ের কাছে রাখলেন।

বামদেব সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "তোর একটি ছেলে হবে। পুত্র সন্তান একটিই হবে। আর রান্না ঘরে কুকুরে যদি ঢুকে হাড়ি খায় (ভাত খায়) তো ফেলতে পারবি না। তবে কুকুরে তোর হাড়ি খাবেনা।"

বামদেবের এই আশীর্বাদ শুনে স্বামী স্ত্রী পরম আনন্দ লাভ করলেন। গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে বামদেবকে প্রণাম করে তাঁরা বাড়ী ফিরে গেলেন।

যে মাসে কর্পূরী দাসীকে বামদেব আশীর্বাদ করলেন, সেই মাস থেকেই কর্পূরী দাসীর গর্ভ হ'ল।

অবশেষে এক বছর বাদে ১৩১৬ সালে কর্পূরী দাসীর একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করলো। আনন্দময় বামদেবের আশীর্বাদধন্য এই মহা-সৌভাগ্যবান পুত্রের নাম রাখা হ'ল আনন্দ নরসুন্দর।

আর কি আশ্চর্য, বামদেবের আশীর্বাদের সময় থেকেই গোপীনাথ নরসুন্দরের বাড়ীতে সবসময় কুকুর রয়েছে। ঘরেও ঢোকে কিন্তু হাড়ি অর্থাৎ ভাত খায়না। মাত্র একবার কর্পূরী দাসীর জীবিতকালে কুকুর হাড়ি স্পর্শ করেছিল।

১৩২০ সালে গোপীনাথ নরসুন্দর দেহত্যাগ করেন। পুত্র আনন্দ নরসুন্দরের বয়স তখন চার বছর মাত্র।

গোপীনাথের পত্নী কর্পূরীদাসী দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। ১৩৫৮ সালে ৮৩ বছর বয়সে বামকৃপাধন্যা এই সৌভাগ্যবতী মহিলা কর্পূরী দাসী দেহত্যাগ করেন। পুত্র আনন্দ নরসুন্দরের বয়স তখন ৪২ বছর।

১৩৭৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন তারাপীঠে ৬২ বছর বয়স্ক আনন্দ নরসুন্দর লেখককে উপরোক্ত কাহিনী বলেন। লেখক এজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীশ্রীবামদেবের আশীর্বাদে যাঁর জন্ম, সেই পরম ভাগ্যবান আনন্দ নরসুন্দর যথার্থ আনন্দময় পুরুষ। আনন্দ নরসুন্দর সহৃদয়তার সাথে লেখককে আরো জানান যে, বাড়ীতে এখনও কুকুর আছে। ঘরেও ঢোকে, কিন্তু ভাতের হাড়ি কখনো স্পর্শ করেনা।

আনন্দ নরসুন্দরের সাথে যোগাযোগ করে দেবার জন্য তারাপীঠের রামকানাই যামিনীরঞ্জন ধর্মশালার নিকটবর্তী জয়তারা হোটেলের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন নাগের কাছেও লেখক আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

—o—

রাঙ্গাবাবুর মরদেহ ত্যাগ

একদিন বামদেবের একটি অত্যন্ত প্রিয় কুকুরছানা রাঙ্গাবাবুকে দেখা গেল জীবিত কুণ্ডের ধারে মরে পড়ে আছে। এই কুকুর ছানা রাঙ্গাবাবুকে বামদেব কখনো 'রাঙ্গাবাবা' আবার কখনো 'রাঙ্গাবাবু' বলে আদর করে ডাকতেন। প্রধানত 'রাঙ্গাবাবু' নামেই বামদেব ডাকতেন বেশী।

বামদেবের নিত্যসেবক 'নোদা' (নন্দাহাড়ি) জীবিতকুণ্ডের ঘাটে গিয়ে 'রাঙ্গাবাবুকে মৃত অবস্থায় দেখে বামদেবকে এসে বললো, "বাবা, আপনার রাঙ্গাবাবু জীবিতকুণ্ডের ঘাটে মরে পড়ে আছে।"

বামদেব তখন তাঁর আশ্রমে পূর্বমুখী হয়ে বসে আছেন। নোদার কথা শুনে বামদেব চুপ করে রইলেন। তন্ময় হয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ।

নোদা আবার রাঙ্গাবাবুর মৃত্যু সংবাদ জানালো। তারপর পুনরায় বললো, "বাবা, রাঙ্গাবাবুকে এখানে নিয়ে আসবো?" একথা শুনে বামদেব এবার কথা বললেন। নোদাকে বললেন, "হ্যাঁ বাবা, নিয়ে আসুন তো।"

নোদা মৃত কুকুর ছানা রাঙ্গাবাবুকে নিয়ে এল। বামদেব তাঁর প্রিয় রাঙ্গাবাবুকে কোলে নিয়ে মাথায় "শিবং দুর্গাং" ইত্যাদি বলে জপ করে তারপর নোদাকে সমাজ দিতে (মাটি চাপা দিতে) বললেন। তারপর পশ্চাৎ দেশ ঘষতে ঘষতে জীবিত কুণ্ডের কাছে এসে তাঁর প্রিয় সেবক নগেন বাগচিকে বললেন, "নগেন বাবা, এই কুকুরটি পুরুষ না মেয়্যা।"

যুবক নগেন বাগচি বললেন, "বাবা, এই কুকুরটি পুরুষ।"

একথা শোনামাত্র তিনি দু'হাত তুলে পরম বিস্ময়ের সাথে বললেন, "তাহলে আমরাও মরেছি বাবা?"

বামদেবের এই কথার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও অর্থবহ। সগুণ ব্রহ্ম হলেন পরম পুরুষ। প্রকৃতি তার বাম অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয়েছেন।

তাই সৃষ্টির আদি মহাপ্রাণ হলেন পুরুষ্। তিনি অনন্ত অমর অক্ষয় অবিনশ্বর। তাই পুরুষের মৃত্যু নেই। পুরুষের মৃত্যু হলে সবই ধংস হয়ে যাবে। সবই মৃত্যুর মাঝে বিলীন হয়ে যাবে। তাই পুরুষের মৃত্যু শুনে বামদেব পরোক্ষভাবে এই ইঙ্গিতই করলেন যে পুরুষের মৃত্যু নেই। তাহলে সমগ্র প্রকৃতিই ধংস হয়ে যাবে।

'পুরুষ' বলতে তিনি স্থূল অর্থে পুরুষদেহ রূপী প্রকৃতির জীবকে বোঝাননি। 'পুরুষ' বলতে তিনি সূক্ষভাবে পরম স্রষ্টাকেই বুঝিয়েছেন।

উপরোক্ত কাহিনীটির জন্য লেখক বামদেবের দিব্য সঙ্গধন্য শ্রীনগেন বাগচির কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বাংলা ১৩৭৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন শ্রীনগেন্দ্র নাথ বাগচি লেখককে উপরোক্ত কাহিনীটি বলে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

—০—

সংগীতানন্দে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা

সজল কাজল মেঘের আনাগোনা তারাপীঠের আকাশে বাতাসে। প্রকৃতি দেবী শান্ত স্নিগ্ধ মধুর রূপে সুসজ্জিতা।

প্রকৃতির সজল সরস সঞ্জীবনী রূপ দেখতে দেখতে শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা আনন্দে মগ্ন। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে তিনি পরমাপ্রকৃতি তারামাকেই দর্শন করছেন সর্বত্র। ব্রহ্মময়ী তারামা-ই জগত ও জীব হয়ে বিরাজ করছেন। তাই ত্রিলোকেশ্বরী তারামায়ের জগৎরূপ দেখতে দেখতে ভাবে বিভোর হলেন বামদেব। বামদেব বসে আছেন তাঁর আশ্রমে। বামদেবের চারপাশে তাঁর কিছু শিষ্য ও ভক্ত তন্ময় হয়ে

বামদেবের এই আনন্দময় ধ্যান মগ্ন রূপ দর্শন করছেন। তাঁদের মধ্যে ময়ুর ভঞ্জের হরিভূষণ বাবু, অবিনাশ বাবু, উমেশ চক্রবর্তী, রসিক গোঁসাই, নগেন পাণ্ডা, ভূপতি পাণ্ডা, জনৈক সাধু ও জনৈক ফকিরসাহেব প্রভৃতি রয়েছেন। বামদেবের অন্যতম ভক্ত ও কনকপুর স্কুলের শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও পাশে বসে বামদেবকে তন্ময় হয়ে দেখছেন। তাঁর মনে পড়লো কয়েকদিন পূর্বের একটি ঘটনা। তার সাথে তারাময় বামদেবের একটি অমৃতময় বাণী।

একদিন সকালবেলা বামদেবের কাছে এসেছেন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সারাদিন আধ্যাত্মিক কথায় সময় কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এল। তখন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বামদেবকে বললেন, "বাবা, আমি বাড়ী যাই, নইলে মা (শ্বাশুড়ী) ভাববেন।"

তাই শুনে বামদেব বললেন, "আরে পাগল, জগন্মাতা তারামার কাছে থাকলে কোন ভাবনা থাকে না।"

বামদেবের একথা শুনে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপলব্ধি করলেন যে জগন্মাতা তারামা'র কাছে থাকলে অন্যলোকের ভাবনা নিরর্থক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব চেয়ে শান্তি নিরাপদ ও আনন্দময় আশ্রয় হ'ল তারামায়ের এই অমৃতময় কোল। এই মহাজ্ঞানই সেদিন তারাময় বামদেব তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

যাহোক, তন্ময়তা ভেঙ্গে বামদেব একবার সবার দিকে তাকালেন। তারপর হরিভূষণ বাবুর উদ্দেশ্যে বললেন, "বাবা হরি, একটা গান করুন।

হরিবাবু সশ্রদ্ধ চিত্তে বললেন, "বাবা সেই গানটা করি। এই বলে মধুর কন্ঠে গান ধরলেন—

"কহরে মন তারা তারা
রহরে মন তারাপুরে।
মিছা কেন ভব দুঃখে মর আর ঘুরে ফিরে
দ্বারকা নাম ধারিণী পাপহারিণী প্রবাহিনী কূলে।
মহাশ্মশান মাঝে তারা বিরাজে শাল্মলী মূলে।
উন্মীলিত করি নেত্র

দেখরে এই মহাতীর্থ
যে ক্ষেত্র পরশ মাত্র
জীবের কর্ম সূত্র যায় গো দূরে।
বামাচরণ বামাদি করি
কামাদি করি সব জয়
সমাধি ধরি সকল ছাড়ি
সবে পরমানন্দময়।
তারাপদাজ পরিমল
পানে মত্ত অবিরল
তারা ভেবে তারাপাগল
ভাসে যুগল আঁখি নীরে ॥

গান শেষ হ'ল। তারাভাবে বিভোর বামদেব। একটু পরে আনন্দিত স্বরে বললেন, "বেশ বাবা।"

তারপর তাঁর সামনে উপবিষ্ট তাঁর ভক্ত জনৈক সাধুকে বললেন, "সাধুবাবা, এক্ষণে আপনি একটা স্তব বলুন।"

সাধু তা শুনে ভক্তি ভরে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য কর্তৃক রচিত বিখ্যাত যমুনা স্তব 'মধুবনচারিণী ভাস্কর কাহিনী জাহ্নবী সঙ্গিনী সিন্ধু সুতে' মধুর স্বরে পাঠ করলেন।

সব শুনে বামদেব ও উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দ খুবই আনন্দ পেলেন। বামদেব প্রসন্ন চিত্তে সাধুকে বললেন, "বেশ সাধুবাবা, বড় সুন্দর স্তব, একটা গান করুন বাবা।"

সাধু মধুর স্বরে গাইতে লাগলেন মহাসাধক রামপ্রসাদের বিখ্যাত গান—

"তারা নামে সকলি ঘুচায়
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা
সেটাও নিত্য নয়।
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা, তোর কাজেও তেমনি ধারা
তেমনি দেখতে পাই।

যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে
পেয়ে নাশ ভয়।
ওমা, তুমি তো অন্তরে থাক
সময় বুঝতে হয়॥
যার পিতামাতা ভষ্ম মাখে
তরুতলে রয়।
তার তনয়ের ভিটেয় টেকা
এ বড় সংশয়।
প্রসাদে ঘেরেছে তারা
প্রসাদ পাওয়া দায়।
ভাই বন্ধু থেকোনা কেউ
রামপ্রসাদের আশায়॥

এই অপূর্ব রামপ্রসাদী গান শুনে তারাময় বামদেবের বিশাল নয়ন বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল।

একটু পরে বামদেব আবেগ ভরে বললেন, "বড় সুন্দর গান। 'তারা নামে সকলি ঘুচায়' বটে। এই আমার সংসার বন্ধন সব ঘুচে কেমন শিমুলতলা আর ছেঁড়া ক্যাঁথা সার হয়েছে। আবার ছেঁড়া ক্যাঁথাটাও সব দিন নয়। আর বাবা, মা আমার ভষ্ম মাখে শ্মশানে মশানে থাকে। আমার কি আর লোকালয়ে থাকা শোভা পায়? আমার শিমুলতলা শ্মশান বড়ই ভাল।"

বামদেবের কথা শেষ না হতেই উমেশ বাবু ভাবের আবেগে রামপ্রসাদের গান ধরলেন—

"মা তোদের খ্যাপার হাট বাজার
গুণের কথা কব কার
কর্ত্তা যিনি খ্যাপা তিনি
খ্যাপার মূলাধার।
(আবার) চাকলা ছাড়া চেলা দু'টো
সঙ্গে অনিবার (মা তারা),
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্ কদাচার

মণি মুক্তা ত্যাজে গলে পরিস্
নরশির হার॥
শ্মশানে মশানে বেড়াস্
কার বা ধারিস্ ধার
ওমা রামপ্রসাদকে ভব ঘোরে
কত্তে হবে পার॥"

গান শুনে সবাই আনন্দিত। স্বয়ং বামদেব গান শুনে আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। এই সময় ভক্ত গায়ক হরিবাবু বামদেবকে বললেন, "বাবা, আপনার সেই গানটি 'নগর হতে কানন ভাল' করুন।

বামদেব তা শুনে সানন্দে সুমধুর স্বরে গাইতে লাগলেন। হরিবাবুও বামদেবের সাথে গান শুরু করলেন—

"নগর হতে কানন ভাল
সেথায় নাইকো কোন কোলাহল
মন একবার আনন্দে তারা তারা বল্।"

গান শেষ করেই বামদেব সহসা গাইতে লাগলেন—

"মরবো আর অমনি যাব
ব্রহ্মে মিশাইয়ে
কিবা ফল আছে বল
সংসারে থাকিয়ে।
সংসারেই সুখসার
ভগলিঙ্গ একাকার।"

গভীর ভাব ও নিবিড় দরদের সাথে আসন্ন মহাপ্রস্থানের সংকেত দিয়ে বামদেব গান শেষ করলেন। মহাকাশে সূর্য অস্তাচলের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে পূরবীর সুর যেন ধ্বনিত হচ্ছে চির বিদায়ের বেদনা নিয়ে। উপস্থিত সবাই গভীর ভাবে বামদেবের এই সংগীতের ইঙ্গিত উপলব্ধি করে এক অব্যক্ত বেদনায় স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

—০—

পুরীতে শ্রীবামের অলৌকিক পূজা

শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা বাবার নয়নে সবই তারামা। পরমা প্রকৃতি তারামা-ই অনন্তরূপে অনন্তভাবে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করছেন। অনন্ত ভাষায় তাঁর নিত্য সেবা পূজা অর্চনা চলছে অবিরাম। এই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন শ্রীবামের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান।

পরম ব্রহ্মক্ষেত্র তারাপীঠের অন্তর প্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতি সবই তারামা।

তাই পরম ব্রহ্মবিদ বামদেবের কাছে জপ ধ্যান মন্ত্র পূজা প্রভৃতি যেমন তারামা তেমনি তারামায়ের শ্রীপাদপদ্ম, মন্দির, মূর্তি, মহাশ্মশান, জীবিত কুণ্ড, দ্বারকা নদী প্রভৃতি এবং সাধু-সন্ত, পাণ্ডা ও লোকজন সবই তারামা।

আবার এই তারামা-ই ভারতের দিকে দিকে একশো আট সতীপীঠে একশো আট রূপে ও নামে বিরাজিতা। তাঁর ভৈরব স্বরূপ মহেশ্বরও একশো আট সতীপীঠে একশো আট রূপে ও নামে বিরাজিত।

কিন্তু বিচিত্র বৈচিত্র্যময় ব্যাপার হ'ল নীলাচলে তথা পুরুষোত্তমে তথা পুরীতে। সেখানে সত্যযুগে সতীদেবীর নাভিপদ্ম পতিত হয়েছে। সেখানে তিনি বিমলা রূপে সুপ্রসিদ্ধা। তাঁর ভৈরব রূপে কিন্তু সেখানে মহেশ্বর নেই। সেখানে বিরাজ করছেন স্বয়ং জগন্নাথ দেব।

শ্রীবিষ্ণু জগন্নাথই দেবী বিমলার ভৈরব। এই মহাশক্তি পীঠের অধিশ্বরী দেবী বিমলা। মহাশক্তি বিমলা দেবী মূলত আদ্যাশক্তি কালী তথা ব্রহ্মময়ী তারা। তাঁর ভৈরব শিব। অথচ এই নীলাচল তথা পুরীতে তাঁর ভৈরব হলেন শ্রীবিষ্ণু জনার্দন জগন্নাথ।

এই বিচিত্র বিস্ময়কর ব্যাপার সারা ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। শক্তিপীঠের ভৈরব বিষ্ণু, তা জগতে কোথাও দেখা যায় না। আবার বলা যায়, বিষ্ণুক্ষেত্রের মধ্যে শক্তিপীঠ ও জগতে দেখা যায় না।

এই দুই বিপরীত মেরু এক বিন্দুতে কি করে মিলিত হ'ল তা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার।

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল যে, দেবী বিমলার ভৈরব জগন্নাথের নিত্য ভোগ নিবেদিত হয় তারা মন্ত্রে।

এই পরম বৈষ্ণব ক্ষেত্রে মহাবিষ্ণুর পূজা ও ভোগ নিবেদন হয় মহাশক্তি মহাবিদ্যা তারামন্ত্রে। বৈষ্ণব ও শাক্তের এই মহামিলন একমাত্র পরম ব্রহ্মক্ষেত্রেই সম্ভব। নীলাচল তথা পুরুষোত্তম তথা পুরী সেই পরম ব্রহ্মক্ষেত্র।

তাই পরম ব্রহ্মক্ষেত্র তারাপীঠের সাথে পুরীর অধ্যাত্ম একাত্মতা রয়েছে যুগ যুগ ধরে। তাই পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রায় তারামা থাকেন রথে। যেমন সেই সময় রথযাত্রায় তারাপীঠে তারামাও রথে থাকেন এবং তারাপীঠ পরিভ্রমণ করেন। (দ্রষ্টব্য তারাপীঠে রথযাত্রা ২য় খণ্ড)। তাই দিব্য ব্রহ্মক্ষেত্র পুরীর সাথে তারাপীঠের আত্মিক-যোগ অভিন্ন রয়েছে।

পুরুষোত্তম শ্রীবাম তাই জগন্নাথ ও বিমলা দেবীর দর্শনের জন্য পুরী রওনা হলেন। নারায়ণ ও মহাদেবীর এই অতি দুর্লভ দিব্য শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থিতি দর্শন করা অশেষ সৌভাগ্যের ব্যাপার।

তারাপীঠে রথযাত্রার পর একদিন বামদেব দু'একজন সেবক ভক্ত সহ মহাতীর্থ পুরী চললেন।

শ্রীবাম পাল্কী করে তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট এলেন। তারপর যথা সময়ে রামপুরহাট থেকে ট্রেনে উঠলেন। বর্ধমানে নেমে পুনরায় পুরীর ট্রেনে উঠে পরদিন পুরী পৌঁছলেন।

শিবকল্প মহাযোগী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ভক্তগণ সহ পুরীর মন্দিরে এলেন। হাজার হাজার বছরের সুপ্রাচীন এই ঐতিহ্য মণ্ডিত মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে জগমোহন পার হয়ে মূল মন্দিরে প্রবেশ করলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করে দীর্ঘক্ষণ ভাবস্থ হয়ে রইলেন। জগন্নাথ ও শিব, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন তা শ্রীবাম প্রত্যক্ষ করলেন।

শ্রীবাম তারামাকেই দেখলেন দেবী সুভদ্রার মধ্যে। তারামায়ের

অন্তররূপের একরূপ 'দেবীভদ্রা'। সেই 'দেবীভদ্রা-'ই সুভদ্রারূপে এখানে বিরাজিতা।

রথযাত্রার সময় পুরীতে এই দেবী সুভদ্রার রথেই তারামায়ের ভোগ মূর্তিকে স্থাপন করা হয়। এ যেন তারামা তথা ভদ্রা তথা সুভদ্রার এক অদ্বৈত ভাবরূপকেই প্রকাশ করছে।

আর বলরাম যেন জগন্নাথ ও সুভদ্রা তথা শিব শক্তির আনন্দময় অদ্বৈতরূপ দর্শন করে বিমোহিত ও দারুভূত হয়ে রয়েছেন সাক্ষী স্বরূপ। বলরাম যেন নিত্য অমৃতময় ব্রহ্মের প্রেমময় সাকার বিগ্রহ। তাই জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম তথা শিব শক্তি ব্রহ্ম যেন সৎ চিৎ ও আনন্দরূপ বিগ্রহ। এই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই এখানে নিত্য আনন্দঘন রসবিগ্রহ রূপ বিরাজমান।

শিবাবতার শ্রীশ্রীবামদেব অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পানে। তাঁর দু'নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা বইছে।

দীর্ঘক্ষণ পরে তিনি বের হলেন জগন্নাথ দর্শন করে। তারপর চলছেন জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সতীপীঠ-মণ্ডিত দেবী বিমলার মন্দিরে। সত্যযুগে এই পবিত্র স্থানেই সতীদেবীর নাভিপদ্ম পতিত হয়েছে শ্রীবিষ্ণু চক্রে ছিন্ন হয়ে। যেতে যেতে এক ভক্ত প্রশ্ন করলেন, "বাবা, এই দারুভূত জগন্নাথ মূর্তি যত দেখি ততই ভাল লাগে। এত আকর্ষণ করে কেন?" তা শুনে প্রসন্ন কন্ঠে তিনি বললেন, "ওরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম যে জগন্নাথের এই শ্রীবিগ্রহের মধ্যে রাখা আছে। তাই ভক্তের হৃদয়ে জগন্নাথ মূর্তি এত মধুর এত আকর্ষণীয়। যুগ যুগ ধরে ভগবান যে ভক্তকে আকর্ষণ করে চলেছেন।"

আরেক ভক্ত প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু বাবা, বার বছর পর পর তো শ্রীবিগ্রহ পাল্টানো হয়। নতুন বিগ্রহ তৈরী হয় সব। এই নব-কলেবরের আকর্ষণ কি করে সম্ভব?"

শ্রীবাম বললেন, "ওরে শাল, তখন জগন্নাথের সেই নতুন শ্রীবিগ্রহের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণের সেই পবিত্র নাভি সযত্নে রেখে দেয়। এ ভাবেই তো বরাবর চলছে।"

কথা বলতে বলতে সবাই বিমলা মন্দিরের কাছে এলেন। বিমলা মন্দিরের পূর্বে জগন্নাথ দেবের সুবিশাল কারুকার্য্য মণ্ডিত সুপ্রাচীন মন্দির। মাঝখানে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব বিস্তৃত সুবিশাল চত্বর। ভারতের অগণিত সাধু সন্ত ও ভক্ত যাত্রীগণ যুগ যুগ ধরে এই পবিত্র স্থান দিয়ে মন্দিরে মন্দিরে যাতায়াত করেছেন। জগতগুরু শঙ্করাচার্য্য থেকে রামানুজ, মাধবাচার্য্য, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামদাস কাঠিয়াবাবা, ভাস্করানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, তোতাপুরী মহারাজ, ভোলানন্দ গিরি, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, মাধবানন্দ গিরি মহারাজ প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রায় সকল মহাসাধক সাধিকা এই মহাপবিত্র পথ দিয়ে শ্রীজগন্নাথ মন্দির, বিমলা মন্দির, লক্ষ্মী মন্দির প্রভৃতি মন্দিরে যাতায়াত করেছেন। আজো লক্ষ লক্ষ সাধক ভক্তের পবিত্র স্পর্শ মণ্ডিত এই বিশাল আঙ্গিনায় নিত্য সাধক ভক্ত ও যাত্রীদলের অবিরাম আসা যাওয়া চলছে। পুরীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব রথযাত্রার সময় তা শতগুণ বৃদ্ধি পায়। তারাপীঠেও রথযাত্রা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। জগন্নাথ ও তারামায়ের এই আত্মিক যোগ বিশেষ ভাবে লক্ষ্মনীয় (দ্রষ্টব্য তারাপীঠে রথযাত্রা ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা —২য় খণ্ড)।

অবশেষে বিমলা দেবীর মন্দিরের সামনে উপস্থিত হলেন শ্রীশ্রীবাম সদল বলে। পাণ্ডারা জানালেন মন্দির বন্ধ। কিছুক্ষণ পূর্বে পূজা ও ভোগ নিবেদন হয়ে গেছে। এখন ভোগ রাগের পর বিশ্রামের সময়। তাই মন্দির বন্ধ। কয়েক ঘন্টা পর আবার খুলবে। শ্রীবাম পূজা করতে চাইলেন দেবী বিমলাকে এখনি। কিন্তু পাণ্ডারা মন্দির খুলতে অসম্মত হলেন।

জগত জননী মা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছেন অথচ শত শত মাইল দূর থেকে পুত্র ছুটে এসেছে মাকে দর্শন করতে অনাহার ও অনিদ্রা নিয়ে। তবু মা ছেলেকে দেখবেন না ? ডাকবেন না কাছে আদর করে ? একি রকম কথা ! কি রকম আচরণ !

এই বিসদৃশ ভাব ও আচরণ তারাময় তথা মা'ময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার ভাল লাগলো না। তিনি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হলেন। শ্রীবামের কাছে

ঈশ্বর তথা জগত জননী হলেন নিজের গর্ভধারিনীর ন্যায়। সম্পূর্ণ মা'ময় তিনি। তাই মান অভিমান, আদর আবদার সবই মায়ের ওপর করেন। তাই শ্রীবামের প্রচণ্ড অভিমান হ'ল তারামায়ের ওপর।

তারামা-ই এই পুরীর মন্দিরে সুভদ্রা রূপে ও বিমলা রূপে এবং লক্ষ্মী রূপে বিরাজ করছেন। অথচ তাঁর বরপুত্র আদরের 'ক্ষ্যাপা'কে মন্দিরে ঢুকতে দিচ্ছে না পাণ্ডাগণ, এই ব্যবহারে শ্রীবাম তারামা তথা মা বিমলার ওপর ভীষণ রেগে উঠলেন। তাঁর কাছে পাণ্ডারা নিমিত্ত মাত্র। তারামা তথা মা বিমলাই তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না, তাঁকে ছলনা করে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তাই মনে হ'ল শ্রীবামের। মহা ক্রোধে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। নাদ সিদ্ধ শ্রীবাম 'তারা' বলে বজ্রগম্ভীর স্বরে ডেকে উঠলেন। সমগ্র মন্দির ও চারপাশ যেন বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ শব্দে কেঁপে উঠলো।

উপস্থিত পাণ্ডাগণ ও উপস্থিত যাত্রীগণ ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে কোন বিরাট মহাপরুষ আজ এই মন্দিরে এসেছেন।

পাণ্ডাগণ কি করবেন ভেবে পেলেন না। দেবীর বিশ্রামের সময় মন্দির খোলা নিষেধ। অথচ এই বিরাটকায় ভীমভৈরব মূর্তির রুদ্র রূপও পরম ভীতিপ্রদ।

করুণাময় শ্রীবাম পাণ্ডাদের অবস্থা উপলব্ধি করলেন। তিনি ইচ্ছা করলে পাণ্ডাদের দিয়ে বিমলা মন্দিরের দরজা এখনি খোলাতে পারেন। কিন্তু তাতে এদের ওপর অনেক ঝামেলা অশান্তি আসবে। করুণাবতার শ্রীবাম তা চান না।

তাই তিনি এক অলৌকিক লীলা শুরু করলেন। সহসা যোগবলে আরেক মূর্তি ধারণ করে মন্দিরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সবাই মহা বিস্ময়ে এই অলৌকিক ব্যাপার দেখতে লাগলেন। বন্ধ দরজার সামনে এসে শ্রীবামের বিশাল নব কলেবর সহসা মিলিয়ে গেল দরজার সাথে।

সাথে সাথে মন্দিরের ভেতরে শ্রীবামের বজ্র নির্ঘোষ কন্ঠ শোনা গেল। অভিমান ভরে মা বিমলাকে শ্রীবাম নানান কথা বলছেন। একটু পরে শ্রীবাম মা বিমলাকে পূজা করতে লাগলেন। তাঁর উদাত্ত কন্ঠস্বর, পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ, পূজারতি প্রভৃতি মন্দিরের দরজার বাইরে থেকে সবাই মহা বিস্ময়ে শুনতে লাগলেন।

বিমলা মন্দিরে মহাযোগী ও মহাতান্ত্রিক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অলৌকিক প্রবেশ ও এই অলৌকিক দিব্য পূজার কথা মন্দিরের বাইরে বামদেবের ভক্ত, পাণ্ডা এবং সমবেত কৌতুহলী যাত্রীদের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বঙ্গদেশের তারাপীঠের এক সিদ্ধ মহাপুরুষ এসে বিমলা মন্দিরের ভেতর পূজা করছেন অলৌকিক-ভাবে প্রবেশ করে—এই মহা আশ্চর্যকর ব্যাপার শুনে জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাগণ ও বহু স্থানীয় লোক এবং কিছু সাধুসন্ত ছুটে এলেন।

বিমলা মন্দিরের বন্ধ দরজায় কান পেতে তাঁরাও শুনতে লাগলেন শ্রীবামের গুরু গম্ভীর কন্ঠস্বর। এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হ'ল। বাইরে বিশাল জনতা অপেক্ষা করতে লাগলো দরজা খোলার অপেক্ষায়। মন্দির খোলার সময় হ'ল। এদিকে শ্রীবামও প্রাণ ভরে তাঁর পূজা শেষ করলেন।

অন্তর্যামী শ্রীবাম বুঝতে পারলেন বাইরে বিশাল জনতা তাঁর দর্শনের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাঁকে দর্শন মাত্র শুরু হবে হৈ চৈ হট্টগোল।

শ্রীবাম স্বভাবত নির্জনতা প্রিয়। এসব ভীড় গোলমাল খ্যাতির বিড়ম্বনা তিনি পছন্দ করেন না।

সর্বদর্শী শ্রীবাম দেখলেন তাঁর ভক্তগণ বিমলা মন্দিরের বাইরে একধারে বসে আছে। আর দরজার সামনে পাণ্ডাগণ ও স্থানীয় লোকজন ভীড় করে আছে। এদিকে বিমলা মন্দিরের দরজা খোলা আরম্ভ হ'ল। শ্রীবাম পলকে যোগবলে মন্দিরের বাইরে চলে এলেন। এদিকে বিমলা মন্দিরের দরজা খুলতেই সমবেত জনতা মন্দিরে ঢুকে শ্রীবামকে খুঁজতে লাগলেন। এই অবসরে বামদেব তাঁর ভক্তগণকে নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরের বাইরে চলে এলেন।

ওদিকে পাণ্ডাগণ ও অন্য সবাই বিমলা মন্দিরের ভেতর সর্বত্র খুঁজেও বামদেবকে দেখতে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

তারাপীঠের এই বিরাট সিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক ভাবে প্রবেশ ও পূজা করা এবং অলৌকিক ভাবে অদৃশ্য হওয়ায় উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। অথচ বামদেবের এই দিব্য পূজার চিহ্ন বিমলা মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে রয়েছে। রাশি রাশি ফুল বেল পাতা জবা ছড়িয়ে রয়েছে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে। ধূপ দীপ প্রজ্বলিত রয়েছে। চারদিকে অপূর্ব সুগন্ধ। মা বিমলার দিব্যমূর্তিও আশ্চর্য উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল অতি প্রসন্ন ও হাস্যমণ্ডিত। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে সবাই মুগ্ধ। মনে হয়, এইমাত্র কে যেন পূজো করে উঠে চলে গেলেন। অথচ মন্দির বন্ধ করবার সময় এসব কিছুই ছিল না।

এদিকে শ্রীবাম তাঁর সেবক ভক্তগণ সহ হাটতে হাটতে পুরীর স্বর্গদ্বারে এলেন। সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত নীলসমুদ্র দেখে শ্রীবাম ভাবস্থ হলেন। অসীমের প্রতীক এই নীল সমুদ্র যেন সাকার ব্রহ্মের মুখর রূপ। বেশ কিছুক্ষণ বামদেব এই দৃশ্য উপভোগ করলেন। স্বর্গদ্বারের পাশেই স্বর্গদ্বার শ্মশান। শ্রীবাম এই নির্জন শ্মশানে মনের আনন্দে প্রবেশ করলেন। একদিকে জনমানব শূন্য ধু ধু বালুকারাশী অন্য দিকে বিশাল নীলসমুদ্র। অগণিত উত্তাল ঢেউ সগর্জন করে সশব্দে নির্জন বেলাভূমিতে এসে অবিরাম আছড়ে পড়ছে। শ্রীবাম সেদিন স্বর্গদ্বার শ্মশানেই অতিবাহিত করবেন স্থির করলেন। শ্মশান ও সমুদ্র একই সাথে পাওয়া খুবই আনন্দদায়ক। জীবন মৃত্যু যেন একই সাথে নৃত্য চঞ্চল।

পরদিন শ্রীবাম পুরী থেকে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দু'দিন পর যথাসময়ে ভক্তগণসহ তারাপীঠে ফিরে এলেন।

শ্রীবাম বিহনে সমগ্র তারাপীঠ যেন আঁধারে নিমজ্জিত ছিল। শ্রীবাম তারা মন্দিরে এসে সানন্দে তারামাকে দর্শন করলেন। প্রাণাধিক প্রিয় 'ক্ষ্যাপা'কে দেখে তারামাও প্রসন্না হলেন। তারামায়ের দিব্য মূর্তি উজ্জ্বল ও হাস্য মধুর হ'ল।

তারামাকেই আরেক দেশে আরেক বেশে দেখে এসে শ্রীশ্রীবামা-

ক্ষ্যাপাও অশেষ আনন্দ ও শান্তি পেলেন। তার সাথে মহাতীর্থ নীলাচলে তথা পুরীতে মা বিমলাকে করে এলেন অলৌকিক দিব্য পূজা।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক মহোপাধ্যায় মুরারী মোহন বেদান্ত তীর্থশাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

১৯৮৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী শনিবার তিনি লেখককে উপরোক্ত কাহিনী বলেন। তারামা ও বামদেবের কি বিচিত্র লীলা! উপরোক্ত কাহিনী লেখককে ব্যক্ত করবার সময়েও তারামা বামদেবের একটি অলৌকিক লীলা ঘটে এই দীন লেখককে কেন্দ্র করে। যথাসময়ে যথাস্থানে (দ্রষ্টব্য—বামদেবের বিদেহ লীলা শ্রীশ্রীবামপঞ্জী, পঞ্চম খণ্ড) তা বর্ণিত হবে।

—o—

শ্রীবাম সান্নিধ্যে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ

ভারতের অধ্যাত্ম জগতের অন্যতম বিশিষ্ট অধ্যাত্মবিদ, সুপণ্ডিত ও সাধক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় তন্ত্রসাধনার শ্রেষ্ঠ পীঠ তারাপীঠে এলেন মহাতান্ত্রিক ও রাজযোগী মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপা বাবাকে দর্শন করতে। বামদেবকে দর্শন ও প্রণাম করবার সাথে সাথে বামদেব এই শুদ্ধসাত্বিক যুবকের মধ্যে এক উন্নত সাধকের সুলক্ষণ সকল দেখতে পেলেন। শুদ্ধ আধার সম্পন্ন প্রমথনাথের তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্র শাস্ত্র সম্পর্কে অসীম আগ্রহ দেখে বামদেব প্রমথনাথের উন্নত আধারে অকৃপন ভাবে ঢেলে দিলেন তন্ত্রের নিগূঢ় ঐশ্বর্য সকল।

তন্ত্র সাধনা, তান্ত্রিক ক্রিয়া কর্ম ও তন্ত্রের ক্রম পর্য্যায় তথা পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচারের নিগূঢ় প্রক্রিয়া সকলও বামদেব ধীরে ধীরে প্রমথনাথকে শিক্ষা দিলেন।

তন্ত্রমতে সাধনের ক্ষেত্রে তন্ত্রসিদ্ধ গুরু ছাড়া অগ্রসর হওয়া যায়না। যিনি এই কঠিন দুর্গম পথে স্তরে স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তিনিই একমাত্র তাঁর উপযুক্ত শিষ্যকে এপথে সিদ্ধিলাভ করাতে পারেন।

মহাতান্ত্রিক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা শুধু তন্ত্রসিদ্ধ নন, তিনি তন্ত্রের চরম স্তর কুলনাথের নাথ তথা দ্বিতীয় শিবস্বরূপ। তাই তন্ত্রের সকল ধারাতেই তিনি স্বয়ং সিদ্ধ। তাই এই ভয়ঙ্কর মধুর দুর্গম পথে তিনি অবাধে বিচরণ করেন। তাছাড়া বামদেব যোগপথেও পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন অনায়াসে। হঠযোগ সিদ্ধির পর তার চরম অবস্থা রাজযোগেও সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং অষ্টসিদ্ধি তাঁর স্বভাবত করায়ত্ব। তাছাড়া কায়াত্যাগ, কায়া নির্মাণ ও কায়াভেদ ও পরকায়া প্রবেশ প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়াগুলো তিনি তাঁর অজস্র লীলায় বহুবার প্রদর্শন করেছেন জীব কল্যাণে জগৎ কল্যাণে।

তাই শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার দিব্য আশ্রয়, দিব্যসঙ্গ ও প্রত্যক্ষ উপদেশ ও নির্দেশ লাভ করে ধন্য হলেন প্রমথনাথ। তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনার বহু দুর্লভ ঐশ্বর্য তিনি লাভ করেন পরম করুনা-ঘন বামদেবের কাছ থেকে।

অনেক তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ তাঁর শিষ্য ছাড়া এই পরম গুপ্ত সাধন ঐশ্বর্য অপর কারোকে দেননা কিন্তু শিবস্বরূপ বামদেব অকৃপণ ভাবে তা অফুরন্ত ধারায় বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাছে আগত সকল যথার্থ শিক্ষার্থীকে। এখানেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়।

বামদেবের দিব্য কৃপা লাভ করে ধন্য হলেন মহান সাধক প্রমথ নাথ। উত্তরকালে তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্র দর্শন ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি ভারতে এক উচ্চস্থান লাভ করেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম হয় স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ। একাধারে অপার জ্ঞান, অফুরন্ত কর্মধারা এবং অসীম ভক্তি এই ত্রিধারার মধুর সমন্বয় ঘটে তাঁর অধ্যাত্ম জীবনে। ভারতের অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সুচিহ্নিত হ'ল বহুমুখী প্রতিভা সমন্বিত এক তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ রূপে।

একাধারে দেশপ্রেমিক, মহাজ্ঞানী, বিশিষ্ট তান্ত্রিক, মহান সাধক, ভক্ত, কবি ও বহু বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থের সুলেখক রূপে তিনি কালক্রমে

সর্বজন শ্রদ্ধেয় হ'ন। বাংলা ১২৮৫ সনে (ইংরেজী ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ২৭শে আগষ্ট) শুভ জন্মাষ্টমীর দিন এই মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। বাল্যকাল থেকেই অধ্যাত্ম ভাবধারায় তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপনার জগতে প্রবেশ করেও অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় অধ্যাত্ম পথেই নিজেকে চালিত করেন।

তিনি বামদেবের কৃপালাভ করবার পর পরবর্তীকালে বামদেবের কৃপাধন্য বিশিষ্ট তন্ত্র সিদ্ধ পুরুষ কুমারখালির শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গ ও কৃপালাভ করেন।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের বিশিষ্ট গ্রন্থ 'তন্ত্রতত্ত্ব'র ইংরেজী অনুবাদ শিবচন্দ্রের বিশিষ্ট শিষ্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচাপতি স্যার উডরফ করলেও তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় তথা স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ।

তিনি বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। পরে এসব প্রবন্ধের সঙ্কলন স্বরূপ বেদ ও বিজ্ঞান, 'পুরান ও বিজ্ঞান', 'তপোবনের বাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ হ'ল, 'জপসূত্রম' (ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ছয় খণ্ডে রচিত), 'ইতিহাস ও অভিব্যক্তি', 'সংগীতাঞ্জলী', 'বিচিত্র শ্লোক মঞ্জুরী', Approches to truth, Patent wonder, You-tram mean you, Metaphysics of physics, Science and Sadhana, Mean you, Malli Bithika প্রভৃতি।

বাংলা ১৩৮০ সালে প্রায় ৯৫ বছর বয়সে এই মহাপুরুষের তিরোভাব ঘটে।

—o—

ভক্তপ্রবর দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

বামদেব বসে আছেন শান্তভাবে তাঁর আশ্রমে। প্রসন্ন সকাল। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় তারাপীঠের আকাশ বাতাস উদ্ভাসিত। এই মহেন্দ্র লগ্নে একটি দশ এগার বছরের বালক বামদেবকে দর্শন করতে তারাপীঠের অদূরবর্তী খরুণ গ্রাম থেকে তারাপীঠে এল। বালকের নাম দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। খরুণের এক বিখ্যাত বনেদি বংশে জন্ম। এই অভিজাত সম্পন্ন পরিবারটি তিন পুরুষ ধরে বামদেবের ভক্ত। বামদেব এই ভক্ত গৃহে একাধিকবার পদার্পণ করেছেন।

বালক দোলগোবিন্দের পিতা কালীপ্রসন্ন এবং পিতামহ অক্ষয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বামদেবের বিশেষ গুণমুগ্ধ ও বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। বামদেব তারাপীঠ থেকে খরুনে এলেই অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে পদার্পন করতেন।

তাছাড়া খরুণে তাঁর ভক্ত নকড়ি রায় ও আশু কর্মকারের গৃহেও পদার্পণ করতেন। তাই বালক দোলগোবিন্দ ছোটবেলা থেকেই বামদেবকে তার পিতৃগৃহে আসা যাওয়া করতে দেখে।

তাছাড়া কখনো বাবা কালীপ্রসন্ন ও ঠাকুরদা অক্ষয় চন্দ্রের সাথে তারাপীঠে বামদেবকে দর্শন করতে এসেছে একাধিকবার। কখনো নিজেও চলে আসে বামদেবের কাছে। বামদেব স্নেহ করেন এই ধর্মপ্রাণ বালককে। বালক দোলগোবিন্দ বামদেবকে প্রণাম করলো প্রাণ ভরে। বামদেব শ্রান্ত ক্লান্ত পিতৃহীন বালক দোলগোবিন্দকে সাদরে কাছে টেনে আশীর্বাদ করলেন।

জনৈক সেবককে বললেন দোলগোবিন্দকে জল মিষ্টি দিতে। জলযোগ করে সে বিশ্রাম করতে লাগলো।

বামদেবের আশ্রিত এই তিন পুরুষের ভক্ত পরিবার। দোলগোবিন্দ ভক্ত পরিবারের অন্যতম পুরুষ। এই ভক্ত বংশের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

আছে। দোলগোবিন্দের ঠাকুরদাদা অক্ষয় চন্দ্রের বয়স যখন মাত্র দেড় বছর তখন অক্ষয় চন্দ্রর পিতা রামলাল চট্টোপাধ্যায় সন্ন্যাসী হয়ে যান। দোল গোবিন্দের পিতা কালীপ্রসন্নও অপরিণত বয়সে সংসারের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন।

সর্বজ্ঞ বামদেব জানতেন যে কালী প্রসন্নর সংসার ভোগ শেষ হয়ে গেছে। তাই কালীপ্রসন্ন বাবুর দেহত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি তাঁর গৃহে উপস্থিত হ'ন।

কালীপ্রসন্নর পিতা অক্ষয়চন্দ্র বামদেবকে তাঁর এই পুত্রের অসুস্থতার কথা বামদেবকে বলবার চেষ্টা করলেন কিন্তু বামদেব নানান অধ্যাত্মকথা বলে সে কথা তুলতেই দিলেন না। তার কিছু-কাল পরই কালীপ্রসন্ন বাবু দেহত্যাগ করলেন।

তাঁর বালক পুত্র দোলগোবিন্দ পিতামহ অক্ষয়চন্দ্রের সাথে মাঝে মাঝে তারাপীঠে এসে বামদেবকে সশ্রদ্ধ চিত্তে দর্শন করে যায়। তারাপীঠের কাছেই অক্ষয়চন্দ্রের মনোরম একটি বাগান বিরাজমান। এই বাগানে প্রায়ই কালীপ্রসন্ন আসতেন। সাথে থাকতো তাঁর পিতা অক্ষয়চন্দ্র ও পুত্র দোলগোবিন্দ।

এই বাগানের ফল নিয়ে তাঁরা তারাপীঠে এসে তারামা ও বামদেবকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতেন।

কালীপ্রসন্নর মৃত্যুর পর পুত্র শোকাতুর পিতা অক্ষয়চন্দ্র তাঁর নাতি দোলগোবিন্দকে নিয়ে মাঝে মাঝে বাগানে আসেন বিষন্ন হৃদয়ে। পুত্রের স্মৃতিচারণ করেন আপন মনে। তারপর শোক জর্জরিত অক্ষয়চন্দ্র নাতি দোলগোবিন্দকে নিয়ে শ্রীবাম দর্শনে অদূরবর্তী তারাপীঠে আসেন। এই ভাবে পিতৃহীন বালক দোলগোবিন্দ তাঁর দাদুর সাথে বামদেবকে দর্শন ও বামদেবের সান্নিধ্য লাভ করতে থাকে।

করুণাময় বামদেবও সহৃদয়ভাবে পিতৃহীন বালক দোলগোবিন্দকে এবং পুত্রহীন বৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্রকে নানান আধ্যাত্মিক কথা বলে সান্ত্বনা দেন। এভাবে দিন কাটতে থাকে।

দোলগোবিন্দের জন্ম বাংলা ১৩০৪ সনে। ছোটবেলা থেকে চৌদ্দ

বছর পর্যন্ত এই ভাগ্যবান কিশোর বামদেবের দর্শন, সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করে।

বাংলা ১৩১৮ সনে ২রা শ্রাবণ বামদেব তাঁর এই মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। তখন দোলগোবিন্দের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। বামদেবের তিরোধান শ্রীবামকৃপাধন্য কিশোর দোলগোবিন্দের পক্ষে মর্মান্তিক হয়। শ্রীবামের দিব্য সান্নিধ্য ও কৃপা এবং উপদেশের স্মৃতি বুকে নিয়ে দোলগোবিন্দ জীবন পথে যাত্রা শুরু করলো।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দর্শন ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি যুবক দোলগোবিন্দের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। ক্রমে দর্শন ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হন। তার সাথে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রামপুরহাটে ওকালতি শুরু করেন। পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কাজেও তাঁর উৎসাহ দেখা যায়। রামপুরহাটে সংস্কৃত টোল তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। একাধারে সুপণ্ডিত, আইনজীবি ও বিশিষ্ট সংগঠক রূপে তিনি জনজীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পারিবারিক জীবনেও তিনি সহৃদয় ও কর্তব্যপরায়ন গৃহস্বামী রূপে সুচিহ্নিত হন।

তাঁর পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা তাঁর সংসার জীবনকে পূর্ণ করে তোলে। পুত্র কন্যাদের প্রতি তাঁর কর্তব্য যথারীতি সুসম্পন্ন করেন।

কিন্তু এই সকল জাগতিক কর্মধারার বাইরে একান্ত নিভৃতে তিনি বামদেবের সাধনস্মৃতি ও সান্নিধ্য স্মৃতি জাগ্রত করে অধ্যাত্ম পথে গভীর ভাবে অগ্রসর হন।

মাঝে মাঝে তারাপীঠে চলে যান শ্রীবামের সূক্ষ্ম সান্নিধ্যের আশায়।

বাল্য ও কৈশোরের সুমধুর বহু স্মৃতি বিজড়িত এই পবিত্র অধ্যাত্ম ভূমিতে বসে আপন মনে স্মৃতি চারণ করেন। তার সাথে প্রাণ ভরে করুণাময় বামদেবের দিব্য লীলা সকল আস্বাদ করেন। বামদেবের অনেক লীলা কাহিনী তিনি শুনেছেন তাঁর ঠাকুরদাদা অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পিতা কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং ভক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কাছ থেকে।

এভাবে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় পথে ভক্তপ্রবর দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে।

মাতৃভক্ত দোলগোবিন্দবাবু তাঁর মাতৃদেবীর দেহত্যাগের সময় মাতৃদেবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দেবেন। অবশেষে বাংলা ১৩৭৪ সনে (ইংরেজী ১৯৬৭) সত্তর বছর বয়স্ক দোলগোবিন্দবাবু গয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এক শুভদিনে গয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন বাড়ী থেকে। যাবার পথে তিনি তাঁর অনুগত গাড়োয়ানকে সহসা বললেন, "আমি আর থাকবো না। বাবুদের দেখিস্।"

গয়ায় পৌঁছে যথারীতি শাস্ত্রীয় নিয়মে পিণ্ড দিলেন। পিণ্ড দেবারপরই হঠাৎ তাঁর বুকে ব্যাথা হ'ল। বীর ভক্ত দোলগোবিন্দবাবু উপলব্ধি করলেন যে তাঁর মরদেহ ত্যাগের মহালগ্ন উপস্থিত এই পবিত্র ধামে।

প্রশান্ত চিত্তে শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মে দেহত্যাগ করলেন। এই অপূর্ব মৃত্যু দেখে উপস্থিত ধর্মপ্রাণ নরনারীগণ সবাই আশ্চর্য হলেন।

দোলগোবিন্দবাবুর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সাধনবাবু ও অন্যান্যগণ গয়া থেকে ট্যাক্সি করে তারাপীঠে নিয়ে আসেন এবং দোলগোবিন্দ বাবুর পূর্ব ইচ্ছানুসারে তারাপীঠ মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ল।

একদা যে মহাপুরুষের দর্শন ও কৃপা নিয়ে বালক দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই মহাপুরুষ বামদেবের কৃপায় তাঁরই নিত্য লীলার স্থানে এসে দোলগোবিন্দবাবুর দীর্ঘ জীবনের যাত্রা শেষ হ'ল।

লীলাময় বামদেব সাদরে কোলে তুলে নিলেন প্রিয় ভক্তকে। শিবাবতার বামদেবের চির শান্তিময় ও চির আনন্দময় কোলে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে রইলেন ভক্তপ্রবর দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসাধন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ১৯৭১ সালে তিনি লেখককে বলেন উপরোক্ত কাহিনী।

—o—

শ্রীবামের আশির্বাদধন্য সপুত্র
যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা

তারাময় বামদেবের নিত্যলীলার অন্যতম সহচর নগেন পাণ্ডার শ্যালক শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা বামদেবের কৃপাধন্য পাণ্ডাদের মধ্যে অন্যতম।

ভক্তপ্রবর যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডার জন্ম বাংলা ১২৮৬ সনের আঠাশে অগ্রহায়ণ। ছোটবেলা থেকে বামদেবকে দর্শন ও কৃপালাভ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়। বামদেবের অন্ত্যলীলা যখন শুরু. হয় (বাংলা ১৩০০ সন) তখন বালক যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। কিন্তু সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে (১৩০০—১৩১৮ সন) বামদেবের অন্ত্যলীলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময় কিশোর থেকে যুবকে পরিণত হন যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা এবং বত্রিশ বছর পর্যন্ত বামদেবের বহু দিব্যলীলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানবার সৌভাগ্য তাঁর হয়।

তাঁর বত্রিশ বছর বয়সে বামদেব তাঁর বিশাল মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন।

যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডার পিতা অম্বিকা চরণ পাণ্ডা বামদেবের সমসাময়িক হলেও বামদেবের মাহাত্ম্য তিনি বিশেষ উপলব্ধি করতে পারেন নি। সেদিক থেকে তাঁর পুত্র যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা বামদেবের মাহাত্ম্য বেশী-ভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে বামদেবের কৃপায় যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডার জ্যেষ্ঠ পুত্র বালক শ্যামাচরণ পাণ্ডা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসায় যতীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ভক্তি বামদেবের প্রতি আরো বৃদ্ধি পায় এবং বামদেবের অপার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডার তিন পুত্র (শ্যামাপদ, গুরুপদ ও রমাপদ) ও পাঁচ কন্যা।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাপদর বয়স যখন সাত বছর তখন শ্যামাপদ গুরুতর অসুস্থ হয়। বিশিষ্ট বৈদ্যগণের দ্বারা চিকিৎসা করানো সত্ত্বেও বালক শ্যামাপদর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ক্রমে অন্তিম অবস্থা ঘনিয়ে এল।

বালক মৃত্যু মুখে পতিত হ'বার পথে এগিয়ে চললো। সবাই হতাশও বিষণ্ণ। বালককে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই দেখে যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা তাঁর স্ত্রী এবং আত্মীয় স্বজন আসন্ন শোকের সম্ভাবনায় বিষাদে মগ্ন হলেন।

এই সময় একদিন বামদেব যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় তিরিশ বছর বয়স্ক যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা জ্যেষ্ঠ পুত্রের চিন্তায় জর্জরিত। সহসা বামদেবকে দেখতে পেয়ে বাড়ীতে ডেকে আনলেন। তারপর বামদেবকে ছেলের অসুস্থতার কথা জানিয়ে অসুস্থ ছেলে শ্যামাপদকে বামদেবের চরণে রাখলেন।

একটু পরে শান্তভাবে বামদেব যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডাকে বললেন, "বালকটিকে তুলে নে"।

বামদেবের নির্দেশ মত তিনি বালক শ্যামাপদকে বামদেবের শ্রীপাদপদ্ম থেকে তুলে নিলেন। বামদেব তাঁর গন্তব্য পথে চলে গেলেন। বালক শ্যামাপদ আশ্চর্য ভাবে আরোগ্য লাভ করলো।

উত্তরকালে যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা তাঁর রচিত 'তারাপীঠ মাহাত্ম্য' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বামদেবের একটি অতি সংক্ষিপ্ত জীবনীও দিয়েছেন (কয়েক পৃষ্ঠার)।

তারাপীঠের বিষয় নিয়ে তিনি উপরোক্ত গ্রন্থ রচনার প্রায় ১২ বছর পূর্বে (বাংলা ১৩৪২ সনে) পদ্যের আকারে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপিটি তাঁর পরিচিত কয়েকজন লোক দেখতে নিয়ে গিয়ে আর ফেরৎ না দেয়ায় তিনি পুনরায় গদ্যের আকারে উপরোক্ত 'তারাপীঠ মাহাত্ম্য' গ্রন্থটি রচনা করেন (১৩৫৪ সনে)। তখন তাঁর বয়স আটষট্টি বছর।

যতীন্দ্র মোহন পাণ্ডা কর্মযোগী পুরুষ রূপে সুচিহ্নিত। জগত জননী তারামায়ের পূজা ছাড়াও অধ্যাত্ম চিন্তা, সাধুসঙ্গ, অতিথি সেবা, সংগীত, যন্ত্র সংগীত, তন্ত্রশাস্ত্র ও জ্যোতিষ চর্চা, তারামন্দির ও শিব মন্দির

সংস্কার এবং তারামন্দিরে নতুন নাটমন্দির নির্মাণ (১৩৪২ সনে), স্কুল নির্মাণ এবং যাত্রী নিবাস নির্মাণ, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি বহুমুখী কাজের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মযোগী পুরুষরূপে খ্যাতি লাভ করেন। শিবাবতার বামদেব ছাড়াও তিনি তারাপীঠে আগত একাধিক বিশিষ্ট সাধক সাধিকার সান্নিধ্য ও কৃপালাভ করেন।

প্রথম জীবনে মোক্ষদানন্দ ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা, মধ্য জীবনে চক্রবর্তীবাবা, পঞ্চানন মিত্র, দয়ানন্দ সরস্বতী, ললিত গোঁসাই, কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি এবং শেষ জীবনে আনন্দময়ী মা ও রাঙামা'র সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করেন।

মাত্র পয়তাল্লিশ বছর বয়সে সাধক ও ভক্ত এবং কর্মযোগী পুরুষ যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা প্রিয়তমা পত্নী শরৎ সুন্দরী দেবীর দেহত্যাগের পর নিজেকে সংসার জীবন থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে তারামায়ের সেবা ও সাধনার মাঝে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন।

কয়েক বছর পরে শ্রীরামযাদব ভট্টাচার্য্য নামে এক উন্নত ভক্ত সাধকের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা লাভ করেন।

অবশেষে বাংলা ১৩৬৯ সনের ৭ই ফাল্গুন রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে তিনি তারামায়ের কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করেন।

দেহত্যাগের সময় তাঁর হয়স হয়েছিল ৮৬ বছর ২ মাস ১ দিন। তারাপীঠে মহাশ্মশানে তাঁর শেষ কৃত্য যথারীতি সম্পন্ন হয়।

পরবর্তীকালে তারাপীঠ মহাশ্মশানে তাঁর সৌধ স্মৃতি স্থাপিত হয়।

যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডার উপরোক্ত কাহিনীর ব্যাপারে লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্যামাপদ পাণ্ডা ও তাঁর ছোট ভাই ডাক্তার গুরুপদ পাণ্ডার কাছে। তাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাপদ পাণ্ডাও লেখকের সুপরিচিত। ১৯৭০-৭১ সাল থেকে দীর্ঘকাল লেখক তারাপীঠের বিভিন্ন উন্নয়নের কাজকর্ম (তারামায়ের মন্দির সংস্কার, চন্দ্রচূড় শিবমন্দির সংস্কার।) জীবিত কুণ্ড সংস্কার, রথের ঘর নির্মাণ প্রভৃতি) বিশিষ্ট কর্মযোগী ডাক্তার গুরুপদ পাণ্ডাকে দিয়ে সুসম্পন্ন করান। তারাপীঠের সর্বজন পরিচিত প্রবীণ গুরুপদ পাণ্ডাও তাঁর পিতার ন্যায় বহুগুণে গুণান্বিত।

—০—

শ্রীবাম করুণাধন্য কালীদাস লাহিড়ী ও উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শরৎকাল শেষ হয়ে আসছে। এই সময় অর্থাৎ বাংলা ১৩১৫ সালের ২৩শে আশ্বিন শুক্রবার সকালে কলকাতার এন্টালী পদ্মপুকুর নিবাসী শ্রীকালীদাস লাহিড়ী ও নদীয়া জেলার হরিনাথপুর নিবাসী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য একত্রে কলকাতা থেকে তারাপীঠ এলেন বামদেবকে দর্শন করবার জন্য।

উভয়ের তারাপীঠে আসাটা বহিরঙ্গে যেমন আকস্মিক তেমনি অন্তরঙ্গে শ্রীবাম নির্দিষ্ট দেখা যায়। বিশেষ করে কালীদাস বাবুর বামদেবের কাছে আসবার ব্যাপারে সব চেড়ে বড় অবদান স্বয়ং বামদেবের। অলৌকিক ভাবে তিনি বামদেবের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে তারাপীঠে এলেন। যদিও পুর্বদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে বামদেবের কাছে যাবার জন্য তাঁকে প্রথম প্রস্তাব দেন তাঁর এক বন্ধু ফরডাইস লেন নিবাসী শ্রীগুরুশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুশঙ্কর বাবুর নিজেরও আসবার কথা ছিল কালীদাস লাহিড়ীর সাথে কিন্ত শেষ মুহূর্তে তিনি না আসায় কালীদাসবাবু একাই আশ্চর্য অলৌকিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারাপীঠ রওনা হ'ন। হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে উঠে তাঁর সাথে পরিচয় হয় যুবক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সাথে। উপেন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন রামপুরহাটের বার মাইল দুরে নারায়ণপুর পাহাড়ে। সেখানে তার গুরুদেব তান্ত্রিকাচার্য্য কৈলাসপতি রয়েছেন। গুরুর কাছে পূর্ণাভিষিক্ত হ'বার জন্যই উপেন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন।

ট্রেনে কালীদাস বাবুর মুখে তাঁর অলৌকিক অভিজ্ঞতা শুনে তিনিও বামদেবকে দর্শন করবার জন্য ব্যাকুল হ'ন। তিনি ঠিক

করলেন যে মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপাকে প্রথমে দর্শন করে তারপর নারায়ণপুর পাহাড়ে তাঁর গুরুর কাছে যাবেন। উভয়ে একত্রে মনের আনন্দে তারাপীঠে এলেন বামদেবকে দর্শন করতে। মূলত কৃপাময় বামদেব উভয়কেই আকর্ষণ করেছেন।

দ্বারকানদী পার হ'বার পূর্বেই বামদেবের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী শ্যামানন্দ তারাপীঠের দিক থেকে দ্বারকা পার হয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন। তারপর কালীদাস বাবুকে বললেন, "আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন? আপনার ব্যাগে কি মদ ও গাঁজা আছে? যদি থাকে তো শিগ্‌গীর মদের বোতলটা বার করে দিন।"

কালীদাস লাহিড়ী এই অলৌকিক ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সত্যিই তিনি গতরাত্রে কলকাতা থেকে আসবার সময় আশ্চর্য্যভাবে গাঁজা ও মদ কেনেন বামদেবের জন্য। কিন্তু এই ব্রহ্মচারী কি করে জানলেন? কালীদাস বাবুকে ভাবতে দেখে ব্রহ্মচারী বললেন, "আমি বামাক্ষ্যাপার সেবক। রাত্রে তিনি আমায় বললেন, একটা ছোঁড়া কলকাতা হতে আমার জন্য ব্যাগে করে সাহেব বাবাদের রক্ত বিলাতি কারণ ও গাঁজা নিয়ে আসছে। আর সঙ্গে আরেকটা ছোঁড়া আছে, তাদের পথ দেখিয়ে শিগ্‌গীর নিয়ে আয়। আমার বড় কারণের পিয়াস লেগেছে। শিগ্‌গীর যা।" ঐ অন্ধকারে আপনাদের কোথায় খুঁজে বেড়াব। একটু দেরীতে বেরিয়েছি।" কালীদাস বাবু সানন্দে ব্যাগ থেকে মদের বোতলটি বের করে দিলেন। ব্রহ্মচারী তা নিয়ে দ্রুত ফিরে চললেন। কালীদাসবাবু ও উপেন্দ্রনাথ তাঁকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে দ্বারকা পার হয়ে মহাশ্মশানের শিমূলতলায় এলেন।

তাঁরা সশ্রদ্ধ চিত্তে দেখলেন তারাপীঠের সদা জাগ্রত ভৈরব মহাযোগী বামাক্ষ্যাপা বসে আছেন ভক্ত পরিবৃত অবস্থায়। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মচারী। বামদেব কারণ পান করছেন। তাঁর এক হাতে কারণের কপাল পাত্র রয়েছে, অন্য হাতে কালীদাস বাবুর দেয়া উন্মুক্ত হুইস্কির বোতলটি। বোতল থেকে কপাল পাত্রে একটু করে ঢেলে খাচ্ছেন। খেতে খেতে কিছুটা মদ মহাশ্মশানের মাটিতে ঢেলে দিয়ে বললেন, "যে ক'দিন আছি একটু খেয়ে নে মা।"

ক্রমে বামদেবের বিশাল নয়নদ্বয় আরক্তিম হয়ে উঠলো। নাদসিদ্ধ বামদেব 'তারা তারা' বলে ডাকলেন মেঘমন্দ্রিত স্বরে।

তাঁর এই 'তারা' ডাকের মধ্যে এক অপূর্ব গভীর গম্ভীর ও মধুর মাধুর্য্যের অপূর্ব সমাহার উপস্থিত সবার হৃদয় তন্ত্রীতে শিহরণ জাগালো।

একটু পরে বামদেব শ্যামানন্দকে বললেন, "জানিস রে শাল, রাত্রি সাতটায় গাঁজা কিনিয়েছি, রাত্রিতে গাঁজা দেয়রে শাল? রাত আটটায় মদ কিনিয়েছি। পাছে গাড়ি না পায় তাই ইঞ্জিনে আগুন জ্বালিয়ে গাড়ি থামিয়ে রেখেছিলুম। শুধু কি তাই, টিকিট পর্যন্ত কিনতে দিইনি।"

কালীদাস বাবু বামদেবের কথা শুনে সানন্দে মহাবিস্ময়ে আনন্দাশ্রু ফেলতে লাগলেন।

গত রাত্রের সব ব্যাপারই বামদেবের প্রতিটি কথাই সত্যি। একদিকে অলৌকিক অন্যদিকে আশ্চর্য সত্য। কালীদাস বাবু গত রাত্রে কলকাতা থেকে তারাপীঠে আসবার সময় বামদেবের জন্য অসময়ে গাঁজা কিনতে গিয়েও আশ্চর্য ভাবে গাঁজা পেলেন। শুধু পাওয়া নয়, গাঁজার দামও নিলেন না দোকানদার বামদেবের নাম শুনে।

বিলেতি নাম্বার ওয়ান হুইস্কি এক বোতল কিনলেন, কথা প্রসঙ্গে বামদেবের নাম শুনে মদের দোকানের কর্মচারী মদের দাম সামান্য নিলেন। তারপর প্রায় ১২ মিনিট বিলম্বে এসেও গাড়ি পেলেন এবং তিনি ওঠা মাত্রই গাড়ি ছেড়ে দিল। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, না জেনেই তিনি গাড়িতে উঠে পড়েছিলেন! ঐ গাড়িই যে রামপুরহাট যাবে তা-ও তিনি জানতেন না।

তার ওপর তিনি তাড়াতাড়ির জন্য টিকিটও কাটতে পারেন নি। বিনা টিকিটেই যাচ্ছিলেন। অথচ সারা পথে টিকিট চেকার সবার কাছে টিকিট চাইলেন কিন্তু তাঁর কাছে টিকিট চাইলেন না।

এতগুলো পর পর আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনার তাৎপর্য এতক্ষণে বামদেবের কথা শুনে কালীদাস বাবু উপলব্ধি করতে পারলেন অসীম আনন্দে। এ সবই বামদেবের অলৌকিক কৃপার নিদর্শন। কাল রাতে

বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত যেন তিনি একটা আশ্চর্য ঘোরে ছিলেন। কে যেন পর পর সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। তিনি যে স্বয়ং বামদেব, তা এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন। তারাপীঠে বসেই সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ বামদেব তাঁকে আকর্ষণ করে কলকাতা থেকে তারাপীঠে নিয়ে এলেন। পথে সঙ্গীভক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকেও জুটিয়ে দিলেন। শিবাবতার বামদেব স্থূলদেহে তারাপীঠে বিরাজ করলেও সূক্ষ্মে সর্বত্র বিরাজ করছেন। সবার অন্তরে তিনি অবস্থান করছেন। তাই তাঁর লক্ষ কোটি নয়ন ত্রিভুবনে সর্বত্র সমভাবে সদা উন্মিলিত ও প্রসারিত।

বামদেবের নির্দেশে জনৈক পাণ্ডা কালীদাস বাবু ও উপেন্দ্রনাথকে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন বিশ্রাম ও চা জলখাবার খাওয়ানোর জন্য।

চা খাবার খেয়ে ও একটু বিশ্রাম করে আবার তাঁরা শিমূলতলায় বামদেবের কাছে এলেন। এই সময় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিংয়ের ম্যানেজার এক ঝুড়ি দরবেশ ও সন্দেশ নিয়ে এলেন। বামদেবকে প্রণাম করে নিবেদন করলেন সব মিষ্টি। বামদেব সামান্য কিছু গ্রহণ করলেন এবং বাকি সকল মিষ্টি উপস্থিত সকলকে ও অন্যান্যদের বিলিয়ে দেয়া হ'ল।

হঠাৎ বামদেব কালীদাস বাবুকে বললেন, "গাঁজাটা বার করে দে, তারামা'র পুজো করি।"

কালীদাস বাবু সানন্দে বের করে দিলেন। ব্রহ্মচারী শ্যামানন্দ গাঁজা তৈরী করে বামদেবকে দিলেন। বামদেব তারামাকে নিবেদন করে সজোরে টান দিলেন। তারপর স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

শ্যামানন্দ বললেন, "বাবা, তারামার চরণে পুষ্প দিতে হবে।"

বামদেব শান্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমরা আমাকে ধরে তোল।"

৭।৮ জন ভক্ত বামদেবকে ধরে তুললেন। তারপর তাঁকে তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মের সামনে নিয়ে এলেন।

প্রেমভক্তি মণ্ডিত দিব্য ও পবিত্র আনন্দাশ্রু দিয়ে তারামায়ের চরণে জবা ফুল দিতে দিতে বামদেব বললেন, "নে বেটী নে।"

উপস্থিত শিষ্যভক্ত মুগ্ধ নয়নে দেখলেন এই সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা ও পরম সাত্বিক পুষ্পার্ঘ্য।

একটু পরে বামদেব সেবক শ্যামলানন্দকে বললেন, "আজ মেলার দিন (তারা পূজা উপলক্ষ্যে সাতদিন ধরে বিরাট মেলা), তারামায়ের পুজো, মাছ ভাজা, মাছের ঝোল ও ভাত খাবো। তাই কর্।"

শ্যামলানন্দ বিব্রত হলেন। এখন দুপুর বেলা, এই অসময়ে মাছ কোথায় পাবেন? তিনি সবিনয়ে বামদেবকে তা জানাতেই বামদেব বললেন, "খুঁজে দেখ্‌না রে। ইচ্ছে যখন হচ্ছে, আজ খেতেই হবে।"

তারপর কালীদাস বাবু ও উপেন্দ্রনাথকে বললেন, "তো শালরা এখানে চুপ করে বসে আছিস কেন? মন্দিরের পেছন দিকে এগিয়ে দেখনা মাছ পাস কিনা। যা না ঠিক পাবি।"

বামদেবের নির্দেশে উভয়ে মাছের খোঁজে তারামায়ের মন্দিরের পেছন দিকের ছোট্ট রাস্তায় উপস্থিত হলেন।

রাস্তাটি পায়ে হাটা সরু মাটির পথ। পুব পশ্চিম বরাবর এই পথের বামদিকে সুউচ্চ তারামন্দির। ডান দিকে পাণ্ডাদের কয়েকটি মাটির ঘর। পূর্বে পাণ্ডা পাড়া ও তার পাশে কুমোর পাড়া।

যাহোক, এই সরু নির্জন পথ দিয়ে উভয়ে একটু এগিয়ে যাবার পর সহসা দেখতে পেলেন একটি শ্যামবর্ণা সুশ্রী যুবতী মেছুনি মেয়ে মাথায় করে একটি বড় জ্যান্ত কাতল মাছ নিয়ে আসছে।

মেছুনীর চেহারা এক আশ্চর্য স্নিগ্ধপূর্ণ। মেছুনী কাছে আসতেই সরু পথের একধারে কালীদাস বাবু ও উপেন্দ্রনাথ সরে দাঁড়ালেন।

মেছুনী তাঁদের পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলো। কিন্তু হঠাৎ কাতল মাছটি এক ঝাপটা দিয়ে মাটিতে পড়লো।

মেছুনী দ্রুত মাছটিকে ধরতে গেলে কালীদাসবাবু মেছুনীকে বললেন, "মাছটা কি বিক্রি করবে?"

উত্তরে মেছুনী তাঁদের দিকে অপার্থিব দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, "বিক্রি করবো না তো কি ঘরে ফেরত নিয়ে যাব?"

উত্তর শুনে কালীদাস বাবু আনন্দিত হয়ে মাছের দাম কত জিজ্ঞেস করলেন।

মেছুনী বললো, "এক টাকা।"

কালীদাস বাবু খুশি হয়ে পকেট থেকে একটাকা মেছুনীকে দিতেই চক্ষের নিমেষে মেছুনী অদৃশ্য হয়ে গেল। আর বিরাট কাতল মাছটা মাটিতে পড়ে লাফাচ্ছে।

যেই মেছুনী মিলিয়ে গেল সাথে সাথে কালীদাসবাবু ও উপেন্দনাথ যেন শক্তিহীন হয়ে পড়লো।

মেছুনীর আশ্চর্য আবির্ভাব, অপূর্ব দিব্য রূপ, সহসা মাছ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, এই তিনটি ঘটনা এত দ্রুত ঘটলো যে তাঁর প্রভাবে উভয়ে বিহ্বল হয়ে সজল নয়নে মাতৃহারা বালকের মত কাঁদতে কাঁদতে পাগলের ন্যায় মেছুনী মাকে খুজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও আর খুঁজে পেলেন না।

তারাময় বামাদেবের ইচ্ছে তারামা ছাড়া আর কে পূরণ করবেন? কৃপাময় বামদেবের ইচ্ছায় এই মহা সৌভাগ্যবান ভক্তদ্বয় আশাতীত-ভাবে ত্রিলোক জননীর দিব্য দর্শন লাভ করে মানব জীবন সার্থক করলেন। শুধু আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাভক্তি এবং সেবার দ্বারাও যে বিনা সাধনায় এই অহেতুকী কৃপা পাওয়া যায়, তা করুণাময় বামদেব দেখালেন তাঁর এই অপার কৃপা লীলার মাধ্যমে।

যাহোক, এই ১০।১২ সের কাতল মাছ নিয়ে কালীদাস বাবু ও উপেন্দ্রনাথ এলেন বামদেবের কাছে। মাছের দাম এক টাকা শুনে শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ও উপস্থিত সবাই খুশি হলেন।

লীলাময় বামদেব কালীদাস বাবুকে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরে, মাছের দাম দিয়েছিলি?"

কালীদাস বাবু অশ্রুসিক্ত কন্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ'।

সর্বজ্ঞ বামদেব মৃদু হেসে বললেন, "তো শালরা মেড়া, তোদের প্রাণটা বড় হাঁচর পাঁচড় করছে না?

উত্তরে ভাবাবেগে কালীদাস বাবু বললেন, "যা শক্তি সেল মেরেছেন, সহ্য করতে পারলে হয়।"

তাই শুনে সর্বজ্ঞ বামদেব বললেন দৃঢ় স্বরে, "সহ্য করবি না তো কি, যে বাস্তব কামনা নিয়ে এসেছিলি, সে কামনা তোর কখনো

পূর্ণ হবে না। নিস্কাম ভাবে মাকে ডাক। তাতে তোর ভালই হবে। কখনো অভাব হবে না।"

অতঃপর মাছ রান্না হ'ল। বামদেব তারামাকে ভোগ নিবেদন করে অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

বামদেবের প্রসাদ পেলেন কালীদাস বাবু ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। তারপর তারামা ও বামদেবকে প্রণাম করে বামদেবের আশীর্বাদ নিয়ে মহাভাগ্যবান কালীদাস লাহিড়ী ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তারাপীঠ ত্যাগ করে আপন আপন গন্তব্য স্থলে রওনা হলেন।

তাঁরা এসেছিলেন বামদেবকে দর্শন করতে। কৃপাময় বামদেবের অশেষ কৃপায় বিনা সাধনায় উভয়ে ত্রিলোক জননী তারামায়ের দর্শন পেলেন। দিনের বেলায় মধ্যাহ্নকালে এমন দিব্য দর্শন ও কথাবার্তা বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনাতেও হয় না।

শিবাবতার বামদেবকে সামান্য সেবা করে (গাঁজা ও মদ দিয়ে) ও শ্রদ্ধাভক্তি করে এই মুনি ঋষি বাঞ্ছিত পরম দর্শন লাভ করলেন এই মহাভাগ্যবান ভক্তদ্বয়। তাছাড়া বামদেবের কৃপায় কালীদাস বাবুর আর্থিক অভাব কখনো হয় নি।

শ্রীশ্রীবামদেবের অহেতুকী লীলার এক মধুর নিদশন হয়ে রইলেন পরম ভাগ্যবান কালীদাস লাহিড়ী ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক কালীদাস লাহিড়ীর মধ্যম পুত্র শ্রীমল্লিনাথ লাহিড়ীর কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

—o—

করুণাঘন বামদেব ও সেবক নোদা

মহাপীঠ তারাপীঠের পশ্চিমে দ্বারকানদীর ওপারে কবিচন্দ্রপুরের নন্দলাল দাই তথা নন্দাহাড়ি তথা নন্দপাটনী তথা নন্দকুটে তথা 'নোদা' বামদেবের নিত্যসেবক। বামদেবের এই অতিপ্রিয় সেবক 'নোদা' একাধারে বামদেবের নিত্য সহচর, সবেতন চাকর, ভক্ত ও লীলা পরিকর।

বিচিত্র প্রভু বামদেবের এই বিচিত্র সেবকের বহু বিচিত্র কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

নোদা সপরিবারে বামদেবের চির আশ্রিত।

নোদা জাতিতে ডোম এবং গলিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ। তবু তাকে ছাড়া বামদেবের চলেনা। করুণাময় বামদেব সবার অবাঞ্ছিত, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত নোদার সেবাই সর্বাধিক গ্রহণ করেন। মহাভাগ্যবান নোদা সুদীর্ঘকাল বামদেবের সেবা করলেও এবং বামদেবের পরমাশ্রয়ে থাকলেও এবং বামদেবের বহু অলৌকিক লীলা দর্শন করলেও ভক্তি ও একনিষ্ঠতা কি কঠিন ও দুর্লভ বস্তু তা সে উপলব্ধি করতে পারেনি।

করুণাময় বামদেব একদিন তাঁর এই নিত্য সেবককে তা উপলব্ধি করালেন এক আশ্চর্য লীলার মধ্য দিয়ে। তার সাথে সাথে 'নোদা'কে চিরতরে এই গলিত কুষ্ঠ থেকেও মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য 'নোদা'র, তাই সে তা নিতে পারলো না। তাঁর পূর্ব জীবনের সঞ্চিত বিশাল কর্মফল তথা 'প্রারব্ধ'ই নোদাকে তা নিতে দিলনা।

বামদেবের অন্তরঙ্গ সেবক ভক্ত নোদা বামদেবের অনেক মাহাত্ম্য জেনেছে অনেক লীলা দেখেছে তবু বামকৃপা ভক্তি সে একনিষ্ঠতার সাথে নিতে পারলো না। দুর্লভ ভক্তি ও একনিষ্ঠতার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলো না।

সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর একটানা বামদেবের নিত্য সেবা করেও 'নোদা' এই পরীক্ষায় সফল হতে পারলো না। শ্রীবামকৃপা ও বামতত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পারার এই তীব্র অনুশোচনা 'নোদা'র আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। করুণাময় বামদেব তাঁর এই নিতান্ত অশিক্ষিত সেবককে করুণাভরে এক বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তা উপলব্ধি করিয়ে দিলেন।

একদিন বামদেব মধ্যাহ্ন কালে তারামায়ের অন্নপ্রসাদ খাচ্ছেন। সাথে যথারীতি তাঁর কুকুর কুকুরীবৃন্দ। একই পাত থেকে বামদেব খাচ্ছেন এবং কুকুর কুকুরীরাও খাচ্ছে। অষ্টপাশ মুক্ত বামদেব নির্বিকার ভাবে খাচ্ছেন এদের নিয়ে। যেন স্নেহময় পিতা তাঁর পুত্র কন্যাদের নিয়ে খাচ্ছেন। বামদেব কখনো স্নেহভরে কোন কুকুরের মুখে এক গ্রাস ভাত গুজে দিচ্ছেন। আবার সেই হাতে ভাত মেখে নিজে খাচ্ছেন। একটু পূর্বেই এই কুকুরেরা শ্মশানের বাসি মড়া খেয়ে এসেছে। সেই মড়া যত না জীবজন্তুর তার চেয়ে বেশী মানুষের। বামদেব সবই দেখেন সবই জানেন। তবু প্রতিদিন দু'বেলা এদের নিয়েই একসাথে একপাতে খান।

একটি কুকুর সহসা অন্য কুকুরের ভাগ থেকে জোর করে একদলা মাছ ভাত নিজের মুখে পুরে দিল। অন্য কুকুরটি সরবে চিৎকার করে উঠলো। তাই দেখে বামদেব দোষী কুকুরটিকে এক চড় মেরে সেই কুকুরের মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে সেই চর্ব্বিত দলা বের করে সেই প্রতিবাদকারী কুকুরের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে পুনরায় বামদেব সেই হাতেই ভাত খেতে লাগলেন। শ্মশানের বিষাক্ত মড়া খেকো কুকুরের মুখের লালা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। বামদেব সেই বিষাক্ত লালা মিশ্রিত হাতেই যথারীতি সানন্দে খেতে লাগলেন। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ নন্দদাই তথা নোদা দূর থেকে ঘৃণা ভরে এই দৃশ্য দেখছে আর বামদেবের নিত্য কাজ করছে।

বামদেবের নিত্য কাজ হ'ল, বিছানা পরিস্কার করা। ঘর দোর পরিষ্কার করা। বামদেবের নিত্য ব্যবহার্য একটি পেতলের বাটি পরিস্কার করা ও তাতে জল আনা। বামদেবের কাপড়, গামছা, কৌপিন কাচা ইত্যাদি।

হঠাৎ বামদেব খেতে খেতে নোদাকে আদর করে ডেকে বললেন, নন্দলাল, আমার প্রসাদ খাবি ?"

নোদা বামদেবের দিকে তাকালো। বামদেবের চোখে পিচুটি, মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। তার ওপর কুকুরদের লালা মিশ্রিত ঐ ভাত। যা প্রসাদ বলে বামদেব দিতে চাইছেন।

নোদার কেমন ঘৃণা হ'ল বামদেবের প্রসাদ খেতে। নোদা তাই বামদেবের প্রসাদ খাবার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে চুপ করে রইলো।

কিন্তু করুণাময় বামদেব পর পর তিনবার একই কথা নোদাকে বললেন। নোদা সাড়া দিলনা। তখন বামদেব নিজেই একটি কলার পাতায় তাঁর প্রসাদ তথা সেই মাখা ভাত নোদাকে দিলেন।

নোদা অন্নপ্রসাদ ভর্তি কলাপাতাটি বামদেবের কাছ থেকে নিয়ে "পরে খাব" বলে রেখে দিল। মনে মনে বামদেবের এই প্রসাদের প্রতি নোদার ঘৃণা এল। বিশেষ করে বামদেবের সেই চোখে পিচুটি পড়া ও মুখ দিয়ে লালা পড়ার দৃশ্যটি নোদা বার বার ভাবতে লাগলো। ফলে এই প্রসাদের প্রতি নোদার আরো ঘৃণা হ'ল। একে বামদেবের অপরিস্কার চেহারা তার ওপর কুকুরের লালা মিশ্রিত এই ভাত, এসব ভাবতে ভাবতে নোদার ঘৃণা আরো বাড়লো। নোদা মনে মনে বলতে লাগলো, "ও, প্রসাদ কি খায় ?"—এই ভেবে অবসর সময় প্রসাদ ভর্তি পাতাটি তুলে নিয়ে অদূরে তালতলায় ফেলে দিল।

রাত পোহালে, নোদা প্রতিদিনের মত যথারীতি এসে বামদেবের গাঁজা তৈরী করতে লাগলো। বামদেব নোদাকে বললেন, "হ্যারে, আমার প্রসাদ খেয়েছিস্ ?"

নোদা চুপ করে রইলো। সবজ্ঞ বামদেব তখন স্নেহ করুণ কন্ঠে বললেন, "ও, আমার চোখে পিচুটি, মুখে নালা পড়ছে, তাই তালতলায় ফেলে দিয়েছিস্, নয় ?"

নোদা মহাবিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। যা সে মনে মনে ভেবে ফেলে দিয়েছে ঘৃণাভরে তাই ক্ষ্যাপা বাবা বলে দিলেন।

একটু চুপ করে ব্যাথিত স্বরে করুণাময় বামদেব বললেন, "খেলে ভাল হয়ে যেতিস।"

ভয়াবহ গলিত কুণ্ঠ রোগ থেকে প্রিয় সেবক 'নোদা'কে সম্পূর্ণ নিরোগ করে দেবার যে পরম সুযোগ বামদেব দিলেন, হতভাগ্য নোদা নিজ কর্মদোষে সেই মহাসুযোগ পেয়েও হারালো। তার সাথে সাথে প্রভু বামদেবের ওপর গভীর ভক্তি, নিষ্ঠা ও নির্ভরতার পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে পারলো না নোদা। বামদেবের এই কথা শুনে নোদা তাই হায় হায় করে উঠলো গভীর অনুশোচনায়।

এই রকম কুণ্ঠরোগ থেকে কত রোগীকে বামদেব সম্পূর্ণ নিরোগ ও সুস্থ সবল করে দিয়েছেন। আর বামদেবের নিত্য সেবক হয়েও বামদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা বশত নোদা এই মহাব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারলো না। আমৃত্যু নোদার এই অনুশোচনা ছিল।

আসলে নোদার জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল তথা প্রারব্ধ এত প্রবল যে নোদাকে এই মহারোগ থেকে সেই প্রারব্ধ মুক্তি দিল না।

এই পৃথিবী হ'ল কর্মভূমি। এই পৃথিবীতে কর্মই মানুষকে ফল দেয়। কর্ম অনুসারেই মানুষের ফল লাভ হয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল লাভ করবে। জন্ম জন্মান্তর সেই অনুসারে সে চলবে। পাপ কাজে পাপ ফল, পুণ্য কাজে পুণ্য ফল লাভ করবে। তাই পূর্ব জন্মের কর্মফল খুব খারাপ থাকলেই অর্থাৎ মহাপাপ করলেই এই কুণ্ঠরোগ তথা মহাব্যাধি হয়। মানুষ তথা সমগ্র জীবকুল এই কর্মফলের অধীন। মানুষ শুধু শুধু বিধাতাকে তথা নিয়তিকে দোষারোপ করে। কিন্তু নিজকর্ম দোষের কথা ভাবে না।

এই পার্থিব জগতে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানুষ ষড়রিপুর মধ্যে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য) যে, যে রিপুর বিশেষ দাসত্ব করে সেই সেই রিপু জনিত রোগেই সে ভোগে এবং তার মৃত্যু হয় সেই রোগেই।

দেহের ক্ষেত্রেও যে যে ইন্দ্রিয়ের (জিহ্বা, উপস্থ প্রভৃতির) বিশেষ দাসত্ব করে সেই সেই ইন্দ্রিয় জনিত রোগেই সে ভোগে এবং সেই রোগই তার মৃত্যুর কারণ ঘটে।

এক মৃত্যুতেই এই কর্ম্ম ভোগ শেষ হয়ে যায় না। জন্ম জন্মান্তর

ধরে তা ভোগ করতে হয় জীবকে। তাই এই জগত একাধারে কর্মভূমি ও মৃত্যুভূমি এবং ভোগভূমি।

একমাত্র অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষগণ মানুষকে কৃপা করে, এমন কি মনুষ্যতর জীবকেও কৃপা করে রোগমুক্ত করতে পারেন। আবার এই পৃথিবী মুক্তি ভূমিও বটে।

যাঁরা সৎ কাজ, সৎ চিন্তা, সংযম, সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, দেবসেবা, জীবসেবা প্রভৃতি করেন, তাঁরা ইহ জন্মে তার সুফল দেহে মনে লাভ করেন। পর জন্মেও তাঁরা সুস্থ নিরোগ দেহে পরম আনন্দে সাধুসঙ্গ ও সৎ গুরুর কৃপা লাভ করে চিরতরে মুক্তি লাভ করে নিত্যলোকে গমন করেন।

যাহোক, নোদার পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মজনিত এই মহাব্যাধিকে কৃপাময় বামদেব নিজ সাধন বলে টেনে নিয়ে নোদাকে নিরোগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নোদা নিজ কর্ম দোষে তা হারালো। অবশিষ্ট জীবন নোদা এজন্য প্রতিদিন গভীর অনুশোচনা করেছে।

এই নিত্য অনুশোচনা জনিত প্রায়শ্চিত্তের সুফল কালক্রমে নোদার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। বামদেবের অভয় চরণে শরণাগত হ'বার জন্য ব্যাকুল হ'ল নোদা তার জীবন সন্ধ্যায়। একে এই সুতীব্র অনুশোচনা তার ওপর সে বামদেবের নিত্য সেবক। তার সুফলও কম নয়।

ইতিপূর্বে বিগত চব্বিশ বছর ধরে বামদেবের সেবক থাকাকালীন আর্থিক ব্যাপারে নোদা তাঁর এই প্রভু বামদেবকে জীবনে বহুবার ঠকিয়েছে। সামান্য ব্যাপারেও কৌশল করে বামদেবের থেকে টাকা নিয়েছে। সর্বজ্ঞ বামদেব সব জেনেই নোদাকে টাকা দিয়েছেন এবং ক্ষমা করেছেন।

একবার, বামদেবের সর্বাধিক প্রিয় কুকুর 'কালু'কে তিনদিন না খাইয়ে বদ্ধ ঘরে আটকে রেখেছিল নোদা টাকার জন্য। টাকার প্রতি নোদার এই সীমাহীন লোভই নোদার কাল হ'ল। তার পাপ পরিপূর্ণ হ'ল। বামদেব কালুর জন্য স্বয়ং তিনদিন না খেয়ে রইলেন। বামদেব না খাওয়ায় তারামা-ও উপবাসী রইলেন তিনদিন। মহাপাপী

নোদা জানালো যে টাকা লাগবে কালুকে খুঁজে বার করতে। অথচ সে নিজেই কালুকে ঘরের মধ্যে না খাইয়ে আটকে রেখেছে।

সর্বজ্ঞ বামদেব সবই জানেন। নোদার এই সীমাহীন লোভ ও পাপ কর্মের ফল ফললো অচিরে। বিরক্ত বামদেবের এক কথায় নোদার একদিনে দু'হাতের আটটি আঙ্গুল খসে পড়ে। নোদা ভয়াবহ গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হ'ল। তবু এই মহারোগ নিয়েই নোদা বামদেবের নিত্য সেবা করে এবং বামদেবও তার সেবা গ্রহণ করে সেবকের পাপরাশিকে নিত্য ক্ষয় করাতে লাগলেন। জীবন সন্ধ্যায় এসে নোদার অনুশোচনা হতে লাগলো সারাজীবন ধরে বহুবার তার প্রভুকে ঠকাবার জন্য।

বামদেবের এই প্রসাদ অবজ্ঞা করার তীব্র অনুশোচনার সাথে সেই আর্থিক লোভ জনিত কর্মের অনুশোচনাও যুক্ত হ'ল। এই দুই অনুশোচনায় অবিরত দগ্ধ হতে লাগলো সেবক নোদা। অবশেষে একদিন নোদা বামদেবের কাছে এসে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "গোঁসাই, তুমার নিছি, তুমারই খেছি। তুমাকেই ফাঁকি দিয়ে টাকা লিঁয়ে দৌড়ছি। আর কার লিব গোঁসাই! কোন লোকটো এ কুঁট্যাকে অমন ভালবাসবে গোঁসাই? আমি ফাঁকি দিয়ে লিছি, তুমি ফাঁকি দিবেনা গোঁসাই। আর কেউ নাই আমায় উ কালকে বাঁচাবে। তুমার চরণ আসল করে তুমাকেই ঠকিঁইনি গোঁসাই। তুমি তারামার চরণ পেছ, দম ভরে লিঁয়ে বসে আছো, আমি তুমার চরণ লিঁয়েছি, দম ভরে থাকবো গোঁসাই। আমায় ছাড়তে হয়না গোঁসাই।" এই বলে কাতর ভাবে বামদেবের চরণে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো বামদেবের দীর্ঘ-কালের নিত্যসেবক ও ভক্ত 'নোদা'।

প্রেমভক্তির পবিত্রতায়, সততার স্বচ্ছতায়, অনুশোচনায় অশ্রুধারায় ও শরণাগতির শুদ্ধতায় নোদা পবিত্র হ'ল। তার এতদিনের অন্তরের এই অকপট নিবেদন তাঁকে যথার্থ ভক্তরূপে প্রতিষ্ঠা করলো। ভক্ত নোদা শুদ্ধ মুক্ত হ'ল চিরতরে। ভক্তির অনুরাগে রঞ্জিত 'নোদা'র নয়ন ধারার দিকে তাকিয়ে পরম করুণাঘন রূপমণ্ডিত বামদেব স্নেহভরে 'নোদা'কে বললেন, "নোদা বাবা, তুঁই লিঁয়েছিস টাকা চুরি

করে। আর কত লোক বেঁড়িই (মারধোর করে) লিয়েছে বাবা, ত-র স্যাবা (সেবা) আমার বড় ভালরে, ত-র সব লিব বাবা, তারামা ত-কে চরণে লিবে, তু কেনে কাঁদবি বাবা ?—বলতে বলতে প্রেমময় বামদেবের বিশাল নয়নদ্বয় অশ্রুতে ভরে উঠলো। সেই অপার করুণা ও প্রেমের অশ্রুধারা শ্রীবামের নয়নদ্বয় বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। ভক্ত ও ভগবানের এই অপার্থিব অশ্রুধারা এক অপূর্ব দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি করলো। মহামৌন ধ্যানগম্ভীর মহাপীঠ তারাপীঠ স্তব্ধ হয়ে এই পবিত্র দুর্লভ দৃশ্য অবলোকন করলো অন্তরলোকে।

অপার করুণাময় বামদেবের এই পরম করুণার আরেকটি দিকও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভক্ত যখন ভগবানের কাছে অনুতপ্ত হৃদয়ে সজল নয়নে ক্ষমা চায় তখন ভগবান ভক্তকে তো ক্ষমা করেনই, উপরন্তু ভক্তকে জানান যে তার চেয়েও অনেক বেশী অপরাধীকেও তিনি ক্ষমা করেছেন করুণাভরে। সুতরাং ভক্তের কোন ভয় নেই।

শিবাবতার বামদেবও তাঁর এই করুণাঘন লীলায় ভক্ত নোদার তীব্র অনুশোচনা, স্বীকারোক্তি ও সজল নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা এবং শরণাগতির উত্তরে নোদাকে অভয় দিয়ে জানালেন যে নোদা তো কেবল চুরি করে টাকা নিয়েছে কিন্তু কত লোকে তাঁকে মারধোর করেও টাকা নিয়েছে এবং এই মহাঅপরাধীদেরও তিনি যখন ক্ষমা করেছেন, তখন শরণাগত নোদার আর ভয় কি ?

মহাযোগী বামদেবের দিব্য দেহে কখনো তাঁর কোন শিষ্যভক্ত আঘাত করেননি। করবার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেননি। তাঁর অজস্র গুণমুগ্ধ মহাপুরুষগণও তা করেন নি। আর তাঁর কাছে আগত লক্ষ লক্ষ আর্ততাপিত নরনারীর কথা তো চিন্তার অতীত। তাঁরা বামদেবের প্রসন্নতা লাভ করে তাঁর কৃপা লাভ করবার জন্য এসেছিলেন।

তাই বামদেবের দিব্য পবিত্র দেহে একমাত্র পাণ্ডাগণই বার বার আঘাত করেছে টাকার জন্য (দ্রষ্ঠব্য শাসক ও সেবকরূপে পাণ্ডাগণ)। পাণ্ডাদের ছাড়া আর কারোর এত বড় স্পর্ধা কখনো হয়নি।

কিন্তু পরম করুণার পরম বিগ্রহ বামদেব শুধু পাণ্ডাদের ক্ষমায়

করেননি, দেহের অজস্র আঘাতের তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা নিয়েই আবার তাদেরই জন্য তারামাকে বলেছেন সজল নয়নে। "মা আমায় বেঁড়াইছে (মেরেছে)। আমার তু আছিস, দেখবি। তু অ'দের বেঁড়াই'লে (মারলে) কে দেখবে মা ?"

অর্থাৎ মা ওরা আমায় মেরেছে। আমার তো তুমি আছ। তুমিই আমায় রক্ষা করবে। কিন্তু তুমি ও'দের মারলে, ও'দের কে রক্ষা করবে মা ? তুমি ছাড়া যে ওদের কেউ নেই মা।

পতিত পাবন শ্রীশ্রীবামদেব এই অধমদের তারণের জন্য ত্রিলোক তারিণীর কাছে এই সকরুণ আর্তির তুলনা জগতে নেই। যাঁরা চরম অন্যায় করেছে, আঘাত করেছে সেই নরাধমদের ক্ষমা অনেক সময় মহাপুরুষগণ করেন করুণাবশত। এই দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ নয়। কিন্তু সেই নরাধমদের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধি দৈবিক—এই ত্রিতাপ ও সার্বিক মুক্তির জন্য (বিনা প্রায়শ্চিত্তে) ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা করছেন সদ্য জর্জরিত রক্তাক্ত দেহে কোন মানুষ, তার দৃষ্টান্ত জগতে নেই।

প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে ঈশ্বরের বরপুত্র যিশুখৃষ্ট তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করবার জন্য রক্তাক্ত দেহে ঈশ্বরকে বলেছিলেন, "হে পিতা, তুমি ওদের ক্ষমা কর। ওরা জানে না ওরা কি করছে।"

অর্থাৎ করুণাময় যিশু ঈশ্বরকে এই নরাধমদের কেবল মাত্র ক্ষমা করতে বলেছিলেন। কিন্তু এ'দের উদ্ধারের জন্য এ'দের সার্বিক মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে সজল নয়নে সকাতরে তিনিও প্রার্থনা করেন নি, যা করুণাবতার বামদেব করেছেন। এইখানে বামদেব অতুলনীয়।

যারা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর তাঁকে অকথ্য অপমান ও অপরিসীম দৈহিক যন্ত্রণা দিয়েছে, আর তিনি অসীম শক্তিধর হয়েও সেই দুর্বল অত্যাচারীদের আঘাত রক্তাক্ত দেহে সহ্য করে প্রতিবারই তাদের জন্য প্রতিনিয়ত পরম ব্রহ্মময়ীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তাদের হয়ে এবং সাথে সাথে এসব অত্যাচারীদের উদ্ধারের জন্য ও সার্বিক মুক্তির জন্য ত্রিলোক জননীর কাছে কাতর প্রার্থনা করেছেন

সজল নয়নে ও আঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেহে। এ যে কত বড় ক্ষমা ও করুণা তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কেবল মাত্র উপলব্ধি সাপেক্ষ।

শুধু তাই নয়, "তু তাদের বেঁড়াইলে কে দেখবে মা"? (তুমি ওদের মারলে ওদের কে রক্ষা করবে মা?)—বামদের এই পরম মহিমান্বিত বিরাট দার্শনিক জিজ্ঞাসা তাঁর অন্তহীন প্রেম ও করুণাকে জগৎ কল্যাণে জীব কল্যাণে প্রকাশ করেছে।

শুধু তাই নয়, জগতের সকল পাপীর হয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে সৃষ্টি তত্ত্বের এই চরম প্রশ্ন তুলে দেখিয়ে দিলেন যে, জগতে সকল পাপীর একমাত্র আপনজন স্বয়ং ঈশ্বরই।

ঈশ্বর ছাড়া এই পাপীদের আর কেউ নেই জগতে। সুতরাং ঈশ্বরকেই এই পাপীদের ক্ষমা করতে হবে এবং উদ্ধার করতে হবে। এটাই ঈশ্বরের চিরন্তন কর্তব্য। সারাজীবন ধরে শিবাবতার বামদেব শত সহস্রবার জগতের অধিশ্বরীর কাছে এই কর্তব্যের কথা এই মুক্তির কথা কাতর ভাবে বলেছেন নিজ দেহের তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে।

পৃথিবীর ইতিহাসে অপরাধীদের জন্য এমন সার্বিক ক্ষমা ও মুক্তির প্রার্থনা এবং শাশ্বত জিজ্ঞাসা ঈশ্বরের কাছে সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে অজস্র আঘাতে জর্জরিত দেহে আর কেউ করেননি এমন অবিরাম ভাবে। এ ক্ষেত্রে জগতে তিনি অদ্বিতীয় ও তুলনা রহিত।

জীবের প্রতি তাঁর এই মহাপ্রেম, অপার করুণা, ও অসীম ক্ষমা সমগ্র জগতের চির আদর্শনীয় হয়ে থাকবে। সমগ্র জগৎ ও জীবের মহামুক্তির পরম দিশারী রূপেও তিনি চির ভাস্বর চির আলোক বর্তিকা স্বরূপ।

যাহোক, ভক্ত নোদার শত সহস্র অপরাধ করুণাময় বামদেব শুধু ক্ষমাই করলেন না। সাথে সাথে পরম করুণাময়ী তারামায়ের চির আনন্দময় চির অমৃতময় চরণ কমলে নোদার চির শান্তি ও চির মুক্তির ব্যবস্থাও করে দিলেন। শ্রীবামের কৃপায় নোদা যথার্থ পরম ভাগ্যবান রূপে সুচিহ্নিত হ'ল। শত সহস্র সাধকের চির আকাঙ্খিত ব্রহ্মময়ী তারামায়ের যে অতি দুর্লভ রাঙ্গাচরণ, যা লক্ষ-

কোটি জনমের সাধনার ফল স্বরূপ, সেই পরম দুর্লভ রাঙ্গাচরণ লাভ করবার অধিকারী হ'ল নোদা প্রভু শ্রীবামের অসীম কৃপায়।

শ্রীবামের তিরোভাবের বছর দু'য়েক পর নোদা তার কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ দেহ থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করে তারামা ও বামদেবের চির-শান্তিময় চির আনন্দময় কোল লাভ করলো। বামদেবের অসীম কৃপায় নোদা উদ্ধার হয়ে গেল। বামদেবের কথায় স্বয়ং তারামা নোদার সকল ভার গ্রহণ করলেন চিরতরে। মহাভাগ্যবান নোদা চিরতরে মুক্ত হয়ে গেল পরম আনন্দে।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বামদেবের দিব্য সঙ্গ ধন্য শচী পাণ্ডার স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুধামুখী দেবী ও বামদেবের অশেষ কৃপাধন্য ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূতের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বাংলা ১৩৭৮ সনের ২৪শে ফাল্গুন সুধামুখীদেবী লেখককে তাঁর তারাপীঠের স্বামীগৃহে বসে উপরোক্ত কাহিনী বলেন।

শ্রীযুক্তা সুধামুখীদেবী প্রথম জীবনে একাধিকবার তাঁর স্বামীগৃহে নিজহাতে রান্না করে বামদেবকে খাইয়েছেন। তিনি ঐ সময় বামদেবের নিত্যসেবক নোদাকে বহুবার দেখেছেন।

বাংলা ১৩৮০ সনের শারদীয়া মহানবমীর দিন (ইংরেজী ৫ই অক্টোবর, ১৯৭৩) ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দও নোদার উপরোক্ত কাহিনীর ব্যাপারে লেখককে বহুতথ্য প্রদান করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বামদেবের অপার কৃপাধন্য ভক্ত ও সেবক নোদা কালক্রমে বামদেবের অশেষ করুণায় বামদেবের উত্তর সাধকত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

—o—

শ্রীবামের বিচিত্র দিব্যজ্ঞান

হেমন্তের স্নিগ্ধ পরশ লেগেছে তারাপীঠের আকাশে বাতাসে। মাঠে মাঠে সোনালী ধানের অফুরন্ত রূপ। সূর্য্যের সোনালী আলো অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে চারদিকে। এমনি শান্ত মনোরম পরিবেশে বামদেব প্রসন্ন মনে বসে আছেন।

এমন সময় একটি নবীন সন্ন্যাসী এসে বামদেবকে প্রণাম করলো ভক্তিভরে।

বামদেবের পায়ে সন্ন্যাসী মাথা রাখতেই বামদেব সন্ন্যাসীর দাড়ি ধরে সজোরে মোচড় দিয়ে উগ্রস্বরে বললেন, "আমার সাধু বাবা আলছে। শালো সাধু হঁয়ে মাথা হেট বটে"—এই বলেই আরো জোরে সন্ন্যাসীর দাড়িতে মোচড় দিলেন। যন্ত্রণায় সন্ন্যাসীর প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম। আর কোন উপায় না দেখে সন্ন্যাসী প্রাণের দায়ে বামদেবের দাড়ি চেপে ধরলো।

বামদেবের নিজের দাড়িতে ব্যথা লাগতেই বামদেব সন্ন্যাসীর দাড়ি ছেড়ে দিলেন। নবীন সন্ন্যাসীটি মাটি থেকে উঠেই রাগের বশে বামদেবকে কিল মেরে চলে গেল।

বামদেব চুপ করে রইলেন শান্তভাবে। এই বিচিত্র লীলা খেলার কয়েক ঘন্টা পর বামদেবের পরম ভক্ত ও নিত্যসেবক যুবক নগেন বাগচী বামদেবের কাছে এলেন। বামদেব নগেন বাগচীকে বললেন, "লগেন বাবা, ও বেলা একটো ভদ্দর লোক আলছিল। আমায় দিব্য জ্ঞান দিয়ে গেলেন বাবা। শালো ঠগ বটে।"

বামদেবের একথা শুনে নগেন বাগচী স্তম্ভিত হলেন। বামদেবের এই উক্তি গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ।

সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ রাজযোগী মহাপুরুষ বামদেব ঐ নবীন সন্ন্যাসীর

সশ্রদ্ধ প্রণামের পরিবর্তে সন্ন্যাসীকে যে মহান শিক্ষা দিলেন তা সেই অর্বাচীন সন্ন্যাসী উপলব্ধি করতে পারলো না।

বামদেব এখানে সন্ন্যাসীকে এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন যে, যিনি সৎ কে অর্থাৎ সত্য তথা শাশ্বতকে (ঈশ্বরকে) ধরে আছেন তিনিই সাধু। সেই চিরন্তনের পূজারী সাধুর মাথা, সতত ঈশ্বরীয় চিন্তারাশির অমূল্য সম্পদ স্বরূপ। সেই পরম মূল্যবান মহাপবিত্র মস্তককে সাধু কেন অপরের পায়ে নত ক'রে তার মহামর্যাদা নষ্ট করবে? তাই সাধুকে শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষাদাতা বামদেব প্রথমে সাধুকে বললেন সেই কথা অর্থাৎ "শালো, সাধু হয়ে মাথা হেট বটে।"

কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য সেই নবীন সন্ন্যাসী তথা সাধুর। সে বামদেবের কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারলো না। উল্টো রেগে গিয়ে বামদেবকে কিল মেরে চলে গেল।

তাই বামদেব কিছুক্ষণ পরে নগেন বাগচীকে বললেন, "একটা ভদ্দরলোক আলছিল।"

তার মানে সে সাধু বা সন্ন্যাসী নয়। সে এক আত্মাভিমানী। সাধুর বেশ নিয়েছে শুধু। ভদ্রলোক যেমন বাইরে ভাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে কিন্তু তার ভেতরে আত্ম অভিমান, কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি সবই থাকে, তেমনি তথাকথিত এই 'ভদ্দরলোক' সাধুর বেশ ধরে বামদেবের কাছে এসেছে। কিন্তু সামান্য দাড়ি ধরার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলো না। অথচ সে সাধু বেশ ধারণ করেছে। কিন্তু সাধুর সহ্যশক্তি অসীম থাকে। সাধুর দেহবোধ থাকেনা। কিন্তু এই লোকটির তা আছে। উপরন্তু লোকটি তার ভেতরের ক্রোধকে চাপতে পারলো না। রেগে গিয়ে বামদেবের দাড়ি টেনে ও কিল মেরে চলে গেল।

তাই সে সাধু নয়। সাধু বেশধারী এক ক্রোধী 'ভদ্দরলোক' মাত্র। সেই ভদ্দরলোক তার অহঙ্কার ও শক্তি দেখালো। তাই সে অভিমান ও আত্ম অহঙ্কারে পূর্ণ।

সুতরাং সে সাধুবেশে 'ঠগ' ছাড়া আর কিছু নয়। তার সাথে আবার দাড়ি ধরে টান দেবার যন্ত্রণা কি তাও লোকটি বামদেবকে

জানিয়ে দিয়ে গেল বামদেবের দাড়ি টেনে দিয়ে। তাই এই ভদ্দর লোকটিকে চিনতে পারা এবং দাড়ি টানার যন্ত্রণা এই দু'টি জ্ঞান তথা বামদেবের ভাষায় "দিব্যজ্ঞান" বামদেব লাভ করলেন এই লীলায়। বামদেবের এই বিচিত্র দিব্যজ্ঞান লাভের কথা শুনে সেবক নগেন বাগচীও বিচিত্র আনন্দ লাভ করলেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক বামদেবের দিব্য সঙ্গধন্য নগেন্দ্র নাথ বাগচী ও ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

—o—

ভক্তপ্রবর যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৩১৫ সালের শীতকালের এক প্রসন্ন সকাল। শ্রীশ্রীবামদেব শিমুলতলায় বসে আছেন। এই সময় হাওড়ার পঞ্চাননতলা থেকে সাইত্রিশ বছর বয়স্ক এক ভক্ত ও সুলেখক এবং অধ্যাত্মবাদী বামদেবের কাছে এসে প্রণত হলেন।

এই শুদ্ধ আধার সম্পন্ন ভক্তকে দেখে বামদেব প্রসন্ন হলেন। আশীর্বাদ করলেন প্রাণভরে। নিজ আশ্রয়ে রেখে কিছুদিন অধ্যাত্মপথে চালনা করলেন। তারপর তাঁর নির্দেশে এই ভক্ত প্রবর যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গৃহে ফিরে গেলেন মনের আনন্দে।

বামদেবের কৃপাধন্য এই যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একাধারে লেখক সাধক ও কর্মযোগী। বাংলা ১২৭৮ সালে হাওড়ার পঞ্চাননতলায় এই কর্মযোগীর জন্ম হয়। পড়াশুনার পর ব্যাকুল হয়ে যৌবনেই তিনি নিগমানন্দ নামে একজন গৃহী সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা লাভ করেন। নিগমানন্দ তাঁর সন্ন্যাস নাম। তাঁর পুত্র হরিপদ ভট্টাচার্য্য একজন ধর্মপ্রাণ লোকরূপে সুচিহ্নিত। নিগমানন্দের বাড়ী যোগীন্দ্র-

নাথের বাড়ীর অদূরে। নিগমানন্দ হাওড়ার ক্ষিরোদতলায় মুখার্জীদের বাড়ীতে কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া আরো একাধিক স্থানে কালী প্রতিষ্ঠা করেন। নিগমানন্দ তারাপীঠে গিয়ে বামদেবকে দর্শন করেন এবং বামদেবের কৃপালাভ করেন। তিনি প্রিয় শিষ্য যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে তারাপীঠে গিয়ে বামদেবকে দর্শন করতে বলেন। যোগীন্দ্রনাথ গুরুর নির্দেশ পালন করেন এবং শিবাবতার বামদেবের কৃপালাভ করে ধন্য হন। পরবর্তীকালে যোগীন্দ্রনাথ বামদেবের একটি ক্ষুদ্র জীবনী রচনা করেন ১৩৩৩ সালে। নাম 'বামাক্ষ্যাপা'। তিনি সাহিত্যকেই নেশা ও পেশা রূপে গ্রহণ করেন। তিনি 'বামাক্ষ্যাপা' গ্রন্থ ছাড়াও 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ', 'রামপ্রসাদ', 'নদের নিমাই', 'তুলসীদাস', 'জয়দেব', 'পওহারী বাবা', প্রভৃতি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন।

তাছাড়া 'তান্ত্রিক সাধন রহস্য', 'শক্তিসাধনা', 'বর্ণাশ্রম', 'জটিল-তপস্বী', 'পঞ্চরত্ন' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। মোট আঠাশটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তাছাড়া আলোচনা, বিশ্বদূত ও বিশ্বজননী এই তিনটি পত্রিকায় সম্পাদক রূপেও তিনি সুপরিচিত হন।

একাধারে সাধক, ভক্ত, লেখক ও সম্পাদক রূপে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ১৩৩৯ সালে ৬১ বছর বয়সে বামদেবের কৃপাধন্য যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কর্মবহু জীবন শেষ করে অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

তাঁর তিন পুত্র। পুত্রগণ সবাই কৃতী। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ও তৃতীয় পুত্র বলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংসারে থেকেও অধ্যাত্ম পথের সন্ধানী।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক ১০৫, পঞ্চাননতলা রোড নিবাসী শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ও বলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীচন্দ্রশেখর মিত্রের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বাংলা ১৩৮১ সালে (ইং ১৯৭৪) কৃষ্ণধনবাবু ও বলাইবাবু লেখককে তথ্য দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন।

—০—

ভক্ত ও সেবক রূপে নগেন্দ্রনাথ বাগচী

বামলীলার অন্যতম লীলা পরিকর নগেন বাগচী মহাসৌভাগ্যবান পুরুষ। (ইতিপূর্বে তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে)। সুদীর্ঘ আট বছর শ্রীবামের দুর্লভ সঙ্গধন্য এই মহাপ্রাণ।

প্রথমে জিজ্ঞাসু, পরে দর্শক তারপরে ভক্ত ও সেবক এবং তারপরে শিষ্য—একাধারে এত বিচিত্র ভাব ও স্তরের ক্রমিক সমন্বয় বামদেবের অন্য কোন শিষ্যের জীবনে ঘটেনি। সেদিক থেকে শ্রীনগেন বাগচীর জীবন অসাধারণ ও অতুলনীয়।

শ্রীবাম সঙ্গধন্য, কৃপাধন্য তথা বামলীলার দর্শক. সেবক, ভক্ত ও শিষ্য নগেন বাগচী বাম-সমুদ্রের এক সুবিশাল বৈচিত্র্যময় ঢেউ। তাই শ্রীবামের কৃপায় বামলীলার অসংখ্য ঢেউ এই বিশাল ঢেউয়ের জীবনকে পরিপুষ্ট করে রেখেছে। শ্রীনগেন বাগচীকে কেন্দ্র করে লীলাময় বামের আরো কয়েকটি লীল-তরঙ্গের কথা এখানে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বামদেবের ব্রহ্মজ্ঞভাব গভীরতম মণ্ডিত। এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ কিন্তু বালকভাব মণ্ডিত। শিশুর মত একেবারে, শৌচ করতে পর্যন্ত জানেন না। জল নিয়ে কোমরে ঢেলে দেয় ভক্ত ও সেবক যুবক নগেন বাগচী।

শেষের দিকে অর্থাৎ বামদেবের স্থূলদেহ ত্যাগের কিছুকাল পূর্ব থেকে নগেন বাগচী নিজেই বামদেবকে শৌচ করিয়ে দেন। কখনো বালকের মত 'নুনু' স্পর্শ করে থাকেন। পাণ্ডারা তাই কড়ি বেঁধে দেন তাঁর কোমরে।

শেষের দিকে বামদেব সাধারণতঃ মাথা নিচু করে বসে আছেন দেখা যায়। কেউ মনে মনে কোন বিষয় তাঁর কাছে প্রশ্ন করলে বামদেব আরেক জনের কোনও প্রশ্নের উত্তরে তা বলে দেন। যার

প্রশ্ন সে উত্তর পেয়ে যায় কিন্তু অন্যলোক সেই উত্তর শুনে তাঁকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবে না।

একবার বামদেবের আশ্রম ঘরে ৫।৭ জন পাণ্ডা ও লোকজন সব রয়েছে। বামদেব মাথা নীচু করে বসে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে নগেন বাগচী বসে আছেন। হঠাৎ বামদেব বললেন, "ঘরে কে কে আছেন?" বামদেবের এই প্রশ্ন শুনে পাণ্ডা প্রধান নগেন পাণ্ডা উপস্থিত সকলের নাম বললেন কেবল সেবক ও ভক্ত যুবক নগেন বাগচীর নাম ছাড়া। কারণ নগেন বাগচীর উপর নগেন পাণ্ডার খুবই রাগ। কারণ ইতিপূর্বে পাণ্ডারা তাঁদের জাগতিক প্রয়োজনমত বামদেবকে ব্যবহার করতেন। কখনো গালাগালি দিয়ে কখনো মারের ভয় দেখিয়ে কখনো খোসামোদ করে কিন্তু বামদেবের সেবকরূপে ভক্ত নগেন বাগচীর আত্মপ্রকাশের পর বামদেবের উপর পাণ্ডাদের এই আধিপত্য নষ্ট হয়ে যায়। তেজস্বী ও বলিষ্ঠ পুরুষ যুবক নগেন বাগচী বৃদ্ধ পিতাকে যেমন যুবক ছেলে দুই হাত দিয়ে ঘিরে রাখে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তেমনি বামদেবকে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখেন নগেন বাগচী। তাই নগেন পাণ্ডা নগেন বাগচীকে স্বভাবতঃই দেখতে পারে না। তাই নগেন পাণ্ডা নগেন বাগচীর নামটা বামদেবকে বললো না। পুনরায় বামদেব একই প্রশ্ন করলেন, এবারও নগেন পাণ্ডা একই উত্তর দিলেন। তৃতীয়বার বামদেব নগেন পাণ্ডাকে বললেন "আর' কে আছেন লগেন কাকা?" এবার বাধ্য হয়ে চক্ষু লজ্জার খাতিরে নগেন পাণ্ডা বামদেবকে বললেন "আর পদতলে আছে নগেন বাগচী"।

তাই শুনে বামদেব সস্নেহে বললেন "আহা থাক্ থাক্।" অর্থাৎ পদতলে একমাত্র নগেন বাগচীই থাকবার অধিকারী। আর সব বাইরের লোক এটাই বামদেব বুঝিয়ে দিলেন পরোক্ষ ভাবে।

আর একদিনের—কথা বামদেবের আশ্রমের উত্তর পূর্ব দিকে আটচালায় রথের একটি ঘর রয়েছে। একটি বড় কাঠের রথ ঐ আটচালা ঘরে থাকে। রথযাত্রা ও উল্টোরথের সময় ঐ রথ বের করা হয়। ঐ রথের ঘরের দক্ষিণ দিকে এবং রথের ঘরের গায়ে একটি বিরাট নিমগাছ রয়েছে। একদিন ঐ নিমগাছের নীচে ভাত

নিয়ে বামদেবের জন্য ভক্ত যুবক নগেন বাগচী উপস্থিত হলেন। বামদেব তখন রথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নগেন বাগচী ভাত নিয়ে বামদেবকে খেতে দেবার সময় মনে মনে একটি সংকল্প করলেন। অন্তর্যামী বামদেব মুখ তুলে বললেন "হবে—হবে।" তাই হল পরে।

আরেকবার রাত প্রায় ১১ টা। বামদেব খাচ্ছেন তারামায়ের প্রসাদ, ভক্ত ও সেবক নগেন বাগচীও খাচ্ছেন। বামদেব খেতে খেতেও কি যেন চিন্তা করছেন ক্রমে খাওয়া ছেড়ে বামদেব বসে আছেন। তখন নগেন বাগচী বললেন "বাবা, আপনার খাওয়া হয়েছে?—উত্তরে বামদেব বললেন, "হ্যাঁ, বাবা"। তারপর বামদেব নগেন বাগচীকে বললেন "ওরে প্রসাদ খাবি?"—নগেন বাগচী সাগ্রহে রাজি হলেন প্রসাদ খেতে। বামদেব কৃপাকরে পরপর চারবার প্রসাদ দিলেন তাঁর অতি প্রিয় ভক্ত ও সেবক নগেন বাগচীকে।

বামদেব তাঁর এই প্রিয় ভক্ত নগেন বাগচীকে "লগেন বাবা' বলে এবং 'আপনি' করে ডাকেন। একবার ভাগলপুরে বামদেব একদিন শুধু এর ব্যতিক্রম করেন। সহসা নগেন বাগচীকে কথা প্রসঙ্গে 'তুই' করে বলেন। তাই শুনে খাবার ব্যাপারে অভিমান করে নগেন বাগচী বলেন বামদেবকে "আমি কারো বাড়ীতে খেতে আসিনি। কারো বাড়ীতে খাবো না।" নগেন বাগচী আর একবার শিশুর মত অভিমান করেন বামদেবের কাছে। কারণ জগতে যিনি একাধারে সবকিছু এবং যার ওপর হৃদয়ের ভক্তি বিশ্বাস ভালবাসা ও নির্ভরতা সম্পূর্ণ-ভাবে রয়েছে তাঁর ওপরেই অভিমান করা চলে। যুবক নগেন বাগচী তাই একদিন রাতে প্রচণ্ড ক্ষুধায় জর্জরিত হয়ে বামদেবকে বললেন "বাবা, রাত্রি হয়েছে আমাদের ক্ষিদে পেয়েছে। তাই শুনে বামদেব বললেন "খাই খাই কি বাবা? আমি কি খোঁয়ে?" ভক্ত নগেন বাগচী সতেজে বললেন "আপনি কি না খেয়ে?—ও বেলা মায়ের পূজোয় পাঁঠা প্রসাদ একবাটি, বিলুই ডিঙ্গুতে পারে না অন্ন, শুক্ত, চচ্চড়ি—বেশ তো সেবা করলেন বাবা। আর আমি আপনার দূরে বসেছিনু, দেখেননি যে, দুটি অন্ন, একটু শুক্ত, চচ্চুড়ি, পাঁঠার ঝোল ও দুখানা

মাংস মাত্র, পেট ভরেনি বাবা"। নগেন বাগচীর অভিমান দেখে বামদেব বললেন "দাও খোঁ দেখি।" এই বলে পাঁঠা কাটার কাটারীটা দেখিয়ে দিলেন। তাই দেখে অভিমান নগেন বাগচী বললেন "আমি খেতে না পারি কামড়াবো, মড়মড় করবে—আপনি খেতেও পারবেন না। দাঁত নেই, ফসকে যাবে"। নগেন বাগচী শ্রীবামের কৃপাধন্য বীরভক্ত ও পরম সেবক তাই নির্বিকার ভাবে উপরোক্ত উত্তর দিলেন। বামদেব আর কিছু বললেন না।

বামদেব নগেন বাগচীকে কে দা খেতে বলেছিলেন তার কারণ হ'ল, দা খাওয়ার মানে হল মায়া বিকার কাটার যন্ত্র এটি, তাই দিয়ে জাগতিক জীবনের মায়ামোহ ও ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ কাটিয়ে পরম চিন্তা ও পরমা প্রকৃতির অমৃত মধুর চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকলে জাগতিক ক্ষুধা তৃষ্ণাবোধ থাকে না। তাই এই পরম কাম্য বস্তুটির দিকেই বামদেব ইঙ্গিত করলেন নগেন বাগচীকে।

আরেকবারের কথা। বামদেবের কাছে কয়েকজন বসে আছেন। নগেন বাগচী ও নগেন পাণ্ডাও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। বামদেবের নিত্য সেবক 'নোদা' তথা নন্দা কুড়ে তখনও এসে পৌঁছয়নি তার দৈনন্দিন কাজ করতে। দৈনন্দিন কাজ মানে—বামদেবের বিছানা পরিস্কার, ঘর উঠান পরিস্কার, কলসীতে খাবার জল ভরে রাখা, তামাক সাজা প্রভৃতি কাজ নোদার নিত্য কর্মের অন্তর্গত। তাছাড়া কারণ, মুড়ি প্রভৃতি কিনে আনা তো আছেই। গলিত কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্থ নোদার দুই হাতের আটটি আঙ্গুলই নেই। শুধু দুই বুড়া আঙ্গুল ও হাতের সাহায্যে সে বামদেবের নিত্য সেবা করে।

যাহোক 'নোদা'র আসতে বেশ বিলম্ব হচ্ছে। সেই সুযোগে নগেন পাণ্ডা বামদেবকে বললেন "বাবা, নোদা তো এখনো এলোনা।"

বামদেব উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, নগেন কাকা, নোদা তো এলোনা"। নগেন পাণ্ডা পুনরায় বললেন, "বাবা, নোদা আপনার চাকর, ঠিক সময় আসা উচিত।" বামদেব যথারীতি নগেন পাণ্ডাকে সমর্থন করে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। আবার নগেন পাণ্ডা বললেন "বাবা, নোদা আপনার কাছ থেকে মাইনে পায়।" বামদেব যথারীতি উত্তর

দিলেন "হ্যাঁ বাবা, নোদা আমার কাছ থেকে মাইনে পায়।" এবার সুযোগ বুঝে নোদার বিরুদ্ধে নগেন পাণ্ডা ত'র কথার জাল ছড়িয়ে দিলেন। বললেন "বাবা যে চাকর মাইনে নেয়, অথচ ঠিকমত আসেনা তাকে রেখে কি লাভ বাবা"? বামদেব যথারীতি সেই কথার প্রতিধ্বনি করলেন। এদিকে নোদা দূর থেকে সবই শুনছে এবং ধীরে ধীরে আসছে। ইতিমধ্যে বামদেবের ওঠবার প্রয়োজন হল, দুজন জোয়ান ভক্ত বামদেবকে ধরে ওঠাতে চাইলেন কিন্তু 'নোদা' না ধরলে বামদেবের ওঠা হবেনা। বামদেব 'নোদা'র অপেক্ষায় বসে আছেন। কিন্তু এদিকে উপস্থিত দু'জন শক্তসামর্থ জোয়ান ভক্ত নোদার অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেরাই বামদেবকে জাপটে ধরে তুলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বামদেব বাঁশের খুটিটি এমন জোরে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন যে তা ছাড়াতে গেলে তাঁর স্থবির হাতের আঙ্গুলগুলো ভেঙ্গে যেতে পারে। অথচ বামদেবের কোমর ধরে দুজন জোয়ান ভক্ত তাঁকে তুলবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু বামদেব খুটি চেপে ধরে ব্যাথার চিৎকার করছেন। এই দৃশ্য দেখে যুবক নগেন বাগচী বাধ্য হয়ে ধমক দিয়ে ঐ লোক দুটোকে নিরস্ত্র করলেন। একটু পরে 'নোদা' এলো। নোদা এসে তার দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল দুটো বামদেবের দুই কাঁধে ছোঁয়াতেই বামদেব উঠে পড়লেন এবং চলতে শুরু করলেন। নোদাও পিছু পিছু বামদেবকে ছুঁয়ে চলতে লাগলো। উপস্থিত সবাই এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে বামদেব যথার্থ ভক্তের ভগবান। তাঁর শরণাগতকে কখনোই তিনি ত্যাগ করেন না।

বামদেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ব্রহ্মচারী তারানাথ (তারাক্ষ্যাপা) মুর্শিদাবাদ জেলার জুড়নপুরে থাকেন। বামদেব জুড়নপুরকে 'জড়ই' বলেন।

তারাক্ষ্যাপা মহা তেজস্বী বীরাচারী সাধক। তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস তেজস্বিতা, উগ্রতা ও দৃঢ়তার জন্য নগেন পাণ্ডা ও অনেকের বিরাগভাজন তিনি। একবার তারাক্ষ্যাপা তাঁর উগ্রমেজাজের জন্য মার খেয়েছিলেন এবং তাঁর পাঁচ টাকা জরিমানা হয়েছিলো।

তাই তারাক্ষ্যাপা প্রসঙ্গে বামদেব নগেন বাগচীকে বললেন, "লগেন বাবা, কোথায় থাকেন? মার খেয়ে খেয়ে থাকেন লয় বাবা?" বামদেব তারপর বললেন, "ওর বিচার 'মা' করবেন।"

আরেকবারের কথা। অনন্ত লেটের স্ত্রীর স্বভাব ভাল না। সে সৎ নয়। তাই একদিন বামদেব তাঁকে গালাগালি দিলেন। সেও বামদেবের সাথে ঝগড়া করতে করতে বামদেবকে বললে "তোর কুড়ে হবে।"

উত্তরে বামদেব তাকে বললে "তোর কুড়ে হবে।" বাক্সিদ্ধ মহাপুরুষ বামদেবের কথা অচিরেই ফললো। গলিত কণ্ঠ হয়ে অনন্ত লেটের স্ত্রী মারা গেলো। বামদেবের কিছুই হলো না। এ ব্যাপারে কথা প্রসঙ্গে নগেন বাগচীকে বিচিত্র ভাষায় বললেন "বাবা, কুড় হবে বাবা? মা ছেলেকে বললে মার হয়।" বামদেবের এই রহস্যময় কথা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আরেকদিন, 'কারণ' করে বামদেব বসে আছেন। প্রসাদ পেয়ে নগেন বাগচী এবং আরো কয়েকজন বসে রয়েছেন তার কাছে। সহসা বামদেব 'কারণ' করে নগেন বাগচীকে বললেন "মরবো আর অমনি যাব ব্রহ্মে মিশাইয়ে। কাজ কিরে ভোগাশ্রয়ে দেহ ধরিয়ে।" যখন বামদেব বললেন তখন তাঁর তিন চক্ষু জ্বলে উঠলো। কি অপূর্ব জ্যোতি। নগেন বাগচী যেন সাক্ষাৎ তারা দেখলেন।

ব্রজপাঠক একদিন আশ্রমে বামদেবকে তার বয়স ও নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বামদেব বিচিত্র উত্তর দিলেন। বামদেব বললেন "আমার বয়স তিনকুড়ি বছর। আমার নাম? বামা—তার চরণ নিয়ে ক্ষ্যাপা।"

নগেন বাগচী উপলব্ধি করলেন তার মানে, বামদেব যে ভৈরব তারই ইঙ্গিত করলেন। নগেন বাগচি উপলব্ধি করেন যে বামদেব তাকে ছাত্রভাবে তৈরী করছেন।

নগেন বাগচীর কাছে পিতা মাতা গুরু সবই হল বামদেব। শ্রীবামই তাঁর সর্বস্ব। তাই বামদেবের ভক্ত সেবক ও শিষ্যরূপে তিনি উত্তরকালে এক মহান পুরুষ রূপে বামমণ্ডলে চিহ্নিত হন। বামদেবের দেহ ও বিদেহ লীলা দর্শন করে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধন্য।

শতাধিক বছর বয়স্ক এই বামময় মহান সাধক আজো (১৩৯৭ সন) স্থূল দেহে শ্রীগুরু বামের নিত্য লীলা কীর্তনে মুখর। তারাপীঠে নিজ গৃহে বসে উপরোক্ত কাহিনী শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচী লেখককে বলেন। বাংলা ১৩৮১ সালের ১১ই আশ্বিন উপরোক্ত কাহিনী বর্ণিত হয়।

—ঃ—

শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়বার তারাপীঠে আগমন

১৩১৫ সালের ১০ই পৌষ সকালে অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার তারাপীঠে শ্রীগুরু বামকে দর্শন করতে এলেন। তাঁর সাথে এসেছেন তাঁর গুরুভাই সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়। সুবোধবাবু শাস্ত্রী মশায়ের খুড়তুতো ভাইও বটে। তাঁরা তারাপীঠ পৌঁছবার পূর্বেই বামদেব তাঁর প্রিয় সেবক নুটু পাণ্ডাকে তাঁদের আসার কথা জানালেন।

যথাসময়ে দুই ভাই এসে বামদেবকে প্রণাম করলেন। বামদেব প্রিয় শিষ্য সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়কে আদর করলেন কিন্তু হরিচরণবাবুকে সাময়িকভাবে না চেনার ভান করলেন।

তারাপীঠ আসবার পূর্বে কোলকাতায় থাকতেই দুই ভাই এক আশ্চর্য পণ করেন। সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে বামদেব পাঁঠা খেতে চাইবেন। হরিচরণবাবু বলেন যে বামদেব নিশ্চয়ই সুবোধ ভায়ের ইচ্ছাপূর্ণ করবেন, কিন্তু বামদেব তাঁর আবদারও রাখবেন যে একদিনের বেশী পাঁঠা খাওয়া হবেনা। সর্বজ্ঞ বাম উভয়ের পণই রাখলেন। প্রথমদিন অর্থাৎ শুক্রবার বামদেব সুবোধের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন অর্থাৎ পাঁঠা খেতে চাইলেন। কিন্তু পরবর্তী তিনদিন পাঁঠা খেতে চাইলেন

না। অর্থাৎ হরিচরণবাবুর ইচ্ছানুসারে ঐ একদিনই মাত্র পাঁঠা খাওয়া হল।

যাহোক বামদেবের জন্য আনা বিলাতী কারণের বোতল বামদেবকে দেওয়া হল। বামদেব সেই কারণের অর্ধেকটা নিজের কপাল পাত্রে ঢেলে তারামাকে নিবেদন করলেন। তারপর নিজে সামান্য প্রসাদ করে বাকিটা হরিচরণকে দিলেন কিন্তু তিনি দৈহিক বিকারের ভয়ে সেই প্রসাদ হাতে নিয়েও ভয়ে খেতে পারলেন না। সর্বজ্ঞ বাম তাঁর অবস্থা উপলব্ধি করে প্রসাদের পাত্র নিজে ফিরিয়ে নিয়ে কণামাত্র প্রিয় শিষ্যকে দিলেন ও হরিচরণবাবু তা জিভে স্পর্শ করে কপালে ফোঁটা কাটলেন। বামদেব বাকি সমস্ত কারণটা নিজেই খেয়ে ফেললেন। পরে হরিচরণবাবুর খুব অনুতাপ হল। তাঁর মনে হল বামদেব এই কারণ প্রসাদের মধ্য দিয়ে তাঁর শক্তি সঞ্চার করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সিদ্ধিলাভের এক দুর্লভ সুযোগ তিনি হাতছাড়া করলেন। পরে উপলব্ধি করলেন যে সর্বজ্ঞ বাম তাঁকে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তিনি বেদাচারের উপযুক্ত, বীরাচারের নয়। তাঁর আধার বেদাচারের।

যাহোক অতঃপর তিনি দ্বারকা নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেখানে বামদেবের অন্যতম ভক্ত, কবি অবিনাশ চৌধুরীর সাথে আলাপ হল। ইতিপূর্বে বামদেব যখন তাঁর আশ্রমে কারণ প্রসাদ দিচ্ছিলেন তখন অবিনাশবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আলাপ প্রসঙ্গে অবিনাশবাবু হরিবাবুকে ঐ প্রসাদ প্রত্যাখান ব্যাপারটির জন্য দোষ দিলেন না। অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে হরিবাবুর হৃদ্যতা হয়। অবিনাশ চৌধুরী বামদেবের কাহিনী পদ্যছন্দে লিখেছিলেন তা হরিবাবুকে দেন।

যাহোক স্নান সেরে হরিবাবু বামদেবের ইচ্ছানুসারে শিমুলতলায় তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মের সামনে চণ্ডীপাঠ করতে বসলেন। উত্তর সাধকতার জন্য বামদেবও পাণ্ডাদের কাঁধে ভর দিয়ে শিমুলতলায় এসে বসলেন। কিছুকাল থেকে তাঁর স্থূল দেহ ক্রমেই স্থবির হয়ে পড়ছে। ওঠা চলাতে ভক্ত সেবকদের সহযোগিতা লাগে। এ সময় বামদেবের বয়স ৭১ বছর ১০ মাস। এদিকে হরিবাবু যখন চণ্ডীপাঠ করছেন—

তখন সুবোধবাবু পাঁঠা কিনে আনিয়ে পাঁঠা বলির জন্য নিজেই প্রস্তুত হলেন শিমুলতলায়। সুবোধবাবুর বংশগত ঐতিহ্য বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট। পাঁঠাবলি সেখানে নেই। কিন্তু বামদেবের কৃপায় সুবোধ-বাবুর বীরাচারী ভাব। নুটু পাণ্ডার প্রত্যক্ষ বারণ এবং বামদেবের পরোক্ষ বারণ সত্ত্বেও সুবোধবাবু বীরভাবে বিভোর হয়ে পাঁঠাবলির জন্য খড়্গ নিয়ে শিমুলতলার কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন, এমনকি বামদেবকে বললেন—"আপনি বাবা পাঁঠা বেঁড়ে করিতেন শুনিয়াছি, আমি কখনো করি নাই। বামদেবের বিচিত্র ভাষার অন্যতম শব্দ হল 'বেঁড়ে'। শব্দটি, একবারে কাটতে না পারাকে বামদেব বলেন বেঁড়ে। সুবোধবাবুর কথা শুনে বামদেব মৃদু হেসে বললেন "তুমিও বাবা, বেঁড়ে করিবে।"

বামদেবের কথাই সত্যি হল। সুবোধবাবু একাধিক কোপেও পাঁঠা কাটতে পারলেন না। নুটু পাণ্ডা অবশেষে পাঁঠার মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করলেন। এই বিভৎস দৃশ্যে ও বিঘ্ন ঘটায় সুবোধবাবু ভীষণ অনুতপ্ত হলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বামদেব সুবোধবাবুর বলি দেবার প্রবৃত্তি কেড়ে নিলেন। নিজের হাতে বলি দিলে পশুর অন্তিম কান্নায় সংসারের মায়া কাটে। বামদেব তাই করলেন প্রিয় শিষ্যকে দিয়ে। পরবর্তীকালে সুবোধবাবু সংসারের মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন।

যাক্ সুবোধবাবুর একবারে পাঁঠা কাটতে না পারার দুঃখ ও অনুশোচনা দেখে করুণাময় বামদেব সস্নেহে তাকে বললেন "বাবা, তারামা বেঁড়ে পাঠাও খান।" ইতিমধ্যে হরিবাবুর চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত হল। দুপুর গড়িয়ে গেছে। পাঁঠার মাংস রান্না হতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তাই তারামার অন্নপ্রসাদ নুটু পাণ্ডা নিয়ে এলেন আশ্রমে। কিন্তু বামদেব যোগনিদ্রায়, তাঁকে ছাড়া শাস্ত্রী মশায় ও সুবোধবাবু সেই অন্ন ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে পারলেন না। রাত ৮টার পরে বামদেব যোগনিদ্রা থেকে উঠলেন। ইতিমধ্যে আশ্রমের দক্ষিণ দিকের দাওয়ার চুল্লীতে নুটু পাণ্ডা মাংস রান্না সম্পন্ন করলেন। বামদেব অন্ন ও মাংস তাঁরামাকে নিবেদন করে তারপরে সুবোধবাবু ও হরিবাবুকে দিয়ে কালু ভুলু প্রভৃতি কুকুরদের নিয়ে খেতে শুরু

করলেন। বামদেব কুকুরদের মুখে পাঠার মাংস দিচ্ছেন কিন্তু তা তারা গ্রহণ করলো না। অথচ কুকুর মাংসাশী জীব, তাই বামদেব নিজে বীরাচারি হয়েও লোক শিক্ষার জন্য এক অপূর্ব প্রেমময় কথা উপস্থিত সবার সামনে বললেন "পাঁঠা খাওয়া বদ, দেখনা কুকুরেও পাঁঠা খায় না। পাঁঠার মা কাঁদে।" এই মর্মস্পর্শী ও অনবদ্য অহিংসার বাণী শুনে হরিবাবুর সর্ব শরীরে শিহরণ খেলে গেল। খাওয়ার পরে শয়নের ব্যবস্থা হল। বামদেবের অন্যতম শিষ্য হৃষিকেশবাবুর দেয়া একটি কম্বল পাতা হল। তার ওপর একটি কোল-বালিশ এই হল মহাপুরুষ বামদেবের বিছানা। শীতকাল বলে একটি লেপ গায়ে দেবার জন্য রয়েছে। বামদেব শয়ন করলে তাঁর বিপরীত দিকে সুবোধবাবু ও শাস্ত্রী মশায় শয়ন করলেন। শেষ রাতে হরিবাবুর ঘুম ভেঙ্গে যায় বামদেবের ডাক শুনে। বামদেব প্রিয় শিষ্য সুবোধবাবুকে ডাকছিলেন। হরিবাবু ঘুম থেকে উঠে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বামদেব তাঁকেই বললেন "আমায় শৌচে যেতে হবে।" হরিবাবু বামদেবকে ধরে তুললেন। আশ্রমের বাইরে একটু গিয়েই বামদেব ছোট্ট ছেলের মত দাঁড়িয়ে মলত্যাগ করলেন—যা নিতান্ত জলের মত। বামদেব বললেন "পাঁঠা খাওয়া বদ, পাঁঠা খেলে হজম হয় না।" অতঃপর হরিবাবু জীবিতকুণ্ড থেকে জল এনে তাঁকে শৌচ করালেন।

উভয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত সমাগত হওয়ায় বামদেবের কথায় তিনি আর শুলেন না। ক্রমে ভোর হল। শনিবারের প্রসন্ন সকাল শুরু হল। শ্রীগুরু বামদেবের কথায় শিষ্য হরিবাবু বামদেবকে আশ্রমের অদূরে নিমগাছের নিচে বসিয়ে দ্বারকায় স্নান করতে গেলেন। ইতিমধ্যে বামদেবের নিত্য সেবক নন্দলাল দাই তথা নন্দা হাড়ি বা 'নোদা' এলো। বামদেবের বিছানা তুলতে গিয়ে নোদা দেখলো বিছানা মূত্রতে সিক্ত হয়ে রয়েছে। বামদেবকে এবিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন "তা হবে বাবা, নল দিয়ে জল গড়াইয়েছে।" নোদা জীবিত-কুণ্ডে বিছানা রোদে মেলে দিল।

এদিকে হরিবাবু দ্বারকা নদীর ওপারে শৌচকার্য সেরে এপারে

এসে স্নান করলেন। আকস্মিক ভাবে বৈরাগ্য বশতঃ তিনি তার শিশু পুত্রের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের কথা ভাবতে লাগলেন কিন্তু একটু পরেই মহামায়ার প্রভাবে নিজপুত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করলেন।

স্নান সেরে যথারীতি বামদেবের অনুমতি নিয়ে তিনি শিমুলতলায় চণ্ডীপাঠ করতে বসলেন। বামদেব পূর্ব দিনের ন্যায় শনিবারও অদূরে বসে যথারীতি উত্তর সাধকতার কাজ করলেন। যথা সময়ে শাস্ত্রী মশায় চণ্ডীপাঠ শেষ করে বামদেবের আশীর্বাদ লাভ করলেন। দুপুরে ভোগ এলো, বামদেব শাস্ত্রীমশায় ও সুবোধবাবু এই দুই শিষ্য নিয়ে নিমতলায় ভোজন করলেন। সাথে বামদেব কারণ পানও করছেন। বামদেব সহসা প্রাণ ভরে গান শুরু করলেন। গানটি হল—"মরবো... ......থাকিয়ে।" গানটি বামদেবের আচার্য স্বরূপ বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দের রচনা। বামদেব প্রায়ই গানটি করেন। হরিবাবু হঠাৎ বামদেবকে প্রশ্ন করলেন—"মরে কি ব্রহ্মে মিলায়? শাস্ত্রে তো বলে জীবদ্দশায় ব্রহ্মে মিলায়।" উত্তরে বামদেব ডান হাতের আঙুল দিয়ে এক দুর্বোধ্য মুদ্রা করে তা ব্রহ্মরন্ধ্রে স্পর্শ করে বললেন "এই যে বাবা, ব্রহ্মে মিশে আছি।" এই বলে স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। একটু পরে মোক্ষদানন্দের গানটির প্রথম লাইনটি একটু পাল্টে গাইলেন, "মরবো ... . লুকইয়ে।" হঠাৎ বামদেব বীরভাবে বললেন "কোথায় আর যাব? এই শিমুলতলাতেই থাকিব, লাখ লাখ, ক্রোড় ক্রোড় পাঁঠা খাব, সাদা পাঁঠা বাবা।" এ কথার অর্থ হরিবাবু সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারলেন না। পরবর্তীকালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হোল তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে বামদেব এ ব্যাপারেরই ইঙ্গিত সেদিন দিয়েছিলেন।

যাহোক অতঃপর বিশ্রামের জন্য বামদেব আশ্রমে ফিরে এলেন সদলবলে। বিকেল বেলায় বিশ্রাম শেষে বামদেব তাঁর আশ্রমের দাওয়ায় বসে আছেন—পাশে হরিবাবু বসে রয়েছেন। এমনি সময় একটি মহিলা তাঁর সাত বছর বয়সের ছেলে নিয়ে বামদেবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মহিলাটি তাঁর এই শিশুপুত্রের কল্যাণের জন্য

ব্যাকুলভাবে বামদেবের চরণে প্রণাম জানিয়ে বামদেবের শ্রীচরণধুলি চাইলেন। কিন্তু বামদেব নির্বিকার ভাবে বসে রইলেন। হরিবাবু মহিলার ব্যাকুলতা দেখে সহৃদয় ভাবে বামদেবের অনুমতি ছাড়াই বামদেবের শ্রীচরণের পবিত্র ধূলো নিয়ে বালকটির মাথায় দিলেন। বামদেব রেগে গিয়ে শাস্ত্রী মশায়কে বললেন "ব্যাটা, এতবড় স্পর্ধা, আমার পায়ের ধূলি আমায় না বলিয়া দিলি। তোর ব্যাটার ফটের ভয় নাই।" হরিবাবু সভয়ে মনে মনে বামদেবের কাছে ক্ষমা চাইলেন। করুণাময় শ্রীবাম একটু পরেই শান্ত হলেন। মহিলাটিও পুত্র সহ উঠে চলে গেলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হলো। আশ্রমে প্রদীপ জ্বালা হল। ইতিমধ্যে আটলা গ্রাম থেকে বামদেবের পরোলোকগত ছোট ভাই রামচন্দ্রের বড় মেয়ে এলেন বামদেবের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য, বললেন "জেঠাবাবা, বড় শীত আমাদের গায়ের কাপড় নাই।" সর্বজ্ঞ বামদেব জানেন যে তাঁর ছোট ভাই শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী ইন্দুমতীদেবী দুই মেয়ে নিয়ে কঠোর দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করছে। করুণাময় বামদেব তাই মাঝে মাঝে কিছু আর্থিক সাহায্য করেন। যাহোক বামদেব এ ব্যাপারে প্রিয় শিষ্য সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়কে কিছু অর্থ দেবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। সুবোধবাবুর কাছে টাকা না থাকায় তিনি গুরুভাই হরিবাবুর কাছ থেকে ৪৲ নিয়ে বামদেবের বড় ভাইঝির হাতে দিলেন। রাতে তারামার শীতলীপ্রসাদ সারমেয়বৃন্দ নিয়ে খেয়ে বামদেব আশ্রমের উত্তর দিকের দাওয়ায় দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়ে শুলেন। রাতের জলযোগ সেরে হরিবাবু তার গুরুভাই সুবোধ সহ বামদেবের বিপরীত দিকে শুলেন।

যথাসময়ে রবির কিরণ নিয়ে ১২ই পৌষ রবিবার শুরু হল। তারাপীঠে হরিবাবু ও সুবোধবাবুর তৃতীয় দিন শুরু হল। যথারীতি স্নান সেরে হরিবাবু বামদেবের অনুমতি নিয়ে শিমুলতলায় চণ্ডীপাঠ শুরু করলেন। করুণাময় বামদেব বিগত দু'দিনের মত যথারীতি উত্তর সাধকতার কাজ করলেন অদূরে বসে থেকে। চণ্ডীপাঠান্তে নেমে এসে হরিবাবু যথারীতি বামদেবকে প্রণাম করলেন। বামদেব সস্নেহে

তাঁর দক্ষিণ চরণকমল প্রিয় শিষ্যের মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। হরিবাবু বামদেবের কাছে এক উন্নত সন্ন্যাসীকে দেখলেন বসে থাকতে। পরে তার সাথে আলাপ হ'ল, তার নাম জ্ঞানানন্দ পরমহংস। বামদেবের অন্যতম বিশিষ্ট ভক্ত তিনি। এই সময় গুরুবাক্য পালনের মহাজ্ঞান বামদেব শাস্ত্রীমশায়কে নতুন করে শেখালেন। মধ্যাহ্নে নিরামিষ ভোগ এলো। শিমুলতলায় বামদেব ভোজনে বসলেন। তার সাথে দুই শিষ্য ও ভক্ত, জ্ঞানানন্দ পরমহংস, শাস্ত্রীমশায় ও সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় বসলেন। নুটু পাণ্ডা চক্রে না থাকলেও পাশে রয়েছেন। নুটু পাণ্ডা বামদেবের কারণ প্রসাদে একটু চঞ্চল হয়ে জ্ঞানানন্দের কাছে অন্ন প্রসাদ চাইলেন। কিন্তু জ্ঞানানন্দ শক্তি ক্ষয়ের ভয়ে তা দিতে রাজি হলেন না। হরিবাবু তখন জ্ঞানানন্দের পাত থেকে কিছু অন্নপ্রসাদ নুটু পাণ্ডাকে দিলে জ্ঞানানন্দ ও নুটু পাণ্ডা উভয়ে খুশি হলেন। খাওয়া সেরে হরিবাবু জীবিতকুণ্ডে মুখ ধুয়ে পুনরায় শিমুলতলায় এসে বসলে বামদেব সহসা পরম করুণাভরে নিরামিষ অন্নপ্রসাদ দিয়ে বেদাচার শক্তি সঞ্চার করে দিলেন যার ফলে হরিবাবু নির্বিকার ভাবে ঘৃণিত শবমাংস ভোজী কুকুরদের সাথে একত্রে সেই অন্নপ্রসাদ খেলেন। আহারান্তে বামদেব শিমুলতলা থেকে শিষ্য হরিবাবু ও নুটু পাণ্ডার কাঁধে ভর দিয়ে তাঁর আশ্রমের উত্তরদিকের নিম-গাছের নীচে বসলেন। একটু পরে জ্ঞানানন্দ পরমহংস এলে বামদেব তাঁর নিজস্থানে বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন। জ্ঞানানন্দ পদসেবা করতে লাগলেন। দুই শিষ্য হরিবাবু ও সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ও পাশে রয়েছেন। জ্ঞানানন্দ পরম আনন্দে "জয়মা তারা আদ্যাশক্তি"......নামে বামদেবের এক প্রিয় গীত শুরু করলেন তাঁর মধুর কন্ঠে। দিব্যভাবের এই গানটির সাথে দিব্য পরিবেশ অপূর্ব মিলে গেল। সবাই মুগ্ধ ও আনন্দিত। একটু পরে জ্ঞানানন্দ বিশ্রামের জন্য উঠলেন।

হরিবাবু বামদেবের পদসেবা করতে লাগলেন। এমনি সময় তিনি মনে মনে তিনটি উন্নত বাসনা (দুটি জাগতিক ও একটি আধ্যাত্মিক) বামদেবের কাছে কামনা করলেন। সাথে সাথে সর্বজ্ঞ বাম তা পূরণ করলেন এবং তা যে পূরণ করলেন তার প্রমাণও তিনি শিষ্যকে মনের ইচ্ছানুসারে দিলেন নিজ শ্রীচরণদ্বয়ের মাধ্যমে। একটু পরে বামদেব উঠে

বসলেন এবং জ্ঞানানন্দ এসে বামদেবকে গাঁজা সেজে দিলেন। হরিবাবুকে জ্ঞানানন্দ তাঁর জীবনের কথা বললেন। ক্রমে সন্ধ্যা হল। যথাসময়ে তারামায়ের শীতলীপ্রসাদ বামদেব তাঁর প্রিয় সারমেয় সহ গ্রহণ করলেন। শিষ্যদ্বয় সামান্য জলযোগ সেরে যথারীতি বামদেবের আশ্রমে বামদেবের ঠিক বিপরীত দিকে শয়ন করলেন এবং কিছু পরেই নিদ্রাদেবীর কোলে ঢোলে পড়লেন।

এক ঘুমে রাত কেটে গেল। সোমবার সকাল শুরু হল। এই দিন দুপুরে হরিবাবু, সুবোধবাবু ও জ্ঞানানন্দ পরমহংস তারাপীঠ থেকে কলকাতায় ফিরবেন ঠিক হল। স্নান সেরে হরিবাবু বামদেবের ইচ্ছানুসারে শিমুলতলায় যথারীতি চণ্ডীপাঠ করতে শুরু করলেন। বামদেবও যথারীতি চণ্ডীপাঠ শুনতে শুরু করলেন। যথারীতি উত্তর সাধকতার জন্য অদূরে বসলেন। চণ্ডীপাঠান্তে তিনি নেমে এসে বামদেবকে প্রণাম করলে বামদেব সস্নেহে তাঁর পরমপবিত্র দক্ষিণ চরণকমল হরিবাবুর মাথায় রেখে বললেন "শিমুলতলায় ভট্টাচার্য্য বাবা।" অর্থাৎ বামদেব হরিবাবুকে পরম ব্রহ্মবিদ্যা তারাতত্ত্বের ব্যাখ্যাতার পদ দিলেন।

অতঃপর খিচুড়ি ভোগ এলো শিমুলতলায়। বামদেব তাঁর দুই শিষ্য হরিবাবু ও সুবোধবাবু ও প্রিয়ভক্ত জ্ঞানানন্দকে নিয়ে চক্রে বসলেন। এক ঘন্টার মধ্যে খাওয়া শেষ হল। এবার তারাপীঠ থেকে বিদায়ের পালা তাঁদের। বামদেব উপরোক্ত তিনজনকেই আশীর্বাদ করলেন। জ্ঞানানন্দ মাঝে মাঝেই আসেন বামদেবের কাছে। তাই বামদেব সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়কে "আবার আসবি" বললেন, কিন্তু হরিবাবুকে বললেন না। ফলে পরবর্তী কালে শিষ্য সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের আরো একাধিকবার তারাপীঠে বামদেবের সঙ্গ লাভ হয় কিন্তু শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় আর স্থূল দেহে শ্রীগুরু বামদেবকে দর্শন করতে পারেন নি।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য জ্ঞানানন্দ পরমহংস

জ্ঞানানন্দ পরমহংস নামে একজন উন্নত সন্ন্যাসী বামাক্ষ্যাপা বাবার বিশেষ স্নেহের পাত্র। এই বীরাচারী শিষ্যপ্রতীম উন্নত সাধককে বামদেব অধ্যাত্ম জগতের অনেক ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন। জ্ঞানানন্দের ইচ্ছা ছিল বামদেবকেই গুরুরূপে বরণ করেন। কারণ তাঁর সর্বসত্ত্বায় শ্রীবামই বিরাজ করছেন। মনপ্রাণ দিয়ে তিনি মহাযোগী বামদেবকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধাভক্তি করেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ বাম জানেন যে জ্ঞানানন্দের ঐশী নির্দিষ্ট গুরু কাশীতে রয়েছেন। তাই তিনি কাশীতে স্বামী বেদানন্দের কাছে জ্ঞানানন্দকে পাঠালেন। যেমন ভক্ত কুলদানন্দকে ডাবুকের কৈলাসপতির কাছে দীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যদিও বামদেবের নির্দেশে জ্ঞানানন্দ কাশীতে গিয়ে স্বামী বেদানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নিলেন তবু বামদেবকেই তিনি গুরুরূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রায়ই বামদেবের কাছে ছুটে ছুটে আসেন।

জ্ঞানানন্দ একবার অর্থাৎ ১৩১৫ সালের ১২ই পৌষ রবিবার সকালবেলা তারাপীঠে বামদেবের কাছে আসেন এবং ১৩ই পৌষ সোমবার বামদেবের আশ্রমে বসে বামদেবকে করজোড়ে বললেন" তুমিই কাশীতে পাঠাইয়াছ, তাই গিয়াছি ও তথায় মন্ত্র লইয়াছি কিন্তু গুরু তুমিই, তোমাকে ছাড়িব না।" বামদেব জ্ঞানানন্দকে সাদরে বললেন "তুমিই আমার পরমহংস"। জ্ঞানানন্দ উত্তরে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন, "হাঁ বাবা, তোমার কৃপাতেই আমার সব।" জ্ঞানানন্দ বামদেবের মহাত্ম যথেষ্ট উপলব্ধি করেছেন। শ্রীবামের অনেক লীলা ঐশ্বর্য্যও তিনি দর্শন করেও ধন্য হন। শ্রীবামের সাথে জ্ঞানানন্দ বহুবার চক্রেও বসেছেন। ১৩১৫ সালের ১২ই পৌষ রবিবার দুপুরে শিমুলতলায় বামদেবের সাথে তিনি চক্রে বসেন। বামদেবের দুইজন বিশিষ্ট

শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ও সেই চক্রে উপস্থিত রয়েছেন। তন্ত্রমতে ভৈরবী দ্বারা চক্র হয় না।

একথা মনে মনে শাস্ত্রী মশায় চিন্তা করলে সর্বজ্ঞ বামদেব সাথে সাথে তার উত্তরে বললেন "তারাই আমার আশ্চর্য ভৈরবী।" বামদেবের একথা শুনে জ্ঞানানন্দ বললেন "হ্যাঁ বাবা, তাতো ঠিক।" বামদেব পুনরায় বললেন "দেখ না বাবা, পাশে তো ভৈরবী বসিয়াছেন।" বামদেবের এই কথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সবার পক্ষে তা সঠিক-ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বামদেবের তথাকথিত 'আশ্চর্য' কথার অর্থ হল 'দিব্য' বা 'Divine', এবং তাঁর ভাষায় ভৈরবী কথায় অর্থ হল শক্তি অর্থাৎ তারামা দিব্য শক্তিরূপে তাঁর পাশে সূক্ষ্মভাবে বিরাজিতা। আর তারামা বামারূপিনী বলে বামেই অবস্থান করছেন। তারামাই পরমা প্রকৃতি আবার তিনিই পরম পুরুষ—তাই তারাই ব্রহ্মময়ী এবং ব্রহ্ম একাধারে। তাই তারামাই বামরূপে বামে এবং বামাচরণরূপে ("আমার নাম বামা, তায়ে চরণ দিয়ে ক্ষ্যাপা—নিজ নাম সম্পর্কে বামাক্ষ্যাপার উক্তি) ডানে বসে আছেন। তাই তিনিই মূলে ও সূক্ষ্মে বসে আছেন দুই রূপে এবং এই স্থূল ও সূক্ষ্মের 'কারণ'ও তিনিই।

জ্ঞানানন্দ পরমহংস শ্রীবামের কৃপায় অতি উন্নত সাধক। তাই বামদেবের এই কথার তাৎপর্য যথার্থ উপলব্ধি করে অন্তরের সাথে তিনি বামদেবকে সমর্থন করেছেন।

বামদেবের কৃপায় তিনি পরে আরো উচ্চতর অধ্যাত্ম সাধনায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন। বামদেব স্থূলদেহে বর্তমান থাকতে বহুবার এবং স্থূলদেহ অপ্রকট হবার পরেও একাধিকবার জ্ঞানানন্দ তারাপীঠে আসেন। যতদূর সম্ভব জানা যায় শেষ জীবনে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পঞ্চবটী বনের পাশে শিবমন্দিরে সাধনা করতেন। ১৩২১ সালে তিনি মরদেহ ত্যাগ করে অমরলোকে গমন করেন।

—০—

বামদেবের টাকা চুরি প্রসঙ্গে

বামদেবকে দীর্ঘকাল ধরে অনেক শিষ্য ভক্ত ও গুণমুগ্ধ নর-নারীগণ এবং উপকৃত ব্যক্তিগণ প্রণামী স্বরূপ অর্থ দেন। ক্রমশঃ অনেক টাকা জমতে থাকে। প্রায় তিন চার হাজার টাকা হ'ল। তার ফলে একটি লোহার সিন্দুকের প্রয়োজন হয়। এই লোহার সিন্দুকটি কিনে দেন বামদেবের সুযোগ্য শিষ্য ইকিরা নিবাসী শ্রীহৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়।

এই লোহার সিন্দুকটি বামদেবের আশ্রমের ঘরের মধ্যে রাখা হ'ল। চাবিটি বামদেবের কাছেই রাখা হ'ল। যখন খুশি বামদেব ভক্ত ও সেবকের মাধ্যমে প্রণামীর টাকা সিন্দুকে রাখতে পারবেন। আবার প্রয়োজন মত অভাবী লোককে তাঁর ইচ্ছে মত টাকা দানও করতে পারবেন।

তাই বামদেবের কাছেই চাবিটি রাখা হ'ল। আধসের ওজনের চাবিটি কোমরে খড় দিয়ে বামদেব পরলেন। দেহবোধহীন ত্রিগুণাতীত বামদেবের এ এক বিচিত্র লীলা রহস্য শুরু হ'ল। ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু বামদেব। তাই ভক্তদের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। তাই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী বামদেব তাঁর কোমরে এই ভারী চাবিটি রাখলেন।

এই মায়াতীত ব্রহ্মবিদ্ মহাযোগীকে শিষ্য ভক্তগণ এবার চাবির সাজে সাজালেন। রহস্যময় বামদেব কোমরে চাবি রেখে বিষয়ী লোকের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই নগ্ন মহাকায় বৃদ্ধ শিশুর দেহে চাবি দেখে অনেকে হাসলেন। অনেকে আবার বিস্মিত হলেন। অনেকে বৃদ্ধ বয়সে বামদেব বিষয়ী হলেন ভেবে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন। লীলাময় বামদেব যথারীতি নির্বিকার। অর্থের প্রতি তাঁর কোন দিনই তিলমাত্র মোহ নেই। একবার কাশ্মীরের মহারাজা প্রদত্ত বিরাট সোনার থালায় অজস্র স্তূপিকৃত সোনার মোহরের প্রণামীকে

বামদেব "কুকুরের অস্পৃশ্য" বলে প্রত্যাখ্যান করেন। আরো একাধিক-বার টাকা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। সেই বামদেবকেই শিষ্যভক্তগণ এই সামান্য কয়েক হাজার টাকা জমা সিন্ধুকের চাবি রাখতে বললে বামদেব রাজী হ'লেন। চাবিও নিলেন। কিন্তু অনেক সময় এই ভারী চাবি খুলে রাখেন। তাঁর শিশুভাব—প্রথমে আকর্ষণ, তারপর যথারীতি উদাসিনতা। যাহোক, এই টাকা জমা ও খরচ এবং হিসাব রাখার জন্য একটি কমিটি তৈরী হ'ল। রামপুরহাটের উকিল সাধন কুমার মুখোপাধ্যায়, সিউড়ির জনৈক উকিল, রামপুরহাটের উকিল শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কমিটিতে রইলেন।

বামদেব মাঝে মাঝে চাবি খুলে রাখায়, প্রয়োজন বোধে কখনো বামদেবের ভক্ত ও সেবক নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা, কখনো ভূপতি পাণ্ডা, কখনো নুটু পাণ্ডার কাছেও চাবি থাকে এই আয়রণ সেফের। প্রয়োজন মত তাঁরা প্রণামীর টাকা সিন্ধুকে জমা রাখেন এবং খবচের জন্য টাকার দরকার হলে বামদেবের অনুমতি নিয়ে খরচ করেন।

বাংলা ১৩১৫ সালে শারদীয়া পূজার পূর্বে, বামদেবকে প্রদত্ত এই প্রণামীর সঞ্চিত টাকা হিসাব করে দেখা গেল, যে টাকা জমা থাকবার কথা তার থেকে তিনশো টাকা কম রয়েছে। এই তিনশো টাকার হিসাব পাওয়া গেল না। এই তিনশো টাকা চুরি যাওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। বাংলা ১৩১৫ সালে (ইংরেজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ) এই তিনশো টাকার মূল্য যথেষ্ট ছিল (তখন চালের মন দু' টাকা, ডালের মন আড়াই টাকা, মাছের মন দু' টাকা, দুধের মন এক টাকা ছিল)। তখন পঁচিশ টাকায় গৃহস্থ ঘরে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা হ'ত।

যাহোক, বামদেবের দীর্ঘদিনের নিত্যসঙ্গী ও অন্যতম পারিষদ নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডাকে কেন্দ্র করে টাকা চুরির ব্যাপারটি চূড়ান্ত রূপ নেয়। কারণ ১৩১৫ সালের প্রথম ভাগে নগেন পাণ্ডা বামদেবের কাছে থেকে সিন্ধুকের চাবি নেন। সিন্ধুকে টাকা জমা করা ও বামদেবের অনুমতি অনুসারে প্রয়োজনীয় খরচের জন্য।

বেশ কিছুদিন পর বামদেবকে নগেন পাণ্ডা চাবি ফেরৎ দেন। শারদীয়া পুজার সময় কমিটি সিন্ধুক খুলে জমা খরচের হিসেব মিলিয়ে

দেখেন তিনশো টাকা কম। এত টাকা কম দেখে কমিটি খোঁজ করে জানেন যে, সেই সময় নগেন পাণ্ডা চাবি নিয়েছিলেন এবং নগেন পাণ্ডা দুই মেয়ের বিয়ের জন্য বামদেবের ঐ আয়রণ সেফ থেকে তিনশো টাকা নেন বামদেবকে না জানিয়ে।

কমিটি নগেন পাণ্ডাকে ডাকিয়ে এনে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নগেন পাণ্ডা অস্বীকার করেন। তখন রামপুরহাটের উকিল তথা কমিটির সদস্যদ্বয় সাধন কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় নগেন পাণ্ডাকে সিউড়ির জেল হাজতে চালান করেন টাকা চুরির দায়ে।

নগেন পাণ্ডার স্ত্রী শরৎকুমারী দেবী বামদেবকে এসে বলেন, "বাবা, আপনার নগেন কাকাকে পুলিশ ধরে লিয়ে গেছে। আপনি ছাড়িয়ে লিয়ে আসুন বাবা।" করুণাময় বামদেব তাই শুনে সিউড়ি গেলেন।

বিচারককে বললেন, "ও আমার টাকা লিয়েছে। তুই বিচার করছিস কেনে বটে।" বিচারক তাই শুনে ছেড়ে দিলেন নগেন পাণ্ডাকে।

পরে তিনি কমিটির সদস্যদের বললেন, "এমন মামলা কেন করেন? আপনারা বলছেন আপনাদের টাকা, কৈ বামদেব যখন বললেন তাঁর টাকা তখন তো আপনারা কিছু বলতে পারলেন না?"

উত্তরে কমিটির উকিল সদস্যগণ বললেন, "বামদেবকে দেয়া প্রণামীর টাকা তো বামদেবেরই। বামদেব তাই ঠিকই বলেছেন। তবে এই টাকা বামদেবরই নির্দেশে সৎকার্যে ব্যয়ের জন্য রাখা হয়েছে আমাদের তত্ত্বাবধানে। তাই আমরা ঐ টাকা নিজের টাকার মতই যত্ন করে রক্ষা করি।"

যাহোক কৃপাময় বামদেব নগেন পাণ্ডাকে নিয়ে সিউড়ি থেকে তারাপীঠে ফিরলেন। ফেরবার পথে সাত সের জিলিপি খেয়ে মনের আনন্দে ফিরলেন এই প্রসঙ্গে আরো তিনটি কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ব্যাপারে দ্বিতীয় কাহিনী হ'ল বামদেবের দিব্যসঙ্গ ধন্য ও তন্ত্রাভিলাসী এবং সাধক শিল্পী প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় বর্ণিত কাহিনীটি।

এই টাকা চুরির কিছুকাল পর বাংলা ১৩১৭ সালে ভাদ্র মাসে তিনি তারাপীঠে যান বামদেবের দিব্যসঙ্গ লাভ করবার জন্য। দীর্ঘদিন তিনি ঐ সময় তারাপীঠে বামদেবের আশ্রমে বামদেবের সঙ্গে বাস করেন এবং বামদেবের দিব্য সান্নিধ্য ও বিশেষ কৃপা ও জ্ঞানলাভ করে ধন্য হন। এই সময় প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় এই টাকা চুরি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে যে তথ্য আহরণ করেন এবং স্বয়ং বামদেবের শ্রীমুখ থেকে এই ব্যাপারে তিনি যে কথা শুনেছেন, তাই তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। (দ্রষ্টব্য তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ, ২য় খণ্ড)। তাছাড়া নগেন পাণ্ডার সাথেও তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি নগেন পাণ্ডার একটি স্কেচও অঙ্কন করেন। এই টাকা চুরির কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বামদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই প্রণামীর প্রায় তিন চার হাজার টাকা বামদেব তাঁর আশ্রম সংলগ্ন এক বিশেষ স্থানে পুতে রেখে দেন। একমাত্র সেই বিশেষ স্থানটির কথা তাঁর নিত্য সহচর নগেন পাণ্ডাই শুধু জানেন।

হঠাৎ বামদেব একদিন দেখতে পেলেন যে তাঁর সেই বিশেষ স্থানে টাকাগুলো নেই। তিনি বুঝতে পারলেন যে এটা নগেন পাণ্ডার কাজ। কারণ নগেন পাণ্ডা ছাড়া আর কেউ এই বিশেষ স্থানটির কথা জানে না।

তখন বামদেব নগেন পাণ্ডাকে ডেকে তার গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টিভাবে টাকাটা ফেরৎ দিতে বললেন। নগেন পাণ্ডা অত্যন্ত বিস্মিত হ'বার ভান করে টাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন।

সর্বজ্ঞ বামদেব পুনরায় নগেন পাণ্ডাকে বললেন যে টাকাটা ফেরৎ দিলে নগেন পাণ্ডার ভাল হবে। কিন্তু যে 'ভাল' নগেন পাণ্ডা ইতিমধ্যে হস্তগত করেছেন তা ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত 'ভাল'র জন্য তিনি উৎসাহ বোধ করলেন না।

তখন রসিক বামদেব নগেন পাণ্ডাকে নিয়ে একটু রহস্য করলেন। তাঁর শিষ্যভক্ত উকিলদের মাধ্যমে এই টাকা চুরির ব্যাপারটা সিউড়ির আদালত পর্যন্ত গড়ালো। নগেন পাণ্ডা জব্দ হলেন। বামদেব

সিউড়ির আদালতে দাঁড়িয়ে নগেন পাণ্ডার কথাই বললেন। দোষ স্বীকার করলেন নগেন পাণ্ডা বামদেবের পায়ে ধরে।

কৃপাময় বামদেব নগেন পাণ্ডাকে ক্ষমা করলেন বটে কিন্তু চুরির শাস্তি স্বরূপ নগেন পাণ্ডাকে কিছু কালের জন্য তাঁর আশ্রমে প্রবেশ করতে দিলেন না। তাছাড়া এই টাকা চুরির জন্য নগেন পাণ্ডা সাময়িকভাবে হাঁপানীতে আক্রান্ত হন।

এই সময়ে দেখা যায় যে নগেন পাণ্ডা হাঁপানীতে আক্রান্ত হয়ে বামদেবের আশ্রমের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছেন। কিছুকাল পর বামদেব কৃপা করলেন নগেন পাণ্ডাকে। তাঁর আশ্রমে নগেন পাণ্ডাকে পুনরায় প্রবেশ করতে দিলেন। নগেন পাণ্ডা আবার পূর্বের মত আসা যাওয়া করতে লাগলেন বামদেবের আশ্রমে কিন্তু হাঁপানী রোগটি তাঁর কমবেশী রয়ে গেল।

এই ঘটনার কিছুকাল পর বামদেবের আশ্রমে একদিন তরুণ শিল্পী ও তন্ত্রাভিলাসী এবং পরিব্রাজক প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় বামদেবের আশ্রমে বসে বামদেবের সাথে অধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনা করছেন। ঘরে আরো অনেক ভক্ত উপস্থিত রয়েছেন। তার মধ্যে বামদেবের ভক্ত ও সেবক বাইশ বছর বয়স্ক নগেন্দ্রনাথ বাগচী ও নগেন পাণ্ডা প্রভৃতিও রয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে ভক্তিবাদের কথা উঠলো। নগেন পাণ্ডা এই সময় সহসা বামদেবের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি দেখাবার জন্য বামদেবকে প্রণাম করতে গেলে বামদেব তাঁর পদযুগল সরিয়ে নিয়ে বিরক্তির সাথে উপস্থিত সবার সামনে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তু শালার আবার ভক্তি, তু শালা চোর কোথাকার।" ...ইত্যাদি।

নগেন পাণ্ডাকে সবার সামনে চোর আখ্যা দিয়ে বামদেব যে কিছুকাল পূর্বের চুরির কথাটাই ঘুরিয়ে ইঙ্গিত করলেন তা উপস্থিত সবাই বুঝতে পারলেন।

নগেন পাণ্ডা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সময় সময় বামদেব তাঁর বুদ্ধির প্রশংসাও করতেন। কিন্তু তিনিও কল্পনা করতে পারেন নি যে বামদেব সহসা তাঁর প্রণাম প্রত্যাখ্যান করে উপস্থিত সবার সামনে তাঁকে "চোর" বলে সম্বোধন করবেন। তাই বামদেবের এই

"আকস্মিক উক্তিতে বিশেষ ভাবে সবার সামনে বলায় তিনি লজ্জায় ও অপমানে সাময়িকভাবে বিবর্ণ হয়ে গেলেন।

যাহোক, বামদেবের টাকা চুরির প্রসঙ্গে তৃতীয় কাহিনীটি সংগৃহীত হয় বামদেবের নিত্যলীলার অন্যতম লীলা পরিকর, সেবক ও শিষ্য শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচীর কাছ থেকে।

এই কাহিনীটি হ'ল, বামদেবের গৃহীশিষ্য, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের প্রদত্ত প্রণামীর টাকা জমতে জমতে অনেক টাকা হ'ল।

অবশেষে বামদেবের আটচালা আশ্রমের ঘরের মধ্যে অবস্থিত একটি লোহার সিন্দুকে সেই টাকা জমা রাখা হ'ল। তার সাথে প্রতিদিন যা প্রণামী পড়ে তাও রাখা হতে লাগলো।

সিন্দুকের চাবি বামদেবের কাছেই থাকে। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। প্রায় আড়াই বছর পূর্বে (১৩১৩ সালে) দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং তারাপীঠে এসে বামদেবের কৃপায় তাঁর রাজ্য পুত্র লাভ করেন। কৃতজ্ঞ মহারাজা বামদেবকে প্রতিমাসে প্রণামী বাবদ চল্লিশ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন (দ্রষ্টব্য কামেশ্বর সিং-এর কাহিনী।

কিন্তু দীর্ঘ দু'বছরের ওপর বামদেবের প্রাপ্য প্রণামী দ্বারভাঙ্গা থেকে তারাপীঠে আসেননি। ফলে কামেশ্বর সিং-এর নিকট বামদেবের প্রণামী বাবদ অনেক টাকা পাওনা হয়, প্রায় দেড় হাজার টাকার মত। অবশেষে ১৩১৫ সালে পূজার কিছু পূর্বে নগেন পাণ্ডা সেই টাকা দ্বারভাঙ্গা থেকে তারাপীঠে নিয়ে আসেন কিন্তু তারাপীঠে এসে সেই টাকা প্রাপ্তির কথা তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ায় বামদেবের রামপুরহাট ও সিউড়ির কয়েকজন ভক্ত উকিল নগেন পাণ্ডাকে আইনানুসারে সিউড়ির জেলহাজতে নিয়ে যান।

রামপুরহাটে বামদেবের অন্যতম ভক্ত উকিল শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছেলে তখন ম্যাজিস্ট্রেট। সিউড়ি আদালতে নগেন পাণ্ডাকে উপস্থিত করা হ'ল। ইতিমধ্যে নগেন পাণ্ডাকে মুক্ত করবার জন্য স্বয়ং বামদেব তারাপীঠ থেকে সিউড়িতে এলেন।

আদালতে এসে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তিনি উপস্থিত হলেন।

আদালত লোকে লোকারণ্য হ'ল বামদেবকে দর্শন করবার জন্য এবং বামদেবের কথা শোনবার জন্য।

ম্যাজিস্ট্রেট যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে বামদেবকে বললেন, "বাবা নগেন পাণ্ডা দ্বারভাঙ্গা থেকে আপনার টাকা নিয়ে এসেছে।"

উত্তরে বামদেব বললেন, "যে এনেছে ওই নিয়েছে বাবা।"

করুণাময় বামদেব নগেন পাণ্ডাকে ক্ষমা করলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট এক কথায় নগেন পাণ্ডাকে ছাড়লেন না। তিনি বামদেবের কথায় পাণ্ডাকে জেল হাজত থেকে মুক্তি দিলেও আইনানুসারে নগেন পাণ্ডার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে নিলাম করলেন এবং তা থেকে পনেরশো টাকা তুললেন। সেই টাকার কিছু বামদেবের নিত্য সেবার জন্য রেখে বাকি টাকা দিয়ে রাস্তা করলেন লোকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য। সেই রাস্তার নাম বামদেব রোড।

চতুর্থ তথা শেষ কাহিনীটি হ'ল। নগেন পাণ্ডা একেবারে টাকাটা চুরি করেননি। বাধদেবের জন্য প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা মনি অর্ডারে আসতো।

বুদ্ধিমান নগেন পাণ্ডা বামদেবকে দিয়ে টিপ সই করিয়ে টাকাটা নিয়ে নিতেন। তারপর তিনি ধরা পড়েন। সিউড়ি জেলহাজতে তাঁকে পুলিশ নিয়ে যায়। তখন নগেন পাণ্ডার শালা যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা তাঁর দিদি শরৎ দেবীকে (নগেন পাণ্ডার স্ত্রী) বললেন, "দিদি, তুমি ক্ষ্যাপা বাবার কাছে যাও। তিনিই কেবল জামাইবাবুকে ছাড়িতে আনতে পারেন।" শরৎদেবী তখন বামদেবকে গিয়ে বললেন তাঁর স্বামীর মুক্তির জন্য।

করুণাময় বামদেব সিউড়ি গেলেন। সিউড়ির আদালতে উপস্থিত হলেন। তারাপীঠের বিখ্যাত বামাক্ষ্যাপাবাবা আদালতে আসায় আদালতের চারদিকে প্রচণ্ড ভীড় জমে গেল। বিচারকের নির্দেশে নগেন পাণ্ডাকে নিয়ে আসা হ'ল আদালতে। নগেন পাণ্ডার হাতে হাত কড়া পরা। করুণাময় বামদেব তা দেখে বিচারককে বললেন, "বাঁধন খুলে দাও বাবা। আমার টাকা নিয়েছে। তুমাদের কি? এর (নগেন পাণ্ডাকে দেখিয়ে) সব ছেলেপূলে রয়েছে। ভাল লাগেনা বাবা। ছেড়ে দাও।"

বিচারক ; বামদেবের নির্দেশে ছেড়ে দিলেন। বামদেব নগেন পাণ্ডাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তারাপীঠ চললেন। তারাপীঠে ফেরবার পথে মল্লারপুরে নেমে মহুলা গ্রামে গিয়ে শুড়ির দোকানে মদ খেয়ে 'তারা তারা' বলতে বলতে তারাপীঠে চলে এলেন নগেন পাণ্ডা সহ।

বামদেব যে এই টাকা চুরির ব্যাপারটা কত সহজ ভাবে গ্রহণ করেছেন তার একটি আশ্চর্য উক্তি থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

তাঁর এই টাকা চুরি যাবার পর একভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, কে টাকা চুরি করেছে ?

সর্বজ্ঞ বামদেব জানেন নগেন পাণ্ডাই টাকা চুরি করেছে এবং তা প্রমাণিত হয়েছে এবং নগেন পাণ্ডার জেলও হয়েছে। সর্বোপরি বামদেব স্বয়ং সিউড়ি গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। তবু বামদেব আশ্চর্য উত্তর দিলেন, "তারা বেটী বদ্‌। বেটিই সব টাকা চুরি করেছে।"

তারাময় বামদেবের সবই তারামা। তাই জগত সংসারের নিত্য সকল ঘটনার স্রস্টা স্বয়ং তারামা-ই। তাই সবকিছুর কারণ তারামা-ই। বামদেবের এই আশ্চর্য পরম জ্ঞান মণ্ডিত উক্তির মধ্য দিয়ে এই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ দেবমানবের ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মজ্ঞান তথা অভেদ জ্ঞান ও করুণাঘন রূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

যাহোক ; বাংলা ১৩১৫ সালে পূজোর পূর্বে বামদেবের এই টাকা চুরি প্রসঙ্গে উপরোক্ত চারটি বিশিষ্ট কাহিনী থেকে মোটামুটি তিনটি ব্যাপার পরিস্কার ভাবে পাওয়া যায়। প্রতিটি কহিনীর মধ্যে তিনটি ব্যাপার রয়েছে। তাহ'ল—

১। নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা বামদেবের টাকা চুরি করেছিলেন।

২। নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডাকে টাকা চুরির অপরাধে সিউড়ি জেল হাজতে থাকতে হয়েছিল।

৩। বামদেব তারাপীঠ থেকে সিউড়ি গিয়ে নগেন পাণ্ডাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

উপরোক্ত চারটি কাহিনীই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। তাই এই চারটি বাস্তব ভিত্তিক কহিনীর এই ব্যাপারে সত্যতা ও প্রামান্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

নগেন পাণ্ডা কিভাবে টাকা চুরি করেছিলেন, কত টাকা চুরি করেছিলেন, কত টাকা জরিমানা দিয়েছিলেন—এই ব্যাপারে উপরোক্ত চারটি কাহিনী কিন্তু একমত নয়।

কিন্তু একমত না হলেও ক্ষতি নেই। কারণ চুরিটাই-ই মুখ্য ব্যাপার। চুরির পদ্ধতি, বা স্থান বা পরিমানটা বড় কথা নয়। সেটা গৌণ ব্যাপার। তাই মুল ব্যাপারে উপরোক্ত চারটি কাহিনীই সম্পূর্ণ একমত।

তাছাড়া এই চুরির মামলা ও জরিমানার ব্যাপারটি তৎকালীন সিউড়ি আদালতের নথিপত্রে নথীভুক্ত রয়েছে।

উপরোক্ত প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ কাহিনীর জন্য লেখক যথাক্রমে বামদেবের দিব্যকৃপাধন্য হুগলীর হরিপালের তেলিখানা শ্মশান আশ্রমের অধ্যক্ষ ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত, বামদেবের অশেষ সঙ্গ ও কৃপাধন্য কলকাতা (টালীগঞ্জ) নিবাসী শ্রীপ্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়, বামদেবের সেবক ও শিষ্য তারাপীঠ নিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচী এবং বামদেবের দর্শন ও কৃপাধন্য কড়কড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীকমলাক্ষ রায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বাংলা ১৩৫২ সালের মহানবমীর দিন (৫ই অক্টোবর ১৯৪৪) প্রথম কাহিনীটি ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত সহৃদয়তার সাথে লেখককে বলেন।

বাংলা ১৩৫২ সালের ৩০শে আষাঢ় নব্বই বছর বয়স্ক প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় কাহিনীটি লেখককে বলেন।

তৃতীয় কাহিনীটি বাংলা ১৩৫২ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ সাতাশী বছর বয়স্ক শ্রীনগেন বাগচী লেখককে আন্তরিকতার সাথে বলেন।

চতুর্থ কাহিনীটি বাংলা ১৩৫২ সালের ২৫শে পৌষ ছিয়াশী বছর বয়স্ক শ্রীকমলাক্ষ রায় লেখককে বলেন।

এজন্য উপরোক্ত চার জনের কাছে লেখক বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

—০—

স্যার মহারাজের কৃপালাভ

শিবাবতার বামাক্ষ্যাপা তারাপীঠ থেকে সিউড়ি আদালতে এসেছেন। তাঁর টাকা চুরি করেছিলেন নগেন পাণ্ডা (যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে)।

নগেন পাণ্ডা ধরা পড়ে সিউড়ি জেল হাজতে রয়েছেন। করুণাময় বামদেব নগেন পাণ্ডাকে মুক্ত করবার জন্য সিউড়ি আদালতে এলেন। বিচারককে নির্দেশ দিলেন মুক্তি দেবার জন্য। বামদেবের নির্দেশে নগেন পাণ্ডাকে মুক্তি দিলেন বিচারক।

বামদেব আদালতের বাইরে এলেন। তাঁর চারপাশে তাঁর গুণমুগ্ধদের ভীড়।

এই সময় সিউড়ি হাই স্কুলের শিক্ষক চক্রবর্তীমশায় বামদেবের কাছে এলেন। তাঁর কোলে একটি মুমূর্ষু বালক। বামদেবের পায়ের কাছে বালকটিকে নামিয়ে রেখে সবিনয়ে বললেন, "বাবা, একে রক্ষা করুন। এই আমার এখন একমাত্র বংশধর। ইতিপূর্বে আমার পরপর কয়েকটি সন্তান শিশু বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই ছেলেই এখন একমাত্র সম্বল। কিন্তু এই ছেলেও বুঝি আর বাঁচে না। কি হয়েছে কেউ ধরতে পারছে না। সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়েছে। অবস্থা খুবই সংকটজনক।"

করুণাময় বামদেব শান্তভাবে সব শুনলেন। আদর্শ শিক্ষাব্রতী চক্রবর্তী মশায়ের দিকে তাকালেন। চক্রবর্তী মশায়ের গভীর বিষণ্ণ ও শোকাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে করুণাময় বামদেবের কোমল হৃদয় সমবেদনায় ভরে উঠলো। কিন্তু চক্রবর্তী মশায়কে কিছু বললেন না। সহসা এক বিচিত্র লীলার অবতারণা করলেন।

হঠাৎ সজোরে পদাঘাত করলেন মুমূর্ষু বালকটিকে। মহাকায় বামাদেবের প্রচণ্ড পদাঘাতে জীর্ণ শীর্ণ মৃত প্রায় বালকটি ছিটকে

পড়লো কিছু দূরে। উপস্থিত সবাই হয়ে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক। সবাই ভাবলেন যে বোধ হয় এই রুগ্ন বালকটি বামদেবের প্রচণ্ড লাথি খেয়ে মরেই গেছে। এটাই স্বাভাবিক।

বামদেব কিন্তু আর কোন দিকে না তাকিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন ভক্ত সঙ্গে। চক্রবর্তী মশায় এই আকস্মিক ঘটনায় হতচকিত ও বিহ্বল হয়ে গেলেন। মুমূর্ষু পুত্রের জীবন বাঁচাতে এসে শেষে কি পুত্রকে মেরে ফেললেন।

যে বামাক্ষ্যাপার কাছে পুত্রের জীবন বাঁচাতে এলেন সেই বামাক্ষ্যাপাই শেষে তাঁর পুত্রকে মেরে ফেললেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, চকবর্তী মশায়ের চিররুগ্ন মুমূর্ষু পুত্রটি নিজের থেকেই উঠে বসলো। সে সম্পূর্ণ সুস্থ বালক। এক দিব্য আনন্দে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন।

মহানন্দে পুত্রকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন চক্রবর্তী মশায়। বামদেবের কৃপায় এই ভাগ্যবান পুত্রটি শুধু বেঁচে গেল নয়, উত্তরকালে বংশের মুখ উজ্জ্বল করলো। সিউড়ি নিবাসী এই ভাগ্যবান বালকের নাম উমাপ্রসন্ন চক্রবর্তী।

উত্তরকালে 'স্যার মহারাজ' নামে সুপ্রসিদ্ধ হ'ন। একাধারে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। সাধক ও সন্ন্যাসী রূপে তিনি জন জীবনে সুচিহ্নিত হ'ন।

সিউড়ির সর্বজন পূজনীয় দেবমানব স্বামী সত্যানন্দ পুরী মহারাজের কাছে তিনি দীক্ষা লাভ করে তাঁর মানব জীবন সার্থক করেন।

পরবর্তীকালে কলকাতার উত্তরে বরাহনগরে মণি মন্দির আশ্রমে শ্রীগুরু স্বামী সত্যানন্দের নির্দেশে তিনি শিক্ষকতা ও সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অবসর সময় সত্যানন্দ দেব প্রতিষ্ঠিত এই রামকৃষ্ণ সেবায়তন আশ্রমে শ্রীগুরুর সেবা ও উপদেশের মধ্য দিয়ে সাধন পথে অগ্রসর হতে থাকেন।

বাংলা ১৩৫৬ সালের ২০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার অপরাহ্নে স্বামী সত্যানন্দ পরী মহারাজ অপ্রকট হ'ন। শ্রীগুরুর পুণ্যস্মৃতি ও নির্দেশ

হৃদয়ে নিয়ে স্যার মহারাজ আপন লক্ষ্য পথে অগ্রসর হতে থাকেন। আশ্রমের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষকতা ও আপন সাধনার মধ্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

উপরোক্ত কহিনীটির জন্য লেখক বরাহনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনের ও পশ্চিমবঙ্গের সকল শাখা আশ্রমের সভাপতি স্বামী নির্বেদানন্দের (মাণিক মহারাজের) কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ১৯৫১ সালের ১৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার তিনি বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে অবস্থানকালে লেখককে উপরোক্ত কাহিনী বলেন।

পরে তাঁর মাধ্যমে বরাহনগর আশ্রমে অবস্থানরত স্যার মহারাজের সাথে লেখকের সাক্ষাত হয়। স্যার মহারাজও লেখককে উপরোক্ত কাহিনী স্বয়ং সবিস্তারে বলেন। উপরোক্ত তিনি আরো বলেন যে বামদেবের পদাঘাতের সময় তিনি শরীরে কোন ব্যথাই পান নি বরং অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছিলেন। সে আনন্দ বর্ণনা করা যায় না। সেই পরম আনন্দেই তাঁর রুগ্ন দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। বামদেব শুধু তাঁর জীবনদাতাই নন, তাঁর পরম আনন্দদাতা ও মুক্তি দাতাও বটে।

—o—

ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীবামদেব

বাংলা ১৩১৫ সালের বসন্তকাল। গুড ফ্রাইডের ছুটীতে তারাপীঠে শ্রীবামের কৃপাধন্য ভক্তবৃন্দের আগমন হ'ল।

শ্রীবামকে কেন্দ্র করে শ্রীবামমণ্ডলের এক আনন্দ অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। শ্রীবাম ভক্ত ফতেপুর এম-ই স্কুলের শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবাম শিষ্য রসিক গোঁসাই, হরিবাবু, জনৈক ফকীর

সাহেব, জনৈক সাধু প্রভৃতির আগমনে বামদেবের আশ্রম এখন আনন্দপূর্ণ।

একদিকে ঈশ্বরীয় নামগান, সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ চললো। অন্যদিকে এসবের কেন্দ্রমণি বামদেব চুপচাপ সব দেখছেন, শুনছেন, এবং মাঝে মাঝে মধুর মন্তব্য করছেন।

সেদিন বিকেলবেলা বামদেব জীবিতকুণ্ডের ধারে একটি কম্বলের ওপর বসে আছেন। বসন্তের মৃদু মন্দ মলয় বইছে। মহাজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ বামদেব স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তাঁর পূর্ব ও উত্তর দিকে দিগন্ত প্রসারী মাঠ। দক্ষিণ দিকে তারামায়ের মন্দির শোভা পাচ্ছে। পশ্চিমে তাঁর আশ্রম। আশ্রমের উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম জুড়ে মহাশ্মশান। পূর্বদিকে জীবিতকুণ্ড।

বামদেবের পাশে বসে রয়েছেন শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি প্রভৃতি।

এই সময় দু'জন যুবক তারামায়ের মন্দিরে গিয়ে তারামাকে প্রণাম করে বামদেবের কাছে এল। জীবিতকুণ্ডের পশ্চিম দিকের ঘাটে কম্বলাসনে শ্রীবাম বসে আছেন। যুবকদ্বয় বামদেবকে প্রণাম করে সামনে বসলো। প্রথমটির বয়স বছর আঠাশ। দ্বিতীয়টির বয়স প্রায় বিশ বছর। দ্বিতীয়টির নাম নগেন্দ্র, জাতিতে সে কায়স্থ। তার বাড়ী কান্দীর নিকট। নগেন্দ্র অধ্যাত্মপিয়াসী যুবক। মানসিক অশান্তিতে ভুগছে। তাই তারাপীঠে বামদেবের দর্শন ও কৃপা লাভের জন্য এসেছে। উভয়ে এদিন তারাপীঠে থাকবে। পরদিন তারাপীঠে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন ও লীলাপূর্ণ স্থান দক্ষিণেশ্বরে যাবে। কৃপাময় বামদেবের ইচ্ছায় বামদেবের প্রাজ্ঞ ভক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাদের সাথে আলাপ করে তাদের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ও তৃষ্ণা দূর করলেন। তার সাথে জীবনের উদ্দেশ্য, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, ঈশ্বর দর্শনের উপায়, আত্মত্যাগ এবং অনাসক্তির শান্তিময় পন্থার কথাও আলোচনা হ'ল।

এই সময় এক মুসলমান ফকির এসে বামদেবকে সেলাম করে বললেন, "সেলাম ক্ষেপা বাবা, ভাল আছেন?"

বামদেব স্নিগ্ধস্বরে বললেন, "আসুন ফকির সাহেব এই একরূপ আছি। তারা বেটী বদ্। ভাল খেতে দেয়না, কষ্ট দেয়। বেটী মুণ্ডমালী জীবে কেলী বদ্।"

তারপর বামদেব তাঁর পণ্ডিত ভক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বললেন "ফকির সাহেবকে গাঁজা খাওয়াও পণ্ডিত বাবা।"

যোগেন্দ্রনাথ ফকিরের জন্য গাঁজার ব্যবস্থা করলেন। ফকির সাহেব একাধারে সাধক, কবি ও সংগীতশিল্পী।

যোগেন্দ্রনাথের অনুরোধে ফকির সাহেব বামদেবকে একটি সায়ের শোনালেন। ফকির সাহেব সুর করে বললেন,

"যাকে গোরস্থার মে দেখ
আজব সুরত কি হাল।
ক্যায়সে ক্যায়সে
পয়গম্বর হুঁ রহা হ্যায় পয়মাল।।"

অর্থাৎ কত কত ভাল ভাল লোক, কত কত পয়গম্বর কোথায় চলে গেল, তবু লোকের এই দুদিনের দুনিয়ার জন্য এত মারামারি ও এত আসক্তি।

ফকিরের এই সায়ের শুনে বামদেব ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দ আনন্দিত হলেন। বামদেব অনুরোধ করলেন এই সুফি সাধক ফকিরকে আরেকটি সায়ের শোনাবার জন্য। ফকির সাহেব ধীরে ধীরে বললেন,

"দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা
বেনিয়া বয়েল চড়াই।
ঔর একদিন ভাই আন পরেগা
খোঁজ খবর না পাই।।"

অর্থাৎ মানুষ কোথায় একদিন সব ফেলে চলে যাবে তার ঠিকানা নাই। তবু মোহগ্রস্ত মানুষ কেবল আমার আমার করছে।

বামদেব খুশি হলেন সায়ের শুনে। জীবনের যথার্থ দর্শন এসব অধ্যাত্ম মণ্ডিত ছোট ছোট কবিতার স্তবকে মণি মাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বামদেবকে সেলাম জানিয়ে ফকির সাহেব তাঁর অদূরবর্তী গ্রামের পথে গমন করলেন।

বামদেবের শিষ্য রসিক গোঁসাই ও জনৈক সাধু অধ্যাত্ম আলোচনা শুরু করলেন। সকাল থেকেই এঁরা আলোচনা করছেন। বামদেবের ভক্ত হরিবাবুও এই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় যোগ দিলেন।

বামদেব দীর্ঘক্ষণ আলোচনা শুনলেন শান্তভাবে। তারপর রসিক গোঁসাইকে বললেন "বাবা রসিক, আজ সকাল থেকে এরা অনেক বকলেন। গান কর বাবা।

রসিক গোঁসাই, "যে আজ্ঞে বাবা" বলে মধুর কণ্ঠে সাধক কমলাকান্তের গান ধরলেন—

"তারা নাচ গো মা
দশ দিক আলো করে নাচ গো মা
নাচগো নাচগো শ্যামা আমারি অন্তরে
সদানন্দময়ী নাচগো চিদানন্দ পরে।
নাচ নাচগো শ্যামা অসি লয়ে করে
তোমার দিগবাস্ অট্টহাস গলিত চিকুরে
বাঁশী লয়ে নেচেছিলে মা যশোদার ঘরে।
এবার হৃদে নেচে কৃতার্থ করমা দাস কমলাকান্তরে॥"

গান শুনে বামদেব তারাভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে মুখে এক অপার্থিব জ্যোতি পরিস্ফুট হ'ল। উপস্থিত ভক্তগণ মুগ্ধ নয়নে এই দিব্য দৃশ্য প্রাণ ভরে দর্শন করতে লাগলেন। সাথে সাথে এই মহাসত্য উপলব্ধি করলেন যে, অন্তরে যাঁর তারামা নিত্য নৃত্য করেন, জগতে কোন দুঃখ অশান্তিই তাঁর অন্তরায় হয়না।

—ঃ—

ভাগ্যবান ভোলানাথ দত্ত

কয়েকটি কিশোর শিমুলতলা মহাশ্মশানে এলো। উদ্দেশ্য কিছু খাবার সংগ্রহ করা। মহাশ্মশানে বসে আছেন ভৈরব বামাক্ষ্যাপা। কিশোরেরা বামাক্ষ্যাপার কাছে আসতে সাহস পেলনা। দূরে দাড়িয়ে রইল। কিশোরদের মধ্যে স্বাভাবিক শক্তি ও সাহসের অভাব দেখে বামদেব তাদের বকতে লাগলেন। অর্বাচীন কিশোরগণ তা উপলব্ধি করতে না পেরে চপলতা ও কৌতুকবশতঃ বামদেবের উদ্দেশ্যে ঢিল ছুড়তে লাগলো। ফলে বামদেব কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে কিশোরদের উদ্দেশ্য করে পাল্টা ঢিল ছুড়তে লাগলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য ঢিলগুলো কিশোরদের কাছে এসে পড়ছে বড় বড় বাতাসা রূপে। কখনো বা সন্দেশ রূপেও। পরম বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল কিশোরগণ। তারপরই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো তাদের হৃদয়। মহানন্দে সেই বাতাসা সন্দেশ খেয়ে তারা বাড়ী ফিরলো। এরপর মাঝে মাঝে এই বাতাসা সন্দেশের লোভে এই কিশোরগণ তারাপীঠে বামদেবের অদূরে দাঁড়িয়ে ঢিল ছোড়ে—বামদেবও তার উত্তরে ঢিল ছোড়েন বকতে বকতে কিন্তু তা বাতাসা সন্দেশের রূপ নিয়ে এসে ছেলেদের উদর পরিতৃপ্ত করে।

উপরোক্ত এই অপর্ব ও অলৌকিক কাহিনীটির জন্য গ্রন্থকার সাঁইথিয়া নিবাসী শ্রীভোলানাথ দত্তের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থ রচনা কালীন (৬ই শ্রাবণ, ১৩৮১) ভোলানাথ দত্তের বয়স প্রায় উনআশী বছর। তথাকথিত ঐ কিশোরগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি সানন্দে তারাপীঠে বসে মধুর স্মৃতিচারণ করেন লেখকের সামনে।

—০—

শ্রীবাম করুণাধন্য সবান্ধব ননী কোনাই

তারাপীঠের দু'মাইল দক্ষিণে কড়কড়িয়া গ্রাম। এই গ্রামের আদি নাম রাঘববাটী। রাঘব পণ্ডিতের নামানুসারে হয়েছিল। পরবর্তী কালে নাম হয় কড়কড়িয়া গ্রাম।

এই কড়কড়িয়া গ্রামের একাধিক ভাগ্যবান লোক বামদেবের দর্শন ও সান্নিধ্য এবং কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

অনেকে বামদেবের একাধিক অলৌকিক লীলাও দর্শন করে জীবন সার্থক করেছেন। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য রাজেন্দ্র মণ্ডল ও তাঁর পুত্র নৃসিংহ মুরারী মণ্ডল, মহাদেব মণ্ডল, ননী কোনাই, ভানু মণ্ডল প্রভৃতি।

রাজেন্দ্র মণ্ডল বামদেবের ভক্ত ছিলেন। বামদেবের বহু লীলা দর্শন করেছেন। তাঁর পুত্র ভাগ্যবান নৃসিংহ মুরারী মণ্ডল ছোট বেলা থেকেই বামদেবের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর মানব জীবন সার্থক করেন। একবার ছোটবেলায় তাঁর পিতার সাথে বামদেবের এক বিচিত্র লীলাও তিনি দর্শন করেছেন (দ্রষ্টব্য শ্রীবামের বিচিত্র লীলা)। তিনি দীর্ঘকাল বামদেবের দিব্য সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করেন। এই ভাগ্যবান ভক্তের জন্ম ১২৮৩ সালে। তিনি বামদেবের অন্তলীলার বিভিন্ন সময়ের বহুলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৩৭২ সালে ৮৯ বছর বয়সে এই ভাগ্যবান ভক্ত শ্রীবামমণ্ডলে গমন করেন।

কড়কড়িয়া গ্রামের আরেক ভক্ত মহাদেব মণ্ডল বামদেবের সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করেন বাল্যকাল থেকেই। ১০/১২ বছর বয়স থেকেই তিনি তারাপীঠে গিয়ে বামদেবের আশ্রম গৃহের জন্য জল নিয়ে আসতেন এবং নানান ফরমায়েস খাটতেন। এই ভক্তের জন্ম ১২৯৪ সালে। বাংলা ১৩৬৪ সালে ৭০ বছর বয়সে মহাদেব মণ্ডল অমৃত লোকে যাত্রা করেন।

কড়কড়িয়া গ্রামে ভক্ত প্রবর ননী কোনাই ছোটবেলা থেকে বামদেবের দিব্য দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করেন। বামদেবের বহু অলৌকিক লীলাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন।

ননী কোনাই যৌবন কাল থেকেই স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি একাধিক কবিতা মুখে-মুখে তৈরী করতে পারতেন। তিনি গানও গাইতে পারতেন। তাঁর রচিত একাধিক প্রিয় গানও তিনি বামদেবকে শুনিয়েছেন।

কেউ বামদেবকে তাঁর গুরুদেবের কথা জিজ্ঞেস করলে বামদেব তাঁর আচার্য গুরু মোক্ষদানন্দকে দেখাতেন। আবার 'শালা' বলে মোক্ষদানন্দের সাথে ঝগড়াও করতেন। ননী কোনাই ও উপস্থিত আরো অনেকে এই বিচিত্র মজা দেখতেন।

বামদেব পয়সা ছুঁতেন না। বামদেবের নিত্যসেবক ও চাকর নন্দ দাই (নোদা) কাজকর্ম না থাকলে মাটি খুড়তো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বামদেবকে শুনিয়ে সজোরে বলতো, "গোঁসাইয়ের (বামদেবের) সমাজ দেব (সমাধি)।"

তা শুনে বামদেব ভয়ের ভান করে নোদাকে পয়সা দিতেন। যেন নোদা আর মাটি না খোড়ে। প্রভু বামদেব ও নোদার এই বিচিত্র রসিকতা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ।

ননী কোনাইয়ের একটি লাঠি রয়েছে। এই লাঠি তাঁর যৌবনে বামদেব স্পর্শ করেছেন। দু'একদিন ব্যবহারও করেছেন। আবার ননী কোনাইকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বামদেবের পবিত্র স্পর্শ ও স্মৃতি বিজড়িত সেই লাঠি ননী কোনাই সারাজীবন নিজ গৃহে সযত্নে রেখেছেন।

বাংলা ১৩৫২ সালের ২৫শে পৌষ শনিবার শতাধিক বছর বয়স্ক ননী কোনাই সেই আশ্চর্য সর্পাকৃতি লাঠিটি এই লেখককে স্বেচ্ছায় উপহার দেন। এই লাঠিটিকে ঘিরেও একাধিক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে।

ননী কোনাইয়ের বন্ধু ভানু মণ্ডলও বামদেবের দিব্য দর্শন ও সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করেছেন।

একবার যুবক ননী কোনাই ও ভানু মণ্ডল কড়কড়িয়া থেকে তারাপীঠে গেছেন। বামদেব আপন মনে বসে আছেন। জনৈক ভক্ত পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়ে গেছেন। বামদেবের ইঙ্গিতে তাঁর এক সেবক পাণ্ডা বামদেবের লোহার সিন্ধুকে পাঁচ টাকা ফেলতে গেলেন। বামদেব নিজে টাকা স্পর্শ করেন না। পাণ্ডা পাঁচ পয়সা সিন্ধুকে ফেলে বামদেবকে বললেন, "দেখুন বাবা, পাঁচ টাকা ফেললুম।"

বামদেব হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। পাণ্ডা খুশি হয়ে টাকা নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। সর্বজ্ঞ বামদেব সবই জানেন কিন্তু তিনি যথারীতি নির্বিকারভাবে বসে রইলেন।

একদিন সন্ধিগড়া বাজারের এক ডোম তত্ত্ব নিয়ে যাচ্ছে। হাসন থেকে আরেক ডোম আসছে জিনিষপত্র নিয়ে। উভয়ের দেখা হ'ল তারাপীঠে। দু'জনে বামদেবকে প্রণাম করলো। সহসা বামদেব মোটা লাঠি দিয়ে ওদের সকল তত্ত্ব ও জিনিষ পত্র ভেঙ্গে ছাতু করে দিলেন। তা দেখে উভয়ে খুশি হলেন। ওরা মনে মনে ঠিক করে-ছিল যে, বামদেব যদি সত্যিই অন্তর্যামী মহাপুরুষ হয়, তবে এসব জিনিষ পত্র বামদেব তার মোটা লাঠি দিয়ে (সরু লাঠি দিয়ে নয়) সব ভেঙ্গে ছাতু করে দেবেন। সর্বজ্ঞ বামদেব ওদের মনের বাসনা পূর্ণ করলেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক কড়কড়িয়া গ্রামের ননী কোনাই ও ভানু মণ্ডলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বাংলা ১৩৮২ সালের ২৫শে পৌষ শনিবার শতাধিক বছর বয়স্ক ননী কোনাই এবং প্রায় নব্বুই বছর বয়স্ক ভানু মণ্ডল লেখককে উপরোক্ত কাহিনী বলেন। এজন্য বামদেবের দর্শন ও কৃপাধন্য এই দুই প্রবীন বৃদ্ধের কাছে লেখক বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবাম কৃপাধন্য সবান্ধব লালমোহন মুখোপাধ্যায়

১৩১৬ সালের বর্ষাকাল, শনিবার দিন কলকাতা থেকে লালমোহন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর আত্মীয় ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁদের বন্ধু মন্মথ নাথ সেন তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন।

তারাপীঠে তাঁদের আসার উদ্দেশ্য হল তারাপীঠ অধিশ্বরী তারামাকে দর্শন করা ও তারাপীঠের বহু বিশ্রুত মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করা ও তাঁর সঙ্গ লাভ করা। এদের মধ্যে আশুবাবু লেন, খিদিরপুর, নিবাসী লালমোহন মুখোপাধ্যায় বিশেষ ভাগ্যবান লোক। তারাপীঠে আসবার কিছুকাল পূর্বে তিনি স্বপ্নে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখেন। এক বিশাল মহাশ্মশানের মধ্যে এক একটি ছোট্ট কুড়ে ঘর। তার মধ্য থেকে এক বিস্ময়কর দিব্য দেহ মণ্ডিত প্রকৃতি পুরুষ-সমন্বিত দেবী মূর্তি বেরিয়ে এসে তাঁকে বললেন, "আমার কাছে আয়, তোর ভাল হবে।

সেই থেকে ভাগ্যবান লালমোহন মুখোপাধ্যায় মনে প্রাণে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন স্বপ্নের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করবার জন্য। এর কিছুকাল পরেই দৈবযোগে তার আত্মীয় বেচারাম স্ট্রীট নিবাসী ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসাদ দত্ত স্ট্রীটের অধিবাসী বন্ধুবর মন্মথ নাথ সেনের আকস্মিক সহযোগীতায় তিন বন্ধুতে মিলে তারাপীঠে চলে এলেন। পথে আসার সময় ট্রেনে বামদেবের অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য জানকী নাথ ভট্টাচার্যের সাথে পরিচয় হল। তিনিও যথারীতি শ্রীগুরু বামের কাছেই আসছিলেন। রামপুরহাট নেমে পদব্রজে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে পরম আনন্দে রওনা হলেন।

দ্বারকা নদী পার হয়ে তারাপীঠে প্রবেশ করবার কিছু পূর্বেই তারা দূর হতে নাদসিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষ্যাপার মেঘমন্দ্রিত স্বর তারপরে

"শ্রীদুর্গা, জয়তারা" শুনতে পেয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলেন। দ্বারকা নদী পার হবার পূর্বেই অদূরে দেখলেন তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব মহাযোগী বামাক্ষ্যাপাকে। বামদেব তখন দ্বারকা নদীতে স্নান করছেন। দ্বারকা নদী পার হয়ে তারা তারাপীঠে উপস্থিত হয়ে বামদেবের অদূরে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে ভূপতি পাণ্ডা যজমান রূপে লালমোহন বাবু, ননীগোপালবাবু ও মন্মথ নাথ সেনকে চিহ্নিত করলেন। বামদেব এক এক দেবদেবীর নাম ধরে অবিরাম ডুব দিয়ে চলেছেন। তা দেখে ভূপতি পাণ্ডা লালমোহন বাবুদের আসবার কথা বামদেবকে জানালেন কিন্তু বামদেব তা গ্রাহ্য করলেন না। তখন বামদেবের অন্যতম শিষ্য উকিল হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় এসে বামদেবকে বিশেষ অনুরোধ করায় বামদেব কিছুক্ষণ পর জল থেকে উঠে এলেন। তারপর ভক্তবৃন্দের সামনে তারামায়ের চরণ কমলে পুষ্পাঞ্জলী দিলেন। তারামার দর্শন, পূজা ও বামদেবের সঙ্গলাভ করে শনিবার দিনটি মহালগ্নে লালমোহন বাবুরা কাটিয়ে দিলেন। রবিবার সকালে শিমুলতলায় ভক্ত পরিবৃত অবস্থায় বামদেবকে দর্শন করে তাঁরা মুগ্ধ হন। বামদেবের জন্য ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে যে বিলেতি মদ ও গাঁজা এনেছিলেন তা তিনি বামদেবের চরণে সশ্রদ্ধ চিত্তে রাখলেন। বামদেব বিলেতি মদকে সাহেব বাবাদের রক্ত বলেন। আনন্দে তাই তিনি জলের মত পান করে শেষ করলেন।

এই দিনটি লালমোহন বাবু এবং তার দুই বন্ধু ননীবাবু ও মন্মথ নাথ সেনের জীবনে চিরস্মরণীয়। এই দিন বিকেলবেলা শিমুলতলায় বামদেব নিজগুণে কৃপা করে এই তিনজনকে তারামন্ত্রে দীক্ষা দেন। দীক্ষার পর তারা যেন নবজন্ম লাভ করেন। এই দীক্ষার দু' একদিন পরে সর্বজ্ঞ বামদেবের একটি বিচিত্র লীলা তাঁরা দর্শন করেন। বিকেল বেলা বামদেব শিমুলতলায় আপনভাবে বিভোর হয়ে বিরাজ করছেন। তাঁকে ঘিরে আছেন শিষ্য জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ও নবীন তিন শিষ্য অর্থাৎ লালমোহন মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মন্মথনাথ সেন এবং বামভক্ত কয়েকজন ফকির। সহসা বামদেব বলে উঠলেন "বদ শালরা আসছে, সব বদ জিনিষ নিয়ে আসছে"।

একটু পরে দুটি তরুণ হারমোনিয়াম ও বেহালা সহ সেখানে উপস্থিত হল। তারা এসেছে কলকাতা থেকে। বামদেবের জন্য গোটা কয়েক বিলেতি মদের বোতল ও এক হাঁড়ি সন্দেশও নিয়ে এসেছে। তরুণ দুটি বামদেবের সামনে মদের বোতল ও সন্দেশ রাখলো, বামদেবের সেবার জন্য।

এই সময় বামদেবের নিত্য সহচর কালু কুকুর সন্দেশের হাড়িটি একটু শুঁকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সাথে সাথে বামদেব উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। কালু কুকুর যে জিনিষ খেতে ঘৃণা করে সে জিনিস বামদেব খেতে পারেন না। কে কি মন নিয়ে দিচ্ছে তার মাপকাঠি হল কালু। যে সৎভাবে, সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, শুদ্ধভাবে বামদেবকে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে তার দেয়া জিনিষ কালু স্পর্শ করে। কালুর স্পর্শ মানেই সে পাশ করলো বামদেবের দিব্য দরবারে। আর তার দেয়া জিনিষ বামদেব সানন্দে গ্রহণ করেন। কিন্তু কালু যার জিনিষ স্পর্শ করে না অর্থাৎ লোভী ও ভোগী লোকের জিনিষ বামদেব চরম ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন। কালু তাই বাম দরবারের দ্বারী। শ্রীবামের প্রথম পরীক্ষার প্রতীক হল কালু। সৎ ও অসৎ মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি, কালুই সবার সামনে জানিয়ে দেন বামদেবকে। আপাতদৃষ্টিতে বামদেবের বিচিত্র বিচারালয়ে মানুষের বিচারক হল পশু। সত্যই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বহিরঙ্গে তাই মনে হলেও অন্তরঙ্গে কিন্তু এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ বামদেবের কাছে এমন অনেক মানুষ এসেছে যারা আকৃতিতে মানুষ কিন্তু প্রকৃতিতে পশুরও অধম। তাই বহিরঙ্গে মানুষ কিন্তু অন্তরঙ্গে পশু, এসব নরপশুদের স্বরূপ প্রকাশের জন্যই বামদেব বহিরঙ্গে পশু অন্তরঙ্গে মহান মানুষ কালুবাবুকে বিচারকরূপে নিযুক্ত করেছেন তার অধ্যাত্ম জগতের বিচারালয়ে। কালু সম্বন্ধে বামদেব একাধিকবার তাঁর শিষ্য ভক্তদের বলেছেন যে কালু শুধু নিছক কুকুর নয়। সে গতজন্মে একজন উন্নত ব্রাহ্মণ সাধক ছিল। কিন্তু তন্ত্র সাধনার উচ্চ অবস্থায় সিদ্ধাই শক্তি প্রয়োগ করে পতন হয়। শক্তি চালাচালির ফলে শক্তির অপচয় ঘটায়, ফলে তার পতন ঘটে। তার শাস্তি স্বরূপ তারামা তাকে

কুকুর যোনি দিলেন। কুকুর যোনি প্রাপ্ত হলেও সে তার গত জন্মের সংস্কার সব নিয়েই জন্মেছে।

তাই আকৃতিতে পশু হলেও কালু প্রকৃতিতে যথার্থ মানুষ। তাই নররূপী দেবতা বামদেবের কাছে কে কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে তার পরীক্ষক হলেন পশুরূপী মানুষ 'কালু বাবু'। তাই 'কালু বাবু' পরীক্ষা করে যে নির্ভুল রায় দেন—বামদেব তা সানন্দে গ্রহণ করেন এবং সেই মত ব্যবস্থা দেন। বামদেবকে খুশি করে তাঁর মুখে থেকে লটারীর প্রথম পুরস্কার পাবার কথাটি আদায় করে নেবার মতলব করে এসেছে এরা। যথারীতি 'কালু বাবুর' রায়ের জন্যই বামদেব চুপ করে অপেক্ষা করে আছেন। যেই কালু মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, সাথে সাথে বামদেব কালুর রায় পেয়ে গেলেন অর্থাৎ এই তরুণ দুটির উদ্দেশ্য অসৎ। খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এরা বামদেবকে এই ভেট দিয়ে তাদের জাগতিক মতলব সফল করতে চায়। অর্থাৎ ডারবি লটারীর টিকিট কিনেছে এরা। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ বামদেবকে মদ ও সন্দেশ খাইয়ে ও গান বাজনা শুনিয়ে কৌশলে ঘুষ দিয়ে পরমার্থের কাছ থেকে অর্থ লাভ করতে চায়। অধ্যাত্ম জগতের পরম শিখরে যিনি বসে আছেন—তাঁর কাছে এই জাগতিক কৌশল টেঁকে না। এ দুজন আসার আগেই এদের এই মতলব সর্বজ্ঞ বামদেব জেনে গেছেন। তাই বললেন "বদ শালরা আসছে, সব বদ জিনিষ নিয়ে আসছে।"

কিন্তু উপস্থিত লালমোহন বাবুরা, জানকী ভট্টাচার্য ও ফকিরগণ বামদেবের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। দেবতার ভাব ভাষা সাধারণ 'মানুষ কি করে উপলব্ধি করবে।' তাই সবার সামনে বামদেব পশুরূপী মানুষ ও বামদরবারের দ্বারী কালুকে মনে মনে আহ্বান করলেন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে কালু ছুটে এসে সন্দেশের হাঁড়ি শুঁকে মুখে ফিরিয়ে চলে গেল অর্থাৎ জানিয়ে দিল যে এ খাদ্য অসৎ উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে তাই গ্রহণযোগ্য নয়। বামদেব কালুর ইঙ্গিত পেয়েই ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। বামদেবের এই উগ্রভাব দেখে উপস্থিত অনেকে ভাবলেন যে, কালু কুকুর পশু হয়েও যে খাবার ঘৃণাভরে স্পর্শ না করে চলে গেল, সেই পশুরও ঘৃণিত ও

পরিত্যাজ্য খাবার বামদেবকে নিবেদন করা হয়েছে। তাই বামদেব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। সহসা বামদেব একটি মড়া পোড়ানো কাঠ দিয়ে সেই সন্দেশের হাঁড়ি ও মদের বোতলগুলো ভেঙ্গে ফেলে দিলেন। ফলে মাটিতে সন্দেশ ও মদে একাকার হল। বামদেবের এই ভয়ঙ্কর মেজাজ দেখে ভয় পেয়ে তরুণ দুটি হারমোনিয়াম ও বেহালা নিয়ে তারামায়ের মন্দিরে চলে গেল। নগেন পাণ্ডার কাছে গিয়ে বললো সব কথা। এসব জাগতিক ব্যাপারে অনেকেই নগেন পাণ্ডার শরণ নেয়। নগেন পাণ্ডা এসব জাগতিক ব্যাপারে তাঁদের শুধু আশ্রয়-দাতাই নন, প্রশ্রয়দাতাও বটে। তাই নগেন পাণ্ডা এলেন বামদেবকে শান্ত করবার জন্য। যাতে করে এই দুজনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। নগেন পাণ্ডা শিমূলতলায় এসে দেখেন শিমূলতলা সন্দেশ ও মদে একাকার। নগেন পাণ্ডা সব জেনেও না জানার ভান করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বামদেব বললেন "ও শালরা বদ লগেন কাকা। তারামা আমার জিহ্বাগ্রে এসে বললে "ওসব বদ জিনিষ খেতে নেই"। বুদ্ধিমান নগেন পাণ্ডা বুঝলেন এভাবে বামদেবকে রাজি করানো যাবেনা। তাই কৌশল অবলম্বন করলেন। বললেন, "ওরা আপনার ভক্ত, বহু দূর থেকে এসেছে আপনাকে তারানাম শোনাবার জন্য। খুব ভাল তারানাম গাইতে পারে।"

তারানাম গাইতে পারে শুনে তারাময় বামদেব ওদের কাছে এসে গান গাইবার অনুমতি দিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধি আসন্ন ভেবে কৌশলী নগেন পাণ্ডা আনন্দে মন্দিরে গিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিলেন। ওরা দুজনে এসে বামদেবের সামনে হারমোনিয়াম ও বেহালা সহযোগে গান আরম্ভ করলো। গানটি অত্যন্ত স্থূল ধরনের। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওদের সাথে বামদেবও গাইতে শুরু করলেন। গানের মাঝ পথে এক জায়গায় গানের ছন্দ ও সুরের সাথে সঙ্গতি রেখে বামদেব সহসা তরুণ দুটির চোখের সামনে তাঁর দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দুটি তুলে ধরে গানের রেশ টেনে গাইলেন "বদ শালরা, আর এসোনা, বদ শালরা আর এসোনা। লটারীতে টাকা পাবে না।" বামদেবের এই ভাব

ও ভাষা দেখে তারা ভয় পেয়ে তাদের গান বাজনা বন্ধ করে তারামায়ের মন্দিরে চলে গেল। তাদের উদ্দেশ্য ও নগেন পাণ্ডার কৌশল সবই ব্যর্থ হল। সেদিনই তারাপীঠ ছেড়ে তারা কলকাতায় চলে গেল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লালমোহন বাবুরা শ্রীগুরু বামদেবের লীলা মাহাত্ম্য আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীগুরু বামদেবের কাছে এলে যে সর্বজ্ঞ বামদেব পর্বেই তা জানতে পারেন এবং তারামায়ের মাধ্যমে যে তাদের অসৎ গ্লানি থেকে মুক্ত করে কল্যাণ করেন তা লালমোহন বাবুরা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন। শুধু তাই নয় বামদেবকে কে কেউ পরীক্ষা করতে এলে বামদেব যে তা জানতে পেরে সেই লোককে পরীক্ষার মোহ থেকে মুক্ত করে যথার্থ জ্ঞান দেন তাকে, তাও শ্রীগুরু বামের শিষ্য ভক্ত একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছেন।

একদিন এক ধনীলোক বামদেবকে পরীক্ষা করবার জন্য অনেক মূল্যবান অলঙ্কার ও টাকার থলি নিয়ে এসে বামদেবকে প্রণাম করলো। সর্বজ্ঞ বামদেব মুচকি হেসে সে সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাড়ের মালা ও শ্মশানের ধূলি দেখিয়ে সে ধনীকে বললেন, এই দেখ আমার অলঙ্কার, আমার এসব কি হবে? বামদেবের যথার্থ ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করে সেই লোকটির মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার হল। তাই লজ্জায় তিনি অলঙ্কার ও টাকার থলি নিয়ে চলে গেলেন। যাহোক শ্রীবামের কৃপায় দীক্ষা লাভ করে ও বামদেবের দুর্লভ সঙ্গ লাভ করে বামদেবের একাধিক লীলা প্রত্যক্ষ করে লালামোহন মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মন্মথ নাথ সেন ইষ্টদেবী তারামা ও গুরুদেব বামদেবের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে পরম আনন্দে কলকাতায় ফিরে এলেন।

১৩৫৮ সাল (ইং ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫১) রবিবার বামদেবের অন্যতম শিষ্য লালমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর খিদিরপুরের ২ নং আশুবাবু লেনের বাড়ীতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে শ্রীবাম মণ্ডলে চলে গেলেন। বামদেবের কৃপাধন্য মন্মথ নাথ সেন বামদেবের ত্রিশূল ও খড়ম পান। আজো সেই ত্রিশূল ও খড়ম বংশ পরম্পরা তাঁর গৃহে নিত্য পূজিত হচ্ছে।

—o—

লীলাময় বামদেব কর্তৃক ট্রেন আটক—ও মুক্তিদান

আনুমানিক ১৯১৬ সনের শরতের এক মধ্যাহ্ন। বামদেব কয়েক-জন ভক্তবৃন্দসহ তারাপীঠ থেকে সাঁইথিয়ার নন্দিপুর গ্রামে দেবী নন্দিনীকে দর্শন করে যথারীতি তাঁর অন্যতম ভক্ত অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে এলেন। অনন্তবাবু স্থানীয় একটি হোটেলের মালিক। তিনি মূলতঃ অন্তর্মুখীন সাধক। কথায় কথায় রাত হয়ে যায়। সেদিনই বামদেবের তারাপীঠ ফেরবার কথা। কিন্তু বামদেবের সেদিকে খেয়াল নেই। এদিকে সাঁইথিয়া থেকে শেষ গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে গিয়েছে। গার্ডসাহেব গাড়ী ছাড়বার সঙ্কেত জানিয়ে নীল নিশান দেখালো। ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল কিন্তু গাড়ী ছাড়লো না। অথচ ইঞ্জিনে কোন খুঁত নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেলো সবই ঠিক আছে। তবু গাড়ী চলেনা। গাড়ী না চলায় যাত্রীরা অস্থির হয়ে ওঠে। সাঁইথিয়া থেকে রামপুরহাট টেলিগ্রাম করে নতুন ইঞ্জিন এনে গাড়ীতে জুড়ে দেখা হল তবু গাড়ী নড়ল না। ড্রাইভার, গার্ড, ষ্টেশনমাষ্টার প্রভৃতি চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। গাড়ী না চলার কোন কারণই তারা খুঁজে পেলেন না। এদিকে এই শেষ গাড়ীর যাত্রীরাও ক্রমেই অস্থির ও অশান্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষ চেষ্টা হিসাবে লাইনে বালি ছড়িয়ে ও ইঞ্জিনের বাম্পার পাতি বাড়িয়ে দেয়া হল কিন্তু তাও গাড়ী নড়ল না। এমনি সময় বামদেব সাঁইথিয়া ষ্টেশনে এলেন শিষ্য ভক্ত সহ। সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহানযোগী বামদেবকে আসতে দেখে সবাই যেন অকুলে কুল পেলেন। বামদেবের অলৌকিক শক্তির কথা সর্বজন বিদিত। যাত্রীরা বামদেবকে গাড়ীর অচল অবস্থার কথা জানালো। বামদেব শান্তভাবে গাড়ীতে উঠে বসলেন। তারপর বললেন "তারামা চল্"। কি আশ্চর্য সাথে সাথে গাড়ী চলতে

শুরু করলো। সবাই স্তম্ভিত ও আনন্দিত। এই অপূর্ব ঘটনাটি সিউড়ির বিশিষ্ট নাগরিক তথা বি, বি, বাস সার্ভিসের মালিক ভূতনাথ বসু নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে বাংলার বিশিষ্ঠ কবি কুমুদ-রঞ্জন মল্লিককে জানান। কবি তাই শুনে পরে এই ঘটনার ওপরে 'ট্রেন আটক' নামক একটি মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করে বামদেবের ওপর কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান।

বামদেবের এই অলৌকিক লীলাটির সম্পর্কে আরেকটি কাহিনী পাওয়া যায় তা হল বামদেব সিউড়ির আদালতে নগেন পাণ্ডাকে মুক্ত করবার জন্য গিয়েছিলেন এবং নগেন পাণ্ডাকে মুক্ত করে তাকে নিয়ে ফেরবার পথে সাঁইথিয়াতে উপরোক্ত লীলাটি করেন।

তবে স্থান, কাল, পাত্র পরিপ্রেক্ষিতে, এ সম্পর্কে প্রথম মতটিই বিশেষ ভাবে গ্রহণযোগ্য।

—:—

শ্রীবামদর্শনে ধন্য কমলাক্ষ রায়

বাংলা ১৩১৬ সালের হেমন্তের এক স্নিগ্ধ সকাল। বামদেব তাঁর আশ্রমে বসে আছেন। তাঁর আশে পাশে কালু ভুলু শ্বেতফুলি প্রভৃতি সারমেয়বৃন্দ। বামদেবের ভক্ত ও সেবকগণ যে যার প্রাত্যাহিক কাজে ব্যস্ত।

এই সময় কড়কড়িয়া গ্রাম থেকে উনিশ বছর বয়স্ক যুবক কমলাক্ষ রায় এল বামদেবের কাছে। তার সাথে তার বন্ধু ভূষণ মখার্জী ও নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই যুবকদের উদ্দেশ্য হ'ল বামদেবকে

দর্শন করা এবং বামদেবকে মদ মুড়ি খাওয়ানো। স্বভাবত এই মদ মুড়ি প্রসাদ তারাও পাবে।

তিন জনে বামদেবকে প্রণাম করে দেশী মদের বোতলগুলো ও শুদ্ধি স্বরূপ মুড়ি বামদেবের সামনে রাখলো।

বামদেব চুপ করে বসে আছেন। বামদেবের বিশালকায় ভৈরব মূর্তির সামনে কমলাক্ষ রায় ও তার বন্ধুদ্বয় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সশ্রদ্ধ চিত্তে। সর্বজ্ঞ বামদেব এই যুবকদের মনের বাসনা জানতে পারলেন।

কিছুক্ষণ পর বামদেব কারণের বোতল খুলে নিজের কারণ পাত্রে ঢেলে তারামাকে নিবেদন করলেন। তারপর নিজে গ্রহণ করবার পর প্রসাদ দিলেন যুবক কমলাক্ষ রায়, ভূষণ মুখার্জী ও নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে। শুদ্ধি স্বরূপ মুড়ি বামদেব গ্রহণ করলেন এবং এদেরকেও দিলেন। এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হ'ল।

ভারত বিখ্যাত মহাতান্ত্রিক ও মহাযোগী প্রবীণ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার সাথে একত্রে 'কারণ' পান করছে নিতান্ত অর্বাচীন তিনটি নবীন ছেলে। বামদেবের বয়স একাত্তর বছর আর তাঁর সাথে বসে যারা কারণ পান করছে তাদের বয়স এখনও বিশ বছর হয়নি। উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর ওপর ব্যবধান।

কিন্তু করুণাময় বামদেব বয়স দেখেন না। তিনি মন দেখেন। বামদেবকে 'কারণ' খাইয়ে এদেরও 'কারণ' প্রসাদ পাবার বাসনা মনে মনে উদয় হয়েছিল। কৃপাময় বামদেব এদের মনের সেই বাসনা পূরণ করলেন।

এক সময় 'কারণ' পান শেষ হ'ল। কমলাক্ষের বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বামদেবের প্রিয় ভক্ত দুর্গাপদ চক্রবর্তীর (বামদেবের একান্ত প্রিয়, দুর্গামা দ্রষ্টব্য তৃতীয় খণ্ড) ভাইপো, একথা জেনে বামদেব প্রসন্ন হলেন। তারপর বামদেবকে প্রণাম করে ও বামদেবের আশীর্বাদ নিয়ে মনের আনন্দে তিন যুবক কড়কড়িয়া গ্রামে ফিরে গেল।

তারপর মাঝে মাঝে তাঁরা বামদেবকে দর্শন করতে তারাপীঠে যায়। বামদেবের কাছে যখনি যায় কখনো কারণ মুড়ি কখনো

ফল মিষ্টি নিয়ে যায়। সাধুর কাছে কখনো খালি হাতে যেতে নেই। শাস্ত্র সম্মত এই শিষ্টাচার যুবকদের অভিভাবকগণ শিখিয়ে দিয়েছেন।

কমলাক্ষ রায়ের কাকা কড়ারাম রায় তার কৈশোরে চণ্ডীপুর স্কুলে পড়তে যেত। সাথে তাঁর সহপাঠী রাজেন্দ্র মণ্ডল ও বিষ্ণুদাস যেতেন। চণ্ডীপুর তারাপীঠের আদি নাম। তারাপীঠে তখন 'গয়ারাম' নামে তিনটি আমগাছ ছিল। বালক সুলভ চাপল্যবশত কড়ারাম, রাজেন্দ্র মণ্ডল ও বিষ্ণুদাস বামদেবকে দেখলেই 'বামদেব ফট' বলে ঐ 'গয়ারাম' আমগাছ তিনটিতে তিনজনে উঠে পড়তো। কারণ বামদেব তাই শুনে ক্রোধের ভান করে ওদের তাড়া করতেন। তারপর বামদেব ৫/৬ খান আস্ত ইট ছুড়ে মারতেন ওদের দিকে। মজার ব্যাপার এই বিরাট বিরাট ইটগুলো ওদের গায়ে কোনদিনই লাগতো না। বিশাল উচু আমগাছের মাথা ছাড়িয়ে ইটগুলো চলে যেত বহু দূরে। তারামায়ের চিরশিশু বামদেব এই বালকদের সাথে এমনি ভাবে খেলা করতেন।

পরবর্তীকালে বড় হয়ে এই কড়ারাম রায়, রাজেন্দ্র মণ্ডল ও বিষ্ণুদাস বামদেবের মহিমা উপলব্ধি করে বামদেবের ভক্ত হন।

একদিন যুবক কমলাক্ষ রায় বামদেবকে দর্শন করতে গেছেন। বামদেব শিশুর মত নগ্ন হয়ে বসে তারামায়ের অন্নপ্রসাদ খাচ্ছেন। তাঁর সাথে একই পাতায় কুকুরেরাও খাচ্ছে। বামদেব মাঝে মাঝে নিজের হাতে ওদের খাইয়ে দিচ্ছেন। খাওয়া শেষে এঁটো পাতাগুলো ফেলে দিয়ে জীবিত কুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিয়ে মাঝখানে গিয়ে ডুব দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠলেন। তারপর আশ্চর্য স্থির-ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ভেসে রইলেন। তারপর আবার ডুব দিলেন। তারামা'র নামে ডুব দিলেন। এক একবার 'তারা' বলছেন আর ডুব দিচ্ছেন জলে। বেশ কিছুক্ষণ পর জল থেকে উঠে এলেন।

বামদেবের কাছে বড়শাল গ্রাম, চিতুরী, খরুণ, কড়কড়িয়া, আটলা, সরলপুর, প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম থেকে আর্ত ও সমস্যা জর্জরিত বহু নরনারী নিত্য আসা যাওয়া করতো। বহু বালবিধবা বামদেবের কৃপায় আবার নতুন ভাবে সংসার জীবন ফিরে পেয়েছে।

বামদেবের বহু লীলা কাহিনী কমলাক্ষ রায় তাঁর কাকা কড়ারাম রায়ের কাছে শুনেছেন। তাছাড়া গ্রামের আরো প্রাচীন লোকদের মুখ থেকেও শুনেছেন (যথাস্থানে সে সব বর্ণিত হয়েছে)।

কমলাক্ষ রায়ের জন্ম ১২৯৬ সালে। উনিশ বছর বয়সে সর্বপ্রথম তিনি শ্রীবাম সান্নিধ্যে আসেন। ১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ বামদেব তাঁর মহালীলা সম্বরণ করে অপ্রকট হন। তখন কমলাক্ষ রায়ের বয়স প্রায় বাইশ বছর। তারপর সুদীর্ঘকাল বামদেবের এই মধুর স্মৃতি বুকে নিয়ে তিনি দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন। আমৃত্যু সেই স্মৃতি তাঁর পরম পাথেয় হয়ে থাকে। বাংলা ১৩৮২ সালের ২৫শে পৌষ শনিবার কড়কড়িয়া গ্রামে নিজগৃহে বসে ছিয়াশী বছরের বৃদ্ধ শ্রীকমলাক্ষ রায় লেখককে উপরোক্ত কাহিনী বলেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর বন্ধু শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এজন্য লেখক উভয়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বাংলা ১৩৮৬ সনের ১৩ই ফাল্গুন (ইং ২৬. ২. ১৯৮০) মঙ্গলবার বেলা ১২ টা ২০ মিনিটে ৯০ বছর বয়সে কমলাক্ষ রায় পরলোক গমন করেন।

—০—

শ্রীবামকৃপাধন্যা কুণ্ডলিনী ও ননীবালা দেবী এবং শ্রীবামভক্ত গোপেশ্বর মাষ্টার

১৩১৬ সালের হেমন্তের এক মনোরম সকাল। একদিন সকালবেলা বামদেব মহাশ্মশানের পবিত্র শিমুল তলায় বসে আছেন। তারামায়ের ভাবে বিভোর হয়ে আছেন।

মহাপীঠ তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব বামদেবকে দূর থেকে প্রণাম করছেন তাঁর কৃপাধন্য সাধকগণ। এঁরা তারাপীঠ মহাশ্মশানে

বামদেবের কৃপালাভ করে সাধনা করছেন দীর্ঘদিন ধরে। এঁদের মধ্যে পঞ্চানন মিশ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী, কালীকানন্দ ব্রহ্মচারী, চক্রবর্তী-বাবা, সুখানন্দ, জ্ঞান গুরুবাবা, ইটে গোঁসাই, প্রভৃতির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সময় বামদেবের স্নেহধন্য নবীন পাণ্ডার কিশোরী স্ত্রী কুণ্ডলিনীদেবী ও বিপিন পাণ্ডার তরুণী স্ত্রী ননীবালাদেবী তারামায়ের পাদপদ্মে প্রণাম করতে এলেন। তারামাকে প্রণাম করে দূর থেকে বামদেবকে প্রণাম করলেন। কিশোরী কণ্ডলিনীদেবীর বয়স বার বছর। কয়েকদিন পূর্বে শ্বশুর বাড়ী এসেছেন। বাপের বাড়ী বড়তরী গ্রামে। কুণ্ডলিনীদেবীর জন্ম ১৩০৪ সালে। মাত্র সাত বছর বয়সে কুণ্ডলিনী-দেবীর বিয়ে হয় তারাপীঠে। বামদেবের সেবক ও ভক্ত পাণ্ডা শচীপাণ্ডার স্ত্রী সুধামুখীদেবী কুণ্ডলিনীদেবীর মাসী হন। ১৩১১ সালে একই দিনে উভয়ের বিয়ে হয়।

১৩১১ থেকে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর কুণ্ডলিনীদেবী বামদেবকে দর্শন করেছেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছেন। একবার আটচালা আশ্রমে বামদেব বসে আছেন। বামদেবের পাশে কমণ্ডলু ও চিমটে রয়েছে। বামদেবকে প্রণাম করতেই বললেন, "মা, আজ আমাকে দু'টি ভিজে ভাত আর কলাই গুড়ো খেতে দাও"। তাই দেয়া হ'ল। বামদেবের কৃপাধন্য বিপিন পাণ্ডার স্ত্রী ননীবালা-দেবীও বামদেবকে দর্শন করেন এবং নিজ হাতে খাবার তৈরী করে বামদেবকে খাওয়াবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

যাহোক, কুণ্ডলিনীদেবী ও ননীবালাদেবী চলে যাবার কিছুক্ষণ পর বামদেবের বিশেষ স্নেহধন্য গোপেশ্বর মাষ্টার বামদেবকে দর্শন করতে এলেন।

গোপেশ্বর মাষ্টারের বাড়ী বীরভূম জেলার অন্তর্গত গোরসান গ্রামে। গোপেশ্বর মাষ্টার একাধারে ভক্ত ও জ্ঞানী পুরুষ রূপে সুচিহ্নিত। শিক্ষকতার অবকাশে মাঝে মাঝে তারাপীঠে চলে আসেন বামদেবের দিব্যসঙ্গ লাভের জন্য। আজও ছুটী পেয়ে চলে এসেছেন বামদেবের কাছে। গোপেশ্বর মাষ্টার তারামায়ের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করে

বামদেবের কাছে এলেন। বামদেব ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। তাই গোপেশ্বর মাষ্টার চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বামদেবের আশে পাশে কয়েকজন শিষ্য ভক্ত বসে আছেন। অদূরে বামদেবের অন্যতম কৃপাধন্য ভক্ত মহাদেব পান বসে আছেন। তাঁর পাশে বসে আছেন বামদেবের করুণাধন্য রামপুরহাট নিবাসী অবলা হালদার এবং সুরিচুয়া গ্রাম নিবাসী তরুণ শিবদাস মাহাতো। বামদেব তন্ময় হয়ে বসে আছেন। কিন্তু শিশুর মত তাঁর মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। গভীর রাত পর্যন্ত গত কয়েকদিন শ্রীবাম শ্মশানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রায় বিনিন্দ্র রাত যাপন করেছেন।

কিছুক্ষণ পর বামদেব মেঘ গম্ভীর স্বরে 'তারা তারা' বলে ডেকে উঠলেন। সমগ্র মহাশ্মশান প্রকম্পিত হ'ল সেই মহানাদে।

বামদেবের উপস্থিত শিষ্য ভক্তগণ একে একে বামদেবকে প্রণাম করলেন।

গোপেশ্বর মাষ্টারও যথারীতি সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করলেন বামদেবকে। এই প্রাজ্ঞ ভক্ত ও শিক্ষাব্রতী মনীষীকে দেখে বামদেব প্রসন্ন হলেন। স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছেন বাবা?"

গোপেশ্বর মাষ্টার সবিনয়ে বললেন, "আজ্ঞে বাবা, তারামা ও আপনার আশীর্বাদে ভাল আছি।"

অন্তর্যামী শ্রীবাম জানেন গোপেশ্বর মাষ্টারের অন্তরের জিজ্ঞাসা কি?

অধ্যাত্ম পিপাসু এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মনের বহু পিপাসা বামদেব ইতিপূর্বে মিটিয়েছেন। তাঁর সাধনার পথের বহু সমস্যার সমাধানও বামদেব করে দিয়েছেন কৃপা করে।

আজো কিছু নিগূঢ় জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছেন তিনি। কিন্তু অনেক লোকজন থাকায় গোপেশ্বর মাষ্টার তা জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ বোধ করছেন।

করুণাময় বামদেব তখন গোপেশ্বর মাষ্টারকে সেদিন তারাপীঠে থেকে যেতে বললেন এবং ইঙ্গিতে জানালেন যে রাত্রে তাঁর প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

গোপেশ্বর মাষ্টার আনন্দিত হলেন বামদেবের এই কৃপা লাভ করে। রাত্রে বামদেব নিভৃতে গোপেশ্বর মাষ্টারের নিগূঢ় অধ্যাত্ম মণ্ডিত সকল জিজ্ঞাসার যথারীতি উত্তর দিলেন।

অধ্যাত্ম পিপাসু গোপেশ্বর মাষ্টারকে বামদেব জ্ঞানবারি দিয়ে তৃপ্তিদান করলেন। পরদিন গোপেশ্বর মাষ্টার নিজগৃহে ফিরে গেলেন। এভাবে গোপেশ্বর মাষ্টার প্রায়ই তারাপীঠে আসা যাওয়া করেন।

ক্রমে তিনি বামদেবের দরবারে অন্যতম বিশিষ্ট পারিষদ রূপে সুচিহ্নিত হলেন। বামদেবের একাধিক অলৌকিক লীলাও তিনি প্রত্যক্ষ করে তাঁর জীবন সার্থক করেছেন।

পরিণত বয়সে এই ভক্ত প্রাণ ও মহান শিক্ষাব্রতী এবং সাধক প্রবর গোপেশ্বর মাষ্টার স্থূলদেহ ত্যাগ করে শ্রীবাম মণ্ডলে গমন করেন।

ভাগ্যবান হলধর দাস

মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান নিবাসী হলধর দাস দুরন্ত অম্লশূলের রোগে আক্রান্ত। গ্রামীন চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় তারাপীঠে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার শরণ নেবার জন্য ১৩১৬ সালে শীতকালে তারাপীঠে এলেন। বামদেবের শ্রীচরণ কমল ধরে কাতরভাবে জানালেন তাঁর এই অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক রোগের কথা। বামদেবের দর্শন ও পদধূলি লাভ করে ধন্য হলেন হলধর দাস। অচিরে তিনি রোগমুক্ত হয়ে ফিরে যান নিজ গ্রামে। হলধর দাস সকৃতজ্ঞ চিত্তে বামদেবকে

একটি গামছা উপহার দেন। বামদেব এই গামছাটি তাঁর নিম্নাঙ্গে রেখে নাম দেন 'হলা' গামছা। আর বামদেবের অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (মতান্তরে হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়) বামদেবকে একটি গামছা দিয়েছিলেন, হরিবাবুর দেয়া এই গামছাটি বামদেব উর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করে নাম দেন 'হরি গামছা'। এই 'হরি-গামছা' ও 'হলা গামছা' ব্যবহারে কখনো ব্যতিক্রম হয়নি বামদেবের।

হলধর দাস তারাপীঠ থেকে নিজগ্রামে ফিরে যাবার সময় তার লাঠিটি বামদেবের আশ্রমে ভুলক্রমে ফেলে রেখে যান। পরে সেই লাঠিকে উপলক্ষ্য করে বামদেব সেদিন রাতেই তাঁর প্রিয় ভক্ত ও সেবক এবং দুরন্ত হাঁপানী রোগগ্রস্থ যুবক নগেন্দ্রনাথ বাগচীকে সেই লাঠির দ্বারা মাথায় আঘাত করে নগেন্দ্রনাথ বাগচীর হাঁপানি দূর করেন। (বিস্তৃত বিবরণ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচী প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।) বামদেবের কৃপাধন্য হলধর দাস বামদেবের অন্যতম ভক্তরূপে বাম মণ্ডলে সুচিহ্নিত।

—০—

শ্রীবামের মৃত্যুর স্বরূপ প্রদর্শণ

১৩১৬ সালের বসন্তকালে মীরাট থেকে সুরপতি বসু নামে একজন সামরিক বিভাগের লোক এলেন তারাপীঠে বামদেবের কাছে। বামদেব বসে আছেন মহাশ্মশানে। সঙ্গে আরো কজন ভক্ত শিষ্য ও সুশীল রায়, অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য প্রমুখও রয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলো। একজন ভক্ত বামদেবের কাছে প্রশ্ন করলো "বাবা মৃত্যু ভয় আসে কেন?" বামদেব মৃদু হেসে বললেন, "তোরা

মরতে অত ভয় করিস কেন? মৃত্যু কাকে বলে দেখবি?" বামদেব এই কথা বলার সাথে সাথে ধীরে ধীরে বামদেবের স্থূলদেহ স্পন্দনহীন হয়ে পড়লো। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেল দেহে। ক্রমে দেহটা ঢলে পড়লো মাটিতে। উপস্থিত সবাই ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এমনি সময় একটি মড়ার খুলি হতে প্রচণ্ড অট্টহাস্য হতে লাগলো। সবাই সেই খুলিটার দিকে তাকালেন। খুলিটার ভেতর থেকে বামদেবের সুপরিচিত কন্ঠস্বর শোনা গেল—"একেই বলে মরণ, তোরা এই মরণকে ভয় পাস।" একটু পরেই দেখা গেল বামদেবের স্থূল দেহটা নড়ে চড়ে উঠলো। বামদেব উঠে বসলেন। সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল এই অলৌকিক ঘটনা দেখে। মৃত্যু যে আত্মার স্থান পরিবর্তন মাত্র তা বামদেব উপস্থিত সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। উপস্থিত সবাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে বামদেব পূর্ণ চৈতন্যময় মহাপুরুষ। আত্মানন্দে বিভোর এই শিবময় ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ অনায়াসে মায়াময় জড়দেহের বন্ধন ছিন্ন করে মৃত্যুকে করায়ত্ব করে নিয়েছেন। তাই অনন্ত স্বরূপ প্রাপ্ত তারাময় বামদেবের কাছে মৃত্যু পরাজিত ও পদানত। তাই তিনি ইচ্ছামত জড়দেহ থেকে যখন খশি বের হতে পারেন আবার প্রবেশ করতে পারেন। শুধু তাই নয় অষ্টসিদ্ধির পূর্ণ অধিকারী রাজযোগী বামদেব এই জড় দেহের মধ্যে বসে থেকেও তাঁর ইচ্ছা হওয়া মাত্র একই সাথে একাধিক স্থানে স্থূল দেহে ও সূক্ষ্ম দেহে তিনি তাঁর লীলা করে চলেছেন। তার অজস্র নিদর্শন রয়েছে তাঁর অফুরন্ত লীলামণ্ডিত জীবনে। সর্বদা ভক্ত শিষ্য পরিবৃত অবস্থায় থেকেও তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে যথারীতি লীলা করে যাচ্ছেন। তাঁর হুগলীর লীলা (মল্লিকঘাট শ্মশান), গঙ্গাসাগর লীলা, চট্টগ্রামের লীলা প্রভৃতি তাঁর লীলার নিদর্শন। অথচ সেই সময় তিনি স্থূল দেহে তারাপীঠেও রয়েছেন। আর স্থূল দেহে বিরাজ করেও তাঁর সূক্ষ্ম দেহের লীলার শেষ নেই। ব্রহ্মচারী তারানাথকে অমরনাথের মহাকাশে দর্শন দিয়ে আকর্ষণ, আবার গভীর রাতে জগৎচন্দ্রের (পরবর্তীকালে জগৎক্ষ্যাপা) বদ্ধ গৃহের মধ্যে আবির্ভাব ও আকর্ষণ প্রভৃতি ঘটনাসকল তারই নিদর্শন। শুধু তাই নয়

কুলনাথের নাথ বামাদেবের স্থূলদেহ ত্যাগের পরও স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে লীলার শেষ নেই। তাই মৃত্যুঞ্জয়ী বামাদেবের পক্ষে জড় দেহ থেকে বেরিয়ে আসা পুনরায় প্রবেশ করা অতি সামান্য ব্যাপার।

আসলে বামদেব হিন্দুশাস্ত্র ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্মত মৃত্যুর স্বরূপ প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন যে মৃত্যু বলে কিছু নেই। মৃত্যু হল নিত্য ও শাশ্বত আত্মার স্থান পরিবর্তন মাত্র।

শুধু আসা আর যাওয়া মাত্র। আত্মা যে পরমাত্মার নিত্য আনন্দময় অমৃতময় চিরন্তন অংশ।

সে অবিনাশী, নিত্য, অক্ষয় ও আনন্দ স্বরূপ। তাই মৃত্যু হল নিত্য আত্মার বৈচিত্র্য ও লীলার একান্ত সহকারী শক্তি মাত্র। আত্মার জীবন থেকে মহাজীবনের পথে এক মধুর বিরাম স্থল। আত্মা যে অবিনাশী তা মহামুনি ব্যাসদেবও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে পরলোক থেকে সাময়িক-ভাবে ইহলোকে নিয়ে এসে।

যাহোক মীরাটে ফিরে গিয়ে সুরপতি বসু এই কাহিনীটি তাঁর বন্ধু অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন। পরবর্তীকালে অবিনাশবাবু তাঁর ছেলেকে এই কাহিনীটি বলেন।

—o—

শ্রীবাম স্নেহধন্য শ্রীশ রায়

বাংলা ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাস। কলকাতার ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জী রোড থেকে শ্রীশ চন্দ্র রায় নামে একটি যুবক ও তাঁর বন্ধু পার্বতী চট্টোপাধ্যায় তারাপীঠে এলেন। শ্রীশ চন্দ্রের বয়স প্রায় আঠারো বছর। তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব বামাক্ষ্যাপাকে প্রণাম

করলেন যুবকদ্বয়। শ্রীবাম উভয়কে আশীর্বাদ করলেন। তারাপীঠের ঘোর মহাশ্মশান দর্শন করে শ্রীশ রায় ও পার্বতী চ্যাটার্জী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কলকাতার কেওড়াতলা, নিমতলা বা কাশী মিত্রের শ্মশান যেন তারাপীঠ মহাশ্মশানের কাছে মহাসিন্ধুর মাঝে বিন্দুর মত। তারাপীঠে থাকতে থাকতে একদিন শ্রীবামের কৃপায় শ্রীশ রায় শ্মশান বিভূতিও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করলেন।

এক দিন শ্রীশ রায় ও তাঁর বন্ধু শ্রীবামের নির্বিকার আহার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পাঠার নাড়িভুঁড়ি ও মুড়ি দিয়ে চর্চরি করে শ্রীবাম এক ধামা খেলেন।

যাহোক, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কাছে থাকতে থাকতে ভাগ্যবান শ্রীশ রায় ক্রমে ক্রমে তাঁর অপার কৃপা লাভ করলেন। শ্রীশ রায়ের প্রকৃতি সত্য ও ন্যায়ের এবং নির্ভয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট। চিরনির্ভীক ও স্পষ্টবাদী এই তেজস্বী যুবককে শ্রীবাম করুণা করলেন।

শ্রীবাম তাঁর এই চিহ্নিত সাধক সন্তানকে তাঁর দুর্লভ দিব্যসঙ্গ দিতে লাগলেন। শ্রীবামের কৃপায় মহাপীঠ তারাপীঠের মাহাত্ম্য ক্রমে ক্রমে তিনি উপলব্ধি করতে লাগলেন। কয়েকদিন পরম আনন্দ লাভ করে শ্রীশ রায় তাঁর বন্ধুসহ কোলকাতায় ফিরে গেলেন। কিন্তু চিরতরে তারাপীঠের ও শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার অমোঘ আকর্ষণে বাঁধা পড়ে গেলেন। কিছুদিন পরেই আবার শ্রীশ রায় তারাপীঠে ছুটে এলেন। শ্রীবামের কাছে দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হলেন। শ্রীবাম তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা বুঝতে পারলেন। কিন্তু গাছে যেমন ফল জন্মালেই সাথে সাথে পাকে না, ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, তেমনি দীক্ষার অঙ্কুর মনে উদয় হলেই দীক্ষার মন্ত্র পাওয়া যায় না। তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। শ্রীবাম শ্রীশ রায়কে জানালেন যে তাঁর এখনও সময় হয়নি। তাঁকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সময় মত তিনি দীক্ষা দেবেন। কিন্তু কৃপাময় শ্রীবাম তাঁর দুর্লভ সঙ্গ দিয়ে ও তাঁর বহু দুর্লভ অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করে মহাভাগ্যবান শ্রীশ রায়কে দীক্ষার উপযুক্ত

করে তুলতে লাগলেন ধীরে ধীরে। ১৩১৬ সাল থেকে ১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ পর্যন্ত (শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার স্থূল দেহে মর্ত্যলীলা সুসম্পন্ন করে অপ্রকট হওয়া পর্যন্ত) শ্রীশ রায় দীর্ঘ তিন বছর শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার নিবিড় সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করে মানবজীবন সার্থক করেন। তাছাড়া শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার বহু অলৌকিক লীলা ও তারামায়ের মহাদিব্য ছায়া মূর্তি দর্শন করেও ধন্য হ'ন।

একদিন শ্রীশ রায় তারাপীঠ মহাশ্মশানে বশিষ্ঠাসনের অদূরে চুপ করে বসে আছে। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা বাবা ধ্যানমগ্ন রয়েছেন বশিষ্ঠাসনে। এমন সময় এক মুমূর্ষু যক্ষা রোগীকে নিয়ে একটি খাটিয়া এসে সেখানে থামলো। খাটিয়া বহনকারী লোকেরা জানালো যে তারা বিশ মাইল দূর থেকে এসেছে এই যক্ষা রোগীকে নিয়ে। যদি বামাক্ষ্যাপা বাবা দয়া করেন তবেই এই মৃত প্রায় রোগী কেবল বাঁচতে পারে। সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন পাণ্ডা ও শ্রীবামের ভক্ত এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সব শুনে রোগীর লোকজনদের পরামর্শ দিলেন যে, যক্ষারোগীকে বশিষ্ঠাসনের একদিকে এমনভাবে রাখতে যে, ক্ষ্যাপাবাবা ধ্যান থেকে উঠলেই যেন দেখতে পান। একবার শ্রীবামের কৃপাদৃষ্টি পড়লেই যক্ষা রোগী ভাল হয়ে যাবে।

তাঁদের পরামর্শে রোগীর লোকজন সেই ভাবেই রোগীকে রাখলো। শ্রীবাম গভীর ভাবে সমাধিতে মগ্ন।

সেদিন কেটে গেল। তারপরদিনও সারা দিন রাত কেটে গেল। বামাক্ষ্যাপা গভীর ভাবে সমাধিতে মগ্ন। তৃতীয় দিনও একই ভাবে কেটে গেল। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার এমন গভীর সমাধি কদাচিৎ দেখা যায়। তাই সবাই চিন্তিত হলেন। চতুর্থ দিন শ্রীবাম চোখ মেলে তাকালেন।

তাকিয়েই দেখতে পেলেন সামনে সেই যক্ষা রোগীকে। খাটিয়ায় শুয়ে আছে সেই মৃত্যু পথযাত্রী।

শ্রীবাম সাথে সাথে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। মুমূর্ষু রোগীকে কানধরে তুলে একচড় মেরে বললেন, "শালা, পাপ করবার সময় মনে ছিল না?" এই বলে সবার সামনে যক্ষারোগীটি কি কি পাপ করেছে তা

বললেন। বলেই বামাক্ষ্যাপা বাবা মহাশ্মশান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

যক্ষা রোগীর লোকজনেরা ভাবলো রোগী বোধহয় মরে গেছে। কিন্তু শ্রীবামের ভক্তরা বলেন, "শ্রীগুরু বামের কৃপা স্পর্শ যখন পেয়েছে তখন রোগী নিশ্চয়ই বেঁচে আছে এবং ভাল হয়ে গেছে।"

ঠিক তাই। সবাই আনন্দে বিস্ময়ে দেখলেন রোগী চোখ মেলে তাকালো। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। শ্রী বামের অপার কৃপা স্পর্শ লাভ করে ধন্য হ'ল সেই ভাগ্যবান। সবাই তারামা ও বামাক্ষ্যাপার জয়ধ্বনি দিলেন। ত্রিলোক জননী তারামাকে প্রণাম ও পূজো দিয়ে সেই মহা ভাগ্যবান লোক সদল বলে পায়ে হেটে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত নিজ গ্রামে মনের আনন্দে ফিরে গেলেন।

আরেক দিন, শ্রীশ রায় দেখলেন এক অতি দুর্লভ দৃশ্য। শ্রীশ রায় তারামাকে প্রণাম করতে তারা মন্দিরে এসেছেন। এসে দেখলেন বামাক্ষ্যাপা বাবা তারা মন্দিরে বসে কাঁদছেন। যুবক শ্রীশ রায় ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা আপনার চোখে জল?"

উত্তরে সজল নয়নে বামাক্ষ্যাপা বাবা বললেন, "হ্যাঁ বাবা, তারামা আমাকে চড় মেরেছে।"

'কেন মেরেছেন তারামা?' জিজ্ঞেস করলেন শ্রীশ রায়।

শ্রীবাম বললেন, তারামা আমায় রেগে গিয়ে বললেন, 'তোকে এতসব শক্তি দিয়েছি, তুই যতলোক আসছে সবাইকে নির্বিচারে বিলিয়ে দিচ্ছিস, পাত্র অপাত্র বিচার করছিস না। আজে বাজে লোককেও দিচ্ছিস। ফলে ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে না! প্রারব্ধ খণ্ডন হচ্ছে না। তবু সব মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই তারামা রেগে গিয়ে চড় মেরেছে আমায়। আমি ঠিক করেছি আর কারোর উপকার করবো না।" শ্রীশ রায় একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ঠিক এই সময় শ্রীবামের পরিচিত একজন স্কুল শিক্ষক সেখানে এলেন। তাঁর কান পেকেছে। অসহ্য যন্ত্রণা। কান দিয়ে পূঁজ বের হচ্ছে। বামাক্ষ্যাপা বাবার চরণ তলে এসে তিনি বসলেন। শ্রীবাম মাষ্টার মশায়ের অসহ্য কষ্ট দেখে বললেন, "পণ্ডিত বাবা, কি হয়েছে আপনার?"

পণ্ডিত মশায় সকাতরে জানালেন তাঁর কানের অসম্ভব যন্ত্রণার কথা।

শ্রীবাম সাথে সাথে মাস্টার মশায়ের কানে হাত দিয়ে বললেন, "কোথায় ব্যাথা হচ্ছে বাবা?" এই বলে কানে হাত বোলাতে লাগলেন। তারপর বললেন, "পণ্ডিত বাবা, কোথায় ব্যাথা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না তো?"

পণ্ডিত মশায় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বামাক্ষ্যাপা বাবা তাঁর কানে হাত দেয়া মাত্র তাঁর কানের ভয়াবহ যন্ত্রণা ও পুঁজ রক্ত সব মিলিয়ে গেছে। তাঁর কান সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক রয়েছে।

আনন্দে আবেগে কৃতজ্ঞতায় বামাক্ষ্যাপা বাবার চরণ কমল ধরে বললেন, "ক্ষ্যাপাবাবা, আপনার পবিত্র স্পর্শ মাত্র কান ভাল হয়ে গেছে। আর আমার কোন কষ্ট নেই।" "শ্রীবাম অবাক হ'বার ভান করে বললেন, "পণ্ডিত বাবা, সব তারা বেটীর খেলা। আমি কিছু জানি না।"

পণ্ডিত মশায় মহানন্দে তারামা ও শ্রীবামকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

শ্রীবামের অশেষ কৃপা প্রাপ্ত ও দিব্য সঙ্গ ধন্য শ্রীশ রায় এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে আবার স্তম্ভিত হলেন। শ্রীবামকে বললেন, "একটু পূর্বে এই যে আপনি বললেন আর কারোর উপকার করবেন না। তাহলে পণ্ডিত মশায়ের কানের অসুখ কেন নিমেষে ভাল করলেন?"

শ্রীবাম বিচিত্র রহস্য ভরে উত্তর দিলেন, "বাবা, সব ঐ তারা বেটীর খেলা।" বলতে বলতে উঠে পড়লেন এবং শিমুলতলার দিকে যেতে লাগলেন।

আরেকদিন, শ্রীবাম তারামায়ের ভাবে বিভোর হয়ে গেছেন। এক ভক্ত তাঁকে গাঁজা সেজে দিলেন। শ্রীবাম ঐ বিভোর অবস্থায় গাঁজা খেতে লাগলেন।

টিকের আগুনে তাঁর হাটু পুড়ে গেল। জ্বলন্ত টিকে হাটু ওপরে পড়ে ক্রমে ক্রমে মাংসের মধ্যে ঢুকে গেছে। একটু পরে শ্রীশ বাবু সেখানে এসে এই অবস্থা দেখতে পেলেন। শ্রীবাম স্তব্ধ হয়ে গাঁজার কলকে

হাতে বসে আছেন। হাটু পুড়ে গেছে। চামড়া ও মাংস পোড়ার গন্ধ বের হচ্ছে। আশে আশে কেউ নেই।

শ্রীশ বাবু অস্থির হয়ে শ্রীবামকে ডাকতে লাগলেন। একটু পরে দেহবোধহীন শ্রীবামের হুস হ'ল। শ্রীশ বাবু শ্রীবামকে বললেন, বাবা, টিকের আগুন পড়ে আপনার হাটু পুড়ে গেছে।

শ্রীবাম তখন হাটুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে কি হবে বাবা?" বলতে বলতে হাটুর অগ্নিদগ্ধ স্থানে হাত বোলাতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল সব কিছু। আগুনে পোড়ার চিহ্ন মাত্র নেই, যথারীতি স্বাভাবিক।

এই অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করে শ্রীশ বাবু মহাবিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

একদিন শ্রীশ রায় মন্ত্রের জন্য ব্যাকুল হলেন। অন্তর্যামী শ্রীবাম বুঝলেন ভক্ত শ্রীশ মন্ত্র চাইছে। কিন্তু তার তো সময় এখনও হয়নি। আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। তাই গম্ভীর হয়ে বললেন, "সময় না হলে কিছু হবে না।" শ্রীশ বাবু বাধ্য হয়ে চুপ করে রইলেন। মনকে শ্রান্ত করলেন।

একদিন শ্রীবাম সন্ধ্যাবেলা দ্বারকা নদীর ধারে বসে আছেন। শ্রীশ রায় গিয়ে পাশে বসলেন। সহসা বিশাল মেঘের মত একটা বিরাট ছায়া এসে সামনে দাঁড়ালো। সাথে সাথে বামাক্ষ্যাপা বাবা বার বার নত হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। একটু পরে সেই ছায়া মূর্তি মিলিয়ে গেল।

শ্রীবামের চোখে মুখে গভীরভাব ও আনন্দাশ্রু লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে শ্রীশ রায় কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে শ্রীবাম বললেন, "ওরে, তারামা এসেছিলেন।" তাই শুনে যুবক শ্রীশ রায় জেদ ধরলেন তাঁকে তারামা দর্শন করাবার জন্য। শ্রীবাম হেসে বললেন, "সময় না হলে হয় না। দেখবার মত উপযুক্ত হতে হবে। তখন দেখা যায়।"

শ্রীশ রায় কিছুতেই সেকথা মানলেন না। শ্রীবাম আর কোন কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন। তার কয়েকদিন বাদে আবার

একদিন বিকেলে শ্রীবামের সাথে যুবক শ্রীশ রায় দ্বারকা নদীর ধারে বসে আছেন। ওপারে কবিচন্দ্রপুর। গোধূলীর আলোতে দ্বারকা নদীর জল সোনার মত রূপ ধারণ করেছে। আকাশ নির্মেঘ ও প্রকৃতি নিস্তব্ধ।

সহসা সেই অপূর্ব বিশাল দিব্য ছায়া শ্রীবামের সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্রীবাম সাথে সাথে বিভোর হয়ে বার বার প্রণাম করতে লাগলেন। এদিকে অদূরে একটি বিরাট সুউচ্চ নারকেল গাছ সহসা মাটিতে নুইয়ে পড়লো। আবার উঠলো, আবার নুইয়ে পড়লো। এইভাবে বার বার গাছটি ওঠানামা করতে লাগলো।

শ্রীশ রায় এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতবাক হলেন। কোন ঝড় বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই, অথচ এই অদূরবর্তী বিরাট উচু শক্ত নারকেল গাছটি বার বার নুইয়ে পড়ছে বামাক্ষ্যাপা বাবার সামনে উপস্থিত এই ছায়াটির দিকে। একি আশ্চর্য ব্যাপার! নারকেল গাছ ভীষণ শক্ত গাছ। সেই গাছ ভেঙ্গে না পড়লে এভাবে মাটিতে নুইয়ে পড়তে পারে না। সর্বদা সোজা উঁচু হয়ে থাকে।

অথচ কি আশ্চর্যের ব্যাপার, এই শক্ত গাছ আপাদমস্তক বার বার উঁচু থেকে মাটিতে সম্পূর্ণ নুইয়ে পড়ছে আবার উঁচু হয়ে সোজা হচ্ছে আবার নুইয়ে পড়ছে।

শ্রীশ রায় সেই ছায়া মূর্তির দিকে না তাকিয়ে মহা বিস্ময়ে সেই নারকেল গাছের আশ্চর্যভাবে বার বার নুইয়ে পড়া ও সোজা উচু হওয়া দেখতে লাগলেন।

একটু পরে সেই দিব্য ছায়া মূর্তি মিলিয়ে গেল। নারকেল গাছটিও যথারীতি আবার সোজা হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। শ্রীশ রায় এই অতি আশ্চর্য্য ব্যাপারের কারণ জানতে চাইলেন বামাক্ষ্যাপা বাবার কাছে।

উত্তরে শ্রীবাম বললেন, 'তারামা এসেছিলেন, তাই নারকেল গাছটা মাকে দেখে বার বার নত হয়ে প্রণাম করছিল। গাছটা মাকে দেখতে পেল, প্রণাম করলো, আর তুই মানুষ হয়ে মাকে দেখতে পেলি না ?

শ্রীশ রায়ের তখন হুঁশ হল। গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন। সত্যিই তিনি ছায়া মূর্তিটির দিকে ভাল করে না তাকিয়ে নারকেল গাছটিকেই দেখছিলেন।

পরে শ্রীবাম কৃপা করে বললেন, "সময় হলে দেখতে পাবি"।

সেই চির আকাঙ্খিত "সময়" শ্রীশ বাবুর জীবন সায়াহ্নে শ্রীবামের মাধ্যমে অলৌকিকভাবে এসেছিল।

বাংলা ১৩১৮ সনের ২রা শ্রাবণ। শ্রীবাম এই চিরস্মরণীয় দিনের প্রভাতী বেলায় শ্রীশ রায়কে ডেকে বললেন, "আজ আমি তারামার কাছে চলে যাব।" শ্রীশ রায় একথা শুনে কেঁদে ফেললেন। এই সরল স্পষ্টবাদী ভক্ত শ্রীবামকে অকপটে বললেন, "এই যে দু'তিন বছর ধরে আসছি ও সেবা করছি আপনার, তাতে আমার কি হ'ল? আপনি তো চললেন। আমি আর থাকবো না। আজই চলে যাব।"

শ্রীবাম তাঁকে অভয় দিনে বললেন, "সময় না হলে কিছু হবে না। তোর সময় হলে পাবি।" সেইদিন রাত্রে শ্রীবাম যোগাসনে দেহরক্ষা করলেন।

শ্রীবামের তিরোধানের পর শ্রীশ রায় কোলকাতায় ফিরে এলেন। শ্রীশ রায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করেছেন যে বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রী বামাক্ষ্যাপার কথা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। তাই শ্রীবামের কৃপায় তাঁর দীক্ষা ও তারামায়ের দর্শন এ জীবনে একদিন তাঁর হবেই হবে।

এই আশায় শ্রীশ রায় তাঁর দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবন যথারীতি অতিবাহিত করতে লাগলেন। এই মহাসৌভাগ্যবান বীরভক্ত শ্রীশ চন্দ্র রায়ের জন্ম ইংরেজী ১৮৯১ সালে নৈহাটির পৈত্রিক বাড়ীতে। বাড়ীটি গঙ্গার ধারে অবস্থিত। তাঁর পিতার নাম সতীশ চন্দ্র রায়। সতীশ রায়ের বিবাহ হয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছোট বোনের সাথে। তাই শ্রীশ রায় হলেন স্যার আশুতোষের ভাগ্নে। ইতিপূর্বে তাঁর মামা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও বামাক্ষ্যাপা বাবার কৃপা ও আশির্বাদলাভ করেছেন তারাপীঠে এসে। মামা ভাগ্নে উভয়েই বামাক্ষ্যাপা বাবার আশীর্বাদ ও কৃপাধন্য।

মহা ভাগ্যবান শ্রীশ রায় শুধু ব্যামাক্ষ্যাপার নিবিড় সান্নিধ্য ও অনেক অলৌকিক লীলাই দর্শন করেন নি, তিনি মধ্য জীবনে বামাক্ষ্যাপার বাবার কাছ থেকে অলৌকিক ভাবে সস্ত্রীক দীক্ষাও লাভ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীবাম দেহত্যাগের দিন (২রা শ্রাবণ, ১৩১৮) সকালে যুবক শ্রীশ রায়কে বলেছিলেন, "সময় হলে পাবি।" সেই 'সময়' অবশেষে এল মহাভাগ্যবান শ্রীশ রায়ের মধ্য জীবনে। ইতিমধ্যে শ্রীবামের দেহত্যাগের পর প্রায় পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে। শ্রীশ রায় কর্মজীবনে প্রবেশ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বিবাহ করেছেন: একে একে ছয় পুত্র পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে। ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জী রোড থেকে সাউথ এণ্ড পার্কে বাড়ী করে চলে এসেছেন। শ্রীশ রায় স্ত্রী পুত্র ঘর সংসার কাজকর্ম নিয়ে পুরোপুরি গৃহস্থ জীবন যাপন করছেন। শ্রীশ রায়ের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। এই সময় শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কথিত সেই 'সময়' উপস্থিত হ'ল অলৌকিক ভাবে শ্রীশ রায়ের কাছে। একদিন তিনি তাঁর সাউথ এণ্ড পার্কের বাড়ীর দোতলার বারান্দায় ক্যাম্প খাটে ঘুমিয়ে আছেন। সহসা স্বপ্নে দেখলেন এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে মহামন্ত্র দিলেন। মন্ত্রদানের পর সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন, "যে মন্ত্র তোকে দিলুম তা জপ করবি। পরে আরেক জন এসে একই মন্ত্র দেবেন।" এই বলে সেই ব্রাহ্মণ-বেশী মহাপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তার কয়েকদিন পর অদূরবর্তী পূর্ণ দাস রোডের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ মনোহর কালী মন্দিরের পুরোহিত শ্রীশ রায়ের বাড়ীতে এসে শ্রীশ রায়কে বললেন, "এক ব্রাহ্মণ এসেছেন। তিনি আপনাকে ডেকেছেন।"

শ্রীশ বাবু গেলেন মনোহর কালী মন্দিরে। দেখলেন এক মহাতেজ-দৃপ্ত ব্রাহ্মণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। শ্রীশ রায় কাছে যেতেই সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন, "কাল শিবরাত্রি, উপবাস করে তোরা স্বামী স্ত্রী আসবি। তোদের কাল দীক্ষা দেব।"

শ্রীশ বাবু বিস্মিত হলেন। কে এই ব্রাহ্মণ? তিনি তো এই ব্রাহ্মণের কোন পরিচয়ই জানেন না। অথচ এই ব্রাহ্মণ তাঁর নাম ধাম সব খবর রাখেন। যা হোক তিনি স্বীকৃত হলেন পরদিন আসবেন বলে।

পরদিন মহা শিবরাত্রির পুণ্য তিথিতে শ্রীশ বাবু স্ত্রীকে নিয়ে এলেন মনোহর কালী মন্দিরে। সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। তিনি শ্রীশ বাবু ও তাঁব স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার সময় এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটলো। সেই ব্রাহ্মণ কালী মন্দিরের বারান্দায় বসে হাত বাড়ালেন মা মনোহর কালীর শ্রীপাদপদ্মের দিকে জবা ফুল নেবার জন্য।

বারান্দা থেকে মনোহর কালী মূর্তি তথা শ্রীপাদপদ্ম প্রায় দশ হাত দূরে অবস্থিত ও কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত। আশ্চর্য্যের ব্যাপার সেই ব্রাহ্মণের হাত প্রায় দশহাত লম্বা হয়ে মা মনোহর কালীর চরণ কমলের কাছে পৌঁছলো। সাথে সাথে মা মনোহর কালীর পায়ের ওপর অবস্থিত জবা ফুলগুলো আপনা থেকেই সড় সড় করে নেমে সেই ব্রাহ্মণের বিরাট হাতের মধ্যে এল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রীশ বাবু ও তাঁর স্ত্রী প্রত্যক্ষ করলেন! তবে শ্রীশ বাবু তারাপীঠে শ্রীশ্রী বামাক্ষ্যাপা অনেক অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর কাছে এই ব্যাপার খুব আশ্চর্য মনে হ'ল না।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী মহাবিস্ময়ে অভিভূতা হলেন। তবে শ্রীশ বাবুর কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, যে ব্রাহ্মণ স্বপ্নে তাকে কয়েকদিন পূর্বে দীক্ষা দিয়েছেন, স্বপ্নে পাওয়া সেই মন্ত্রই এই ব্রাহ্মণের কাছে আবার পেলেন। দীক্ষার পর গুরুরূপে শ্রীশ বাবু ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে বরণ করলেন। কিন্তু কোথায় থাকেন জিজ্ঞেস করায় সেই ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

কোনদিনই তিনি শ্রীশ বাবুর বাড়ীতে আসেন নি।

শ্রীশবাবু গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে, স্বপ্নে যে ব্রাহ্মণ মন্ত্র দিয়েছেন এবং স্থূল দেহে যে ব্রাহ্মণ মন্ত্র দিলেন মনোহর কালীমন্দিরে মা মনোহর কালীর সামনে বসে, সেই দুই-ই এক ও অভিন্ন মন্ত্রদাতা এবং সেই মন্ত্রদাতা স্বয়ং তারাপীঠের শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। এই ছায়া ও কায়া দুই-ই স্বয়ং বামাক্ষ্যাপাবাবা।

পঁচিশ বছর পর্বে তিনি তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপা বাবার কাছে যে দীক্ষা চেয়েছিলেন, করুণাবতার বামদেব তা পঁচিশ বছর পর "সময়"

মত তাঁকে সূক্ষ্ম ও স্থূলে দিয়ে গেলেন এবং বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে সৎপ্রার্থনা ও ব্যাকুলতা কখনো ব্যর্থ হয় না। 'সময়' হলে ত্রিলোক জননী তারামা ও তিনি তা পূরণ করেন। তাঁরা যে সর্বদা ত্রিলোকের সকলের খবর রাখেন। সকলের অন্তরে বিরাজ করেন। যাহোক, দীক্ষান্তে ব্রাহ্মণরূপী শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা অন্তর্হিত হলে শ্রীশ রায় ও তার স্ত্রী সদাজাগ্রতা জগতজননী মনোহর কালীমাকে প্রণাম করলেন। এই সিদ্ধপীঠের মাহাত্ম্য অসীম। স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা এই পবিত্র দেবস্থানকে দীক্ষার জন্য নির্বাচন করায় শ্রীশ বাবু এই কালীমন্দির সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হলেন। এই প্রাচীন সিদ্ধ ক্ষেত্রর মাহাত্ম্য অপরিসীম। শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মহাকৃপা ধন্য গৃহী শিষ্য শ্রীশ রায় পরবর্তীকালে বামাক্ষ্যাপা বাবার প্রধান শিষ্য মহাত্মা তারাক্ষ্যাপার সান্নিধ্যও লাভ করেন। মহাযোগী তারাক্ষ্যাপা (ব্রহ্মচারী তারানাথ) একাধিক বার শ্রীশ বাবুর সাউথ এণ্ড পার্কের গৃহে পদার্পণ করেছেন এবং অবস্থান করেছেন। তারাসাধনার নিগূঢ় নির্দেশও তিনি মাঝে মাঝে দিয়েছেন গুরুভাই শ্রীশ রায়কে। জীবন সায়াহ্নে শ্রীশ বাবু ইষ্টদেবী তারামা ও শ্রীগুরু ব্যামাক্ষ্যাপার ধ্যানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

ইংরেজী ১৯৫০ সালে তারাসাধক শ্রীশ রায় মরদেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মময়ী তারামা শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার নিত্য কোলে চলে গেলেন পরম আনন্দে।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য শ্রীশ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবীন হৃষিকেশ রায়ের কাছে লেখক বিশেষভাবে চিরকৃতজ্ঞ। ইং ১৯৫৬ সালের ২২শে জুন রবিবার রাত্রে তিনি উপরোক্ত কাহিনীসকল লেখককে বলেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন তার মধ্যম ভ্রাতা ব্যোমকেশ রায় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুঞ্জকেশ রায়। এজন্য লেখক তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

—o—

শ্রীবাম সান্নিধ্যে স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

বাংলা ১৩১৬ সালের গ্রীষ্মের এক শান্ত সকাল। একটি বলিষ্ঠ তেজদীপ্ত যুবক তারাপীঠে এসে উপস্থিত হলেন। যুবককে দেখে প্রসন্ন হলেন বামদেব। একই সাথে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে ব্রতী ও আধ্যাত্মিক জগতের সুচিহ্নিত মহান সিদ্ধ মহাসাধকের সুলক্ষণ পুষ্ট এই যুবককে দেখে বামদেব সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বামদেবের দুই বিশিষ্ট শিষ্য তারাক্ষ্যাপা ও রামনাথ অঘোরী বাবাও মহান বিপ্লবী ছিলেন। এই যুবকের নাম বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নিবাস পূর্ববঙ্গে। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে কলকাতার রিপন কলেজে এফ-এ পড়ছেন। সত্যদ্রষ্টা বামদেব যুবককে দেশপ্রেমে যেমন উদ্বুদ্ধ করলেন তেমনি অধ্যাত্ম পথেও আত্মদর্শন ও আত্মউপলব্ধির জন্য সাধন নির্দেশ দিলেন। তাছাড়া যোগমার্গের উচ্চ আধার সম্পন্ন এই ব্রহ্মচারী যুবককে যোগপথের কিছু নিগূঢ় ক্রিয়া দান করলেন।

উত্তরকালে বামদেবের এই আশীর্বাদ, উপদেশ ও সাধনার পথ নির্দেশ যুবক বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসে রূপান্তরিত করতে অশেষ সাহায্য করে। একাধারে ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ, অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ওঙ্কারের নিত্য উপাসক, কুম্ভমেলায় অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর, শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা রূপে তিনি ভারতের অধ্যাত্ম জগতে এক মহান অধ্যাত্মগুরু রূপে সুচিহ্নিত হন। এই বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় চারবার কারাবরণ করেন।

অখণ্ড ব্রহ্মগায়ত্রী 'ওঁ' মহামন্ত্রের উপাসক, সমগ্র দেশব্যাপি 'অযাচক' আশ্রমের বিরাট স্থপতি, ওঙ্কারমন্ত্রদাতা, 'ওঁঙ্কার বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা, অখণ্ড ধর্মের প্রবর্তক, মহান কর্মযোগী ও মানবতার মহান পূজারী অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দ তথা সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'বাবামণি'র

সুদীর্ঘ সত্তর বছর ব্যাপী ভারত জুড়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ তাঁকে ভারতের অধ্যাত্ম জগতে স্মরণীয় ও বরণীয় করে তোলে। ফলে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী তাঁকে অধ্যাত্মগুরু রূপে বরণ করেন।

১৯৮৩ সালে কলকাতার কাঁকুরগাছি অযাচক আশ্রম তথা গুরুধামে শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের সাথে লেখকের সাক্ষাত হয়। অসুস্থ অবস্থাতেও আটানব্বই বছরের এই মহান ঋষি লেখকের মনের বাসনা পূরণ করেন। লেখকের সাথে ছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্য প্রখ্যাত শিল্পী প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ইতিপূর্বে স্বামী স্বরূপানন্দের অন্যতম গুণমুগ্ধ সুসাহিত্যিক তারা-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বামদেবের সাথে যৌবনে স্বামী স্বরূপানন্দের সাক্ষাতের ঘটনাটি স্বামী স্বরূপানন্দের অন্যতম প্রিয় শিষ্য খ্যাতনামা শিল্পী প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

উপরোক্ত কাহিনীর জন্য লেখক স্বামী স্বরূপানন্দের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। স্বামী স্বরূপানন্দের প্রিয় শিষ্য ও শিল্পী প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও লেখক কৃতজ্ঞ। সংযোগ ও সহযোগিতার জন্য স্বামী স্বরূপানন্দের মানসকন্যা সংহিতাদেবীর কাছেও লেখক অশেষ কৃতজ্ঞ।

১৯৮৪ সালের একুশে এপ্রিল শতবর্ষের প্রাক্কলগ্নে (নিরানব্বুই বছর অতিক্রম কালে) নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের মহান উপাসক এই পরম প্রাজ্ঞ ঋষি স্বেচ্ছায় ব্রহ্মলীন হন।

ব্রহ্মসমুদ্রের মহাতরঙ্গ আবার ব্রহ্মেই লীন হয়ে গেল বিশাল ঐশী কর্ম সুসম্পন্ন করে।

—o—